মন মাটি মানুষ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

প্রথম প্রকাশ : ১৩ই মাঘ, ১৩৬৩

প্রকাশক
শ্রীকিরীটকুমার পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
ব্লক সি, রুম ৩, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস
২৮/৪এ, বিডন রো
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদচিত্র
শিল্পী অজিত গুপ্ত

পরিকল্পনা
শ্রীসত্যনারায়ণ দে

নিয়ন্ত্রণ
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত

উপন্যাস ৪টি

মহানগরী	...	....	...	১
চৈতালী ঘূর্ণি	...	...	...	১৭৭
ব্যতিক্রম	...	...	...	২৯৮
প্রেম ও প্রয়োজন	...	...	...	৪২২

প্রকাশকের নিবেদন

শরতোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর অতুলনীয় মহত্ত্বে মণ্ডিত একটি নাম। তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রটি ব্যাপ্তিতে যেমন সীমাহীন, গভীরতায় তেমনি অপরিমেয় ও বৈচিত্র্যে চির আস্বাদ্যমান। দেশের অপসৃয়মান জমিদারতন্ত্র ও আধাসামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার ধূসর ভগ্নপ্রায় পটভূমিকায় শিল্পভিত্তিক নূতন নাগরিক সভ্যতার অভ্যগ্র পদসঞ্চার তাঁর মত এমন করে আর কেউ দেখেননি। নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে পিষ্ট কালের আত্মার ক্রন্দনধ্বনি এমন করে আর কেউ শুনতে পাননি তাঁর মত। এক সহজ সুন্দর প্রজ্ঞাদৃষ্টির অগ্রপ্রসারী আলোকে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে এমন জীবন্ত ও প্রোজ্জ্বলভাবে আর কেউ প্রতিভাত করে তুলতে পারেন নি। তারাশঙ্করের সৃষ্ট সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো সকল রকমের বহিপ্রভাবমুক্ত এক অসাধারণ স্বকীয়তা ও শক্তিমত্তা। তাঁর সুবিশাল সুদীর্ঘকালীন সাহিত্য জীবনের মূল বিবক্ষার বীজটি দেশের মাটি ও জলহাওয়ায় লালিত ও শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক দিগন্তের পথে স্বচ্ছন্দে মেঘের প্রসারিত করে দিয়ে এমন এক বিরাট রসঘন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে যার মধ্যে পাঠক মন আপনা থেকেই হারিয়ে যায় নিঃশেষে। তলিয়ে যায় এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসের গভীরে। মহানগরী, চৈতালী ঘূর্ণি, যতিভঙ্গ ও প্রেম ও প্রয়োজন— তারাশঙ্করের সাহিত্যপ্রতিভার অভ্রান্ত অভিজ্ঞানে উজ্জ্বল এই চারটি উপন্যাস গ্রন্থাগারের সাহায্য ছাড়াই যাতে বাঙালী পাঠকসাধারণ অতি সুলভ মূল্যে ঘরে ঘরে বরণ করে নিয়ে যেতে পারেন এবং যুগ যুগ ধরে তার রস আস্বাদন করতে পারেন তারই জন্য এই চারটি উপন্যাস একত্র সন্নিবেশিত করেছি আমরা এই সুবৃহৎ সংকলনগ্রন্থটিতে। স্বাভাবিকভাবেই আশা করব আমাদের এ প্রয়াস ব্যাপকভাবে সমর্থিত ও সমাদৃত হবে তাঁদের দ্বারা।

—কল্যাণব্রত দত্ত

মহানগরী

মহানগরী। স্বর্গলোকের ইন্দ্রপুরীর নাম বৈজয়ন্তী। সেখানে অন্ধকার নাই—আলোর রাজত্ব। সেখানে দুঃখ নাই শুধু সুখ আছে। সেখানে অশান্তি নাই শুধু শান্তি আছে। সেখানে অতৃপ্তি নাই শুধু তৃপ্তি আছে। সেখানে দৈন্য নাই, পরম ঐশ্বর্যে ঝলমল করছে সে পুরী! সেখানে জরামরণ নাই আছে অনন্ত যৌবন এবং অমরত্ব। হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, পাপ নাই, প্রেমের রাজত্ব, প্রীতির নিলয়, পুণ্যের-পবিত্রতায় নিষ্কলুষ, পবিত্র। তাই ধ্বংস নাই; মানুষ বলে মানুষ ধ্বংস হয়ে গেলেও স্বর্গপুর থাকবে।

এ মহানগরী মাটির বুকের উপর রচনা করেছে মানুষ। সম্ভবতঃ ওই বৈজয়ন্তীর মতই একটি পুরী রচনা করবার কল্পনায় সে সভ্যতার উন্মেষের প্রথম দিন থেকে পুরুষানুক্রমে বিভোর হয়ে আছে। ভাঙছে-গড়ছে, গড়ছে-ভাঙছে। অনিচ্ছায় ভাঙে স্বেচ্ছায় ভাঙে। প্রকৃতির মধ্যে চলে ভাঙাগড়া, শীতের পর আসে গ্রীষ্ম—গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা—আকাশে ওঠে কালবৈশাখীর ঝড়, ঝড় আনে মেঘ—মেঘের বর্ষণে আসে প্রলয় প্লাবনের মত বন্যা—সেই ঝড়ে নগর ভাঙে, বন্যায় ডুবে যায়, পলিমাটি চাপিয়ে দিয়ে যায় স্তরে স্তরে। ঝড় বন্যার সঙ্গে আছে আগুন। নগরকে যে দীপমালা মানুষ পরায়—তারই আগুন লাগে, যে অগ্নিকুণ্ডের আয়োজন মানুষ করে জীবনের প্রয়োজনে—সেই আগুন লাগে। আগেকার কালে আসত লুণ্ঠনকারী দস্যুদল—আসত নিষ্ঠুর অভিযানকারীর দল—তারা আগুন লাগিয়ে দিত—নগরীর মাথায় মাথায়, সম্পদভরা নগরীর ঘরে, নগর পুড়ে ছাই হয়ে যেত। মানুষ কিন্তু আবার গড়ত। এই নূতন গঠনে তার রূপ হত অভিনব, উজ্জ্বলতর। তার জীবনের আধুনিকতম আবিষ্কারকে সে কাজে লাগাত। আজকালকার অভিযানকারী আগেকার কালের মত ঘোড়ার ক্ষুরে

ধূলো উড়িয়ে বর্শাফলকে মানুষের মুণ্ড গেঁথে দাউ দাউ করে জ্বালানো মশাল হাতে নগরে ঢুকে আগুন লাগায় না। মাথার উপরে ওড়ে এরোপ্লেন—তাই থেকে ফেলে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক বোমা—বিপুল শব্দ করে বিস্ফোরণ হয়—মানুষের সাধের রচিত নগরীর ঘর বাড়ী টুকরো টুকরো হয়ে ধূলো হয়ে ভেঙে পড়ে, ইনসেণ্ডারী বোমায় আগুন লাগে। যেকালের কথা বলছি তখন এ্যাটমবম তৈরী হয় নি, যুদ্ধ তখনও লাগে নি; সুতরাং এ্যাটমবমের কথা থাক। আগুনে পুড়ে বোমায় ভেঙে নগর ধ্বংস হয়; মনে হয় এ আর কখনও গড়ে উঠবে না। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের উপর আবার মানুষ গড়ে সমৃদ্ধতর নগর। আগুনের পর আছে ভূমিকম্প—তারপর আছে মহামারী—মানুষের সৃষ্ট আবর্জনা থেকে উদ্ভব হয় মৃত্যুরোগের। মহামারীতে নগর হয় জনশূন্য—খাঁ-খাঁ করে।

ইতিহাসে গল্প আছে—গৌতম বুদ্ধ কুশীনগরে মহানির্বাণ লাভের জন্য যাত্রাপথে গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটল বৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে আনন্দকে বলেছিলেন—আনন্দ শোন, আমি দেখতে পাচ্ছি—ভাবীকালে এইখানে গড়ে উঠবে এক মহানগরী। কিন্তু উত্তর-কালে অগ্নিদাহে এবং জলপ্লাবনে সে নগর ধ্বংস হয়ে যাবে।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ অবশ্য হয় নাই। অজাতশত্রুর পত্তন করা পাটলীপুত্র ভারতবর্ষের রাজধানী হয়েছিল একদিন, সে নগর ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়েছিল। মাটির তলা থেকে আজ তাকে খুঁড়ে বের করছে মানুষ। কিন্তু পাটলীপুত্র একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, ইতিহাসের অজ্ঞাত এক অধ্যায়ের পরে আবার পাটলীপুত্র গড়ে তুলেছিল মানুষ, মুসলমানের রাজত্বে পাটনা ভেঙেছে গড়েছে, আবার ইংরেজের আমলে ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে আজ সে নূতন করে গড়ে উঠেছে।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর স্বর্গলোক কলকাতা মহানগরী। সমগ্র দেশের ভাবীকাল এইখানে রচিত হচ্ছে, বর্তমান নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে এইখানেই হয় এ দেশের মানুষের ভাববিনিময়, লেনদেনের বোঝাপড়া। বিমল এ মহানগরীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই সে পল্লীকে পরিত্যাগ করে এখানে এসেছে, এইখানেই সে বাস করবে, এইখানেই তার স্থান তাকে করে নিতে হবে।

বিমল গাছতলায় একটি বেঞ্চে বসে ছিল। সেখান থেকে উঠে ধীরে ধীরে এল এসপ্ল্যানেড ট্রাম ডিপোয়। পিছনে ষ্ট্র্যাণ্ডের ওধারে গঙ্গায় জাহাজের ষ্টীমারের বাঁশী বাজছে। গঙ্গার ধারে মিলে ভোঁ বাজল। খিদিরপুর বেহালা আলিপুরের ট্রামগুলো আসছে বিপুল গতিতে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে, ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ এবং ঘণ্টার শব্দ উঠছে। চৌরঙ্গি ধরে চলেছে বাস, মোটর, লরী; হর্ণ বাজছে, ইঞ্জিন গোঙাচ্ছে। কোথাও বোধ হয় কোন হোটেলে যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে। পার্কটার মোড়েই বিক্রী করছে ঘুঘনি, দহিবড়া, পকৌড়ি, গরমভাজা বেগুনী, আলুর চপ। কাগজওয়ালারা সান্ধ্য সংস্করণ কাগজ বিক্রী করছে। কয়েকজনে রেসের বই নিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে। উত্তরে সাততলা বাড়ীটার মাথার উপরে গোলকের মাথায় খুব জোরালো একটা বাল্ব জ্বলছে, ধর্মতলার মোড়ে গিসগিস করছে লোক; আলো ঝলমল করছে; উত্তর-পশ্চিম কোণে খাবারের দোকানটার মাথায় ইলেকট্রিক লাইট দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলছে।

—শুনুন।

ফিরে তাকিয়ে দেখেই বিমল বিরক্ত হল। বিশ-বাইশ কি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে ডাকছিল। আধুনিক রুচি অনুযায়ী কাপড় চোপড় পরা, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে একটা ব্যাগ। সে তাকে ডাকছিল—শুনুন।

মেয়েটির সঠিক পরিচয় না জানলেও মেয়েটিকে সে প্রায় নিত্যই এখানে দেখে। এমনি ভাবে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। তারপর অদৃশ্য হয় তাকে নিয়ে। শুধু ওই

মেয়েটি একা নয়, আরও অনেকে আসে। কালীঘাটের ট্রাম থেকে একটি মেয়ে নামে, নামে উল্কার মত গতিতে, ভিড় চিরে চলে হন্ হন্ করে। পাশ থেকে কেউ ডাকলে সাড়া দেয় না। সামনে গিয়ে গতিরোধ করে দাঁড়ালে তবে সে দাঁড়ায়। তারপর গিয়ে ওঠে কোন রেঁস্তোরায় অথবা ওঠে ট্যাক্সিতে অথবা ঘুরে পশ্চিম মুখে চলতে থাকে ইডেন গার্ডেনের দিকে।

বিরক্ত হয়েই সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটি এর পরেই যে কথা বললে তাতে সে আশ্চর্য হয়ে গেল, সে বললে—আপনিই তো বিমলবাবু?

চমকে উঠল বিমল। মেয়েটি তার নাম জানলে কেমন করে! শঙ্কিত হল সে। ব্লাকমেলিংয়ের কোন ফন্দী নয় তো? কিন্তু তাকে ব্ল্যাকমেল করে ফল কি? শত্রুই বা তার এমন কে আছে? ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে বললে—হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।

মেয়েটি একটু এগিয়ে এল। কাছে আসতেই বিমল তাকে দেখে আরও একটু বিস্মিত হল। যাকে সে ভেবেছিল এ তো সে নয়। একে কখনও দেখেছে বলে মনে হল না। মেয়েটি বললে—আপনাকে আমি বেডিয়ো আপিসে দেখেছি। আজ বিকেল [illegible] আপনি গিয়েছিলেন। আপনি গল্প পড়লেন সেখানে। আপনার নাম বললে। পড়া শেষ করে আপনি বাইরের আপিসে এসে চেক নিলেন, আপনাকে তখনই দেখেছি আমি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি সেখানে কেন গিয়েছিলেন? আমাকেই বা আপনার প্রয়োজন কিসের?

—আমি বড় বিপদে পড়েছি।

—বিপদ? কি বিপদ?

—কলকাতায় এসেছি আমি। আমার বাড়ী ঢাকায়। রেডিয়োতে গান করেন—ওখানে খুবই প্রতিপত্তি আছে বলে শোনা যায়—অরুণ রায়, চেনেন আপনি? চুল কোঁকড়া, খুব ফরসা রঙ।

—চিনি বৈ কি!

—তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমার গান শুনে তিনি বলেছিলেন কলকাতায় এলে আমি অনেক বড় ফিল্ড পাব। রেডিয়োতে তিনি প্রোগ্রাম করে দেবেন—সিনেমাতে বলে দেবেন, সেখানে আমি স্কোপ পাব। আমি তাই এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে—

মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে ফেললে—কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে বললে—আমার কোন আশ্রয় পর্যন্ত নেই। আমি—আমি—। আর সে কথা বলতে পারলে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

—সে কি? স্তম্ভিত হয়ে গেল বিমল।

—আজ রাত্রিটার মত আমায় কোন ভদ্র পরিবারের মধ্যে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

বিমল একটু চিন্তায় পড়ল। ঠিক বুঝতে পারছে না সে। মেয়েটি যার নাম করছে সেই অরুণ রায়কে সে জানে। অনেকেই জানে কলকাতা শহরে। বিশেষ করে ফ্যাশানেবল সোসাইটিতে। কখনও ধুতি পাঞ্জাবী, কখনও স্যুট, কখনও পায়জামা আচকান, কখনও পাঞ্জাবী ও চুস্ত পায়জামা পরে বেড়ায়, মোটরেই দেখা যায় বেশীর ভাগ। সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে কিসে সে বিশেষজ্ঞ নয়। কোন্ ক্লাবে সে মেশে না। তার পাশে অহরহ কোন না কোন তরুণী বান্ধবী থাকেই। যাকে বলে আলট্রামডার্ণ। বাপ দিল্লীতে বড় চাকুরে। সম্ভবত পুত্রের যোগ্য বাপ মা। সম্প্রতি কোন বিখ্যাত শিল্পীর বাড়ীতে তাকে দেখেছিল বিমল, তার সঙ্গে ছিল পাঞ্জাবিনীর পোষাকপরা এক তরুণী —পরিচয়ে জেনেছিল সে অরুণ রায়ের সহোদরা, তাদের সঙ্গে ছিল একজন পাঞ্জাবী মুসলমান ভদ্রলোক, সে হল অরুণের ভগ্নীপতি। কোন বিখ্যাত সমালোচকের আসরে তাকে দেখেছিল, সেখানে ছিল একটি ভিন্ন-প্রদেশবাসিনী কবিযশপ্রার্থিনী এক বান্ধবী। মেট্রো সিনেমার দরজায় দেখেছিল—সঙ্গে ছিল একটি এ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়ে,

সে নাকি ভারতীয় নৃত্যে পটিয়সী। অরুণ রায় খ্যাতিমান এবং সকল কর্মে পারঙ্গম।

মেয়েটি বললে—আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করছেন না?

বিমল স্পষ্টই বললে—দেখুন, আপনাকে আমি চিনি না। আপনি যে কাহিনী বললেন—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে—কাহিনী নয়, সম্পূর্ণ সত্য। হাতের ব্যাগ খুলে সে একখানি পত্র বার করে বিমলের হাতে দিয়ে বললে—পড়ে দেখুন, অরুণবাবুর পত্র।

বিমল পত্রখানি হাতে নিয়েও পড়লে না, বললে—কিন্তু আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করব? এখানে আমি একা থাকি একখানি ঘরে, খাই হোটেলে—আপনার ব্যবস্থা কোথায় করতে পারি ভেবে তো পাচ্ছি না। আপনি উঠেছিলেন কোথায়?

—হোটেলে। মেয়েটি তিক্ত হাসি হাসলে। বললে—খরচপত্র দিয়ে অরুণবাবু হোটেলে ঘরভাড়া করে রেখেছিলেন। ষ্টেশনে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়েও এসেছিলেন। তারপর—। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল মেয়েটি। তারপর বললে—হোটেল থেকে কোন রকমে বেরিয়ে এসেছি।

—দেশে চলে গেলেন না কেন?

—না। দেশে আমি ফিরব না। সে বারবার ঘাড় নেড়ে তার সংকল্পের দৃঢ়তার ইঙ্গিত প্রকাশ করলে। দেশে আমার কেউ নেই; আশ্রয় আমাকে খুঁজে নিতেই হবে। মানুষের উপর বিশ্বাস করে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই খুব বড় ধাক্কা খেয়েছি। বড় অসহায় অবস্থায় বাধ্য হয়ে আপনাকে ধরেছি। একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে হঠাৎ বললে—নইলে—নইলে—। চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল। তারপর বললে—সাহিত্যিকদের দুর্ণামের কথাও আমার অজানা নয়। তবুও দুর্ণামে তাদের ক্ষতি হয় এবং ওই অরুণ রায় কি—হঠাৎ থেমে সে এসপ্ল্যানেডের গেটটার থামের গায়ে লাগানো একখানি সিনেমার পোষ্টারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—ওই লোকটা—

—কে? বিস্মিত হয়ে বিমল প্রশ্ন করলে। কোন্ লোকটা?

—ওই যে পোষ্টারে ছবি রয়েছে। লোকটার নাম করতেও ঘেন্না হচ্ছে আমার।

'অভিসারিকা' নামক নবতম চিত্রাবদানের পোষ্টারে নায়ক রতন রায়ের হাসি মুখ দেখা যাচ্ছিল। আদর্শবাদী যুবকের ভূমিকায় রতন রায়কে দেখা যাবে। আগামী ২রা মার্চ ১৯৩৭ সালে শুভ উদ্বোধন হবে ছবির। দিনটি শুভদিন তাতে সন্দেহ নাই।

মেয়েটি বললে—অরুণ রায় কি ওই লোকটার সঙ্গে তাঁদের তুলনা আমি করি না। তা ছাড়া—এ সব বিষয়ে আপনার সুনামের কথাই শুনেছি। লেখা পড়ে বিশ্বাস করতে ভরসা হয়। তাই অসঙ্কোচেই উপযাচিকা হয়ে আপনার সাহায্য চাচ্ছি। রাত্রিটার মত কোন ভদ্রলোকের অন্দরমহলে আমাকে আশ্রয় দেখে দিতে হবে আপনাকে। এরই মধ্যে কতকগুলো গুণ্ডা দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে।

বিমল শেষ কথাটায় চকিত হয়ে উঠল। চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখেই বললে—আসুন। কালীঘাটের ট্রাম।

সামনেই দাঁড়িয়েছিল কালীঘাটের ট্রাম। সে উঠে পড়ল। পিছন পিছন মেয়েটিও উঠল। বিমল তাকে লেডিস্ সিটে বসিয়ে দিয়ে সামনের সিটটায় বসল। ১৯৩৭ সালের কথা—কলকাতায় এত ভিড় ছিল না তখন, ট্রামখানা খালিই যাচ্ছিল। সিটে বসে বিমল তার হাতের চিঠিখানা মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলে, বললে—রাখুন আপনার চিঠি।

—না। পড়ুন আপনি। আমি চাই চিঠিখানা আপনি পড়েন। খামখানা ঘুরিয়ে দেখে বিমল চিঠিখানা পকেটে রাখলে। মেয়েটির নাম—অরুণা ঘোষ।

দুই

চৌরঙ্গির ভিজে পিচঢালা পথ আলোর ছটায় কালো অজগরের মসৃণ পিঠের মত চকচক করছে। পশ্চিমদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে ; শীতের বাদলায় ময়দান আজ জনহীন। পূর্বদিকে ফুটপাথেও লোকের ভিড় নাই। দোকানের শো-কেসগুলি আলোকের প্রাচুর্যে ঝকমক করছে, বড়দিনের রঙীন কাগজের সজ্জা এখনও খুলে ফেলা হয় নি। ট্রামেও খুব ভিড় ছিল না। যারা ছিল তারাও সকলেই প্রায় নেমে গেল ভবানীপুরে, যদুবাবুর বাজার থেকে পূর্ণ থিয়েটারের মোড় পর্যন্ত। এদিকটায় লোকজনের ভিড় কিছুটা রয়েছে।

মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে জানালার বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভাবছে। অরুণা ঘোষ, মেয়েটির চিঠিতে ওই নাম লেখা রয়েছে। কি ভাবছে ও-ই জানে। অনেক উদ্বেগের পর একটা আশ্রয় পেয়ে পথশ্রান্ত পথিকের গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়ার মত অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এমনও হতে পারে, অথবা নিরাশ্রয় অবস্থার উদ্বেগে অধীর হয়ে এই অপরিচিত আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরে এখন তার ভবিষ্যতের ভালমন্দ বিচার করছে স্তব্ধ হয়ে—এমনও হতে পারে। বিমল ভাবছিল। ভাবছিল কোথায় তাকে নিয়ে যাবে। তার কয়েকজন সম্পদশালী আত্মীয়স্বজন আছেন। একটা রাত্রির মত আশ্রয় দিতে তাঁরা অস্বীকার করবেন না। কিন্তু—। এই সম্পদ-সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিমল জীবনে দূরে রেখেই চলতে চায়। এই মানুষগুলির মনোভাব বিচিত্র, উদারতা আছে কিন্তু সে উদারতা চেষ্টাকৃত, স্বভাবস্ফূর্ত নয়, উপকার করেন কিন্তু চিরদিন মনে করে রাখেন উপকার করেছি বলে, প্রত্যুপকারেও এ শোধ হয় না ; টাকা ধার দিয়ে সুদে-আসলে শোধ নিয়েও বলে থাকেন বিপদের সময় টাকাটা আমিই দিয়েছিলাম।

শিক্ষাও এদের আছে—বি-এ, এম-এ পাশও করেছে বংশধরেরা, বাড়ীর বহিরঙ্গে সাহেবীআনা প্রকট, সাহিত্য-আলোচনায়, জীবনের আচার বিচারের সমালোচনায়, নারীর অধিকার এবং নরনারীর সম্পর্কের গণ্ডী বিচারে যে সব ভাল ভাল কথা বলে থাকেন সে সব শুনে বিমলের মনে প্রথম প্রথম আক্ষেপ হত, মনে হত এঁদের কত পিছনেই না পড়ে আছে সে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে হৃদয়ঙ্গম করেছে মিথ্যাভাষণে এমন অদ্ভুত পটুত্ব শ্রেণীগত সংস্কৃতি হিসেবে এ দেশের অন্য কোন শ্রেণী আয়ত্ত করতে পারে নি। মনের মধ্যে আসলে এই শ্রেণীর মানুষগুলি যত সন্দিগ্ধ তত সংকীর্ণ, রঙ্গমঞ্চে কুললক্ষ্মীর ভূমিকায় রঙমাখা লালপেড়ে শাড়ীপরা অভিনেত্রীর সঙ্গে তুলনা করলে তবেই স্বরূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁদের ওখানে নিয়ে গেলে স্থান তাঁরা দেবেন, সমাদর করেই স্থান দেবেন কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে কুৎসিত সন্দেহ, স্বভাব অনুযায়ী জেগে উঠবে তাকে স্থির সত্য বলে প্রচার করবার জন্য একমুখ অধীর পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। মিথ্যানিন্দাকে বিমল ভয় অবশ্য করে না কিন্তু অকারণে তার অবকাশ দিতে সে চায় না কাউকে।

হাজরা রোড পার হয়ে কালীঘাটের ট্রাম ডিপোয় ট্রাম দাঁড়াল। বিমল উঠল—মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ডাকলে—উঠুন। এবার নামতে হবে।

চকিত হয়ে মেয়েটি বললে—ও। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠল।

বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে গেছে দুপাশে অসংখ্য ছোট রাস্তা। নূতন যুগে তৈরী শহরের এক অংশে গলি পথ নেই। এ যুগে গলি পথ অচল। পিচ-দেওয়া ঝকঝকে তকতকে রাস্তাগুলি—সুপ্রশস্ত না হলেও প্রশস্ত। তারই মধ্যে একটা রাস্তা ধরে একটা ছোট পাঁচ মাথায় এসে দাঁড়াল বিমল। একদিকে একটা বিস্তীর্ণ বস্তী। প্লটে মালিকরা বাড়ী না করে বস্তী তুলে ভাড়া দিয়েছেন। হিসেব করে দেখেছেন—এতেই সুদ পোষায় বেশী।

অরুণা প্রশ্ন করলে—কোন্ দিকে আপনার বাসা ?

বিমল পশ্চিম দিকটা অঙ্গুলী নির্দেশে দেখিয়ে দিলে।

—ও যে বস্তী !

হেসে বিমল বললে—ওরই প্রান্তসীমায় থাকি। এই যে বস্তীর উত্তর দিকের রাস্তাটা—ওইটেই বস্তী এবং বাসার মধ্যে বাউণ্ডারী লাইন হয়ে রয়েছে। এ পাশে এই যে বাড়ীগুলো—এই সারিরই বাড়ীগুলোর মধ্যে একটা বাড়ীর একখানা ঘর নিয়ে থাকি আমি।

—আমাকে কোথায় রাখবেন ? মেয়েটি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

বিমলের চট করে মনে পড়ে গেল তার স্বর্গত বন্ধু সাহিত্যিক রবীন্দ্র মৈত্রের নাটক—মানময়ী গার্লস স্কুলের একটা কথা। নিঃসম্পর্কিয় একটি পুরুষ ও নারী মনের জোর থাকলে—একই ঘরে ট্রেনের এক কম্‌পার্টমেণ্টের সহযাত্রীর মত রাত্রিটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু রসিকতা করবার প্রলোভন ত্যাগ করলে সে। কথাটা মনে হতেই ঠোঁটে যে হাসিটুকু ফুটে উঠেছিল—সেটুকু সে গোপন করলে না, হাসিমুখেই বললে—ভাবছি সেই কথা।

তারপর বললে—আসুন।

একটু দূরে একটা কয়লার ডিপো—তার সঙ্গে ছোট একটি মুদীখানা। সেখানে গিয়ে বিমল ডাকলে—চিত্ত ! সঙ্গে সঙ্গে একখানা লোহার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—বসুন।

বিমলের গ্রামবাসী চিত্তরঞ্জন। বয়সে বিমলের কনিষ্ঠ—ছোট খাটো মানুষ—দেখে মনে হয় পনের ষোল বছরের ছেলে, কানে খাটো ; আপন চেষ্টায় গড়ে তুলেছে এই মুদীখানা—কয়লার ডিপো। একদল লরীর মালিকের সঙ্গেও খানিকটা ভাগে কারবার আছে, নিজে একখানা লরী ড্রাইভ করে, মাল বইবার অর্ডারও সংগ্রহ করে, তার জন্য একটা বখরা পায় সে। ভাল ঘরের ছেলে কিন্তু লেখাপড়া শেখে নাই। প্রথম যৌবনে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। সন্ন্যাসী হয়ে আর্যাবর্ত ঘুরেছে। মধ্যপথে গেরুয়া ছেড়ে ড্রাইভারি করেছিল।

দেশে ফিরে ফিরিওয়ালার ব্যবসা করেছিল। সে ছেড়ে—প্রাইভেট ট্যাক্সীর ড্রাইভারি করতে গিয়ে পেশোয়ারীদের স্মাগ্‌লিংএর ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছিল। নূতন মাষ্টার বুইক গাড়ী নিয়ে কলকাতা থেকে যেত দুর্গাপুরের জঙ্গলের মধ্যের এক গোপন আড্ডায়, সেখান থেকে মাল নিয়ে রাত্রি দুপুরে ফিরত আড্ডায়। তার পাশে বসে থাকত একজন—কোমরে ছোরা, হাতে রিভলভার নিয়ে। কপটতা প্রকাশ করলে তখন সে ক্ষমা করে না, তার জন্যে ছুরি বার করে বসে প্রকাশ্যেই এবং তার জন্যে কোন ভয় নাই তার।

চিত্তরঞ্জন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই ভিতর থেকে উত্তর দিলে—দাদা! আসুন-আসুন-আসুন। এই রাত্রে? বলতে বলতেই সে এগিয়ে এসে অরুণাকে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—আপনি? কি চান—?

বিমল বললে—ওঁর জন্যেই তোমার কাছে এসেছি। উনি বড় বিপদে পড়েছেন, রাত্রিটার জন্য তোমার বাড়ীতে আশ্রয় দিতে পার?

চিত্ত অরুণার মুখের দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলে, বললে—কিছু মনে করবেন না। কাল সন্ধ্যাবেলা আপনি হোটেল উজ্জয়িনীতে ছিলেন না? এ্যাক্টর রতনবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন পশ্চিম দিকের খোলা বারান্দায় উত্তর দিকের কোণটায়—!

অরুণার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। চিত্ত বললে—ভুল হচ্ছে কি না জানি না। আমি ওই হোটেলটায় কয়লা সাপ্লাই করি কি না। ম্যানেজার চেয়ার টেবিল সাজাবার ব্যবস্থা করছিলেন, আমার তাড়াতাড়ি ছিল—সেখানেই গেলাম। ঠিক আপনার মত—

অরুণা এবার বললে—হ্যাঁ আমিই।

ঘাড় নেড়ে চিত্ত বললে—আপনিই! তাই তো বলি—এত ভুলই কি হবে আমার? তা হোটেল থেকে চলে এলেন কেন?

বিমল বললে—সে অনেক কথা চিত্ত। তবে উনি চলে এসেছেন —না এসে উপায় ছিল না। হঠাৎ আমায় রেডিয়ো আপিসে দেখে আমার পরিচয় পেয়ে আমায় একটু আশ্রয়ের জন্যে ধরেছেন। কোন

ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাত্রিটার মত আশ্রয় করে দিতে হবে। আমার তো ওই একখানি ঘর। অবশ্য ওঁকে ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে আমি তোমার দোকানে থাকতে পারি।

—উঁহু। ঘাড় নাড়লে চিত্ত। বললে—কথা উঠবে। যারা ওঁকে দেখবে আপনার ঘরে, তারা নানা কথা বলবে।

বিমল বললে—আমি বলছিলাম ওকে যদি রাত্রিটার মত বউমার কাছে থাকার ব্যবস্থা করে দাও—তুমি আমার ঘরে থাক।

বাধা দিয়ে চিত্ত বললে—সর্বনাশ। আপনার বউমাটিকে তো জানেন না। সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে। ওঁর চৌদ্দপুরুষ—আমার চৌদ্দদুগুণে আঠাশ পুরুষ—আপনার হয়তো বিয়াল্লিশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। চিন্তিত মুখে সে ঘাড় নাড়তে লাগল।

—বাবু! ডিপোর কুলী একজন এসে দাঁড়াল।

প্রশ্নের ভঙ্গিতে মাথা তুলিয়ে তার মুখের দিকে চাইলে চিত্ত। কানে খাটো চিত্ত ছোট খাটো প্রশ্নোত্তর ইঙ্গিতেই সেরে নেয় স্বাভাবিক নিয়মে। কুলীটা বললে—বাবুলোক ডাকছে।

বিমল একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। সে জানে ডিপোটার ভিতর দিকে কুলীদের ঘরে প্রায়ই চিত্ত এবং তার কয়েকজন বন্ধুর নৈশ আড্ডা বসে থাকে। এবং সে আড্ডায় চলে পান ভোজন। গোপনতা নাই, তবে সামাজিক ভদ্রতার খাতিরে ঘরের ভিতরেই বসে, গ্রীষ্মকালে ডিপোর কয়লার স্তূপের আড়াল দিয়ে খোলা জায়গায় পাতে প্যাকিং কেসের টেবিল এবং কয়েকটা মোড়া ও টুল। চিত্ত এখুনি গিয়ে মদ্যপান করে আসবে—তারপর অসঙ্কোচেই ফিরে এসে ক্রমশিথিল-বন্ধন রসনায় কথা বলতে সুরু করবে। সুতরাং সে ব্যস্ত হয়ে বললে—তা হলে ওকে আমি আমার ঘরটাই ছেড়ে দিচ্ছি। আমি তোমার এই মুদীখানাতেই শোব। বুঝলে!

চিত্ত বললে—দাঁড়ান দাঁড়ান। পাঁচ মিনিট। আমি আসছি। সে রাস্তায় নেমে পড়ল! বললে—এলাম বলে।

—কোথায় যাবে ?

—আসছি।

অরুণা কুণ্ঠিত স্বরে বললে—আমি আপনাকে বড় বিব্রত করলাম।

বিমল কোন উত্তর দিলে না। বিব্রত হয়েছে সে কথা স্বীকার না করে বিনয় দেখাবার মত ঔদার্য তার ছিল না।

অরুণা বললে—আমি বুঝতে পারছি, হোটেল ছেড়ে চলে আসা আমার উচিত হয় নি। কাল সকালে বেরিয়ে যা হয় করাই বোধ হয় ঠিক হত। কিন্তু আমি ভয় পেয়ে গেলাম। রতনবাবু যে রকম উৎপাত সুরু করেছিলেন—তাতে থাকতে ভরসা পেলাম না। সঙ্গে টাকাকড়িও বেশী ছিল না, সম্বলের মধ্যে কয়েকগাছা চুড়ি বিক্রী করলাম দায়ে পড়ে, হোটেলের দেনা মিটিয়ে যা থাকল তাতে অন্য হোটেলে উঠতে ভয় পেলাম। তা-ছাড়া—

বিমলের কোন সাড়া না পেয়ে মেয়েটি আর কথা বলতে উৎসাহ পেল না তবু মনে মনে সে আহত হল। একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে নীরব হয়ে গেল।

চিত্ত এসে এই সময়টিতেই বললে—আসুন। একটা ব্যবস্থা করেছি।

অরুণা তাকালে তার মুখের দিকে, তার মুখ থেকে বিমলের মুখের দিকে। তার দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্ন ছিল। সে জানতে চাইছিল —আশ্রয় স্থানটির বিবরণ। বুঝতে চাইছিল—সে স্থান গ্রহণ করা যেতে পারে কি না!

বিমলই প্রশ্ন করলে—কোথায় ব্যবস্থা করলে ?

চিত্ত বললে—পাড়াতে তিন চারটি বিধবা বেড়ায় দেখেছেন, বেশ আপ-টু-ডেট সাজপোষাক করে, পাড়ার ছোঁড়ারা যাদের কথা নিয়ে ঘোঁট পাকায়।

—হ্যাঁ। কিন্তু তারা কে ? কি করে তারা ?

চিত্ত হাসলে। বললে—আগে বিধবা মেয়েরা কাশী যেত। লোকেও পাঠাত—খারাপ মেয়েদের, আবার যার কেউ কোথাও নাই —সে যেত কাশী, বিশ্বনাথ রক্ষাকর্তা—আর খেতেও পেত—ছত্র ছিল—মঠ ছিল। এখন আর কাশী যায় না। আসে কলকাতায়, তীর্থ বলুন তীর্থ—নরক বলুন নরক—যা খোঁজে পায়। এ বিধবা চারটি থাকে একটি বাড়ীতে—আমার বাড়ীওয়ালার বাড়ীর পাশেই এক ভদ্রলোক থাকেন, তিনিই তাঁর বাড়ীতে দুখানা কামরা ভাড়া দিয়েছেন। ওদের একজন তাঁর নিজের লোকও বটেন। বাড়ীতে একটা সেলাইয়ের কল আছে, দোকান থেকে কাটা কাপড় নিয়ে এসে সেলাই করে দেয়, পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতে ঘোরে, বালিশের ওয়াড়, টেবিল ক্লথ, পর্দা তৈরী করে বিক্রী করে। আমার সঙ্গে জানাশোনা আছে—আমি অর্ডার-টর্ডার যোগাড় করে দি। তাদের ওখানে গিয়ে বললাম। তা তারা রাজী আছেন; তবে বাড়ীটি পাকা মেঝে বস্তী। তাতে আপনার অসুবিধা হবে না তো?

অরুণার চোখে মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল।—না-না-না। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব—

বাধা দিয়ে চিত্ত বললে—বিমলদা-কে দেন ধন্যবাদ। উনি যদি সঙ্গে করে না আনতেন আপনাকে—তা হলে—। কিছু মনে করবেন না যেন। ঐ হোটেলটায় ওই এ্যাক্টর রতনলালের সঙ্গে দেখার পর আমার বিশ্বাসই হত না—আপনি ভদ্রঘরের কি ভদ্রমেয়ে বলে। তবে উনি যখন এনেছেন—তখন আরও খারাপ দেখলেও বিশ্বাস করব আমি।

পাশের গলির মুখে লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে। বললে—কই চিত্তবাবু কে আসবেন?

চমৎকার দেখতে মেয়েটি। দীর্ঘাঙ্গী, বড় বড় চোখ—টিকালো নাক—বেশ মর্যাদাময়ী সুশ্রী মেয়ে। তেমনি সপ্রতিভ—অরুণাকে দেখে বললে—আসুন ভাই।

বিমলের দিকে চেয়ে নমস্কার করে বললে—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে সাহসই হয় নি, ইচ্ছে থাকলেও। আজকে এঁর দৌলতে সে সুযোগ হল।

বিমল প্রতিনমস্কার করলে। বললে—আপনাদের কথা চিত্ত আমাকে বলেছে, আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি। সত্যই শ্রদ্ধা করি।

তিন

প্রকাণ্ড বস্তী। সাধারণতঃ বস্তী বলতে যা আমরা বুঝে থাকি বস্তীর আবহাওয়া বস্তীর মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কল্পনা, আমাদের শিক্ষিত সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনকে একসঙ্গে ভয় ঘৃণা এবং রোমাঞ্চকর বিস্ময়কে জাগিয়ে তোলে—এ বস্তী সে বস্তী নয়। ছিটে বেড়ার এবং কাঠের ফ্রেমে গাঁথা টিনের দেওয়ালের উপর খাপরা বা টিনের চালওয়ালা বাড়ীর বসতিকে আমরা বস্তী বলে থাকি বটে, তবে এ বসতিটিকে বস্তী না বলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থের পল্লী বলাই উচিত।

দালালগিন্নী হিরণবাবুর মা—এই বস্তী বা বসতি স্থাপনের মূল। তিন পাশের পাকা বাড়ীর বাসিন্দাদের মধ্যে তখন এখানে বস্তী এ পত্তনের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ আন্দোলন মাটির নীচের এক মুঠো রের ছোলার মত চাপ বেঁধে অঙ্কুরিত হয়ে মাথা ঠেলে উঠেছিল। দালাল-গিন্নীর এই বাড়ীখানি দেখে সে আন্দোলনের মোড় ফিরে গেল। তাঁরা বললেন—এই ধরনের বসতি—যাকে বস্তী বলা যায় না—তা হতে দিতে আপত্তি নাই। জায়গাটির মালিকও ব্যবসায়ের মধ্যে নূতন পথ দেখলেন। খারাপ দিকটা অনেক ভেবে দেখলেন। দেখলেন, এইসব অসচ্ছল অবস্থার লোকগুলির কাছে ভাড়া আদায় করা কষ্টকর। বাকী

পড়বার সম্ভাবনা বেশী। এরা আইন জানে এবং দেখায়। সমস্ত বিবেচনা করেও তিনি দালালগিন্নীর পন্থানুসরণ করলেন। কারণ আইন জানলেও এবং দেখালেও এরা অত্যন্ত অসহায় এবং দুর্বল। থানায় এবং আদালতে যার পয়সা আছে তার বিরুদ্ধে আইন দেখিয়ে কোন লাভ হয় না। আইন এবং বে-আইন এই দুয়ের মধ্যে যে ছিদ্রপথ আছে সেই পথে যাতায়াতে তিনি অভ্যস্ত। এবং তার নিজের বাড়ীর সামনেই পড়বে এই বস্তী। এই বস্তীতেই একদিন এই দালালগিন্নী একটি বিধবা মেয়েকে দেখলেন। মেয়েটির নাম লাবণ্য। সন্তানহীনা—আত্মীয়হীনা—বিধবা হবার পর কলকাতায় এসেছিল অবলা শিক্ষাশ্রমে শিক্ষার্থীনী হয়ে। বৎসরখানেক থাকার পর—সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে এখন জীবিকার্জনের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্লাউজ-সায়া-সেমিজ সেলাই করে গৃহস্থ বাড়ীর বরাত মত। দালালগিন্নী তার মুখের দিকে চেয়ে মিষ্ট-ভাবেই বলেছিলেন—তাড়িয়ে দিলে কেন?

লাবণ্যের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। লাবণ্যের মুখের গঠনে দীপ্তি আছে, বড় বড় চোখ, টিকালো নাক, ধারালো ঠোঁট, রাগ বা ক্ষোভের রক্তোচ্ছ্বাসে মনে হয় শিখার মত জ্বলে উঠছে। লাবণ্য খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—সে অনেক কথা।

দালালগিন্নী আর কোন প্রশ্ন করেন নাই। তারপরও কয়েকদিন নিত্য দেখাশুনা হয়েছিল একই পথের এখানে বা ওখানে। দালাল-গিন্নী একই প্রশ্ন করেছেন—হেসে সস্নেহে প্রশ্ন করেছেন—কেমন সুবিধে হচ্ছে?

মেয়েটি কোনদিন বলত—হচ্ছে একরকম। কোনদিন চোখমুখ দীপ্ত করে বলত—ও সব জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন তো? কি বলব?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দালালগিন্নী প্রশ্ন করেছিলেন—কোথায় আছ আজকাল?

—প্রথম ওই কয়লার ডিপো করেন চিত্তবাবু। উনিই আমাকে এখানে একটা বস্তীতে আধাভদ্র আশ্রয় খুঁজে দিয়েছেন। ওই যে

ওদিকে গয়লাদের বস্তী রয়েছে ওই গয়লাদের বস্তীতে রয়েছি। একটি বাঙালী ব্রাহ্মণের মেয়ে একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে ঘর সংসার পাতিয়ে রয়েছে, ছেলে মেয়ে জামাই নিয়ে থাকে, তাদের বাড়ীতেই একখানা কুঠুরী ভাড়া নিয়েছি। দেখেছেন বোধ হয় তাকে, খুব মোটা, গলায় সোনার হার, পোষাকে বিধবা, সকালে পিতলের বালতীতে দুধ নিয়ে যায়। সঙ্গে থাকে কয়েকটা বড় লোমওয়ালা ছাগল। ছাগলের দুধও বেচে থাকে।

দুগ্ধব্যবসায়িনী সম্পর্কে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে দালাল-গিন্নী তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—সময় করে একদিন আমার বাড়ী এসো না কেন? আসবে?

—আসব না কেন? আপনার সময় হলে আজই যেতে পারি।

—কাজের ক্ষতি হবে না?

—কাজ? হাসলে লাবণ্য। বললে—ঘরে থাকতে পারি না বলেই বাইরে বেরিয়ে আসি, বাইরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি বলে মরতে ইচ্ছে করে। ঘরে গোয়ালিনীর সংসারের ঝগড়া—অশ্লীল কথা থেকে ঝাঁটা পর্যন্ত। বাইরে অভদ্র পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে পাশ ঘেঁষে যাবার ছলে মৃদুস্বরে আহ্বান—কখনও কখনও ইঙ্গিতময় স্পর্শ পর্যন্ত। কাজ পেলেও ঘরে থাকতে পারি না বলে কাজ শেষ হয় না, বাইরে ঘুরতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি বলে কাজ যোগাড়ও হয় না। বলে না জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ—আমার সেই অবস্থা।

দালালগিন্নী তখনই তাকে নিয়ে ফিরলেন। লাবণ্য সেইদিনই এ বাড়ীতে এসেছে। লাবণ্যের ভাগ্যক্রমে তখন বাড়ীতে দুখানা ঘরের চত্বরটা খালিই ছিল। তারই একখানা ঘর তাকে দিয়ে বলেছিলেন—আমার ঘর দুখানা তো পড়ে রয়েছে; তুমি থাক। সঙ্গতি হলে ভাড়া দিয়ো।

দালালগিন্নীর মমতা আন্তরিক। তিনি নিজে প্রথম জীবন থেকেই স্বাধীনভাবে ঘোরা ফেরা করছেন—লোকচরিত্র তিনি জানেন এবং

কথাবার্তা চালচলন থেকে ভালমন্দ তিনি বুঝতে পারেন, মেয়েটিকে তিনি অবিশ্বাসও করেন নাই। কিন্তু এই দুটি কারণেই তিনি লাবণ্যকে ঘরে স্থান দেন নাই। সম্প্রতি তিনি নিজের বিধবা কন্যাটি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। পুত্রবধূটির নিজের অধিকার সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর আশঙ্কা হয়েছে। ভাবীকালে তাঁর অবর্তমানে বধূ পূর্ণ গৃহিণীত্বে আসীন হলে মেয়ের অবস্থা কি হবে এই চিন্তা তিনি না করে পারেন না। লাবণ্যকে তিনি নিয়ে এলেন, মেয়ে অমলাকে তার সঙ্গে জড়িয়ে দেবার জন্য।

মাসখানেক যেতে না যেতে লাবণ্য আর একটি বিধবা তরুণীকে নিয়ে এল, আরও কিছুদিনের মধ্যে এল আর একজন; তারপর কিছুদিনের মধ্যে এল আর একজন। তখন দুখানা ঘরই তারা ভাড়া নিলে—তারপর কিস্তীবন্দীতে কিনলে একটা সেলাইয়ের কল। ক্রমশঃ পিক্টোগ্রাফের সরঞ্জাম, পশম বোনার কুরুশকাঁটা, ব্যাগ তৈরীর চামড়ার উপর কারুকার্য করবার সরঞ্জাম এনে মাঝখানের ঘর ছেড়ে—রাস্তার দিকের দুখানা ঘর ভাড়া নিলে; এর জন্য প্রচলিত ভাড়ার উপর পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিলে নিজে থেকেই। ক্রমে তিনজনের সঙ্গে আরও একজন এসে দল পুষ্ট করলে। দালালগিন্নীর মেয়ে অমলা ও চত্বরে থাকলেও সেও এখন একজন। অমলার বড় মেয়ে রাণী বড় হয়ে উঠেছে, সেও কাজকর্মের অবসরে এখানে আসে, শেখে। কট্‌কট্ কট্‌কট্ শব্দে সেলাইয়ের কল চলে—মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলে, কাজের কথাই বেশী, মধ্যে মধ্যে হাস্য পরিহাসও চলে। তার অধিকাংশই তাদের দৈনন্দিন কক্ষপথে আগন্তুক কোন বিভ্রান্ত পথিকের হুঁচোট খাওয়া বা পা পিছলে যাওয়া অথবা দুটি বিপরীত-মুখ বিভ্রান্তের পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার কাহিনীকে অবলম্বন করেই চলে। পরস্পরের প্রতি সরল বাক্যবাণও বর্ষণ করে। কখনও কখনও মৃদুহাস্য অকস্মাৎ কলহাস্যে ভেঙ্গে পড়ে। মধ্যে মধ্যে বাইরের দরজায় কড়া

নড়ে। ঝি দরজা খুলে দেয়, লাবণ্য উঠে যায় সামনের ঘরে। সামনের ঘরখানিতে একখানি লম্বা টেবিলের উপরে কিছু কিছু সব রকম কাজের নমুনা সাজানো থাকে। খান চারেক সস্তা দামের চেয়ারও আছে। আগন্তুক অধিকাংশই দোকানের লোক ; দোকান-দারেরাই এখন এদের কাছে জিনিষপত্র নিয়ে থাকে। লাবণ্যই বেশীর ভাগ সময় কথাবার্তা বলে। মধ্যে মধ্যে আসে চিত্ত। কখনও কয়লার দাম, মুদীর দোকানের জিনিষের দাম নিয়ে যায়। কখনও নতুন অর্ডার আনে। কখনও এমনিই এসে বলে—একটু চা খাওয়াও লাবণ্যদিদি। কখনও এসে বলে—একটা ছোকরা ঘুরঘুর করছিল। ছোঁড়াটার কান মলে দিয়েছে মহাবীর। পার্সটাও কেড়ে নিয়েছে—সে কথাটা লাবণ্যকে অবশ্য বলে না। লাবণ্যও পুলকিত হয়। কখনও চিত্ত সংবাদ নিয়ে আসে, চোরাই ছিটের থানের নমুনাও বার করে দেয়।

কখনও কখনও আসে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে দুজন ভদ্রলোক, একজন প্রৌঢ় একজন তরুণ। এঁরা দুজনেই শিল্পী। ডিজাইন নিয়ে আসে। ব্লাউস, ফ্রক, সায়া, টেবিল ক্লথ, বালিসের ওয়াড়, বালিসের ঢাকা প্রভৃতির উপর কারুকার্যের নক্সার নমুনা।

অরুণা এদের মধ্যে এসে সমস্ত দেখে শুনে অবাক হয়ে গেল। অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত কল চলল, গল্প চলল। আজকের গল্প সবই অরুণাকে নিয়ে। অরুণাকে প্রশ্ন করছিল ওরা। কোন প্রশ্নের জবাব দিতে সঙ্কোচ বা দ্বিধা করলে তারা অসঙ্কোচে নিজেদের কথা বলে অরুণার সঙ্কোচ কাটিয়ে দিলে। গল্প বলা এবং শোনার মধ্য দিয়ে পরস্পরের কাহিনী শোনা হয়ে গেল। লাবণ্যদের এই বেঁচে থাকার টিঁকে থাকার বিস্ময়কর অথচ অতি সহজ দ্বন্দ্বের কথা শুনে অরুণা প্রায় অভিভূত হয়ে গেল। সে বললে—আপনাকে দিদি বলব ভাই লাবণ্যদিদি।

লাবণ্য বললে—ইচ্ছে হলে বলতে পারেন। আমরা কিন্তু এখানে ভাই সবাই সখী। প্রাণের কথা মনের কথা কারও কাছে কেউ গোপন করি না।

অরুণা হেসে বললে—তা হলে প্রাণের কথা বলি। আমি আপনার কাছেই থাকতে চাই।

লাবণ্য হাসলে।

অরুণা বললে—আপনার মনের কথা তো বললেন না?

অরুণা বললে—তুমি লেখাপড়া শিখেছ ভাই। তুমি কি দর্জির কাজ নিয়ে থাকতে পারবে? আর কেনই বা তা থাকবে। লেখাপড়া জানলে আমিই কি এই নিয়ে থাকতাম?

অরুণা হেসে বললে—আই, এ পর্যন্ত পড়েছি, এ কি লেখাপড়া জানা? তা ছাড়া—।

—তা ছাড়া?

—তা ছাড়া—একটু দ্বিধা করেই বললে অরুণা—লাবণ্যদি, আপনার রূপ আছে আপনি বুঝতে পারেন না—যাদের রূপ নেই তাদের লেখাপড়া জানলেও চাকরী পাওয়ার কত কষ্ট। কালো মেয়ের সঙ্গে লোকে প্রেম করতে চায় কিন্তু বিয়ে—ওরে বাপরে—কালো মেয়ে তখন কালনাগিনী হয়ে ওঠে তাদের চোখে। বলে, ওরে বাব্বা! কি চক্রান্ত। নাগপাশে জড়িয়ে ফেলে দংশাতে চায়।

তিনটি মেয়েই হেসে উঠল। লাবণ্য হাসল না।

অরুণা বললে—ও আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছি লাবণ্যদি। তবে যদি তাড়িয়ে দেন সে আলাদা কথা।

লাবণ্য বললে—ভেবে দেখ।

পরদিন সকালে উঠেছিল অরুণাই সকলের আগে। লেপের মধ্যে শুয়েই সে শিয়রের জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে

তাকিয়ে ছিল। আজ বোধ হয় বাদলা কাটবে। কুয়াসা জমে উঠছে পৃথিবীর বুকে কিন্তু আকাশে মেঘ কাটা কাটা হয়ে দ্রুত ভেসে চলেছে। সে ভাবছিল গত রাত্রির কথা। রাত্রে ঘুমের মধ্যে মনের আবেগের ঘনত্ব অনেকটা লঘু হয়ে এসেছে। কয়েকদিন দুশ্চিন্তা এবং বিপদের আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছিল কাল। এখন ভাবছিল ভবিষ্যতের কথা। লাবণ্যের গত রাত্রির কথাটাই তার সত্য বলে মনে হচ্ছে। সারা জীবন সে এই দর্জির কাজ নিয়ে থাকবে কি করে? কেনই বা থাকবে?

ঠিক এই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল লাবণ্য। স্মিত হাসি মুখে সে বললে—উঠেছ? রাত্রে ঘুম হয়েছিল?

হেসে অরুণা বললে—হয়েছিল। শরীরটা হাল্কা বোধ হচ্ছে।

লাবণ্য বললে—কাল রাত্রে ভেবে দেখলাম অরুণা! এখানে থাকাই তোমার ভাল। হোক না দর্জির কাজ! চাকরীর চেয়ে অনেক ভাল। আর তোমাকে পেলে অনেক কাজ করতে পারব। বড় বড় সাহেবী দোকানে তুমি যদি আমাদের কাজ নিয়ে গিয়ে চালাতে পার—তবেই আমরা উন্নতি করতে পারব।

অরুণা তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, উত্তর দিলে না।

লাবণ্য বললে—মতের বদল করেছ নাকি?

অরুণা বললে—বিমলবাবুর সঙ্গে আজ একবার পরামর্শ করব।

লাবণ্য বললে—ওঁকে আজ ওবেলায় এখানে চায়ের নিমন্ত্রণ কর না। আমাদের এই সব দেখানোও হবে—পরামর্শ নেওয়াও হবে।

চার

মহানগরীর প্রভাত। আজকের সকালটি কুয়াসায় ঢাকা তীক্ষ্ণ শীত-কাতর।

বিমল এরই মধ্যে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিল ; এটি তার অভ্যাস। মহানগরীর এই নূতন অঞ্চলটিতে সমাজের নবোদিত অভিজাত বা আভিজাত্যের কোঠায় নূতন প্রমোশনপ্রাপ্ত শ্রেণীর সংখ্যাই বেশী। বনিয়াদী অভিজাত যাঁরা তাঁরা অনেক আগেই পুরাতন মহানগরীর শ্রেষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে বহুকাল আগেই এসে বাস করছেন। নূতন কালে ব্যবসায়ে, চাকরীতে অর্থ উপার্জন করে তার সঙ্গে নূতন কালের বাঙালী-জনোচিত সাহেবীয়ানা অর্থাৎ সস্তা মডার্ণ কালচার আয়ত্ত করে পুরানো কলকাতা থেকে সরে এসে উপনিবেশ স্থাপন করছেন। উপনিবেশ স্থাপনকর্তারা অধিকাংশই প্রৌঢ়—অনেকেই খেতাবধারী ; রাজা, স্যার প্রভৃতি উপাধির সংখ্যা কম—রায়বাহাদুর অনেক। ডেপুটি, ডি-এস-পি, সাবজজেরা খেতাব এবং পেনসন নিয়ে এই উপনিবেশে সমাজপতি হয়ে রয়েছেন। বাত, ডিসপেপসিয়া, এ দুটো রোগও তাঁদের মধ্যে খেতাব এবং পেনসনের মত সাধারণ। এর প্রতিকারের জন্য প্রাতর্ভ্রমণকারীর সংখ্যা অনেক। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে —হন্ হন্ করে—একলা এবং দল বেঁধে লেক থেকে আরম্ভ করে পার্ক পর্যন্ত প্রাতর্ভ্রমণকারীর ভিড় জমে যায়। এঁদের উত্তরপুরুষ অর্থাৎ নবীনেরা পার্কে পার্কে টেনিস ক্লাব করেছেন : নিখুঁত পরিচ্ছদে তাঁরাও শীতের ভোরে একদফা টেনিস খেলেন। একটু রোদ চাড়া দিলে—খাওয়া দাওয়া সেরে পার্কে আসেন অন্য দল, তাঁরা খেলেন ক্রিকেট। থলে হাতে বাজারযাত্রী গৃহস্বামীদের সংখ্যা এখানে কম। যাঁরা আছেন তাঁরা বড় রাস্তা ধরে হাঁটেন না, গলিপথে হাঁটেন ; দারিদ্র্যগত মানসিক জটিলতা, ব্যাধিতে অধিকাংশই এঁরা ব্যাধিগ্রস্ত।

অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশই বাজার করান চাকর দিয়ে, ভোজন বিলাস এবং কঠোর হিসাবীরা বাজারে যান চাকর সঙ্গে নিয়ে। কেউ কেউ যান মোটরে, তাঁরা লেকমার্কেট ছেড়ে যদুবাবুর বাজারেই যান।

যাক এত সব কথা। আজ কুয়াসা এবং শীতের জন্য প্রাতর্ভ্রমণকারীর সংখ্যা অনেক কম। কুয়াসার মধ্যে বিমলের কিন্তু ঘুরবার পথটা বেড়ে গিয়েছিল। নিয়মিত সে ওঠে মহানগরীর ঘুম ভেঙে হাঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। রাত্রি অবসানে মহানগরীতে জীবনের জাগরণ-সঙ্গীত পাখীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলেও শোনা যায় না, মহানগরীর নিজের ধ্বনি আছে। ধর্মজগতের সভ্যতায় হিন্দুরা বেদগান করতেন, ইসলাম জগতে আজান আজও ওঠে, মহানগরীর কালে—একসঙ্গে বাষ্প অথবা বিদ্যুৎচালিত বাঁশী বাজাতে থাকে। গঙ্গার বুকে, খিদিরপুর ডকে, গঙ্গার কূলে কূলে এপারে ওপারে মিলে মহানগরীর বুকের মধ্যে ছড়ানো ছোট বড় ফ্যাক্টরীতে বাঁশী বাজে। রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়ীর চাকার লোহার হালের শব্দ ওঠে, ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি জেগে ওঠে, বড় বড় ট্রাক, এবং মোটর বাসগুলির ষ্টার্ট নেওয়ার শব্দ ওঠে। মানুষের মধ্যে হোস পাইপ এবং মই কাঁধে ছুটতে থাকে কর্পোরেশনের উড়িয়া কর্মীর দল। রাস্তায় জল দেয়, আলো নিভিয়ে ফেরে। এ অঞ্চলে পথে গ্যাস-লাইট নাই বললেই হয়; মই কাঁধে আলো নেভানো বড় একটা দেখা যায় না।

বিমল চলতে সুরু করেছিল। সময় সম্বন্ধে খেয়াল হল—কুয়াসা কেটে সূর্যের আলো উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পরার পর। ফিরবার পথে 'দাদার দোকান', রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর উপরেই। এটি তার চা খাওয়ার আড্ডা। দাদা এ অঞ্চলে দোকানদার হিসাবে সর্বজন পরিচিত; ষ্টেশনারী জিনিষের দাম যত বেশী, চা ও খাবার তেমনি অখাদ্য কিন্তু তবু দাদাকে অবহেলা করবার উপায় নাই, কারণ দু দিকে দুশো গজের মধ্যে আর কোন দোকান নাই।

দাদা বিমলকে চেনে লেখক বলে, যথাযোগ্য সমাদরও করে, নমস্কার জানিয়ে সম্মান জানায়, ভাল দেখে চেয়ারখানা এগিয়ে দেয়, দোকানের ছোকরাদের বলে—দেখিস, নিমকী বেছে দিস, চা যেন ভাল হয়। নইলে—। হাসতে সুরু করে দাদা—হেসে বলে—নইলে দেবেন কোন লেখার মধ্যে এইসা ঢুকিয়ে—বাপস্! তারপর একটু কাছে এগিয়ে এসে বলে—এ—মানে কে—যেন বলছিল, এই—বাবুকে নিয়ে কি একটা লিখেছেন!

—কই না তো! বিমল নিস্পৃহ ভাবেই বললে, সে জানে এই অন্তরঙ্গতার হেতু। এইবার এই অন্তরঙ্গতার সুযোগে মৃদুস্বরে সে বলবে—চা নিমকীর দামটা দিন তো দাদা—রুটিওয়ালাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে—টাকা কিছু শর্ট আছে।

বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের দারিদ্র্যের খ্যাতি দাদার কাছে পর্যন্ত পৌঁচেছে। রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর উত্তরদিকেই অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের মস্তবড় বাড়ী, তাঁর মোটরখানাকে দাদা চেনে। কিন্তু শরৎচন্দ্র হিসেবে ভুল বলেই সকলে বিশ্বাস করে। ও কি রকম হয়ে গিয়েছে, নইলে লিখে টাকা হয়? দাদা এগুলি শিখেছে এ অঞ্চলের অভিজাত বাড়ীর ছেলেদের কাছে। যারা নাকি শরৎচন্দ্রের দর্জিপাড়ার দাদার বালীগঞ্জী সংস্করণ। সাহিত্যসভা করে এরা, সাহিত্যিকদের সভাপতি করে সম্মান দেয়, আবেগভরে আবৃত্তিও করে—'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান,' আবার দরিদ্র সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় বলে, ভ্যাগাবণ্ডস্ লোফার্স্। মধ্যে মধ্যে দু চারটে মিথ্যে গল্পও বানিয়ে ফেলে। বলে—আমাদের বাড়ী গিয়েছিল বাবার কাছে, টাকা ধার করতে। ফাদার সিম্প্‌লি বলে দিলেন—এই পাঁচটা টাকা দিচ্ছি ধার নয়, একেবারে। কারণ ধার দিলে আপনি শোধ দেবেন না এবং আপনার সঙ্গসুখ থেকে আমি বঞ্চিত হব। এমনি অনেক অনেক গল্প। দাদা সেইগুলি শুনেছে এবং সুকৌশলে দামটি আগে আদায় করে নেবার এই চতুর পন্থা আবিষ্কার করেছে। খেয়ে

শেষে যদি লেখক মশাই বলেই বসেন—দামটা আজ রইল—তবে জামা টেনে ধরাটা সম্ভবপর হবে না। ধরলে, যে ছেলেরা ঐ সব গল্প করে তারাই দাদার উপর চড়াও হয়ে উঠবে। বিমল খাবারের দামটি—একটি সিকি—টেবিলের উপর রেখে দিলে বিনা বাক্যব্যয়ে। ছোকরাটাও এনে নামিয়ে দিলে নিমকীর ডিসটা।

রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে চলেছেন বিখ্যাত প্রফেসার—একখানা বই বগলে নিয়েই প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। লেকের ধারে খুব মন্থর পদক্ষেপে বই পড়তে-পড়তেও তাঁকে বেড়াতে দেখেছে বিমল। পড়াটা তাঁর কৃত্রিম নয়—লোক দেখানোও নয়—সে কথা বিমল জানে।

বাসায় ফিরে দেখলে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে দুটি গল্প লিখতে সুরু করেছে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, বিমলের ভক্ত। একটি ছেলের বাপ কোন্ জেলার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট—কলকাতায় বাড়ী আছে, অপরটি মেসে থেকে পড়ে। প্রথম ছেলেটি সাহিত্যিকদের সহিত সুপরিচিত হবার জন্য সাধ্য সাধনা করে সাহিত্যিকদের নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে আসে—চায়ে খাবারে আদরে—আপ্যায়িত করেন তার মা। ছেলের চেয়েও মা অনেক বেশী সাহিত্যানুরাগিণী, রোমাঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেক লেখকের লেখা পড়েন—কবিতা গল্প উপন্যাস—নাটক—সব—সব। সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনাও পড়েন। তাঁরও অনেক অনুরোধ আজ পর্যন্ত অনেকবার এসেছে কিন্তু বিমল আজও তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই। ছেলে দুটিকে দেখে সে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। শুষ্ক কণ্ঠে বললে—কি খবর?

ছেলেটি হেসে বললে—আজ ওবেলা নির্মল রায় আসছেন—আপনাকে আজ যেতেই হবে, মা বলেছেন—

সঙ্গী ছেলেটি বললে—সুনীল একটা গল্প লিখেছে—পড়বে।

বিমল বললে—তোমার লেখাটা আমাকে দিয়ো, পড়ে দেখব কিন্তু যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে টেনে নিলে একটা ফাইবারের সুটকেশ। এইটাই তার লেখার ডেস্ক। একসারসাইজ বুক তার উপরে রাখাই ছিল, পাশে ছিল দোয়াত এবং কলম। আজও ফাউণ্টেন পেন কেনে নাই বিমল। এ দিক দিয়ে সে গান্ধীপন্থী; বিলাসের পর্যায়ে ফেলে সে ফাউণ্টেন পেনকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল লাবণ্য এবং অরুণা। স্মিত হাসিমুখে লাবণ্য বললে—লিখছেন?

বিমল মুখ তুলে তাকালে।

—একটু বিরক্ত করব।

বাধ্য হয়ে বিমলকে আহ্বান জানাতে হল—আসুন।

সমস্ত ঘরটাই প্রায় খালি। আসবাবের মধ্যে একখানা ছোট—দুজন বসবার মত—পুরানো আমলের ভেলভেট মোড়া কৌচ। এখানা চিত্ত জোর করে তাকে কিনে দিয়েছে—আলিপুরের নীলামী মালের আড়ৎদারদের কাছ থেকে ওই কৌচখানা আর একখানা ডেক চেয়ার।

ঘরের একদিকে তার সুটকেশ আর ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের উপরেই থাকে তার বিছানা। মেঝেতে বিছানো থাকে একখানা মাদুর, তার উপরে বসে সে লেখে।

লাবণ্য বললে—আপনি নীচে বসবেন, আমরা কৌচে বসব এ কি হয়।

বিমল হেসে বললে—নিশ্চয় হয়—আপনারা অতিথি।

—না আমরা ভক্ত।

বিমল উঠে কোণে ঠেসানো ডেক চেয়ার টেনে পেড়ে নিয়ে বসে বললে—এইবার বসুন। বলুন কি খবর?

—আজ বিকেলে আমাদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।

গোড়া থেকেই বিমল মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল। নিমন্ত্রণের কথায় তার অস্বস্তি ঘন হয়ে উঠল। বললে—হঠাৎ নিমন্ত্রণ কেন বলুন তো?

অরুণা বললে—আমার নিজের কিছু বলবার আছে আপনাকে, লাবণ্য দিদিদের অনেক কথা আছে। তা-ছাড়া আপনাকে কিছুক্ষণ পেতেও চান নিজেদের মধ্যে।

একটু চুপ করে থেকে বিমল বললে—কথা যা আছে সে এখনই বলুন না। তার জন্য নিমন্ত্রণ কেন?

লাবণ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে। তারপর হঠাৎ বললে—আমাদের ওখানে যেতে আপনার কি সংকোচ বা আপত্তি আছে?

বিমল বললে—আপত্তি নেই কিন্তু সংকোচ থাকলেও কি আপনি রাগ করবেন? (ওটা যে বুদ্ধিমানের ভূতের ভয়ের মত। যুক্তিবাদী বুদ্ধি বলে—ভূত নেই যখন তখন ভূতের ভয় কেন? মন বলে আমি নিরুপায়, ভয়টা মূলোর মত দাঁত মেলে কুলোর মত কান নেড়ে—তালগাছের মত লম্বা হয়ে খোনা গলায় হুঁ-হুঁ করে হাসছে, বুদ্ধি তোমার নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে।)

অরুণা হেসে উঠল। লাবণ্যও না-হেসে পারলে না।

বিমল বললে—আচ্ছা যাব। নিমন্ত্রণ নিলাম আপনাদের। কিন্তু কথাটা কি বলে রাখলে সুবিধা হত না? ভেবে রাখতে পারতাম।

—বল অরুণা। তোমার কথাতেই সমস্যা আছে। আমাদের কথায় সমস্যা নাই। আমরা আমাদের সুখ দুঃখের কথা বলব। সুখ নাই—দুঃখ। তবে দুঃখের মধ্যেও অনেক হাসির কথা আছে। সেটা চায়ের আসরেই হবে।

অরুণা বললে তার সমস্যার কথা। —কাল রাত্রে ওঁদের কথা শুনে—ওঁদের কাজকর্ম দেখে বলেছিলাম—লাবণ্যদি, আমি আপনাদের মধ্যেই থাকব। লাবণ্যদি বলেছিলেন—তুমি লেখাপড়া শিখেছ—গান গাইতে পার—তুমি এ দর্জির কাজ নিয়ে কেন থাকবে? আজ সকালে লাবণ্যদি বললেন—রাত্রে ভেবে দেখেছি তোমার এখানে থাকাই ভাল। কিন্তু সকালে উঠে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে লাবণ্যদি যা বলেছিলেন, তাই ঠিক। এ কাজ নিয়ে থেকে কি করব?

বিমল খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—কাল রাত্রে লাবণ্য দেবী যা বলেছিলেন, আজ সকালে আপনার মনে যা হয়েছে সেইটাই আমার মতে ঠিক।

লাবণ্যের চোখে এক বিচিত্র দৃষ্টি ফুটে উঠল। অস্বাভাবিক দীপ্তি তার মধ্যে। অরুণা তার দিকে তাকিয়ে একটু শঙ্কার সঙ্গেই ডাকলে —লাবণ্যদি।

লাবণ্য উত্তর দিলে না।

বিমল বুঝতে পারলে লাবণ্যকে। সে বললে—এই মহানগরীর জীবন—আমাদের সে কালের স্বল্পে তুষ্টির জীবন নয়। মন্থর গতির জীবন নয়, দ্রুতগতির জীবন। কেরোসিন ল্যাম্পের জীবন নয়, ইলেক্‌ট্রিক লাইটের জীবন।

তারপর বললে—জানেন এককালে গান্ধীজীর আদর্শে অনুরাগী ছিলাম। ভাবতাম—গ্রামই একমাত্র সত্য, মহানগরীকে ভয় করতাম, মনে করতাম এই মহানগরেই হবে মানুষের সমাধি। আজ মনে হয়—এই মহানগরেই হবে মানুষের সাধনার সার্থকতা। সে কালে শ্মশানে যেমন হত সাধকের শক্তিসাধনার সিদ্ধি।

পাঁচ

নিমন্ত্রণটা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হল বটে কিন্তু মনে মনে বিমল অপ্রসন্নই হল। এই মেয়ে দুটির সঙ্গে এমন ভাবে চা মিষ্টান্ন সহযোগে আলাপ করতে মন যেন সঙ্কোচ অনুভব করছে। বাঙালী জীবনেরই এটা একটা জটিলতা! এই জটিলতা পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-সমাজে অত্যন্ত বেশী। আলোকপ্রাপ্ত সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অপেক্ষাকৃত সহজ মেলামেশা প্রচলিত হয়েছে বটে কিন্তু এই সমাজের লেখক-দের লেখাতে দেখা যায় একটি তরুণ ও একটি তরুণী কোন একটি

ঘটনার সুযোগে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলেই পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায়; আলাপ হবার অপেক্ষা! অর্থাৎ তাঁদের সমাজেও 'ঘি এবং আগুনে'র প্রবাদটা আজও সত্য। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে রক্তসম্পর্ককে বাদ দিয়ে বান্ধব ও বান্ধবী সম্পর্ক গড়ে তোলবার মত শিক্ষা ও রুচিকে মন দিয়ে আজও গ্রহণ করতে বাঙালী পারে নি। অথচ যে যুগে যে সভ্যতার ভিত্তিতে এই মহানগরী গড়ে উঠেছে তাতে স্ত্রী এবং পুরুষকে চলতে হবে কর্মপথে সহযাত্রিনীর মত, হাঁটতে হবে একই ফুটপাথে, মিলতে হবে একই কর্মক্ষেত্রে। যুক্তির দিক দিয়ে বিমল ঐ কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে কিন্তু মানতে পারে না। শিক্ষা এবং সংস্কারের দ্বন্দ্বে আজও তার সংস্কার এ ক্ষেত্রে প্রবলতর।

হঠাৎ তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। এসে উপস্থিত হল বন্ধু নীরেন। শ্রী নামক মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। এরই মধ্যে তার স্নান আহার সব সারা হয়ে গেছে, আপিসে চলেছে। কাগজ বের হবে, আর মাত্র কয়েকদিন আছে। কাজের চাপ এখন বেশী। বিমল তাকে দেখে খুশী হল। মনে মনে সে যেন তাকেই কামনা করছিল।

নীরেন ধপ করে সেই ভাঙা সোফাটায় বসে পড়ে বললে—লেখা আছে? ভাল গল্প—খুব ভাল গল্প?

—গল্প কি হবে?

—চাই। খুব ভাল গল্প।

—কেন? এ মাসে তো রমেন বসুর গল্প দেবার কথা।

একটু চুপ করে থেকে নীরেন বললে—রমেনকে তো জানিস নে। লেখা শেষ করতে পারবে না জানিয়েছে। দিতে পারবি?

একটু ভেবে বিমল বললে—গল্প একটা ভেবে রেখেছি। চেষ্টা করে দেখতে পারি। রমেনবাবুর একটা গল্প পড়েই লেখার ইচ্ছে হয়েছিল। অভিজাত বংশ নিয়ে রমেনবাবু গল্প লিখেছেন। আমার ভাল লাগে নি, এদেশের অভিজাতের জাতকে রমেনবাবু জানেন না।

আবার একটু হেসে বললে—নীলরক্ত শব্দটা ব্যবহার করেছেন! Blue blood হয়তো ওদেশের অভিজাতদের শিরায় বয়ে থাকে, আমাদের দেশে কিন্তু নীলরক্ত চলে না।

—তবে বসে যা লিখতে। আমি রাত্রে আসব। উঠলাম।

নীরেন উঠল। বিমল খাতা কলম টেনে বসল। কিন্তু কয়েক-মিনিট পরেই নীরেন আবার ফিরল। বললে—তোকে সত্য কথাটা বলে যাই। রমেন গল্প দিয়েছে কিন্তু সে গল্প পছন্দ হয় নি সুরেশ-বাবুর। আমি বললাম—বিমলকে বলে দেখতে পারি যদি বলেন। খানিকটা ভাবলেন—ভেবে সুরেশবাবু বললেন, দেখতে পার। ও পারতে পারে। ওর ষ্টাইল ভাল নয় কিন্তু ওর বলবার কথা অনেক আছে। ভরসা সেইখানে।

মহানগরী কলকাতার এক প্রাচীন অভিজাত বংশীয়ের প্রায় দেড়শো বছরের পুরানো বাড়ী। নূতন কালের রাস্তা এবং আশ-পাশের জমি বাড়ীর উঠান থেকে হাত দুয়েক উঁচু হয়ে উঠেছে। চকমিলানো বাড়ী। দোতলার কাঠের বারান্দায় কাঠের রেলিং। পরপর তিনটি মহল। বড় হলে পুরানো আমলের ভারী আসবাব। মেঝেতে পাতা কার্পেটের পশম উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সুতোর দড়ি বিনুনী, তারও মধ্যে মধ্যে ছিঁড়ে গিয়েছে: কড়ি বর্গায় দীর্ঘকাল রং পড়ে নি, বহুকালের ক্ষয়ে যাওয়া দুচারখানা কড়ি ফেটে নুয়ে পড়েছে। কতকগুলো টালি ভেঙে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ছাদের জমানো খোয়ার দৃষ্টিকটু চেহারা। পলেস্তারা খসে গিয়েছে বহু-স্থানেই। দেওয়ালে ফাটল ধরেছে; জানালা দরজাগুলোর খড়খড়ি ভেঙেছে, কব্জা খসেছে। ওই দেওয়ালের ফাটল এবং জানালার ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে হু-হু করে। বর্ষার রাত্রি, বাইরে মৃদু বর্ষণের সঙ্গে উতলা বাতাস বইছে প্রবল বেগে! সেই বাতাস ঢুকছে ঘরে—শিসের মত শব্দ করে। কড়িতে বাঁধা লোহার

শিকল এবং হুকে ঝুলানো পুরানো কালের কয়েকটা ঝাড় লণ্ঠন সেই বাতাসে দুলছে, কলসে কলসে আঘাত খেয়ে টুং টাং শব্দ উঠছে। এই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সে শব্দ শুনে মনে হবে, কে যেন গুন্ গুন্ করে এক অতি করুণ বিষণ্ণ সঙ্গীত গেয়ে চলেছে।

ঘরে জ্বলছে একটি কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প, চিমনীর মাথাটা ভাঙা এবং কালো হয়ে উঠেছে শিখার কালিতে। পুরানো আলো। কলের দোষে—পলতের জীর্ণতা এবং অপরিচ্ছন্নতার জন্য শিখায় কালি উঠছে। এত বড় হলে ওই একটা দশ বাতির জোরের লালচে আলো—অপর্যাপ্ত এবং অস্পষ্টতার জন্য কেমন একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে। এই আলোর অস্পষ্টতার মধ্যে ঘরখানার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক দীর্ঘাকৃতি শীর্ণ মানুষ; খাঁড়ার মত নাক, আয়তচোখে বিহ্বল উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি ঘুরছেন; দেহের বর্ণ পাংশু পীতাভ; কবরের পাথরের আবেষ্টনীর তলায় যে ঘাস তার রঙের সঙ্গে এ রঙের তুলনা দেওয়া যায়। লালচে দশবাতির আলো তাঁর মুখ এবং অনাবৃত হাত দুখানির উপর পড়ে ম্লান মনে হচ্ছে। মাথার চুল নাই, টাক পড়েছে; পিছনে পাশে স্বল্প-খুঁটিয়ে ছাঁটা সাদা চুল—মূর্তিটির উপর সব চেয়ে বড় মহিমা আরোপ করেছে।

বহু বিভক্ত এই বাড়ীর সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ইনি। আজই এটর্ণির আপিসে গিয়ে এই বাড়ীর বিক্রী কোবালায় সই করে এসেছেন। কিনেছেন এক মিলওয়ালা। জীবন আরম্ভ করেছিলেন তিনি ভাঙা লোহার টুকরো কুড়িয়ে। এই বাড়ী ভেঙে নতুন বাড়ী করবেন তিনি। ফ্ল্যাট সিষ্টেমে ভাগ করে পাঁচতলা বাড়ী।

না বিক্রী করে উপায় ছিল না। কয়েকজন অংশীদার অনেক আগেই তাদের অংশ এঁকেই বিক্রী করেছে। অন্য দিকে তাঁদের দেনাও হয়ে উঠেছে আকণ্ঠ, চিন্তায়, তাগাদার অপমানে শ্বাসরোধ হয়ে আসছে।

আর কিসের জন্য কার জন্য এই ভগ্ন প্রাসাদকে ধরে রাখবেন? ছোট ভাই ব্যারিষ্টার হয়ে এসে—মেম বিয়ে করে—রেস এবং মদের দেনায় তলিয়ে গিয়েছে। তাঁর বড় ছেলে জোচ্চোর, সে তার বংশের দান দেহমহিমা এবং রূপকে মূলধন করে দেশে দেশে জাল রাজা সেজে প্রতারণার ব্যবসা ফেঁদে বেড়াতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে রয়েছে। মেজ ছেলে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ীতে বাস করছে, ধনী পিতার একমাত্র কুরূপা কন্যাকে বিবাহ করে আত্মরক্ষা করেছে। ছোট ছেলেটার ভরসা তিনি করেছিলেন। বংশোচিত দীর্ঘ অগ্নি-শিখার মত চেহারা, প্রদীপ্ত বুদ্ধি, উজ্জ্বল ছাত্রজীবন—মিহিরকে দেখে তাঁর ভরসা হয়েছিল মনে। কিন্তু মিহির নেমেছে পথের ধূলোয়, কংগ্রেসী ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে—চীৎকার করে হেঁটে চলে ধর্মঘটী মজুরদের শোভাযাত্রার পুরোভাগে। পূর্বপুরুষদের গাল দেয়। বলে—'ইংরেজ রাজত্ব যারা কায়েম করেছিল, বিদেশী বাণিয়াদের বেণিয়ানি করে, তাদের অবস্থার দিকে চেয়ে দেখ, ভাঙা জাহাজের মত পুরানো—পড়োপড়ো বড় বাড়ীগুলোর দিকে চেয়ে দেখ; তারা মরছে। তাদের জায়গা দিয়ে উঠেছে—নতুন বাণিয়াদের দল।'

তিনি হাসেন—বিষণ্ণ হাসি।

অক্ষম উচ্চাভিলাষী ক্রোধ! কিন্তু মিহিরের লজ্জা হয় না—ওই হতভাগ্য নোংরা ছোটলোকদের সঙ্গে এক সঙ্গে দাঁড়াতে?

মধ্যে মধ্যে পুলিশ আসে। প্রথম যেদিন পুলিশ আসে মিহিরের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে সেদিনের কথা তাঁর মনে আছে। অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর স্মৃতির মধ্যে। চার বছর আগে দিল্লী থেকে এসেছিল ভারত-বিখ্যাত বাঈজী। প্রৌঢ়া বাঈজী, স্থূলকায় মেদবাহুল্যে তার মুখের দিকে চাওয়া যায় না। তিনি চোখ বুজে বসে এই ঘরেই গান শুনছিলেন। অল্প কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন নিমন্ত্রিত। ঝাড় লণ্ঠনে সেদিনও জ্বলছিল বিজলী বাতি। এক একটি ঝাড়ে প্রায় দুশো আড়াশো বাতির প্রভা। তিনটে ঝাড় জ্বলছিল। বেহাগ আলাপ চলছিল

অপূর্ব সে রাগিণীর আলাপ ; প্রৌঢ়া বাঈয়ের কণ্ঠের স্বরমাধুর্য, সেই মাধুর্যের সঙ্গে সুদীর্ঘ সাধনার অপরূপ কারুকৌশল। হঠাৎ এল চাকর। কানে কানে এসে বললে—ডাকছেন জ্ঞাতি ভাই, পুলিশ এসেছে নীচে। চমকে উঠলেন। ইচ্ছে হল চাকরটাকে গুলী করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে বললেন—বসতে বলো, গান শেষ হোক, যাচ্ছি।

হঠাৎ দমকা বর্ষার বাতাসের একটা ঝটকায় সশব্দে একটা জানালার একখানা ভাঙা কাচ কাঠ ছেড়ে ছিটকে পড়ল ; সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল আলোটা। তিনি বিরক্ত হয়ে সুইচবোর্ডের স্থানটার দিকে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তিন মাস আগে অর্থাভাবে ইলেক্‌ট্রিক কনেকশন কেটে দিয়েছে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

নীচে একটা ঘোড়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে উঠছে। বুড়ো ঘোড়াটাকে আজও রেখেছেন তিনি। আর আছে ভাঙা ব্রূহাম একখানা। আস্তাবলের দরজায় তেরপলের পর্দা ছিঁড়ে গিয়েছে ; নতুন কেনার সামর্থ্য নাই ; জলের ছাটে বাতাসের দমকায় কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়। বাড়ীতে বন্দুক একটা আজও আছে! কার্টিজ নাই। থাকলে আজ ওটাকে গুলী করে মেরে নিশ্চিন্ত হতেন তিনি। আজ এই মুহূর্তে তিনি নিশ্চয় মারতে পারতেন।

বাইরে শব্দ উঠছে সিঁড়িতে। বেশ জোয়ান মানুষের বলিষ্ঠ পদ-ক্ষেপের শব্দ। কাঠের সিঁড়ি কাঁপছে। বুঝেছেন তিনি কে এল এই দুর্যোগের মধ্যে। হ্যাঁ সে-ই। বাইরের বারান্দায় মৃদু কম্পন উঠছে। তিনি ডাকলেন—মিহির!

—বাবা! একি—আলো নিভে গেছে? ফস করে দেশলাই জ্বাললে মিহির।

তাঁর ইচ্ছা হল চীৎকার করে ওঠেন, কিন্তু সে অভ্যাস তাঁর নয়, মুহূর্তে নিজেকে সম্বরণ করে মৃদুস্বরে বললেন—না।

—আলো জ্বালব না ?

—থাক।

বিমলের লেখায় বাধা পড়ল। ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল একটি দীর্ঘ বলিষ্ঠ যুবক। তার দিকে তাকিয়ে বিমল চমকে উঠল। তার গল্পের মিহির—রক্তমাংসের দেহ নিয়ে তার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। মিহির তার কল্পনার মানুষ নয়। সত্যিকারের মানুষ। তাদের বাড়ী তাদের ইতিবৃত্ত তার বাপ ও সে বাস্তব সংসারের জীবন্ত মানুষ। তাদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তার মামার বাড়ীর সঙ্গে এদের সম্বন্ধ ছিল। তা ছাড়া রাজনৈতিক জীবনে যে দলের সঙ্গে একদা জড়িত ছিল, মিহির আজ সেই দলের সভ্য। পুরাতন দলের আদর্শবাদে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নেতাদের একজন ছাড়া অন্যেরা আজ নানা দলে মিশে গেছেন।

মিহির বললে—গোপেন দাদা আপনার কাছে পাঠালেন।

—আমার কাছে ?

—হ্যাঁ।

বাইরে থেকে নারীকণ্ঠে কেউ ডাকলে—বিমলবাবু! সঙ্গে সঙ্গেই সামনে এসে দাঁড়াল—লাবণ্য।

বাইরে বেলা পড়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে আলো কম হয়েছে। মিহির সুইচটা টিপে আলো জ্বাললে।

আর কেউ আসছে। ভারী পায়ের শব্দ উঠছে। ভ্রূ-কুঁচকে বিমল প্রতীক্ষা করে রইল। লাবণ্য সঙ্কুচিত হয়ে একটু সরে দাঁড়াল।

—বিমলদা! কাকে এনেছি দেখুন। চিত্তরঞ্জন এসে দাঁড়াল। তার পিছনে এসে দাঁড়াল তার গ্রামবাসী, প্রায় সমবয়সীও, কালীনাথ—কলকাতার আই-বি অফিসার।

খাল বিলিতী পদ্ধতিতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অনুকরণে তৈরী—সার চার্লস টেগার্টের হাতে গড়া—বাংলাদেশের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পুলিশ বাহিনী। অদ্ভুত শক্তিশালী এবং তেমনি কার্যদক্ষ। কর্মচারীগুলির মন এবং মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন যন্ত্রের মত কাজ করে যায়। কালীনাথ কেন্দ্রীয় আই-বি-তে পূর্ববঙ্গের একটা জেলার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর। ওই জেলাটির সঙ্গে এখানকার যোগসূত্র রাখাই তার কাজ—এবং ওই জেলার যে সমস্ত বিপ্লববাদী কলকাতায় থাকে বা আসে-যায় তাদের কার্যকলাপের সন্ধান রাখাই তার ডিউটি। ওই জেলার সঙ্গে সংশ্রবহীন কলকাতার দলের কর্মীদের চেনা বা জানার কথা তার নয়। মিহির যে দলের অন্তর্ভুক্ত সে দলের কর্মক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার মধ্যেই আবদ্ধ। দলটি ভেঙে-ভেঙে এখন অত্যন্ত একটি ছোট দলে দাঁড়িয়েছে, কর্মী হিসাবে মিহিরও নূতন, বাংলাদেশের পুলিশেরা যাকে বলে পুরনো পাপী—সেই গৌরবজনক অ্যাখ্যা লাভ করতে এখনও পারেনি। মিহিরকে দেখে তবু কালীনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

বিমল মিহিরকে বললে—বলবেন আমি দেখা করব।

মিহির কালীনাথকে সন্দেহ করে নাই। সে বললে—আমাকে কিন্তু বলেছেন—সঙ্গে নিয়ে যেতে।

—কিন্তু—। বিমল একটু দ্বিধা করলে, লেখাটা শেষ করতে হবে। কালীনাথ দাঁড়িয়ে আছে—লাবণ্য দাঁড়িয়ে আছে, সে ফিরে তাকালে পিছনের দিকে যেখানে লাবণ্য দরজার পাশে দেওয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কালীনাথ হঠাৎ মিহিরকে প্রশ্ন করলে—আপনার নাম মিহির বোস না? দর্জিপাড়ার কার্তিক বোসের ছেলে?

মিহির একটু বিস্মিত হয়েই উত্তর দিলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালীনাথ এবার প্রশ্ন করলে—ও মেয়েটি কে? উনিও বুঝি—

বিমল মধ্যপথেই বাধা দিয়ে বললে—থামো কালীদা। এ ছাড়া আর কথা খুঁজে পেলে না।

চিত্ত তাড়াতাড়ি বললে—উনি আমাদের পাড়ারই মেয়ে, এখানে একটি সমিতি করেছেন, কয়েকজন মিলে। তাই দেখাবার জন্য বিমলদাকে চায়ের আসরে নেমন্তন্ন করেছেন।

—ডাকতে এসেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। লাবণ্য এবার দেওয়ালের কাছ থেকে সরে এসে সকলের সামনাসামনি দাঁড়াল। বললে, আমি যাই। উনি তো এখন খুব ব্যস্ত আছেন।

কালীনাথ না থাকলে বিমল এতে নিষ্কৃতি পেল বোধ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত—সঙ্গে সঙ্গে একটু বেদনাও হয়তো অনুভব করতো এইমাত্র। কিন্তু কালীনাথের সন্দিগ্ধ হাসির রেখা তাকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুললে, সে বললে—দাঁড়ান, আমি যাব আপনার সঙ্গে। ফিরে সে মিহিরকে বললে—আমি আপনার সঙ্গেই যেতে পারি, যদি আপনি একটু অপেক্ষা করেন। মানে এঁদের এখানে চা খেয়ে যাব আমি। আপত্তি যদি না থাকে তবে আমার সঙ্গে আসুন—চা খাবেন।

মিহির একটু হেসে বললে—চলুন।

বিমল কালীনাথকে বললে—আমায় যেতে হবে কালীদা।

কালীনাথ কিছু বলবার পূর্বেই চিত্ত বললে—আপনি যান, আমি ঘরে তালা দিয়ে যাব। কালীদা একটু বসবে এখানে। আমার ওখানটা তো খোলা মাঠ। এরপর খুব কাছে সরে এসে—ফিস-ফিস করে বললে—কালীদাকে একটু বিয়ার খাওয়াব।

বিমল কোন উত্তর দিল না, প্যাসেজটা অতিক্রম করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। লাবণ্য এবং মিহির তার অনুসরণ করলে।

আহারের পরিচর্যার পারিপাট্য হোটেলেও থাকে, বরং হোটেলে

যে পারিপাট্য সম্ভবপর সে পারিপাট্য অন্তত কোন সাধারণ বাড়ীতে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যে নিষ্ঠা এবং মমতার স্পষ্ট পরিচয় মেয়েদের হাতে বাড়ীর আয়োজনে পাওয়া যায়—পারিপাট্য সত্ত্বেও হোটেলে তা পাওয়া অসম্ভব। বিমল বিস্মিত হয়ে গেল—এখানে যেন দুয়েরই সমন্বয় হয়েছে। টেবিলের উপরে ধবধবে সাদা চাদর, জানালাগুলিতে সাদা পর্দা, দেওয়াল ঘেঁষে তক্তপোষ একখানি, তার উপরে ধবধবে সাদা চাদর বিছানো, টেবিলের উপরেও কাচের গ্লাসে টকটকে লাল সাটিনের তৈরী ফুল, ফুলগুলির চারিপাশে সবুজ সাটিনের পাতা; দেওয়ালের কোনখানে কোন ছবি বা ক্যালেণ্ডার নাই, সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটি শুভ্র শুচিতা যেন ঝলমল করছে ঘরখানির মধ্যে। ঘরে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিমল বললে—বাঃ!

একটু স্মিত হাসি ফুটে উঠল লাবণ্যের মুখে।

মিহিরও বললে—সুন্দর!

লাবণ্য বললে—আধঘণ্টা সময় দিতে হবে অন্তত। খাবার তৈরী করতে পনের মিনিট, আপনারা বসুন। আমি বসলে তো চলবে না। খাবারগুলো ভেজে নিই। আমি বরং অরুণাকে পাঠিয়ে দিই। লাবণ্য চলে গেল ভিতরে।

বিমল তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল; মনে হল এই শুভ্রশুচি ঘরখানির একটা অংশ যেন ঘরখানাকে অঙ্গহীন করে দিয়ে চলে গেল! লাবণ্যের পরিচ্ছদের মধ্যেও এই শুভ্রতার দীপ্তি, গায়ে তার ফুলহাতা সাদা লংক্লথের ব্লাউজ, পরণে ধোয়া থান কাপড়, সে যেন এই ঘরখানির মর্মকথার মত ঘরখানিকে মুখর করে সজীব করে রেখেছিল। বিমল প্রসন্ন পরিতৃপ্তচিত্ত নিয়ে বসল। মিহিরও বসল।

মিহির বললে—ইনি কে? চমৎকার রুচি।

বিমল উত্তর দেবার পূর্বে অরুণা এসে ঘরে ঢুকল। বিমল তাকে সম্বর্ধনা করে বললে—আসুন।

অরুণা একটু হেসে নমস্কার করে বললে—লাবণ্যদি বললেন, আপনি চলে যাবেন এখুনি।

—হ্যাঁ জরুরী তাগিদ রয়েছে। ইনি এসেছেন তাগিদ নিয়ে। এঁর সঙ্গেই যেতে হবে। বসুন আপনি।

অরুণা বসল না। টেবিলের প্রান্তভাগটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন কিছু চিন্তা করছে অথবা কিছু বলতে চাচ্ছে। বিমল তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব অনুমান করে, সঙ্কোচ কাটাতে সাহায্য করবার জন্যেই প্রশ্ন করলে—কি ঠিক করলেন?

অরুণা জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। কোন উত্তর দিলে না। মিহির বললে—কোন কথা যদি থাকে বিমলবাবু, আমি একটু না হয় বাইরে যাই।

বিমল সঙ্কোচ অনুভব করলেও অরুণা সঙ্কুচিত হল না, তার মুখে চোখে বরং উৎসাহের একটি চকিত দীপ্তিই ফুটে উঠল; তারপর সে বললে—পাঁচ মিনিট! মিহির বাইরে যেতেই সে চেয়ারে বসে পড়ে বললে—সারাদিন আমি ভেবে দেখলাম বিমলবাবু এখানে এইভাবে আমি—। বক্তব্যের শেষ অংশটুকু সে অসম্মতির ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে—না। না সে হয় না।

একটু চুপ করে থেকে বিমল বললে—কিন্তু কি করবেন?

অরুণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর বললে—আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন না? ফিল্মে কি গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গান দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না?

—না। বিমল ঘাড় নেড়ে কায়মনোবাক্যে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললে—না। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—ফিল্মে যদি ঢুকতে চান—তবে সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দিলেন কেন? রতনবাবুর মত নাম করা ফিল্ম এক্টরের সঙ্গে আলাপ রাখলে—যে কোন মুহূর্তে আপনি কণ্ট্রাক্ট পেতে পারেন।

অরুণা চমকে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেল বিমল—চমকানির সঙ্গে

মেয়েটির সর্বশরীর শিউরে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তে গলার সাড়া জানিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মিহির। বলল—বাধ্য হয়ে বাধা দিলাম আপনাদের কথায়। বাইরে একটি লোক ঘুরছে—উঁকি মেরে আপনাদের দেখলে কয়েকবার। অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হল।

বিমলের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কালীনাথের কথা মনে হল। সে কি এরই মধ্যে স্পাই লাগিয়ে দিলে তার উপর। কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? এই মুহূর্তে স্পাই—? সে উঠে দাঁড়াল—বললে—কোথায়?

বেরিয়ে এসে সে দরজায় দাঁড়াল। একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের লোক—কিংবা তার চেয়েও কমবয়স হতে পারে কিন্তু যুবক বলা চলে না, দাঁড়িয়ে আছে। কোল-কুঁজো, শীর্ণ, পরণে ময়লা কাপড়, ময়লা একটা জামা, ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, মাথায় লম্বা ঝাঁকড়া একমাথা রুখু চুল, মুখে গোঁফ দাড়ি অল্প, কিন্তু তাও খোঁচা খোঁচা হয়ে বড় হয়ে শ্রীহীন লোকটিকে আরও বিশ্রী করে তুলেছে, চোখে পুরু লেন্সের একটা চশমা—লোকটিকে দেখলেই মন কেমন বিরূপ হয়ে ওঠে। ভীরু অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা বললে—আমি লাবণ্য দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—কি নাম আপনার? কি দরকার আপনার?

—কে? পিছনে ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করলে লাবণ্য।

বিমল মুখ ফিরিয়ে দেখলে লাবণ্য এরই মধ্যে খাবারের থালা হাতে ঘরে এসে ঢুকেছে। সে বললে—একটি লোক আপনাকে খুঁজছে। দরজার মুখটা ছেড়ে সরে দাঁড়াল বিমল। খোলা দরজার পথে ওই কুৎসিত অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিটিকে দেখে লাবণ্যের মুখ প্রসন্ন হাসিতে সুস্মিত হয়ে উঠল—কয়েক পা এগিয়ে এসে সে সস্নেহ সম্ভাষণ জানিয়ে বললে—পিনাকী? এস—এস!

অপ্রতিভের মত একটু হেসে পিনাকী বললে—হ্যাঁ। নমস্কার করলে সে।

লাবণ্য তাকে প্রতিনমস্কার করলে না। আবার বললে—এস। ভেতরে এস।

—যাব? এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হয়ে যাক।

—না-না। কথাবার্তা নয়, খাওয়া দাওয়া। এঁদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছি। এস, তুমিও এস। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন সাহিত্যিক বিমলবাবু। ইনি এঁর বন্ধু। আর ইনি হলেন পিনাকী ঘোষ, শিল্পী একজন। আমাদের খুব উপকারী বন্ধু। আমদের ফ্রক ব্লাউস বেডশীট বালিশের ওয়াড়ের ওপর ডিজাইন এঁকে দেন। ভারী চমৎকার ডিজাইন করেন। ছবিও আঁকেন খুব সুন্দর।

অপরাধীর মত পিনাকী বললে—আমার একখানা ছবি 'বঙ্গভূমি' মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। কিন্তু নতুন আর্টিষ্টের অসুবিধে তো জানেন। মানে নতুন কিছুকে সহজে তো লোকে নেয় না। তারপর অপ্রতিভের মত হেসে বললে—খুব গরীব আমি। বেঁচে থাকতে হবে তো। তাই কমার্শিয়াল আর্ট করছি সঙ্গে সঙ্গে। এঁরা কিছু কিছু ডিজাইন নেন—

লাবণ্য বাধা দিয়ে বললে—সব ডিজাইনই তো তোমার। এবার মেঘ-বিদ্যুৎ ডিজাইনটা খুব ভাল হয়েছে, খুব আদর করে নিয়েছে দোকানদারেরা।

হাসতে লাগল পিনাকী।

—বস—খাও। বসুন বিমলবাবু, আপনিও বসুন। বড় একটা থালা থেকে গরম নিমকী সে কাচের প্লেটে পরিবেশন করতে লাগল। বিমল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল পিনাকীকে। পুরু লেন্সের ভিতরে চোখদুটিকে ঠিক ঠাওর করা যায় না, তবুও সমস্ত কিছু মিলিয়ে পীড়িত অপরিচ্ছন্ন মলিন অবয়ব এবং বেশভূষার মধ্যে একটি উদাসী অথবা উপবাসী মানবাত্মা যেন উঁকি মারছে ওই দৃষ্টির মধ্য দিয়ে। বাইরের অপরিচ্ছন্নতা এবং ভঙ্গির এই দীনতার জন্য লোকটির উপর ঘৃণা বা

বিরক্তি অর্থাৎ একটা বিরুদ্ধভাব মানুষের মনে জাগবেই—তবুও লোকটির জন্য অন্তর করুণায় ভরে উঠবে।

লাবণ্য বললে—খান।

পিনাকী চোখ বন্ধ করে গব্ গব্ করে খাচ্ছে। বিমল হেসে একখানা নিমকী মুখে তুললে। লাবণ্যের একজন সহকর্মিণী একটা থালায় গরম সিঙাড়া ভেজে নিয়ে এল।

লাবণ্য বললে—এ আমাদের মলিনা। বানে ভেসে চারটি কুটো আমরা চরে এসে একসঙ্গেই ঠেকেছি, মলিনা—আমাদের এক কুটো। তারপর অরুণার দিকে তাকিয়ে বললে—পঞ্চম কুটো আমাদের অরুণা; কিন্তু ও এখনও দুলছে, একটা চরের কুটোর সঙ্গে আটকেছে, অন্য মাথাটা স্রোতের টানে ছুটতে চাচ্ছে। কি হল?

এতক্ষণে পিনাকী চোখ তুলে অরুণার দিকে তাকালে—বললে—এঁর কথা বলছেন বুঝি? ঘাড় ঝুঁকে সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে পুরু লেন্সের মধ্য দিয়ে।

অরুণার মুখ লাল হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। লাবণ্য বললে—পিনাকী, তোমার সহজ বুদ্ধি কখনও হবে না। এমন করে কি দেখছ তুমি?

পিনাকী বললে—দেখছিলাম, বলে সে থেমে গেল, তারপর অপ্রতিভের মত বললে—মানে, মনে হল ওঁকে যেন কোথায় দেখেছি। আবার একটু থেমে বললে—জানেন, আমার আঁকা বিজ্ঞাপনের একটা ছবি আছে, খুব বিষণ্ণ মেয়ের মুখের ছবি, বন্ধ্যা মেয়ে আর কি; সেই ছবির মুখের সঙ্গে খুব মিল আছে। তাই মনে হচ্ছিল—চেনা মুখ। আবার একটু ভেবে বললে—ছেলেবেলায় আমার এক দিদি মারা গেছেন, বিজ্ঞাপনে এসেছিল দিদির মুখ! দিদির মুখের সঙ্গে ওঁর মুখের মিল রয়েছে আর কি। এবার বেশ বুদ্ধিমানের মত খানিকটা হাসলে সে।

এবার চা নিয়ে এল চরে ভেসে এসে লাগা আর দুটি কুটো।

তাদের পিছনে দরজার ওপাশে এসে দাঁড়াল বাড়ীর মালিক দালাল-গিন্নী এবং তাঁর মেয়ে। লাবণ্য পরিচয় করিয়ে দিলে। বিমল কিন্তু কথা বাড়াল না। বললে—আজকে কথাবার্তার সুবিধে হল না। আমায় জরুরী কাজে একজায়গায় যেতে হবে। কথার শেষে সে হাত জোড় করলে।

লাবণ্য হেসে বললে—আমাদের আর কথা কি? আপনারা মানী লোক, অনেক বড়লোকেরা আপনাদের কথা শোনে। একটু বলে দেবেন আমাদের এখানকার কথা। একটু বিজ্ঞাপন আর কি। কথা ছিল অরুণার। ওর কথা শেষ হয়েছে?

বিমল বললে—হ্যাঁ। আমার যা বলবার আমি বলে দিয়েছি। আচ্ছা আসি। চলুন মিহিরবাবু।

সত্যিই তো, আর কি বলতে পারতো বিমল। করুণার্দ্র হয়ে অরুণাকে নিয়ে ফিল্মওয়ালা বা গ্রামোফোন কোম্পানীর দোরে দোরে ঘুরতে পারতো। নিজেকে বিপন্ন করে নিজের উপার্জন থেকে কিছু কিছু সাহায্য করতে পারতো যতদিন না সে নিজে উপার্জনে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সাময়িকভাবে সে নিজেকে জড়াতে পারতো অরুণার সঙ্গে। নিজের জীবনের যাত্রাপথে গতিকে মন্থর করতে হত বা সাময়িকভাবে পথের ধারে অরুণার সঙ্গে ভাগে গাছতলায় মুসাফেরখানা বানাতে হত। সে তা পারে না। মানুষকে চলতে হবে একা। এতকাল পর্যন্ত মেয়েরা পুরুষকে আশ্রয় করে চলে এসেছে। সে এককাল ছিল, কৃষিপ্রধান গ্রাম, পুরুষেকরেছেচাষ। মেয়েরারচেছে ঘর, পুরুষে কেটেছে ধান—মেয়েরা ভেঙেছে চাল, রেঁধেছে ভাত, কেটেছে সুতো—পুরুষে বুনেছে কাপড়। আজ মহানগরীতে সে ধারা অচল হয়ে উঠেছে। সে ধারা ধরে চলতে গেলে মর্মান্তিক কেরাণী জীবনকে অবলম্বন করতে হবে। অন্ধকূপের মত আশ্রয়ে—পাততে হবে সংসার, আলো নাই, বাতাস নাই, পলেস্তারা খসে পড়া দেওয়াল, গাঁথনীর ফাঁকে ফাঁকে

ক্ষয় রোগের জীবাণু বদ্ধ বাতাসের মধ্যে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে—শ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করতে হবে তাদের ; উঠানে মাটির তলবাহী নর্দমার মুখের বদ্ধ ঝাঁঝরিটায় কলেরা টাইফয়েডের বীজ ; মরবে তোমার শিশু। এ পৃথিবীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে নরনারীর মিলিত জীবনের সাধের মাশুল হিসেবে। না—তা পারে না—পারবে না। সে অধিকারই নাই তার। হঠাৎ পায়ে একটা হুঁচোট খেলে বিমল।

মিহির বললে—দেখবেন, রাস্তা বড় খারাপ।

রাস্তা খারাপই বটে। বালীগঞ্জের দক্ষিণে ঢাকুরিয়ার দিকে চলেছে তারা। দুপাশে জঙ্গল, নারকেল বাগান, পুরনো বাড়ী, বজবজে জলে ভর্তি ড্রেন—কোথাও কোথাও কাঁচা। রাস্তার আলো অপর্যাপ্ত। মধ্যে মধ্যে দু'চারটে ছোটখাটো দোকান, কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। নেহাত ছোট দোকানে জ্বলছে কেরোসিনের কুপী। মধ্যে মধ্যে হিন্দুস্থানী গোয়ালা বা ধোবাদের জটলা হচ্ছে ; উড়িয়ারা ঢোলক বাজিয়ে গান করছে। ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে চারিদিকে।

বিমল লজ্জিত হয়েছিল, নিজের কাছেই সে নিজে লজ্জা পেয়েছিল। কেন সে অরুণাকে সাহায্য করার কথা ভাবতে গিয়ে তাকে নিয়ে সংসার বাঁধার কল্পনা করলে ? ছি ! জীবনের পথে চলতে কত পুরুষ কত নারীর সঙ্গে দেখা হবে, হয় তো খানিকটা পথ পাশাপাশি চলতেও হবে ; সে তো অনিবার্য। কথাও বলতে হবে, কথা বলতে গিয়ে সঙ্গীতের রেশও বাজতে পারে কানে, তার ফলে মিতালীও হতে পারে। তাতে কি ? আবার যে দিন সে যাবে এক পথে—ও যাবে অন্য পথে—সে দিন হাসিমুখেই চলবে বিপরীত পথে। চোখে দু'এক ফোঁটা জল আসে—পড়বে ঝরে।

—দাঁড়ান। মিহির পাশে একটু এগিয়েই চলছিল নীরবে, সবল সুস্থ দীর্ঘাকৃতি তরুণ ছেলেটির পদক্ষেপে কঠিন শব্দ বেজে উঠছিল নির্জন অন্ধকার শহরতলীর পথে। সে হঠাৎ বললে—দাঁড়ান।

—কেন ?

মৃদুস্বরে বললে মিহির—একখানা মোটর টর্চ ফেলে কি যেন দেখছে।

অদূরেই অন্ধকারের মধ্যে একখানা মোটর দাঁড়িয়েছিল। পিছনের লাল আলোটাও জ্বলছেনা সুতরাং অন্যমনস্ক বিমলের চোখে পড়ে নাই। গাড়ীর ভিতর থেকে টর্চ ফেলে পাশে কিছু যেন দেখছেন আরোহীরা। গাড়ীর দরজা খুলে কয়েকজন নামলেন। বিমল মিহিরকে বললে—আমি আপনাকে বলি নি, আমি একটু অন্যায় করেছি।

—কি ?

—আমার বাসায় ওই যে লোকটি আপনার নাম জিজ্ঞাসা করলে —ও হচ্ছে আমার গ্রামের লোক আই-বি ইন্সপেক্টার।

—আই-বি ইন্সপেক্টার ? একটু চমকে উঠল মিহির।

—হ্যাঁ, আমার বোধ হয় আজ আপনার সঙ্গে আসা উচিত ছিল না। আপনাকে বিদায় করে দিয়ে, ওকে আটকে রাখলেই ভাল করতাম আমি।

মিহির বললে—না—না। তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। গোপেনদা তো লুকিয়ে নেই যে পুলিশ ফলো করলে কোন ক্ষতি হবে। এ তো কোন গোপন ব্যাপার নয়।

—তবে মোটর দেখে দাঁড়ালেন কেন ?

মিহির হেসে বললে—প্রথমটা দাঁড়িয়েছিলাম অভ্যাসে। তারপর দাঁড়িয়েছি—যাঁরা নেমেছেন তাঁদের একজন আমার কাকা।

—আপনার কাকা ?

—হ্যাঁ। আমাদের বাড়ী বিক্রী হয়েছে। আপনি তো সে জানেন। এক বছর টাইম দিয়েছে খরিদ্দার বাড়ী তৈরী করে নেবার জন্যে। সম্ভবত কাকা এসেছেন জমি দেখতে! এখানকার জমি বিক্রী হবে। ওখানে একটা সাইনবোর্ড আছে 'ল্যাণ্ড ফর সেল'। একটু থেমে বললে—কাকার চোখে ঠিক পড়তে চাই না।

টর্চটা এগিয়ে গেল—রাস্তার পাশের পতিত জায়গাটার মধ্যে। মস্ত একটা নারকেল বাগান, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ছিটে বেড়ার বাড়ী।

মিহির বললে—এইবার আসুন। গাড়ীটার এদিক দিয়ে আড়াল দিয়ে চলে যাওয়া যাবে।

গাড়ীটাকে পাশে রেখে একটা বাঁক ঘুরে পুরানো একতলা একটা বাড়ীর মধ্যে মিহির তাকে নিয়ে গেল। বিমলের বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে উঠল। গোপেন মুখার্জী প্রাচীন কালের বিপ্লবী নেতা। এক-কালে বিমল তাঁকে গুরু বলে পূজা করেছে। তাঁর দেখা পাবার জন্য কত ব্যগ্রতা ছিল। বাংলা দেশের সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগীদের মধ্যে এমন বিরাট সাহস মাত্র কয়েকজনের ছাড়া আর কারও ছিল না। সিংহের মত সবল দেহ। খালি গায়ে—সে বিরাট বুকের পাটা—সে ক্ষীণ কটি—বাঘের থাবার মত হাতের পাঞ্জা—চশমায় ঢাকা—ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ, মাথায় বড় বড় চুল—তাঁর সেকালের মূর্তি স্পষ্ট মনে পড়েছে তার। একটা ঘরের মধ্যে এক কোণে চুপ করে বসে থাকতেন তিনি, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন, তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা কইতে কখনও পারে নি বিমল, কণ্ঠস্বর ছিল ভরাট কিন্তু কথা বলতেন মৃদুস্বরে। শেষবার সে তাঁকে অনুরোধ করেছিল তার গ্রামে তার বাড়ীতে যাবার জন্য। তখন তিনি এ্যাবস্কণ্ড্ করে ফিরছিলেন। তার অনুরোধের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—না। কলকাতা ছেড়ে গেলে কাজ চলবে না।

মহানগরী কলকাতা ইংরেজের শক্তির কেন্দ্রস্থল; মহানগরী কলকাতা ভারতীয় বিপ্লববাদের জন্মস্থল। মহানগরীর অন্তর জগতে লক্ষলক্ষ পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সংঘাতে কলরোল উঠছে অবিশ্রান্ত—বিপুল শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে, আকাশ স্পর্শ করতে চাচ্ছে সে দ্বন্দ্ব, তার আঘাত ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষের দূরতম প্রান্তে।

আজও ঠিক সেইভাবে—সেই এক কোণে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন গোপেনদা। বিমলকে দেখে একটু হেসে নীরবে হাতখানি তুলে রাখলেন নিজের সামনে—অর্থাৎ বস এইখানে।

বাঘের থাবার মত বলিষ্ঠ এবং প্রশস্ত হাতের মধ্যে সস্নেহে তুলে নিলেন বিমলের হাতখানি; একটু মিষ্টহাসি হেসে গোপেনদা বললেন—বিখ্যাত লোক হয়েছ এখন—এঁ্যা?

একটু কুণ্ঠিত হল বিমল, সে বুঝতে পারলে নাগোপেনদা কি বলতে চাচ্ছেন, তবে কথার সুরের মধ্যে এবং তাকে গ্রহণের ভঙ্গিতে স্নেহের ভরসা রয়েছে; তা ছাড়া প্রশংসা বস্তুটাই এমন যে অকুণ্ঠিত গলাধঃকরণ করা যায়; সমাজ-চলিত রীতির অভ্যাসে—নতুন বউয়ের মত মুখ নামিয়ে রক্তিম মুখে আস্বাদন করতেই হয়। বিমল একটু হেসে মুখ নামালে।

গোপেনদা বললেন—তুমি তো জান—আমি নাটক নভেল পড়িনা। তোমার লেখা আমি পড়িনি, তবে লোকে নাম করে শুনেছি; কাগজে সমালোচনা পড়েছি। ভারী আনন্দ হয়। হঠাৎ একজন আমাকে তোমার একটা লেখা পড়ে শোনালেন।

গোপেনদা সোজা হয়ে বসলেন। কণ্ঠস্বর বেশ একটু উস্কে দেওয়া প্রদীপের শিখার মত প্রখরতর হয়ে উঠল। বললেন—গল্পটা শুনে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলাম। গল্পটার নাম আমি ভুলে গেছি। একটি কুষ্ঠরোগগ্রস্তা পাঠশালা-পণ্ডিতের স্ত্রীকে নিয়ে গল্প।

বিমল বললে—হ্যাঁ, 'সারথি' পত্রিকায় বেরিয়েছে।

—হ্যাঁ। সেদিন তোমায় সামনে পেলে আমি তিরস্কার করতাম।

বিমল চুপ করে রইল।

গোপেনদা বললেন—আজ তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এবারও বিমল চুপ করে রইল।

গোপেনদা বললেন—আমার পাশের বাড়ীতে ঠিক ওই ব্যাপার ঘটে গেল। নিতান্ত দরিদ্র কেরাণী-ভদ্রলোক—যক্ষ্মা হয়েছিল, স্ত্রী

দেবীর মত সেবা করছিলেন, হঠাৎ একমাত্র ছেলে, তাকে ধরল ওই রোগে। গোপেনদা চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন—ভদ্রমহিলা যেন পাগল হয়ে গেলেন, সেই রাত্রেই ভদ্রলোকটি মারা গেলেন। আমার সন্দেহ হয়—। গোপেনদার চোখ দুটো ঝকমক করে উঠল —খানিকটা অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন—যখন ঘটনাটার কথা মনে হয়—তখনই তোমার ওই গল্পটার কথা মনে পড়ে।

এর উত্তরেই বা বিমল কি বলবে? গোপেনদা বললেন—ওই ব্যাপারেই তোমাকে ডেকেছি। ভদ্রমহিলাটি তাঁর রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আমি প্রতিবেশী হয়ে জড়িয়ে পড়েছি। তাছাড়া ভদ্রলোকটিকে বড় ভালবাসতাম আমি।

বিমল অস্বস্তিকর বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। এই ব্যাপারে গোপেনদা তাকে ডেকেছেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অরুণার কথা। অরুণাকে নিয়ে সে অকারণে অনিচ্ছায় জড়িয়ে পড়ে অস্বস্তি ভোগ করছে। যে জলে ডোবে সে প্রাণের আকুলতায় পাশে যাকে পায় তাকেই আশ্রয় হিসেবে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চায়। কিন্তু যাকে আশ্রয় করে—তার জীবনও যে যায় তাতে। বাঁচে না কেউ—ডুবে মরে দুজনেই। বিপুল শক্তির অধিকারী যে—সে-ই তীরে উঠতে পারে বিপন্নজনকে পিঠে নিয়ে।

গোপেনদা বললেন—তোমাদের গ্রামের শ্রীচন্দ্রবাবু, যিনি বালী-গঞ্জেই থাকেন—তাঁর কাছে একবার যেতে হবে তোমাকে। সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি আজ।

বিমল এবার আরও বিস্মিত হল। শ্রীচন্দ্রবাবু মস্ত ধনী লোক। নানা ব্যবসায়ে প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছেন। বালীগঞ্জের নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

গোপেনদা বলেই গেলেন—শ্রীচন্দ্রবাবুই এই বাড়ীখানা এবং আশপাশের বাগান বস্তী সব কিনেছেন। বুঝছ তো, শহর বাড়ছে,

সস্তায় জমি কিনে ব্যবসা করছেন। বাড়ীখানা ভদ্রলোকের পৈতৃক বাড়ীই ছিল, তিনি বিক্রী করেছেন শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে। কথা ছিল জায়গাটা ভেঙেচুরে ডেভেলপ করে প্লট করে বিক্রীর সময় ছোট একটা প্লট এঁদের এমনি দেবেন। দলিলে কিছু নেই অবশ্য।

হাসলেন একটু গোপেনদা। বিমল প্রশ্ন করলে—এখন বুঝি দিতে চাচ্ছেন না?

গোপেনদা বললেন—দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্ন তোলার পথই বন্ধ হয়ে গেছে শুনছি। শ্রীচন্দ্রবাবু নাকি আবার গোটা সম্পত্তিটাই বিক্রী করে দিয়েছেন এক লিমিটেড কোম্পানীকে। তারা নোটিশ দিয়েছে—বাড়ী ভাঙবে তারা, বাড়ী ছেড়ে উঠে যেতে হবে।

গোপেনদা বললেন—কি ভাবছ? যেতে কি তোমার আপত্তি আছে?

—আপত্তি? না আপত্তি নয়। তবে ভাবছি গিয়ে ফল হবে না।

—ফল হবে না? গোপেনদার চোখ দুটি অকস্মাৎ জ্বলে উঠল। একটুখানি চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই?

শঙ্কিত হয়ে উঠল বিমল। পুরাণে অবশ্য শোনা যায়—মদোদ্ধত স্ফীতকলেবর বিন্ধ্য তপস্বী অগস্ত্য সম্মুখে উপস্থিত হতেই সসম্ভ্রমে মাথা নত করেছিল, অগস্ত্য বলেছিলেন—কোটী কোটী মানুষের আলো ও বায়ুর পথরোধ করে আর মাথা তুলো না; বিন্ধ্য আর মাথা তোলে নাই। কিন্তু এ যুগে সে হবার নয়। না হলে ফল হবে সংঘর্ষ। গোপেনদা কি প্রত্যাখ্যানকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন!

বিমল বললে—আপনি যাবেন?

—কেন যাব না? সংসারে লিখিত প্রতিশ্রুতিরই দাম আছে? মুখের প্রতিশ্রুতির কোন দাম নাই?

—আগে আমি যাই, আপনার নাম আমি করব। শ্রীচন্দ্রবাবু কি বলেন শুনি। তারপর প্রয়োজন হয় তো যাবেন।

একটু চিন্তা করে গোপেনদা বললেন—বেশ। তা হলে কালই খবর দেবে আমাকে।

—তা হলে আমি উঠি গোপেনদা।

—দাঁড়াও, আমিও যাব। মিহির।

পাশের ঘরে মিহির বসেছিল। সে এসে দাঁড়াল। তার দিকে চেয়ে গোপেনদা বললেন—চল।

মিহির কুণ্ঠিত হয়ে বললে—এই রাত্রেই যাবেন? কাল দিনের বেলা—

—নাঃ। চল রাত্রেই ভাল। গোপেনদা উঠে দাঁড়ালেন। আলোয়ানখানা তুলে নিয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে বিমলকে বললেন, চল। তারপর হেসে বললেন, এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে রাত্রে কাজ করতে যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বেশী। তবু যেন তুমি পেঁচার সঙ্গে তুলনা করো না বিমল।

বিমল বললে, আমি তান্ত্রিকের দেশের লোক দাদা। অমাবস্যায় শ্মশানে যাঁরা শক্তির সাধনা করেন তাঁদের কথা আমার কাছে অজানা নয়।

মুহূর্তে গোপেনদার চোখ দুটো ঝকমকিয়ে উঠল। উষ্ণ হাত দিয়ে বিমলের হাত দুটো চেপে ধরলেন তিনি।

বাসার প্যাসেজের মুখে হঠাৎ বিমলের মনে হল কালীনাথের কথা সে বললে, দাঁড়ান দাদা।

—কেন? কি ব্যাপার?

—বলছি। আসছি আমি। হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল সে। কালীনাথ চলে গেছে, ঘরের তালা বন্ধ। চাবি চিত্তর কাছে। সে বেরিয়ে এসে বললে, দাঁড়ান চাবিটা নিয়ে আসি।

মিহির বললে, আজ থাক বিমলবাবু। অনেক দেরী হয়ে যাবে। বসলে গোপেনদা গল্পই করবেন।

হা-হা করে হেসে উঠলেন গোপেনদা। হেসে বললেন, ওরে শয়তান, আমি বুঝি গল্পই করি! না—না, বিমল চাবি আন তুমি।

বিমল বুঝলে গোপেনদার অভিপ্রায়, সম্ভবতঃ সে ক্ষুণ্ণ হবে বলেই গোপেনদা দেরী হওয়ার যুক্তিটা উপেক্ষা করেও তার ঘরে কিছুক্ষণ বসতে চাচ্ছেন। সে বললে—না গোপেনদা, মিহিরবাবু সত্যিই বলছেন, দেরী হয়ে যাচ্ছে আপনার। আজ থাক।

—থাকবে?

—হ্যাঁ, অন্যদিনে আসবেন। সেদিন—আপনাকে কিছু খাওয়াব। গল্প করব। চলুন আজ আপনাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসি।

—চল। তবে কথা রইল, খাওয়াবে। আচ্ছা কালই আসব আমি। তোমার তো শ্রীচন্দ্রবাবুর কথা নিয়ে আমার ওখানে যাবার কথা। তোমায় যেতে হবে না, আমিই আসব। মিহির মনে করে দিয়ো।

মোড় পর্যন্ত এসে গোপেনদা দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি বুঝিয়ে বলো শ্রীচন্দ্রবাবুকে। ভাল করে বুঝিয়ে বলো।

বিমল কোন উত্তর দিল না। মিহির বললে—এ আপনাদের মিথ্যে চেষ্টা হবে গোপেনদা। কোনও ফল হবে না। আমি জানি—এদের আমি জানি।

গোপেনদা বললেন—জানি; তোরা হয়ত এদের জানিস না, আমি জানি—এই সভ্যতার এই নিয়ম। এ নিয়ম মানে আইনের কথা বলছি—সে তো শ্রীচন্দ্রবাবুরা করেনি, করেছে গভর্ণমেণ্ট; কলকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট জমি এ্যাকোয়ার করে তাকে ডেভেলপ করে চড়া দামে বিক্রী করছে। শহর বাড়ছে, বাড়বে, শহরের এই ধর্ম। বন কেটে শহর বাড়ছে, সমুদ্রের গর্ভ পূর্ণ করে শহর বাড়ছে, বম্বেতে মেরিন ড্রাইভ তৈরী হচ্ছে দেখে এসেছি। আবার দরিদ্র মানুষের বসতি কৃষিক্ষেত্র ভেঙ্গে শহর বাড়ছে। কিন্তু—

সশব্দে একখানা ট্রাম এসে দাঁড়াল। গোপেনদা বললেন—আচ্ছা কাল আসব।

ট্রামে চড়ে বসলেন গোপেনদা ও মিহির। বিমল ফিরল। প্রচণ্ড শব্দ করে একখানা লরী আসছে। সরে দাঁড়াল বিমল। বড় বড় লোহার বীম বোঝাই করে নিয়ে চলেছে লরীখানা। গতির ঝাঁকানিতে লোহাগুলো সশব্দে নড়ছে, সেই জন্য এমন প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। বাড়ী তৈরী হবে, লোহার কড়ি চলল। মহানগরী প্রসারিত হচ্ছে। যত জঙ্গলে ঘেরা দরিদ্রের পল্লীভবন ভেঙ্গে তৈরী হবে দীপমালায় উজ্জ্বল—আরামের উপকরণ-সমৃদ্ধ—শ্রীসম্পদে ঝলমল পুরী।

চীৎকার করছে—কে?

হৈ-হৈ চীৎকার উঠছে। কি হল? বিমল চমকে উঠল এবার। কেউ যেন ছুটে আসছে।—ছুটে গেল একটা লোক। তার পিছনে বিশ পঁচিশ জন লোক ছুটছে। খুন-খুন। ছোরা মেরেছে। ছোরা।

মহানগরীর রাত্রি। এমন একটি রাত্রিও বোধ হয় মহানগরীর ইতিহাসে নাই যেদিন মানুষের দেহের তাজা রক্ত মাটির বুকে না পড়ে।

চাবি নেবার জন্য সে চিত্তর ডিপোর সামনে এসে দাঁড়াল। চিত্তর ডিপোতেই লোক জমে রয়েছে।

—কি ব্যাপার চিত্ত? খুন?

ঘাড় নেড়ে চিত্ত বললে—বেঁচে গেছে। হাত দিয়ে আটকেছিল—হাতে লেগেছে। লাবণ্যদির বাড়ীতে এক ছোকরা, ছবি আঁকে, পাগলাটে ধরন, অতি গো-বেচারা লোক, বেঁচে গেছে খুব।

এবার নজর পড়ল, সেই শিল্পী পিনাকী বসে আছে হাতখানা ধরে, একজন তুলো দিয়ে বাঁধছে।

আট

মহানগরীর ইতিকথায় ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। স্বাভাবিকও বটে, যে ভাবের ব্যবস্থায় মহানগরীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তাতে স্বাভাবিক বললে সত্যই বলা হবে, মহানগরীর অপমান করা হবে না।

ব্যাপারটা ঘটেছিল অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে আকস্মিকভাবে।

পিনাকী বিদায় নিচ্ছিল লাবণ্যদের কাছে। এক লাবণ্য ছাড়া পাগল পিনাকী অপর মেয়েগুলির কাছে কৌতুকের মানুষ। সদাই অপ্রস্তুত হতভম্ব শিল্পীটিকে বেশী করে অপ্রস্তুত করে মেয়েরা আমোদ পায়। পিনাকী বাইরের সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েছিল···মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিল। লাবণ্য ছিল ভিতরে। অরুণাও এসে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কথা হচ্ছিল সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে। সমাজ সম্বন্ধে কথা হলেই ক্ষেপে ওঠে পিনাকী। শান্ত বিনীত কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে ওঠে, তার মুখ চোখের ভীরুভাব কেটে যায়, সে তার মাথার বড় বড় চুল অধীর ভাবে টানে এবং সমাজকে ভেঙ্গে ফেলবার শপথ গ্রহণ করে। সেই সুযোগে মেয়েরা কেউ বিধবা বিবাহের কথা তুলে দেয়। অর্থাৎ সকলেরই ধারণা পিনাকী লাবণ্যকে ভালবাসে। মেয়েদের ঐদিক দিয়ে একটা সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টি আছে। এক দৃষ্টিতেই বুঝতে পারে কোন পুরুষের দৃষ্টি কাকে দেখে রঙীন হয়ে উঠছে। লাবণ্যকেও এ নিয়ে তারা মধ্যে মধ্যে পরিহাস করে থাকে কিন্তু লাবণ্যের সঙ্গে পরিহাস জমে না। তার সহজ গাম্ভীর্যের স্পর্শে এসে তটের উপর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ভেঙে নেমে যাওয়ার মত মিলিয়ে যায়। এই কারণে পিনাকীকে নিয়েই তারা একটু বেশী করে পড়ে।

ঠিক এই সময়েই রাস্তার ওপারের বাজারটার পিছন দিকের নিম্নস্তরের বস্তীর ভিতর থেকে দুটি লোক বেরিয়ে এদের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ভদ্র বেশভূষা, চলার ভঙ্গিতে একটু অসচ্ছন্দ্য। ওরা ওই বস্তীর বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। লাবণ্য-ও এদের একটু একটু চেনে। এ পাড়ার রাস্তায় মধ্যে মধ্যে লাবণ্যকে বিরক্ত করে থাকে। দেখা হলেই খানিকটা পিছু নিয়ে চলে; কখনও শিস্ দিয়ে ওঠে, কখনও অকস্মাৎ চোখে চোখ পড়লে ইঙ্গিত করে থাকে। লাবণ্য এদের দেখলে, যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে, সে রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে; যে ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর না হয় সে ক্ষেত্রে অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে চোখ নামিয়ে পথ চলে। খানিকটা অনুসরণ করেই ওরা ক্লান্ত বা হতাশ হয়ে ফিরে যায়। লোক দুটি পেশাদার গুণ্ডা নয়, কাজ কর্ম করে, কিন্তু মহানগরীর জীবনধারায় সঞ্চারিত এই ব্যাধির বিষে জর্জরভাবে সংক্রামিত। ওদের ধারণা লাবণ্যদের ধরনের অভিভাবকহীন মেয়েরা—যাদের ভরণপোষণের ভার নেবার কেউ নাই, জীবিকার দায়ে যারা এমন পথে পথে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় তারা কখনও ভালো মেয়ে হতে পারে না। স্বাধীনভাবে মেয়েদের জীবিকা উপার্জনের একটি পথই তাদের চোখে পড়ে। সে এই পথ। তারা জানে মেয়েদের মূলধন একমাত্র দেহ। দেহের শক্তিতে মেয়েরা ভাত রান্না করে, ঝিয়ের কাজ করে, দিন মজুরী খাটে অথবা দেহ ভাঙ্গিয়ে তারা জীবিকা উপার্জন করে। বি-এ, এম-এ, পাশ করে যারা চাকরী করে খেটে খায় তাদের কথা স্বতন্ত্র। এ ছাড়া অপর কোনরকম বুদ্ধিগত পন্থায় মেয়েরা জীবিকার্জন করতে পারে এ ধারণা তাদের নাই। এটা শুধু তাদের মন্দত্ব ঢাকবার ছদ্মাবরণ। স্নো ক্রীম পাউডার দিয়ে স্বাভাবিক রূপকে ঢেকে তাকে উজ্জ্বল করে তোলার মতই এই জীবিকার্জনের চেষ্টাটা তাদের মন্দত্ব ঢাকার একটা পালিশ বা প্রলেপ।

আজ এই সন্ধ্যার অভিসার-রাগময় সময়ে মেয়েগুলিকে দরজায়

দাঁড়িয়ে থাকতে এবং পিনাকীর সঙ্গে চপলপরিহাসমুখর অবস্থায় দেখবামাত্র তাদের মনে হল আজ তারা এদের চাতুরী ছলনা ধরে ফেলেছে। তারা মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেই সরাসরি এসে পিনাকীর পিছনে দাঁড়াল। মেয়েগুলি চকিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। অরুণা সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে নীরবে সব দেখছিল এতক্ষণ, সে প্রশ্ন করলে—কে? কে আপনারা? কি চান?

একজন হেসে বলে উঠল—আজ তো ধরে ফেলেছি বাবা।

অপরজন হেসে উঠল। পিনাকী সবিস্ময়ে এদের দিকে ফিরে দাঁড়াল হাসির শব্দ শুনে এবং কথা শুনে লাবণ্য ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে অরুণা?

—দু'জন লোক।

—লোক? লাবণ্য সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কি চান এখানে?

—তোমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গেল। শীর্ণ কুব্জদেহ পিনাকী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠল—স্কাউণ্ড্রেল!

মুহূর্তে লোকটির হাতে ছুরি ঝলকে উঠল, ছোরা নয়, স্প্রিং-দেওয়া পিতলের বাঁটের ছুরি। স্প্রিং টিপ্‌লেই ফলাটা বেরিয়ে পড়ে। মেয়েরা চীৎকার করে উঠল। লাবণ্য হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে টেনে নিলে পিনাকীকে, পিনাকী হাত তুলেছিল আত্মরক্ষার জন্য, সেই হাতে ছুরিটা গেল বিঁধে। এর পরই লোক দুটো পালিয়ে গেল।

বিমল বিস্মিত হয়ে গেল পিনাকীর এমন সাহসের পরিচয় পেয়ে। পিনাকী অপ্রতিভের মত হাসতে লাগল। বললে—ও সব লোকগুলো এমনিই হয়। যে কেউ সাহস করে রুখে দাঁড়ালেই ছুটে পালায়। আমি দেখেছি, ওদের জানি আমি।

—জানেন ? সবিস্ময়ে চিত্ত বললে—জানেন ওদের আপনি ?

—হ্যাঁ। আরও বারদুয়েক ওদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। একবার পিঠে ছুরি মেরেছিল। পিঠে হাত বুলিয়ে পিনাকী বললে—মিউজিয়মের সামনে রাস্তার ধারে গাছগুলোর তলা দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে—সেই রাস্তার উপর। পিঠে দাগ আছে এখনও। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। সাহস করে দাঁড়ালেই ওরা ভয় পায়, পালায়। সন্ধ্যের অন্ধকার ছিল নইলে বোধ হয় ছুরি মারতে পারত না। এমনিই ভয়ে পালাত।

চিত্ত হেসে বললে—পালায়। কিন্তু ছুরি বসিয়েও দিয়ে যায়। আপনার তো এই তালপাতার সেপাইয়ের মত শরীর, সেবার পিঠে ছুরি খেয়ে বেঁচেছেন—এবারে খুব ফস্কে গিয়ে হাতে লেগেছে কিন্তু এরপর বুকে পিঠে বিঁধে হাসপাতালে যাবার সময় হবে না। এ রকম গোয়ার্তুমি আর করবেন না। শুধু হাতে এগুবেন না। আমিও অবিশ্যি দুর্বল মানুষ কিন্তু হাতিয়ার আমার সঙ্গে থাকে। ওটি না নিয়ে আমি এক পা বাড়াই না।

তারপর সে আক্ষেপ করে বললে—লোকটাকে চড় না মেরে যদি চীৎকার করে ডাকতেন মশায়! আঃ! এই তো প্রায় দোরের কাছে বললেই হয়। হারামী দুটোকে আজ আঃ! বসে আছি আমরা—আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ভোঁ করে দৌড়ে পালাল।

—চিত্তদা।

—কে ? লাবণ্যদি ? চিত্ত ডিপোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রাস্তার উপর। লাবণ্যই। লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে—পিনাকীকে আজ মেসে ফিরতে দেবেন না। আমি বিছানা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার ডিপোতেই একটু জায়গা করে যদি—

—ডিপোতে ? এখানে তো কুলীরা থাকে, চারিদিকে কয়লা আর কালি—

—না না। আমি বেশ চলে যাব। আপনি কিছু ভাববেন না। পিনাকী উঠে দাঁড়াল ব্যস্ত হয়ে।

—না। দৃঢ়স্বরে বললে লাবণ্য। রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। তা ছাড়া তোমার মত আধ-কানা আধ-পাগলা মানুষ, পথে যদি লোক দুটো কোথাও লুকিয়ে থাকে—কি? না। যাওয়া হবে না তোমার। এখানে অসুবিধা হলে বিমলবাবুর ওখানে থাকবে, আমি যাচ্ছি তাঁর কাছে। তিনি কখনও না বলবেন না।

বিমল বিস্মিত হয়ে নিস্তব্ধ বসে ভাবছিল পিনাকীর কথা। অপ্রতিভ নিষ্প্রভ এই জীর্ণদেহে পিনাকীর এই সাহসটা কি? চিত্তর শরীর এমনি দুর্বল কিন্তু জীবনে এমন আবেষ্টনীর মধ্যে সে পড়েছে যে এই দুঃসাহস তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে ব্যাধির মত। ক্ষেত্র ছিল অনুকূল। শিক্ষার অভাব, নেশায় আসক্তি, দুর্দান্ত লোকদের সাহচর্য দুঃসাহসকে জাগিয়ে তুলেছে গ্রীষ্মের আবহাওয়ায় বাতাসের সাহায্যে শুকনো কাঠের আগুনের মত। কিন্তু পিনাকীর এ দুঃসাহস কি করে হল?

লাবণ্যের কথা শুনে সে বেরিয়ে এসে নমস্কার করে বললে—আমি এখানেই রয়েছি। আপনি ঠিকই বলেছেন। এই রাত্রে পিনাকীবাবুর যাওয়া ঠিক হবে না। উনি আমার কাছেই থাকবেন। তবে—একটু লজ্জিত ভাবেই বললে—ওঁর জন্যে খাবার পাঠিয়ে দেবেন। মানে আমি তো পাইস হোটেলে খাই।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।

পিনাকীর জামা কাপড় অপরিচ্ছন্ন ময়লা, একটা দুর্গন্ধও তাতে আছে কিন্তু পুলওভার এবং সার্টটা খুলতেই এমন দুর্গন্ধ অনুভব করলে বিমল যে মনে হল তার বমি হয়ে যাবে এখনি। পিনাকীর গায়ের গেঞ্জীটার দুর্গন্ধ এতক্ষণ জামা দুটোর তলায় চাপা ছিল। অসংখ্য ছিদ্রভরা প্রায় রান্নাঘর নিকানো ন্যাতার মত ময়লা এবং চটচটে একটা গেঞ্জী। বোধ হয় নতুন কিনে পরেছে, আজও কাচা হয় নি, এক দিনের জন্যও গায়ের থেকে নামে নি। কিন্তু বলবেই বা কি করে?

বিছানার উপর বসে সে বিড়ি খাচ্ছিল। ঘরের ছাদের দিকে

চেয়ে খুব আরাম করে বিড়িটা উপভোগ করছিল। হঠাৎ বললে—আপনি বেশ আরামে আছেন, চমৎকার ঘরখানি। ছোট্ট, বেশ ঝকঝকে তকতকে—তেমনি নির্জন। I am monarch of all I survey—একলা ঘর না হলে লেখা কি ছবি আঁকা হয়?

বিমল বললে—কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

—আমাকে?

—হ্যাঁ। কিছু মনে করবেন না যেন।

অপ্রতিভ নির্বোধের মত তার মুখের দিকে চেয়ে পিনাকী বললে—মনে করব কেন? কি মনে করব?

একটু ইতস্তত করে বিমল বললে—গেঞ্জীটা খুলে ফেলুন গা থেকে। বড়—

—হ্যাঁ—বড্ড দুর্গন্ধ। অপ্রতিভের মত পিনাকী গেঞ্জীটা টেনে নাকের কাছে তুলে শুঁকলে—বড্ড দুর্গন্ধ। ছিঁড়েও গেছে। মানে একটাই গেঞ্জী কি না। ওটা আর কাচা হয় না। বলতে বলতেই সে খুলে ফেললে গেঞ্জীটা। তারপর একবার ভাল করে দেখে আর একবার শুঁকে বললে—এটাকে তা হলে বাইরের ঘরে রেখে দি। সে উঠে বাইরে রেখে এল গেঞ্জীটা—দরজার ওদিকে সিঁড়ির উপর।

বিমলের কোন কথা বলবার শক্তি ছিল না। সে বিস্ময়ে বেদনায় বাক্যহীন হয়ে গিয়েছিল—পিনাকীর দেহ দেখে। পাঁজরার প্রতিটি হাড় গোণা যায়, বোধ হয় ভাল করে লক্ষ্য করলে—হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুকুনিও দেখা যাবে চামড়ার উপর। শুধু তাই নয়—পিঠে একটা সাংঘাতিক ক্ষতের চিহ্ন—যেন দগদগ করছে।

পিনাকী ফিরে বিছানার উপর বসে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে তার দৃষ্টির অর্থ। হেসে বললে, আমার শরীর দেখছেন?

—আপনার শরীর এত খারাপ!

—এত খারাপ ছিল না আগে। অপ্রতিভের মত হাসলে পিনাকী, —ওই পিঠে ছোরা মেরেছিল—তারপর থেকেই শরীরটা বেশী খারাপ

হয়ে গেল। মানে আর সারাতে পারলাম না। আমার ছবি একেবারেই কেউ নিতে চায় না! ভাগ্যিস লাবণ্যদিদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—উনিই আমার বড় খরিদ্দার। দশটাকা বারোটাকা মাসে পাই ওঁর কাছ থেকে।

—পিঠে ওই দাগটা বুঝি সেই ছোরার দাগ?

—হ্যাঁ। আর খানিকটা ঢুকলে বাঁচতাম না। ডাক্তাররা বললে। হাসতে লাগল পিনাকী।

হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে বিমল প্রশ্ন করলে—মিউজিয়মের সামনে রাস্তার ওপাশে গাছের তলায় সন্ধ্যের সময় যান কেন? জায়গাটাতো খুব ভাল নয়।

—না। জায়গাটা খুব খারাপ। তবে ওখানে সূর্যাস্তের সময় ফোর্টের ছবিটা খুব ভাল লাগে। গরমের সময়, ওখানে গাছতলায় বসে সূর্যাস্ত দেখে বসেই ছিলাম। ঘুমিয়েই গিয়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল একটা শব্দ শুনে। কেউ যেন আঁতকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় কেউ যেন বললে—চুপ। চেঁচালে জান মেরে দেব। আমি লাফিয়ে উঠে গাছের ওপাশ থেকে এসে লোকটার ঘাড় চেপে ধরলাম। লোকটা ঝাঁকি মেরে ফেলে দিলে আমাকে। আমি উপুড় হয়ে পড়েছিলাম, হাত বাড়িয়ে পা চেপে ধরলাম। অন্য লোকটি চীৎকার করতে লাগল; এ লোকটা আমার পিঠে ছোরা মারলে।

একটু থেমে সার্টটা তুলে পকেট খুঁজলে পিনাকী; দুটো পকেটই খুঁজলে। বললে—এ হে—বিড়ি ফুরিয়ে গেছে।

—সিগারেট খান। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে বিমল।

—সিগারেট আমার পোষায় না দাদা। বিড়ি না হলে গলায় সানায় না।

—চুরুট আছে, খাবেন?

—চুরুট? মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিনাকীর।—ওঃ—জীবনের বিলাসকামনার মধ্যে ওইটে একটা। চুরুট খাব আমি। বুঝলেন?

সুটকেশ খুলে চুরুট বার করতে গিয়ে বিমল একটু ভাবলে—তারপর চুরুটের সঙ্গে একটা নতুন গেঞ্জী বার করে পিনাকীর হাতে দিলে, বললে—শীতকাল, খালিগায়ে রাতে সুড় সুড় করবে। এটা পরে ফেলুন। আর এই নিন, চুরুট।

—নতুন গেঞ্জী! খুব নরম। এটা গায়ে দেব?

—হ্যাঁ গায়ে দিন—চুরুটটা ধরান।

—আপনি আমাকে—আপনি বলবেন না। গেঞ্জীটা গায়ে দিয়ে চুরুট ধরিয়ে সে বললে—আজকের দিনটা আমার কাছে খুব মূল্যবান। বুঝলেন? চিরকাল মনে থাকবে। লাবণ্যদি এত স্নেহ করলেন, নিজের হাতে বিছানা করে দিয়ে গেলেন, আপনি গেঞ্জী দিলেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হল, তারপর এই চুরুট। আমার বিছানাটা খুব ময়লা আর খুব শক্ত—চমৎকার বিছানাটি।

বিমল উঠে আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছিল। পিনাকী বললে—আর একটু থাক। চুরুটটা খেয়ে নি। ধোঁয়া না দেখতে পেলে আরামটা পুরো হবে না। গলগলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখব তবে তো!

পিনাকীই উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলে।

বিমল তখনও ভাবছিল পিনাকীর কথা। পিনাকীর মাথার মধ্যে গণ্ডগোল আছে। হয়তো আতঙ্ক অনুভব করায় স্নায়ুশিরাগুলি দুর্বল, অথবা ওর রক্তের ধারার মধ্যে একটা দুর্দান্তপনার সূক্ষ্ম স্রোত প্রবাহমান রয়েছে। হয় তো সেটা অপরাধপ্রবণতাও হতে পারে।

—ঘুমালেন দাদা?

—কিছু বলছেন?

—এই দেখুন। আবার আপনি বলছেন?

হেসে বিমল বললে—অভ্যেস হয় নি এখনও। কিছু বলছ?

—আর একটা স্মরণীয় দিনের কথা মনে পড়ছে। আমার জীবন—কিই বা জীবন! তাতে বলবার মত, স্মরণ করবার মত দিন আর আসবে কি করে? কিন্তু এসেছিল একটি দিন! সে দিনটির মত

দিন বোধ হয় আর আসবে না। আমার বয়স তখন চৌদ্দ পনের বছর। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে ভলান্টিয়ার হয়েছিলাম। গান্ধীজী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একদিন বিপ্লববাদীরা দেখা করলে। আমি ঢুকে পড়েছিলাম, এক কোণে বসেছিলাম। মহাত্মাজী বলছিলেন অহিংসার কথা। বলতে গিয়ে, বুঝাতে গিয়ে বললেন—বুঝলেন দাদা, থম থম করছে সমস্ত আসরটা—আস্তে আস্তে গান্ধীজী কথা বলছেন, সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনছে, অনেকের মনে বিরুদ্ধ যুক্তি ধারালো ছুরির মত উঁচিয়ে উঠে ঝকমক করছে, তাঁদের চোখের চাউনি হয়ে উঠেছে ছোট, ভুরু কপাল উঠেছে কুঁচকে ; ওঃ সে যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। গান্ধীজী আঙুল দেখিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—আমার অহিংসা দুর্বলের নয়, আমার অহিংসা আমাকে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী নির্ভয়ে দাঁড়াবার শক্তি দেবে। মৃত্যু আমার সামনে এসে দাঁড়ালেও আমি স্থির হয়ে তার দিকে তাকাব। আমার বুকটা গুর গুর করে কেঁপে উঠল। মনে হল মৃত্যু বুঝি খুব কাছে—হয়তো আমারই পাশে—কিম্বা গান্ধীজীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছে। শরীরের রোঁয়া খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিমলের শরীরও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে কথা বলতে পারলে না। পিনাকী বললে—ওই কথাটি রোজ আমার মনে পড়ে ! জানেন—এই যে দুবার ছুরি খেলাম, দুবারই আমার মনে পড়েছে কথাটি।

ভোরবেলা দরজায় কড়া নড়ে উঠল, বিমল তখন উঠেছে। মুখ হাত ধুয়ে সে বিব্রত হয়ে বসে ছিল—ভাবছিল বেড়াতে বেরুবার কথা। পিনাকী এখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে ; ওই শীর্ণ দেহ—এতেও ওর নাক ডাকছে। সম্ভবত আরামটা হয়েছে বেশী। কিন্তু এই ভোরে কড়া নেড়ে ডাকছে কে ?

দরজা খুলতেই দেখলে দাঁড়িয়ে আছে লাবণ্য। তার পিছনে অরুণা। হাতে কেটলি, চায়ের কাপ।

—এ কি ? এই সকালে চা নিয়ে খাওয়াতে এসেছেন ?

লাবণ্য বললে—আপনি খুব সকালে বেরিয়ে দোকানে চা খেতে যান—সে আমি জানি। তার আগেই আসব বলে এলাম। কিন্তু পিনাকী এখনও ঘুমুচ্ছে ? পিনাকী ! পিনাকী !

পিনাকী চোখ মেলে চাইলে। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসল। বললে—লাবণ্যদি !

—ওঠ, মুখ ধুয়ে চা খাও। তারপর চল—হাতটা খুলে গরম জলে ধুয়ে ভাল করে বেঁধে দেব।

চারিদিকে সিটি বাজতে লাগল। মহানগরী ঘুম ভাঙ্গাবার আহ্বান জানাচ্ছে। ওরা চলে যেতেই বিমল গল্পটা শেষ করতে বসল।

নয়

রাত্রি তিনটে বাজল।

পাশের বাড়ীর দোতলাতে একটা বড় দেওয়াল-ঘড়ি আছে। যার শব্দ শীতের রাত্রে দরজা বন্ধ থাকলেও শোনা যায়। বিমল ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে চুমুক দিতে আরম্ভ করল। চোখ জ্বালা করছে, হাতের শিরায় টান ধরেছে। আজ সারাটা দিনই লিখছে। গল্পটা শেষ করতে হবে। বাংলা মাসের সংক্রান্তি আজ। হিরণদের কাগজ লেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। বিমলের অনুরোধে সম্পাদক অপেক্ষা করতে রাজী হয়েছেন। বিমলের উপর ক্রমশ তাঁর আস্থা বাড়ছে। আগামীকাল পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন বলেছেন। কিন্তু বিমল আজই লেখাটা শেষ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে। কালকের দিনটা তার নিষ্ফলা দিন গিয়েছে

লাবণ্য, অরুণার নিমন্ত্রণ, কালীনাথের আকস্মিক আবির্ভাব, গোপেনদার ডাক, পিনাকীর ছুরি খাওয়া এবং রাত্রিটা তাকে নিয়ে কাটানো—এই সব নানা ঘটনার মধ্যে লেখার কাজ তার কিছুই হয় নি। লেখা দূরে থাক, গল্পটা নিয়ে সে ভাবতেও পারে নি। আজ সকালে পিনাকীকে বিদায় করে সে লিখতে বসেছে। স্নান করে নি, লিখেই চলেছে। মধ্যে মধ্যে এই ভাবে সে লেখে। এ লেখায় যত যন্ত্রণা তত আনন্দ। আবিষ্ট মস্তিষ্কের অন্তরালে দৈহিক সচেতনতা ক্লান্ত কাতর হয়ে থামতে চায়, কিন্তু থামবার উপায় নাই। চলচ্ছক্তিহীন তৃষ্ণার্ত যেমন বুকে হেঁটে এগিয়ে চলে দূরবর্তী পদ্মদীঘির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ঠিক তেমনি ভাবেই লেখা লিখেই চলে। মধ্যে মধ্যে কলম রেখে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনী আঙুল দুটি টেনে মটকে নিতে হয়, মধ্যে মধ্যে চা খায়, বাঁ পাশে থাকে বিড়ির বাণ্ডিল ও দেশলাই, একটার পর একটা ধরায়, কয়েকটা টান দিয়ে ফেলে দেয়। সেই চায়ের জন্যই সে একটা ফ্লাস্ক কিনেছে, নইলে চা খাবার জন্য বার বার উঠে দোকানে যেতে হয়। এর সঙ্গে থাকে একটা পাঁউরুটি আর দু-চার পয়সার মাখন। নিতান্ত ক্লান্ত হলে—এক একবার উঠে রাস্তায় খানিকটা ঘুরে আসে—সেই সময় ফ্লাস্কটা নতুন চায়ে ভর্তি করে আনে।

চুমুক দিয়ে বিমলের চা আর ভাল লাগল না। বুকের ভিতরটায় কেমন যেন প্রদাহ অনুভব করছে। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সে কুঁজো থেকে গড়িয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে তৃপ্তি পেলে। বিড়ি খেতে ইচ্ছে হল না। একটু চোখ বন্ধ করে বসে রইল।

শেষ রাত্রে স্তব্ধ মহানগরী। রূপকথার জনহীন পুরীর মত মনে হচ্ছে। অন্ততঃ এ অঞ্চলটা মনে হচ্ছে। এ অঞ্চলে এমন কোন কারখানা নাই যা দিন রাত্রি চলে। খবরের কাগজের আপিস থাকলে এতক্ষণে রোটারী চলতে সুরু করত। স্টেটস্‌ম্যান, অমৃত-

বাজারের মেসিনরুম এতক্ষণে মুখর হয়ে উঠেছে। বসুমতীরও রোটারী আছে। এ ছাড়া আর সব বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন। হাসপাতালে রোগী দু একজন জেগে আছে। নার্স ঢুলছে। হাঁপানীর রোগীরা উঠে বসে কাশছে, হাঁপাচ্ছে। চোরেরাও আর জেগে নাই; তারা নৈশ অভিযান সেরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেহপণ্যাদের পল্লীতেও তাণ্ডবের আসর ঝিমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

হঠাৎ সে উঠল। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রাজপথের উপর। চিক্ চিক্ শব্দ করে চকিত হয়ে ছুটে পালাল একটা ছুঁচো। তার পায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড বড় ইঁদুর।

পল্লীগ্রাম হলে হয় তো দেখা যেত সাপ। কিম্বা বাঁপ্ শব্দ করে লাফ দিয়ে পালাত একটা 'ঢাউস বেড়াল'। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেত বাদুড়। গাছ থেকে ডাকত পেঁচা। আর ডাকত অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ এবং লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ।

খাঁ-খাঁ করছে জনহীন রাজপথ। দু ধারে গ্যাসের বাতি জ্বলছে, মধ্যে মধ্যে দু-একটার শিখা কাঁপছে—লালচে হয়ে উঠেছে তাদের শিখা, ম্যাণ্টাল ভেঙে গেছে। কালো পিচ দেওয়া পথের রঙ মনে হচ্ছে ইস্পাতের মত। শীতের রাতে ছাইগাদায় শুয়ে আছে পথবিহারী কুকুর। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলে বিমল। তারপর ফিরে এসে আবার লিখতে বসল। মিহিরের বাবাকে নিয়ে গল্প। কিছু দিন আগে সে তাঁকে দেখেছিল, বর্ষার রাতে ভাঙা ফাটলধরা পুরানো ড্রয়িংরুমে পায়চারি করতে। সেই দিনই তিনি বিক্রী করেছিলেন তাঁর বাড়ী। লালচে কেরোসিনের আলো পড়েছিল তাঁর পীত পাণ্ডুর দেহবর্ণের উপর। অদ্ভুত দৃষ্টি ছিল তাঁর চোখে। অতীত-কালের স্বপ্ন দেখছিলেন বোধ হয়। অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল বিমলের। তাঁর জীবন আজও শেষ হয় নি কিন্তু গল্প তাকে শেষ করতে হবে। তাই সে ভাবছিল। পুরানো বাড়ীখানা ভাঙতে

সুরু করেছে এইটুকু সে জানে। মিহিরের বাবা কোথায় তাও জানে না। মিহিরকেও সে জিজ্ঞেস করতে পারে নি। তাই তাকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ল তার নিজের বাপের কথা। মনে পড়ল তাঁর শেষ জীবনে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় মহলটি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। এর পর তিনি আর বাইরে বড় বের হতেন না। দিনে থাকতেন পূজোঅর্চনা নিয়ে, শাস্ত্রপাঠও করতেন, গভীর রাত্রে তিনি গিয়ে উঠতেন ছাদে। মনে পড়ছে কতদিন ঘুম ভেঙে গিয়ে সে শুনতে পেত ছাদের উপর ভারী পায়ের খড়মের শব্দ বাজছে খট-খট, খট-খট। মধ্যে মধ্যে শব্দ বন্ধ হত। সে শুনেছে, তার মা বলতেন—আর তিনি তাকিয়ে থাকতেন উত্তর দিকের দূরের গাছপালার দিকে; রাত্রির অন্ধকারে গাছপালা স্পষ্ট দেখা যেত না কিন্তু তিনি নাকি বলতেন, ওই ডিহি শ্যামপুরের অশথগাছের মাথা, ঐ তারাসায়রের পাড়ের শালবনের শোভা, দেখতে পাচ্ছ?

হাতে কলম তুলে নিয়ে সে লিখতে বসল।

"শেষ রাত্রির মহানগরী। নিস্তব্ধ, কিন্তু আলোকিত। জনহীন পথ ঘাট। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নতুন তৈরী বিশাল প্রশস্ত কংক্রিট করা পথের ধারে জ্বলছে ইলেক্‌ট্রিক আলোর সারি। সেই পথের ধারেই একটা বিশাল পুরানো ধ্বংসস্তূপ। অর্ধেক ভাঙা হয়েছে—ছাদ নাই, দরজা জানালা ছাড়ানো হয়ে গেছে। একদিকে সাজিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। ভাঙা ইট এবং পুরানো চূণ সুরকীর গাদা পড়ে আছে।

তারই উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ; পীত পাণ্ডুর বর্ণ, শীর্ণ দেহ, চোখে মৃতের দৃষ্টির মত স্থির ভাবলেশহীন দৃষ্টি। বিশাল পুরানো বাড়ীটার প্রাণপুরুষ, অতীতকালের যক্ষ, মুক্তি পেয়েও বিব্রত হয়ে পড়েছে; মাথার উপরে গ্রহতারকার দীপ্তময় মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে ভাবছে কোথায় যাবে? মধ্যে মধ্যে নিজের পাঁজরায় হাত

বুলায়, মনে হয় পাঁজরাগুলি ভেঙে গেছে—বুকের মধ্যে জমে উঠেছে অস্থিপঞ্জরের ভগ্নস্তূপ, ঠিক এই চূণ সুরকীর ভগ্নস্তূপের মতই। কদর্য লাগে নূতন কালের ইমারতগুলি, গড়িয়ে আসে চোখ থেকে জলের ধারা। রাত্রি শেষ হয়ে আসে। অকস্মাৎ এক সময় বড় বস্তীর ধারের ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলি নিভে যায় এক সঙ্গে। আবছা অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে যায়। তারপর ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটতে থাকে কিন্তু মূর্তিকে আর দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে সে মূর্তি মিলিয়ে গেছে বোধ হয়। সকালে শুধু দেখা যায় ওই ইট চূণ সুরকীর স্তূপের উপর পড়ে আছে ছেঁড়া একটা শালের টুকরো; জীর্ণ পুরানো শালের আঁচলার খানিকটা। মজুরের মেয়েরা কুড়িয়ে নিয়ে যায়, ছেলেদের খেলা করতে দেবে।

সকাল বেলা ওদিকে মিহির বের হয় তার কাজে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ পদক্ষেপে সে চলে—ডকের ওখানে তাকে সাড়ে সাতটায় পৌঁছুতেই হবে। সে এখন কাজ নিয়েছে ডকের নূতন কনষ্ট্রাকশন ডিপার্টমেণ্টে।"

শ্রী পত্রিকার সম্পাদক কঠিন ধাতুতে গড়া মানুষ। মোটা নাক, বড় বড় চোখ, বলিষ্ঠ চেহারা, যেমন হাস্যরসিক তেমনি অপ্রিয়ভাষী। এই দুয়ের যেখানে সংমিশ্রণ হয় সেখানে লোকটির জুড়ি মেলা ভার। আর একটি দুর্লভ গুণ মজলিসী শক্তি। সকাল আটটা থেকে চেয়ার জুড়ে বসেন—খাওয়া নাই স্নান নাই ঘর নাই সংসার নাই, আছে শুধু কাগজের আপিস আর লেখকের দল, একদল আসে একদল যায়, গল্প লেখক, প্রবন্ধ লেখক, চিত্রশিল্পী, প্রফেসর, ধনীর সন্তান মায় রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত।

চায়ের পেয়ালা খালি বা ভর্তি টেবিলের উপর আছেই। মধ্যে মধ্যে টোস্ট ডিম আসে। কখনও চলে নূতন কালের সাহিত্যের কঠোর সমালোচনা, কখনও চলে নূতন কালের প্রশস্তি; অর্থাৎ যখন যাদের দল ভারী থাকে তখনই চলে তাদের মতের উচ্চ ঘোষণা।

সম্পাদক বিজয়বাবু কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ মত প্রকাশ করেন না,

শুধু হুঁ-হাঁ করে যান মধ্যে মধ্যে, সুযোগ পেলেই রসিকতা করে হাসির উল্লাসে জমিয়ে তোলেন আসরকে। মধ্যে মধ্যে লোকটির অকপট চেহারা বেরিয়ে পড়ে। সে কিন্তু কদাচিৎ।

গল্পটি নিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকল বিমল। এঁদের এই আসরে প্রত্যেকেই তার চেয়ে খ্যাতিমান। এবং সকলেই এই গ্রাম্য লোকটির প্রতি বেশ একটু অবজ্ঞা পোষণ করে থাকেন। সে বিমল জানে। কিন্তু তাকে জয় করতেই হবে। জেনে শুনেও সে আসে লেখা নিয়ে, চেষ্টা করে সম্পাদককে একা পেতে। একা তাঁকে শুনিয়ে লেখাটি তাঁর হাতে দিয়ে চলে যায়। অনেক সময় দলের ভিড় এসে পড়লে চুপ করে একপাশে বসে থাকে। এদের তরল উচ্ছ্বসিত সংস্কৃতি-বিলাস চোখ মেলে চেয়ে দেখে। মজার কথা হচ্ছে—বিমল এই কবি ও গল্প লেখকদের সকলের চেয়েই বয়সে বড়, কিন্তু সে এখানে বসে থাকে সকলের কনিষ্ঠের মত।

শুধু নীরেন তার একমাত্র সমবয়সী এ দিক দিয়ে—অর্থাৎ এই অবজ্ঞাত সহকারী সম্পাদকটিই তার একমাত্র অন্তরঙ্গ। আর সম্পাদক বিজয়বাবু অন্তরঙ্গ না হলেও তাকে বুঝতে চেষ্টা করেন। এক ক্ষেত্রে বিমলের কাছে বিজয়বাবুকে ঠকতে হয়েছে।

শ্রী পত্রিকা প্রথম বের হচ্ছে সেই সময়ের কথা। এই আপিসেই বিজয়বাবু প্রত্যেককেই লিখতে অনুরোধ করলেন তাঁর কাগজে, শুধু বিমলকে অনুরোধ করলেন না। কথা দু চারটে বললেন—অবশ্য—তাও আরও দু চারটে সিঙারা কচুরী নেবার অনুরোধ জানিয়ে। সিঙারা কচুরী বিমল খেলে না কিন্তু উঠেও গেল না আসর থেকে। সেই আসরেই ঠিক হয়ে গেল প্রথম সংখ্যার লেখক তালিকা। গল্প লিখবেন স্থির হল বিখ্যাত গল্পলেখক সূর্য লাহিড়ী এবং কমল রায়। আসরের শেষে উঠে গেল বিমল। সন্ধ্যায় নীরেন তার বাসায় এসে তার কাছে কাতর ভাবেই ক্ষমা চাইলে, সে-ই তাকে একরকম জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ওই

আসরে। প্রত্যক্ষভাবে বিজয়বাবুর সঙ্গে বিমলের আলাপও সেই প্রথম। বিমল হেসে সেদিন নীরেনকে বলেছিল—বস, ও সব কথা ছেড়ে দে। কাল রাত্রি থেকে একটা লেখা সুরু করেছি, শুনবি? শেষ হয় নি তবু শোননা খানিকটা—।

লেখা যতদূর হয়েছিল পড়া শেষ হতেই নীরেন তার হাত চেপে ধরে বলেছিল—লেখাটা শেষ কর। আর আমায় না বলে কোথাও দিবি না বল?

—দেব না?

—ওরে তুই যেন হঠাৎ সোনার কাঠি খুঁজে পেয়েছিস। লিখে ফেল বিমল—লিখে ফেল।

সত্যিই সোনার কাঠি হঠাৎ খুঁজে পাওয়া। লেখা শেষ করে সে নিজেও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। লেখাটার শেষের দিকে বিজয়বাবুর প্রত্যাখ্যানজনিত ক্ষোভটাই হয়তো সে সোনার কাঠি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

নীরেন গল্পটা চেয়ে নিয়ে গিয়ে শুনিয়েছিল বিজয়বাবুকে। বিজয়বাবু লেখাটি শুনে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি করে এসে বিমলের টিনের ঘরে হাজির হয়েছিলেন। বলেছিলেন লেখাটি আমায় দিতে হবে। এই প্রথম সংখ্যাতেই ছাপব আমি, সূর্যবাবুর লেখা দ্বিতীয় সংখ্যায় যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে পনেরোটি টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন—শ্রীতে আপনাকে লিখতে হবে, নিয়মিত ভাবে লিখতে হবে। আপিসের আসরে যাবেন।

আসরে সে আসে, চুপ করে একপাশে বসে থাকে, শোনে। বড় বড় কথা, অধিকাংশই ইউরোপীয় সাহিত্যের কোটেশন। মোটামুটি ওমরখৈয়ামী ধারা—জীবন একপেয়ালা আনন্দরস, তার উপর জমে আছে বেদনার ফেনা।

তাকে দেখেই বিজয়বাবু বললেন—আপনার জন্যে বসে আছি। বসুন। ওরে চা নিয়ে আয়। পড়ুন লেখা পড়ুন।

লেখাটি হাতে দিয়ে বিমল বললে—আপনি দেখুন। আমার শক্তি নেই আর। ঘুমে চোখের পাতা ভেঙে পড়ছে। চাও খাব না, কাল থেকে দিন রাত চা খেয়ে আছি।

বিজয়বাবু মজলিসে উপস্থিত লোকগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন—থাক এখন।

—আমি উঠি।

—না। ভিতরের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে নিন খানিকটা।

একখানা বইয়ে ঠাসা ঘর, বিজয়বাবুর লাইব্রেরী, তারই মধ্যে একটা ক্যাম্পখাটে একটা বিছানা পাতাই আছে। মধ্যে মধ্যে বিজয়বাবু এখানেই রাত্রি কাটিয়ে থাকেন। পত্রিকা বের হবার আগে দুদিন থাকতেই হয়, তা ছাড়াও থাকেন—কবিতা লেখার নেশা চাপলে সেদিন আর বাড়ী যান না। আর দু চার দিন থাকেন; বইয়ের আলমারীর ফাঁকে প্রকাণ্ড বিয়ারের বোতল রাখা রয়েছে। আলমারীর পিছনে আরও দু চারটে ছোট বোতল খুঁজলে পাওয়া যাবে। জটিল চরিত্রের লোক বিজয়বাবু। লেখক দলের এক গোষ্ঠী আছে যাদের নিয়ে এই হৈ হৈ করে বেড়ানোও তাঁর জীবনের একটা দিক।

বিয়ারের বোতলটার দিকে তাকিয়ে বিজয়বাবুর কথা ভাবতে ভাবতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিজয়বাবু ডেকে তার ঘুম ভাঙালেন। বিমলের মুখের ওপরেই সিলিং থেকে ঝুলছে ষাট ক্যাণ্ডেল পাওয়ার ইলেকট্রিক বাল্ব, আলোটা জ্বলছে। তীব্র আলো, চোখে লাগল। বিজয়বাবু বললেন—উঠুন। রাত্রি নটা বাজে। নীরেন!

নীরেন উত্তর দিলে—যাই।

পাশে বাথরুমের দিকে দেখিয়ে বিজয়বাবু বললেন—যান, মুখ হাত ধুয়ে আসুন।

মুখ হাত ধুয়ে ঘরে এসে বিমল দেখলে—নীরেন এসেছে, টেবিলের উপরে তিনটে প্লেটে ডবল ডিমের মামলেট—আর চা।

বিজয়বাবু বললেন—খেয়ে নিন। তারপর গল্পটা পড়ুন। আপনার মুখে শুনব।

বিমল শঙ্কিত হল। পড়তে পড়তে তা হলে কি সে নিজেই বুঝতে পারবে লেখাটা ভাল হয় নি?

বিজয়বাবু তাড়া দিলেন—পড়ুন।

সঙ্কোচ রেখে বিমল খাতাটা টেনে নিলে। ব্যর্থ হয়ে থাকে—তাতেই বা কি? বইতে পারবে সে ব্যর্থতার বোঝা। পড়তে আরম্ভ করল সে।

—মহানগরী কলকাতার এক প্রাচীন অভিজাত বংশীয়ের প্রায় দেড়শো বছরের পুরানো বাড়ী।

গল্প শেষ করলে বিমল। বিজয়বাবু বড় বড় চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তার দিকে। চোখে শিরার জাল রক্তাভ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে নেশা করেছেন তিনি। নীরেনও চুপ করে বসে রয়েছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিজয়বাবু বললেন—দিন লেখা।

নীরেন আবার হেসে বললে—বড় জবর লিখেছিস রে বিমলা।

গভীর স্বরে বিজয়বাবু বললেন—জবর মানে? বাংলা সাহিত্যের পাঁচটি শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে এটি একটি। যাও দিয়ে এস প্রেসে। কম্পোজিটার বসে আছে। কাল সকালে শেষ হওয়া চাই।

নীরেন চলে যেতেই, বিজয়বাবু বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে।

বিমল তাঁর মুখের দিকে তাকালে।

বিজয়বাবু বললেন—আপনি সকলের সামনে এমন চুপ করে বসে থাকেন কেন? ওদের সামনে লেখা পড়তে চান না—।

বিমল তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। বিজয়বাবু বিস্মিত হলেন তার দৃষ্টি দেখে। এমন দৃষ্টি যে এই লোকটির চোখে ফুটতে পারে এ ধারণা তাঁর ছিল না। কথা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

বিমল বললে—হয়তো আমারই দোষ। ওঁরা ভাবেন দুঃখের ফেনা মাথায় করে জীবন এক পেয়ালা আনন্দ। আমি তা ভাবতে পারি না বিজয়বাবু।

চমকে উঠলেন বিজয়বাবু। এতখানি গভীর-গম্ভীর উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

বিমল বললে—ওই ধারায় যদি আমাকে ভাবতে বলেন, তবে আমি বলব সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বট পাতা মাথায় দিয়ে আনন্দের ধ্যান করব আমি।

বিজয়বাবু আবার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বিমলের দিকে। এ যেন নূতন করে পরিচয় হচ্ছে তাঁদের উভয়ের মধ্যে।

হঠাৎ কাঠের সিঁড়িতে একদল লোকের জুতোর শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের হাসি। বিমল প্রশ্ন করলে—এত রাত্রে কারা?

বিজয়বাবু গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বিরজাদের দল আসছে। বিরজা বিখ্যাত গল্প লেখক, নকুল তার ভক্ত কবি, রতন—বাংলা সাহিত্যের নবীনতম লেখক—বিজয়বাবু ওকে বলেন ডার্ক হর্স, ভূপেন এবং আরও কয়েকজন। লম্বা বাবরী চুল আঙ্গুলে জড়িয়ে পাক দিতে দিতে ভূপেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করছে। চমৎকার আবৃত্তি করে ভূপেন, পড়াশুনাও তেমনি প্রচুর। আরও একটি গুণ আছে ভূপেনের। জীবন তার খোলা খাতা। সে ভালবাসে এক অভিনেত্রীকে। স্ত্রী পুত্র সকলকে পরিত্যাগ করে সে তার সঙ্গে ঘর বাঁধবার ভূমিকা রচনা করছে। মধ্যে মধ্যে দশ দিন বারো দিন একাদিক্রমে সেখানেই থাকে, সকলকেই ঠিকানা দিয়ে রেখেছে—'দরকার হলে বাড়ীতে না পেলে সেখানে পাবে আমাকে।' অসঙ্কোচে বলে সে। এর জন্য বিমল ভূপেনকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু ওই ভূপেনই যখন এসে বলে, 'কিছু টাকা আমায় আজ দিতেই হবে বিজয়বাবু। বাড়ীতে বউ বিয়ের বেনারসী পরে রান্না করছে অর্থাৎ

কাপড় না কিনলেই নয়। টাকাটা অবশ্য এ্যাডভান্স।' তখন বিমল ক্ষুব্ধ হয়।

বিমল উঠল, বিজয়বাবুকে বললে—চললাম আমি তা হলে।

এক কালে ভারতবর্ষে সাহিত্য রচনার কেন্দ্র ছিল বনভূমি। দেবতার স্তবগান রচনা করতেন ব্রাহ্মণেরা। তারপর রাজার সভায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কবিরা। রাজার স্তবগান মিশিয়েছিলেন তাঁরা দেবতার স্তবের সঙ্গে। মুসলমান আমলে হিন্দু কবিরা গ্রামে পাতার কুটীরে বসে গান রচনা করে গানের দল নিয়ে বেড়াতেন। এ কালে মহানগরীতে সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল স্থাপিত হয়েছে। ছাপাখানা বসেছে, প্রকাশকেরা দোকান খুলেছে, কবি লেখকদের রচনা বই হয়ে বেরুচ্ছে—বিক্রী হচ্ছে সর্বসাধারণের মধ্যে। অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের কথা এসেছে। মুক্ত হয়েছে রাজার স্তবগান করার লজ্জা থেকে। রাজা গুণী হলে গুণীর গুণগানে লজ্জা নাই কিন্তু রাজার গুণগান আশ্রয়ের জন্য—অন্নের জন্য—সে যে দাসত্ব, চাটুকারবৃত্তি। চাই জীবনের জয়গান। যে জীবন মাটির তলায় বীজ ফাটিয়ে উদ্গত অঙ্কুরের মত আকাশ-লোকে আলোক স্নানে যাত্রা করতে চায় বনস্পতির মত সেই জীবনের জয়গান। মাটির কঠিন আস্তরণকে চৌচির করে ফাটিয়ে ঠেলে পথ করে নেওয়ার কষ্টে প্রাণান্তকর বেদনায় জর্জর -অথচ আনন্দের তপস্যায় বিভোর সেই জীবনের গান। সমস্ত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা বাধা বিঘ্নকে ঠেলে সে উঠতে চাচ্ছে। দিকে দিকে তার অভিব্যক্তি। যত দুর্বার গতি তার, তত বিরাট বাধা তার সম্মুখে, যত কঠিন বাধা তার পথে তত বিপুল জয় তার, সুখ এবং দুঃখ অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িয়ে আছে দিন এবং রাত্রি আলোক এবং অন্ধকারের মত। এই বেদনা এই আনন্দ মর্মে মর্মে অনুভব না করলে কি সে গাইতে পারে এই গান?

হন্ হন্ করে হেঁটেই চলেছিল বিমল। মনের খুশীতে এবং উত্তেজনায় ভাবতে ভাবতেই চলেছিল এয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে

মনোহর-পুকুর রোড। এসপ্ল্যানেডের মোরে সে থমকে দাঁড়াল। একখানা শ্যামবাজারের ট্রামে জানালার ধারে অরুণা বসে রয়েছে। অরুণার ওপাশে কে? পিনাকী? ঝাঁকড়া চুল, পুরু চশমার একখানা কাচ দেখা যাচ্ছে। পিনাকীই তো!

চৌরঙ্গী পার হয়ে বিমল এসপ্ল্যানেড এল। অরুণা এবং পিনাকীই বটে। পিনাকী অপ্রতিভের মত হেসে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতে নমস্কার করলে। বললে—ওঁকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলাম চাকরীর জন্যে।

অরুণা বললে—একটা অনাথ আশ্রমে ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।

গম্ভীরভাবে বললে কথাটা, রাজ্যের ভাবনার ছায়া নেমেছে অরুণার মুখে। গম্ভীর মুখে সে ময়দানের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললে—আমি অনেক ভাবলাম, ওখানে ওই ভাবে দর্জির কাজ—। কথাটা শেষ না করে সে ঘাড় নাড়লে বারবার।—পারবে না, সে তা পারবে না।

পথে ভবানীপুর চক্রবেড়ের ধারে বিমল নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। এইখানে একটা পাইস হোটেল আছে, সেখানে খেয়ে বাসায় ফিরবে। অরুণা কোন কথা বলল না, সে ভাবছে। পিনাকী একটু হাসলে।

খেয়ে বাসায় ফিরে দরজা খুলতে গিয়ে সে চমকে উঠল। কে বসে রয়েছে দরজায়?

—কে?

—আমি, পিনাকী।

—পিনাকী?

—হ্যাঁ। আজও একটু শোব এখানে। ট্রামে উঠতে গিয়ে দেখি পকেটে একদম পয়সা নেই। একখানা দু টাকার নোট যেন ছিল। কিন্তু—

অন্ধকারে দেখতে না পেলেও বিমল অনুভব করলে সে অপ্রতিভের মত হাসছে।

—লাবণ্যদির কাছে গেলে দিতেন কিন্তু বড্ড বকতেন। আমারও লজ্জা লাগল।

বিমল হেসে বললে—ওঠ দরজা খুলি।

দশ

পিনাকীর মাথাটা বোধ হয় খারাপ।

সমস্ত রাত্রিটাই প্রায় বকেছে। আপন মনে নয়, নিজে বকেছে এবং বিমলকে শুনিয়েছে। বিমল শুনবে না আর নিজে সে বকে যাবে—তা হবে না। বিমল যতবার চেষ্টা করেছে ততবার সে ডেকেছে, ঘুমুলেন না কি?

সাড়া না দিলেও সে ক্ষান্ত হয় নাই—আবার ডেকেছে—বিমলবাবু!

তাতেও সাড়া না দিলে—উঠে আলো জ্বেলে গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছে—বিমলবাবু!

একবার বিরক্তি প্রকাশ করে বিমল বলেছিল—পিনাকী, এবার তুমি আমাকে সত্যিই বিরক্ত করে তুলেছ।

—তা হলে আমি বাইরে গিয়ে বসি, সিঁড়িটায় বসে চুরুট খাই?

—এই শীতের রাত্রে? তুমি পাগল না কি? শুয়ে পড়।

—আমার ঘুম আসছে না বিমলবাবু। অপ্রতিভের মত সে হাসলে।

—কি? তোমার হল কি?

কি যে হয়েছে—এই কথাটা এখনও পর্যন্ত বললে না পিনাকী এবং ঠিক বুঝতেও পারে নি বিমল। কথা আরম্ভ করেছিল সে অরুণার চাকরী প্রসঙ্গ নিয়ে। তার বুদ্ধি, তার দৃঢ়তা, তার সাহস সম্পর্কে শত-উচ্ছ্বাসময় প্রশংসা করেই এসেছে এতক্ষণ। অনাথ আশ্রমে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পদের জন্যে সে তাকে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে—আশ্রমের অধ্যক্ষ নাকি বলেছেন—আপনি—আমাদের তো কুমারী হলে চলবে না, বিবাহিতা হওয়া চাই, শুধু বিবাহিতা নয়, সধবা হতে হবে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অধ্যক্ষের মুখের দিকে চেয়ে অরুণা বলেছে—কেন বলুন তো?

—এই নিয়ম করে রেখেছেন কর্তৃপক্ষ।

এর উত্তরে অরুণা এই নিয়মের যে ব্যাখ্যা করেছে অধ্যক্ষটির মুখের উপর—সে শুনে পিনাকী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। বলতে বলতে উত্তেজনায় বিছানার উপরে উঠে বসে শতমুখ হয়ে বলে—অদ্ভুত মেয়ে, বিমলবাবু—অদ্ভুত মেয়ে। বললে কি জানেন? বললে—সার্কাসে বাঘ সিংহকে আফিং খাওয়ায় শুনেছি, আপনারা শিক্ষয়িত্রীদের স্বামীদের কি খাওয়ান? কথাটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল লোকটা। অরুণা হেসে বললে—সার্কাসে অবশ্য চাবুকও মারে আফিংয়ের সঙ্গে। এখানে হয় তো চাবুকই চালান আপনারা। কারণ শিক্ষয়িত্রীদের স্বামীরা কখনই বাঘের জাত নয়, গরু-গাধার জাত! বলেই বেরিয়ে এল। সমস্ত রাস্তাটা আমি অরুণার সেই বেরিয়ে আসবার সময়ের মূর্তি ভেবেছি। বুঝলেন—ভেবেছি ঠিক নয় ধ্যান করেছি। কল্পনা করেছি—কালো বিদ্যুতের রূপ। কালো বিদ্যুৎ মনে ভাবা যায়—কিন্তু ছবিতে আঁকা যায় না।

বিমল এবার পাশ ফিরে শুয়ে বললে—আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড় পিনাকী। ঘুম না আসে তো—অন্ধকারে শুয়ে ভাবো—কি ভাবে কালো বিদ্যুৎকে রূপ দিতে পার। আমার ঘুম পাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরেই আবার ডাকলে—ঘুমুলেন নাকি? শেষ পর্যন্ত উঠে আলো জ্বেলে গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে—বিমলবাবু।

সকালে উঠে বিমল বিস্মিত হয়ে গেল। পিনাকী সত্যই দরজার বাইরে সিঁড়িতে বসে আছে। বিমলকে দেখেই সে বললে—আমি বাসায় যাচ্ছি বিমলবাবু।

—বাসায় যাচ্ছ? কিন্তু সারা রাত্রি তুমি এই বাইরে বসেছিলে নাকি?

অপ্রতিভের মত হেসে বললে—ঘরের মধ্যে মনে হল বড্ড গরম। ঘুম কিছুতেই এল না। বাইরে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আরাম পেলাম। খানিকটা ঘুমও হয়েছিল।

উঠে ঘরের মধ্যে কম্বলটা রেখে—নমস্কার করে সে বললে—চললাম। কাল রাত্রে বড্ড বিরক্ত করেছি আপনাকে।

বিমলের মনে পড়ে গেল—কাল রাত্রে পয়সার অভাবে পিনাকী বাসায় ফিরতে পারে নাই। এতটা রাত্রে এসপ্ল্যানেডে গিয়ে আবার ওদিকের ট্রাম যদি না পায় এই জন্যে বিমল পয়সা দিয়ে তাকে যেতে বলে নাই। কথাটা মনে পড়তেই সে পিনাকীকে ডেকে বললে—দাঁড়াও। শোন।

পিনাকী বললে—বলুন। ভারী তাড়া রয়েছে আমার।

একটাকার একখানা নোট তার হাতে দিয়ে বিমল বললে—সারারাত্রি ঘুমোও নি। হেঁটে যেয়ো না। ট্রামে বা বাসে যাও।

নোটটা হাতে নিয়ে সে বিমলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বিমল তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ না দেবার জন্যই ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু পিনাকী দরজায় এসে ডাকলে, বিমলবাবু।

—কি? আবার ফিরলে যে! এদিকে তাড়াতাড়ি আছে বলছিলে।

অকুণ্ঠিত ভাবেই পিনাকী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আমাকে আর চারটে টাকা দেবেন? মানে পাঁচটাকা ধার চাচ্ছি।

বিমল সন্তুষ্ট হল না। কপাল কুঁচকেউঠল তার। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করলে সে।

পিনাকী বললে—খুব দরকার আমার। পেলেই দিয়ে দেব আপনাকে। না পারি বইয়ের কভার ডিজাইন করে দেব আপনার। দেবেন?

বিমল কোন কথা না বলে চার টাকা এনে পিনাকীর হাতে দিয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। টাকা দিতে হওয়ায় মন তার বিরূপ হয়ে উঠল পিনাকীর উপর। ছোকরা যাকে বলে কুগ্রহের মত এসে তার জীবনযাত্রার নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে সুরু করেছে। ও যেদিন আসে সে দিন আর সকালে বেড়ানো হয় না। বেলা অনেক হয়ে গেছে। সাড়ে সাতটা বাজে। তবু ভাল যে আজ তার কোন তাগিদের কাজ নাই।

প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেতে বেরুবার মুখেই চিত্ত বললে—কাল সন্ধ্যের পর মিহিরবাবু বলে সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন দাদা।

—মিহিরবাবু!

—হ্যাঁ। আপনার দরজার গোড়া থেকে ফিরছেন—আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আমি দেখেই চিনেছি—সেই সেদিনের ভদ্রলোক। কালীকাকা বলেছিল—দর্জিপাড়ার বোসেদের বাড়ীর ছেলে। আমাকে কিন্তু চিনতে পারে নি ভদ্রলোক। কয়লা চালছিলাম নিজেই, একেবারে কুলির মত চেহারা হয়েছিল। আমি বললাম—বিমলবাবুকে চান বুঝি? কিন্তু তার তো ফিরতে দেরী হবে। আমাকে বললে আমি বলতে পারি। বলুন কি দরকার?

চিত্তরঞ্জন কথা বলতে সুরু করলে থামতে চায় না। একজন কেউ অনর্গল কানের পাশে নিতান্ত নিরস ভাবে বকে গেলে মানুষ যে কি যন্ত্রণা অনুভব করে—চিত্ত নিজে বুঝতে পারে না, বেচারী

কানে কালা। ওকে থামিয়ে না দিলে ও বকেই যাবে। বিমল তাকে বাধা দিয়ে বললে—বুঝতে পেরেছি। আজ বিকেলে আসবেন বলে গেছেন তো!

চিত্ত কথা শোনে মুখের দিকে তাকিয়ে, অর্ধেক শুনে বোঝে—অর্ধেক বোঝে ঠোঁট নাড়ার ভঙ্গি দেখে। বিমল মাঝখানে অতর্কিত ভাবে কথা বলার জন্যে সে সতর্ক ছিল না তাই কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নাই। সে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলে—কি বলছেন?

বিমল নিজেই ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে স্পষ্ট কিন্তু অনুচ্চ স্বরে বললে—আজ বিকেলে আসবেন বলে গেছেন তো?

চিত্ত ঘাড় নাড়লে—অর্থাৎ—না।

—তবে?

—আসবেন না বলে গিয়েছেন।

—আসবেন না?

—না। ভদ্রলোকের বাবা মারা গিয়েছেন কি না। বোধ হয় অশৌচের মধ্যে আসতে অসুবিধা হবে।

—বাবা মারা গিয়েছেন? চমকে উঠল বিমল। বিশাল প্রাচীন ফাটলধরা জীর্ণ প্রাসাদের মধ্যে একটি শীর্ণ বিবর্ণদেহ মানুষের ছবি ভেসে উঠল তার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে। রক্তাভ কেরোসিন ল্যাম্পের অপর্যাপ্ত কম্পিত আলোয় আলোকিত প্রশস্ত ধূলিমলিন ঘরের মধ্যে স্ফটিকের চোখের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে মন্থর ক্লান্ত পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কলকাতার ঊনবিংশ শতকের সভ্যতা আভিজাত্যের জীর্ণ প্রতিভূদের অন্যতম ব্যক্তি চলে গেছেন।

চিত্ত বললে—হার্টফেল করে মারা গেছেন বোধ হয়। অদ্ভুত মৃত্যু! বুঝেছেন কি না!

—কে বললে তোমাকে?

—শ্রীচন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, ডেকে পাঠিয়েছিলেন

আমাকে। ওখানেই শুনলাম। বোসেদের বাড়ীটা কিনেছে যারা তাদের কাছ থেকে ওই বাড়ীর পুরনো মেটিরিয়েল কিনেছেন শ্রীচন্দ্র-বাবুরা। ওঁরা আজকাল ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্টের ব্যবসা করছেন জানেন তো। কাঁকুলের ওই দিকে অনেক জমি কিনে রাস্তা করে প্লটে-প্লটে ভাগ করে বিক্রী করেছেন; দু চারখানা বাড়ী করেও বিক্রী করছেন; অনেক ব্যাপার আছে। পুরনো মেটিরিয়েলের ইট দরজা জানালা লাগাবেন সেই সব কাজে; ভাঙা ইট চূণ-সুরকী দিয়ে রাস্তা ঘাট তৈরী করবেন। বাড়ীটার মেটিরিয়েল কিনবেন তিরিশ হাজারে—তা মাল যা মিলবে তাতে অন্ততঃ পঁয়ষট্টি সত্তর হাজারের মার নাই, বুঝেছেন কি না, আর বাপ্‌রে—কড়ি বরগা দরজা জানালা—সে কত! আর সে সব কাঠ কি? ফার্ষ্টক্লাস টীক—এ রকম টীক আজকাল আর জন্মায় না।

বিমল চিত্তর হাত ধরে তাকে সচেতন করে দিয়ে বললে—আঃ চিত্ত, বোস মশায়ের কথা বল। শ্রীচন্দ্রবাবুর ভাগ্য ভাল, কাঠ কেন, বাড়ীর ধূলোর মুঠোও তাঁকে পয়সা দেবে। সে কথা থাক।

চিত্ত বললে—পরশু সকালে লোকে দেখে বোস মশায় ওই ভাঙা বাড়ীর ইট কাঠ ধূলোর গাদার উপর উপুর হয়ে পড়ে আছেন।

চমকে উঠে বিমল।

কালই সে তার গল্পটা শেষ করেছে—লিখেছে—শেষরাত্রির মহানগরী। আলোকিত কিন্তু জনহীন, প্রাণহীন যক্ষপুরীর মত। নতুন প্রশস্ত পথের ধারে বিশাল বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে পীত পাণ্ডুরবর্ণ, শীর্ণ দেহ, চোখে স্ফটিক চক্ষুর মত স্থির ভাবলেশহীন দৃষ্টি, শুভ্রকেশ একটি মানুষ; ধ্বংসস্তূপে পরিণত বিশাল বাড়ীটার প্রাণপুরুষ, অতীত কালের যক্ষ যেন।

চিত্ত বলেই চলেছিল—নানা জনে তো নানা গুজব নানা জল্পনা কল্পনা করছিল, কেউ বলে আত্মহত্যা করেছেন, কেউ বলে বাড়ীর কোথাও গুপ্তধন আছে, তারই সন্ধানে এসেছিলেন—অন্য মন্দ লোকে

তক্কে তক্কে ছিল—খুন করে গিয়েছে। শেষে মর্গে গেল—ডাক্তারেরা রিপোর্ট দিয়েছে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বিমল।

চিত্ত বললে—শ্রীচন্দ্রবাবুরা এখন ভারী বিপদে পড়েছেন। বুয়েচেন কি না। একটু হাসলে চিত্ত।—মানে, কুলিরা কেউ বাড়ী ভাঙতে আসবে না। এর মধ্যে গুজব হয়ে গিয়েছে যে, ওই বুড়োবাবু ভূত হয়ে রাত্রে ঘুরে বেড়ায় আর বাড়ীর ইট কাঠ আগলায়। তার এক কারণও ঘটে গিয়েছে—বুয়েচেন কি না; হয়েছে কি—কাল লরীতে কাঠ বোঝাই করে আনতে গিয়ে এক-খানা মোটা কড়ি হাত ফসকে একটা কুলির পায়ে পড়ে একেবারে ছাতু হয়ে গিয়েছে। বাস্। আর যায় কোথা! সব একেবারে দে ছুট। এখন শ্রীচন্দ্রবাবুরা মহা মুস্কিলে পড়েছেন, কাজ কর্ম সব বন্ধ। ওদিকে পাড়ার সব বওয়াটের দল যে যাচ্ছে তাকেই বলছে—রাত্রে সে কি আওয়াজ রে বাবা, খচ-খচ, খট-খট ঘুরেই বেড়াচ্ছে সারা রাত্রি। তাই এখন শ্রীচন্দ্রবাবু আমাকে ডেকে ধরেছেন—চিত্ত তোর লরী নিয়ে তুই বাপু কাজ আরম্ভ কর—তাহলে দেখা-দেখি লোক আসবে।

বিমলের ভাল লাগছিল না এসব কথা, তার মনের মধ্যে এখন দুটি বিপরীত ভাবনার দ্বন্দ্ব চলছিল। তার গল্পের মধ্যে ওই অভিজাত বংশীয়ের যে শোচনীয় মানসিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে—যা কাকতালীয়ের মত অতি নিষ্ঠুর সত্য পরিণতির সঙ্গে প্রায় মিলে গেছে—তার জন্য মনে মনে কুণ্ঠা বোধ করছিল, ভাবছিল গল্পটি মিহির এবং ওদের আত্মীয় স্বজনের চোখে পড়লে তারা কি মনে করবে? তারা কখনই বুঝবে না, বিশ্বাস করবে না যে, কল্পনা এমন আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠেছে, তারা ভাববে—তাদের বংশের কুৎসা প্রচারের জন্যই সে এমন করেছে। আবার তার কল্পনা এমন ভাবে সরেত্য সঙ্গে মিলে যাওয়াতেও সে আশ্চর্য আত্ম-প্রসাদ অনুভব করছে। তার ইচ্ছা হচ্ছে এই মুহূর্তেই সে নীরেনের

কাছে ছুটে গিয়ে কথাটা বলে আসে। জানিয়ে আসে তার দৃষ্টি কেমন ভাবে সত্যদৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। সে অকস্মাৎ হন্ হন্ করে চলতে সুরু করে বললে—আমি চললাম চিত্ত, আমার অনেক কাজ আছে।

চিত্ত ডাকলে, শুনুন শুনুন।

—কি

—সব কথাই যে বলা হয় নি।

—কি ? আর কি কথা ?

—শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে যেতে বলেছিলেন আপনাকে। গিয়েছিলেন নাকি আপনি ?

—কেন বল তো ? কথাটা প্রকাশ করতে চাইলে না বিমল ; চিত্ত কতটা জেনেছে সেটাই আগে জানতে চাইলে। চিত্তকে অবিশ্বাস নাই তার কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ সে যদি কথাটা বলে বেড়ায়, বিশেষ করে কালীনাথের কাছে তবে ক্ষতি হবে।

চিত্ত বললে—যদি গিয়েছিলেন তো গিয়েছিলেন। না গিয়েছেন তো যাওয়ার দরকার নেই। মিহিরবাবু বলতে বলে গিয়েছিলেন আপনাকে।

—ঠিক শুনেছ তো তুমি ?

এবার চিত্ত হেসে উঠল, বললে—কানে খাটো বলে বলছেন ?

বিমল হেসে ফেললে, বললে—তা বলছি বৈকি। তুমি রাগ করো না যেন।

চিত্ত বললে—কালাকে কালা বললে কালারা রাগ করে কিন্তু আমি করি না।

—তা হলে তুমি ঠিক কালা নও।

এই রসিকতায় চিত্ত প্রচুর হাসতে সুরু করে দিলে। খানিকটা হেসে একটু সংযত হয়ে বললে—তার মানে আপনি বলছেন আমি

কালা নই কালা সেজে থাকি। মানে আমি কালা বলে লোকে গোপন কথাও তো আমার সামনে ফিস ফিস করে বলে না, চেঁচিয়ে বলে—আমি দিব্যি শুনি।

আবার সে প্রচুর হাসতে সুরু করে দিল। বিমলও খানিকটা না হেসে পারলে না ; তারপর বললে—আচ্ছা চললাম।

—শুনুন—শুনুন। তবে মজার কথা বলি শুনুন। কাল ঠিক তাই হয়েছে। মধ্যে মধ্যে আমি বেশ শুনতে পাই। মানে বেশী গ্রীষ্ম হলে কি বেশী বর্ষা হলে আমি কানে একদম শুনতে পাই না। কানের পাশে ঢাক বাজলেও না বেশী শীতেও না ; কানে যেন ঝাঁপ ধরে থাকে। কিন্তু না-গরম না-শীতে মানে ঠাণ্ডা আরামের দিন হলে বেশ শুনতে পাই, সে একেবারে সহজ মানুষের মত। এই তো এখন এত কথা বললেন—বেশ শুনতে পাচ্ছি।

হেসে বাধা দিয়ে বিমল বললে—এত কথা কিন্তু আমি বলি নি চিত্ত। কথা সব তুমি বলেছ।

চিত্ত আবার হাসতে সুরু করে দিলে। বললে—ওই আমার স্বভাব। কথা বলি না তো বলি না। বলতে আরম্ভ করলে আর থামি না। এখন কালকের কথাটা বলি শুনুন। শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে গিয়ে আর আমি কি করব, চুপ করেই ছিলাম। কিন্তু কানে এই বসন্তের আমেজ পড়েছে এখন বেশ শুনতে পাই। আমি শুনতে পাচ্ছি না মনে করে শ্রীচন্দ্রবাবু একজন পার্টনারের সঙ্গে কাল অনেক কথা বলে গেলেন। আমি তা দিব্যি শুনেছি। কাঁকুলেতে কলোনী করছেন না? ওখানে এক বিধবার বাড়ী নিয়ে ফৌজদারী করেছেন, এ নিয়ে হাঙ্গামাতে পড়েছেন। পাড়ার ছেলেরা এমন মারপিট করেছে ওদের লোকদের যে, গাঁইতি শাবল ফেলে যে যার দৌড় মেরেছে—তাই বলছিল—আমার সামনেই বলছিল, মনে করেছিল আমি শুনতে পাচ্ছি না। বলছিল—ওদিকে ভূত এদিকে ভূতের বাড়া—পাড়ার যত বওয়াটে ছেলে।

বিমল বুঝতে পারলে—গোপেনদা ছেলেদের নিয়ে তাঁর কাজ সুরু করে দিয়েছেন।

চিত্ত আবার হাসতে লাগল—হাসতে হাসতেই বললে—বুয়েচেন—আমি এমন মুখ করে রইলাম যে কার বাবার সাধ্যি বলে আমার কানে কিছু ঢুকছে। অথচ হাসিতে পেট আমার কব্ কব্ করছে কাদাজলের মাগুর মাছের মত। মনে মনে হাসি আর বলি—বাবাধন, পাড়া গাঁ থেকে এসে কলকাতায় জেঁকে বসে ব্যবসা ফেঁদেছ। এইবার ফাঁদে নিজেই পড়েছ। এ সব বাবা কলকাত্তাই ছেলে, গাঁইয়া নয়। এরা বাবা পীরকে মানে না। মামদোর বাড়া এরা।

বিমল আবার যেতে উদ্যত হল। চিত্ত এবার তাকে না থামিয়ে তার সঙ্গ নিলে। বিব্রত হয়ে বিমল বললে—ডিপোয় যাবে না?

—ডিপো তো আছেই, চলুন আপনার সঙ্গে যাই খানিকটা। কোথায় যাচ্ছেন?

—দাদার দোকানে, চা খেতে।

—দাদার দোকানে? ওই চোরটার দোকানে? যান আপনি, ওখানে আমি যাব না। দাদার সঙ্গে চিত্তর ঝগড়া হয়ে গেছে কয়লার দাম নিয়ে। দাদা প্রতিবারই অভিযোগ করে—কয়লা খারাপ। সেই অজুহাতে অন্তত মণকরা দুটো পয়সাও না কেটে দাম দেয় না।

চিত্ত বলে—চেয়ে নাও দুটো পয়সা দিচ্ছি। কিন্তু জবরদস্তি কি ভাঁওতা দিয়ে এক আধলা নিতে দেব না।

দাদা বলে—খারাপ জিনিষ দিয়ে ভালো জিনিষের দাম নেবে—সে দেব কেন?

এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। সেই ঝগড়ার কারণে বিমল আজ চিত্তর কবল থেকে নিষ্কৃতি পেলে।

দাদার দোকানে চা খেয়ে বেরিয়ে পথে সে নেমেছে এমন সময় একখানা মোটর তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে খানিকটা এগিয়েই ব্রেক

কষে সশব্দে থেমে গেল। গাড়ীর ভিতর থেকে মুখ বের করে শ্রীচন্দ্রবাবু তাকে ডাকলেন—বিমল, বিমল।

বিমলকে এগিয়ে যেতে হল। গাড়ীর মধ্যে শ্রীচন্দ্রবাবু একা নন—কালীনাথও রয়েছে। কালীনাথকে দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

শ্রীচন্দ্রবাবু বললেন—এস, গাড়ীর মধ্যে এস।

—কোথায় ?

—আরে এস না। শ্রীচন্দ্রবাবুর বাড়ীতে যাব—চা খাব—গল্প করব খানিকটা। কালীনাথ বললে।

—আমার কাজ আছে কালীকাকা। লেখা দিতে হবে।

শ্রীচন্দ্রবাবু হেসে উঠে বললেন—আরে বাপ্‌রে। সাহিত্যিকেরাও কাজের লোক হয়ে উঠল। কি সর্বনাশ! আমাদের রুটি এইবার মারা গেল দেখছি।

হেসে বিমল বললে—আপনারা রুটি খান না শ্রীচন্দ্রবাবু—লুচি খান। ভাতও খান না—পোলাও খান। সুতরাং ভাগ্যে যদি রুটি কি ভাত জোটে তবুও আপনাদের পাতে আমাদের হাত পৌঁছবে না।

আবার হা—হা করে হেসে উঠলেন শ্রীচন্দ্রবাবু। বললেন—সাহিত্যিকেরা কথা বলতে পারে বটে।

কালীনাথ আই-বি-ইন্‌স্পেক্টর—দেশের লোককে বিশেষ করে যে লোকেরা এগিয়ে হাঁটে তাদের শাসন করে দমিয়ে রাখাটাই তার অভ্যাস, অভ্যাসমত সে সরাসরি বললে—তোমার সঙ্গে তো গোপেন মুখুজ্জের আলাপ আছে। একটা কাজ করে দিতে পার ? শ্রীচন্দ্রবাবুর সঙ্গে তিনি ঝগড়া বাধাচ্ছেন কেন বলতে পার ?

কালীনাথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বিমল বললে—আমি কেমন করে সে কথা বলব বল ?

—আরে এই সেদিন তো তুমি তাঁর ওখানে গিয়েছিলে। কীর্তি বোসের ছেলে—মিহির এসেছিল তোমাকে ডাকতে। তুমি জান

না? বলেন নি তোমাকে গোপেনবাবু? শ্রীচন্দ্রবাবু আমাদের দেশের লোক, গোপেনবাবু নিশ্চয় সে কথা জানে—বলে নি?

ধীরে ধীরে কালীনাথের ভিতরের পুলিশ-পুঙ্গব বেরিয়ে আসছে। গোপেনদার সম্পর্কে কথা আরম্ভ করেছিল 'জানেন—বলেন' বলে—এইবার 'জানে—বলে' সুরু করেছে।

বিমল বললে—না জানি না আমি কিছু, তিনি এ সম্পর্কে আমায় কিছু বলেন নি।

—তবে কি জন্যে ডেকেছিলেন?

অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠল বিমল এবার, বললে—আমায় যে তুমি জেরা আরম্ভ করলে? সত্যিই কোন এনকোয়ারী করছ না কি?

শ্রীচন্দ্রবাবু ব্যবসায়ী লোক। তিনি বলে উঠলেন—আরে না—না! তুমি যে একেবারে রেগে গেলে। উঠে এস—রাগ কর না। হাতটা তিনি ধরে ফেললেন বিমলের।

কালীনাথ বললে—সাহিত্যিকেরা ভয়ানক সেন্টিমেন্টাল। এই জন্যেই ওরা কিছু করতে পারে না।

শ্রীচন্দ্রবাবু ব্যাপারটা নিয়ে আর অগ্রসর হতে চান না। মিটিয়ে ফেলতে চান। চিত্ত যখনকার কথা শুনে এসেছিল—তখন থেকে ব্যাপারটা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ একটা অভাবনীয় মোড় ফিরতে চাচ্ছে।

কালই অংশীদারেরা একটা নূতন খবর পেয়েছেন। খবর পেয়েছেন প্রচুর অর্থ নিয়ে কয়েকটি জমি ও বাড়ী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান টালীগঞ্জ ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে বিত্তশালী অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য সুরম্য নির্জন বাসপল্লী গড়তে উদ্যত হয়েছেন। একটি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা করেছেন—তাঁরা কেবল সিনেমা আর্টিষ্টদের জন্য আমেরিকার অনুকরণে স্বতন্ত্র পল্লী গড়ে তুলবেন। সেখানে যে সব তারকারা নিজেরা বাড়ী করবেন—তাঁদের জমি বিক্রী করবেন, প্রয়োজন হলে—কণ্ট্রাক্ট নিয়ে নিজেরাই বাড়ী তৈরী করে দেবেন; যাঁরা বাড়ী নিয়ে থাকবেন—

তাঁদের আধুনিকতম ফ্যাশনের—সর্বোত্তম আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে বাড়ী তৈরী করে ভাড়া দেবেন। কয়েকটি সিনেমা কোম্পানীকেও তারা ষ্টুডিয়ো করবার জন্য প্রলুব্ধ করেছেন।

একটি প্রতিষ্ঠান শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি কিনে রাখছেন। এই সব সংবাদ পেয়ে তারা বুঝতে পেরেছেন মহানগরী হতে চাচ্ছে এবং হবেই। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট—করপোরেশন—তাদের এলাকা গণ্ডীবদ্ধ করলেও সে গণ্ডীর শাসন মানবে না সে। এই সব আলোচনা করে এঁরা স্থির করেছেন—আরও দূরে অর্থাৎ শহরতলীর প্রান্তভাগে সস্তায় অনেক বেশী জমি তাঁরা কিনে ফেলবেন। কাঁকুলিয়ায় যে জমিটা কেনা হয়েছিল সেটাকে উন্নত করে এখন যে দাম তার দাঁড়িয়েছে তাতে বিক্রী করলে যথেষ্ট লাভ হবে। সেই টাকাটা এখন ওদিকে ফেলতে পারলে ভবিষ্যতে কল্পনাতীত লাভ হবে এ.তে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য এক মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠানকে কাঁকুলিয়ার অবিক্রীত জমিটা সবই একসঙ্গে বেচে দেবেন। কালই তার কথাবার্তা সুরু হয়ে গেছে। এখন গোপেনবাবু ওখানকার ছেলেদের নিয়ে যে উৎপাত সুরু করেছেন—সেটা একটা বাড়ী নিয়ে হলেও গোটা জমিটার সত্ব নিয়ে সন্দিহান করে তুলবে ক্রেতাকে। সেইজন্যেই এটাকে মিটিয়ে ফেলতে চান শ্রীচন্দ্রবাবুরা। ভোরবেলা উঠেই শ্রীচন্দ্রবাবু গিয়েছিলেন কালীনাথের কাছে। আই-বি ইন্‌স্পেক্টার কালীনাথ গোপেনবাবুদের মত লোকেদের কায়দা করতে জানে—ওদের গুপ্ত তথ্যও অবগত ওরা। অজগরের সামনে যেতে গেলে ওঝা নিয়েই যাওয়া সঙ্গত এবং নিরাপদ। কিন্তু কালীনাথ জানে, সাপের ওঝার মতই জানে, তার মন্ত্রতন্ত্র সব মিছে, সরকারী পরওয়ানার দণ্ডটি না থাকলে গোপেন-বাবুর সামনে সে শ্রীচন্দ্রের মতই অসহায়। তাই পথে বিমলকে দেখে ওকেই ডেকে কাজটা উদ্ধার করে নিতে চাচ্ছে। অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন শ্রীচন্দ্রবাবু। যাদবপুরে ওদের একটা কলোনী আছে। পূর্বের শর্তমত সেখানে একটা আড়াই কাঠা প্লট ভদ্রমহিলাকে

দিতে রাজী আছেন, শুধু তাই নয় এখানকার জমির দামের সঙ্গে—ওখানকার জমির দামের তফাৎ হিসাবে ওই জমির উপর সিমেন্টের মেঝে টিনের দেওয়াল টিনের চাল দিয়ে একখানি দু' কুঠরী ঘরও তৈরী করে দেবেন পনের দিনের মধ্যে। ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ীতে চলে যেতে হবে। অর্থাৎ এখানকার বাড়ীর দখল ছেড়ে দিতে হবে।

কালীনাথ বললে—তুমি গিয়ে গোপেনবাবুকে বুঝিয়ে বল। বুঝেছ? মামলা মকদ্দমায় তো ফল হবে না। লেখা যখন কিছু নেই তখন আইনে পাবেন না। ওর ওই ছেলের পাল ক্ষেপিয়ে বিশেষ ফল হবে না। তাতে যদি না শোনে তখন আমি যাব।

শ্রীচন্দ্রবাবু বললেন—আমার গাড়ীতে যাও তুমি।

কালীনাথ বেরিয়ে এসে যাবার সময় মৃদুস্বরে বললে—আমার নামটাম করিসনে যেন?

নিরীহের মত বিমল বললে—করব না?

—না। বুঝলি না—এটাতো আমার official ব্যাপার নয়।

হেসে বিমল বললে—বুঝেছি।

গোপেনদা অরাজী হবেন কেন এতে? তিনি বললেন—এতো ভাল কথা! তবে দলিলটা আগে করে দিন। আমার বন্ধু এক উকিলকে বলে দিচ্ছি—সে সব করে নেবে এঁর তরফ থেকে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—এ ভালই হল। কি বলিস? এদের মত পরিবারের পক্ষে শহরের মধ্যে থাকা অসম্ভব। তার চেয়ে পাড়াগাঁয়ের আবহাওয়ায় এর চেয়ে অনেকটা আরামে থাকবে।

আবার খানিকটা পরে বললেন—একটু হেসেই বললেন—আর শেষ পর্যন্ত সেই যেতেই হবে।

তারপর আবার গম্ভীর ভাবে বললেন—যে দিক দিয়েই ভাবি না কেন, শহরে আর ওদের থাকার অধিকারও নেই। নাই মানলাম—ধনী দরিদ্রের ভেদ—অক্ষম এবং সক্ষমের ভেদ তো মানতেই হবে। একটা

পঙ্গু অসুস্থ ছেলে—আর একটি বিধবা হিষ্টিরিক মেয়ে—কি করবে শহরে ?

বিমল চুপ করেই বসেছিল। এর মধ্যে নিজের বক্তব্য তার কি থাকতে পারে। সে শুধু ভাবছিল এই মহানগরীর কথা।

গোপেনদা বললেন—তুমি বস একটু, আমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে একবার কথা বলে আসি। তাঁর মতটা নেওয়ারও তো প্রয়োজন আছে।

বিমল বেরিয়ে এসে ফালি বারান্দাটায় একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। কোথায় কেউ বা কারা কিছু কাটছে। শব্দ উঠছে। দূরে দেখা যাচ্ছে—একটা নতুন বাড়ির তেতলায় গাঁথনী চলছে, কপিকলে দড়ি ঝুলিয়ে ঝুড়িতে ইট তুলছে টেনে, খন্ খন্ কর্ণির শব্দ হচ্ছে। অকস্মাৎ একটা মড়মড় শব্দ উঠল—শব্দ লক্ষ্য করে বিমল দেখতে পেলে একটা নারকেল গাছ পড়ছে—শূন্য পথে ক্রমবর্ধমান বেগে তার ঘন সবুজ পাতায় ভরা মাথাটা মাটির দিকে নেমে আসছে।

দুম্ করে একটা শব্দ হল।

মহানগরী দ্বিপ্রহর ঘোষণা করছে। একটা বাজল।

নির্জন দুপুরের প্রথম রৌদ্রচ্ছটার দিকে তাকিয়ে বিমল দিবাস্বপ্ন দেখছিল। নারকেল গাছগুলি একের পর এক কাটা পড়ছে। শহরের এই প্রান্তসীমায় পল্লীটিকে মানুষ অনেক কাল আগে ফলের জন্য ছায়ার জন্য ঝড়কে রুখবার জন্য যে উদ্ভিদপ্রজা পত্তন করেছিল—তাকে শহরের বিস্তৃতির প্রয়োজনে কেটে ফেলেছে। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লরী বোঝাই হয়ে চলেছে—শহরের আবর্জনা ভাঙা বাড়ীর ধূলো টুকরো ইট একটা লরীতে গেল। লম্বা কোঁকড়ান চুলের মত লোহার পাড়ের ছাঁট—ওগুলোকেও ফেলা হবে ওই আবর্জনা এবং টুকরো ইট ধূলোর মত সুরকীর স্তূপের সঙ্গে। ডোবা খানা খন্দ বন্ধ করে সমান করা হচ্ছে। যেখানে নারকেল গাছগুলি কাটা পরছে সেখানে আগে ছিল কোন এক সৌখীন ধনীর সখের বাগান, বাগানের মধ্যে মধ্য-আয়তনের একটি চমৎকার পুকুর ছিল—সেটাও

পুরিয়ে ফেলা হচ্ছে। পুকুরের কি প্রয়োজন মহানগরীর মধ্যে? অকারণে কেন বিঘে দেড়েক জায়গা অধিকার করে থাকবে? জলের জন্য এখানে পুকুরের প্রয়োজন নাই। মাটির তলায় তলায় চলে গেছে এখানে জল সরবরাহের পাইপ। ভোর পাঁচটার পরেই কলের মুখে জল এখানে।

বিমল পল্লীর মানুষ, এবং সে পল্লী ভারতবর্ষের পল্লী। তাই ওই গাছগুলির জন্য সে গভীর বেদনা অনুভব করলে। বাহিরের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের তৃপ্তিতে অন্নব্যবস্থার প্রাচুর্যের লোভে, এ-দেশের মানুষ শহরে আসে—থাকে—অনেকে বাসও করে কিন্তু অন্তরে অন্তরে—পল্লীর প্রতি একটি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে তারা। যারা নিজেরা বাড়ী করে এখানে—তাদেরও শতকরা আশীজন পল্লীর বাড়ীটিকে রক্ষা করে যায়। কেউ বা যত্ন করে রক্ষা করে—মধ্যে মধ্যে যায়—ঝাড়ামোছা মেরামত করায়। কেউ বা অবহেলার মধ্যেই বাড়ীটাকে রেখে দেয়। দু দশ বছর অন্তর সেখানে গিয়ে দেওয়ালের গা থেকে বট পাকুড়ের গাছ কাটিয়ে তার উপর বালি চূণ লাগাবার ব্যবস্থা করে। মনে মনে সংকল্পও করে এবার সুযোগ পেলেই এখানে এসে থাকবে কয়েক মাস; মুক্ত শীতল বায়ু—অবারিত সূর্যস্নেহ—ভূমিলক্ষ্মীর অকৃপণ সতেজ প্রসাদ প্রাণ ভরে উপভোগ করবে। কিন্তু মহানগরীর কুহকে যে একবার পড়েছে তার পরিত্রাণ নাই। ছেড়ে গেলেও সে তাকে টেনে নিয়ে আসে। এখানে এলে পড়ে যেতে হয় দ্রুততম গতি ধাবমান জীবনপ্রবাহের মধ্যে। তখন সে স্রোত কেটে পাশে তীরে ওঠা আর হয়ে ওঠে না।

বিমলের স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে বাস্তব ছবি লুপ্ত হয়ে গিয়ে মহানগরীর নূতন রূপ ফুটে উঠেছিল। পিচ ঢালা মসৃণ রাজপথ সরল ও সমান্তরাল রেখায় চলে গিয়েছে—তার দু'ধারে নতুন বাড়ীর সারি, ছোট বড় নানা আকারের নানা রঙের। ইলেকট্রিক ল্যাম্প-পোস্টের সারি—দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে, চৌরাস্তায় অথবা তেরাস্তার মোড়ে

পল্লীটির প্রয়োজনীর বস্তু সরবরাহের দোকান—মুদীর, মনিহারীর দোকান, চায়ের রেস্তোরাঁ, লণ্ড্রী, ছোটখাটো ওষুধের দোকান—তার মালিক সম্ভবতই হবে তরুণ কোন ডাক্তার যে সদ্য সদ্য পাশ করে পসারের চেষ্টা করছে।

বিমলের স্বপ্নভঙ্গ করে হঠাৎ বেজে উঠল কারখানার বাঁশী। অত্যন্ত নিকটে কোথাও বাজছে। কাছেই কোথাও কারখানা আছে। বিমল উঠে দেখতে চেষ্টা করলে—কারখানার লোহার চিমনীর মাথা কোথাও দেখা যায় কি না। দেখা গেল না। পূর্ব দক্ষিণ কোণে রেল লাইনের ধার বরাবর ঘন ঘন পল্লবের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সম্ভবত। গাছগুলো ভবিষ্যতে থাকবে না। সে স্পষ্ট দেখতে পেলে প্রসারিত হয়ে চলেছে মহানগরী। গাছগুলো কাটা পড়ে যাচ্ছে। বস্তী ভেঙ্গে গড়ে উঠছে নব উপনিবেশ। পল্লী অঞ্চল থেকে দলে দলে চলে আসছে নবযুগের দুঃসাহসী অভিযানকারীর দল। তারা সেখানে বাসা বাঁধছে। তার মধ্যেও কিন্তু থাকবে ওই কারখানাটি। ও থাকবেই। হয়ত ওরই দৌলতে ওখানকার পারিপার্শ্বিক আরও জমজমাট হয়ে উঠবে। বড় বাজারই একটা গড়ে উঠবে।

গোপেনদা বেরিয়ে এলেন এতক্ষণে। তিনি বললেন—তোমার খানিকটা কষ্ট হল।

বিমল হাসলে।

—কি করব বল? ভদ্রমহিলা কিছুতেই রাজী হতে চান না। বলেন আমার শ্বশুরের ভিটে। হাসলেন গোপেনদা। বললেন—শহরের মাটি বীরভোগ্যা না হোক বণিকভোগ্য। ভাগ্যান্বেষিণী বাস্তববাদিনী আধুনিকা। অথবা কি বলতে পার। গত্যন্তর গ্রহণই বল আর মনিব বদলানোই বল হাসিমুখে করে যায়। গরীবের ঘর থেকে বেরিয়ে বলে—বাঁচলাম। সে উনি কিছুতেই বুঝবেন না।

বিমল বললে—তা হলে ওঁদের কি বলব?

—বলবে, রাজী হয়েছেন। এই প্রস্তাবই পাকা হয়ে রইল। আমার বন্ধু উকীল এরপর সমস্ত ব্যবস্থা করে নেবেন।

বিমল প্রশ্ন করল—দেখবেন, কোন গোলমাল হবে না তো?

—না। অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী করে এনেছি। শেষ কথাই আদায় করতাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঁদতে সুরু করে দিলেন—আমার শ্বশুরের ভিটে। একবার ক্ষেপে উঠে বললেন—এই মাটিতে আমি চোখের জল ফেলে যাচ্ছি। এই জল আগুন হয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে তার সংসার যে এখানে বাড়ী করবে।

তারপর বললেন—চল তোমার সঙ্গে আমিও যাই। আজ আর রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হয়ে ওঠে নি। মিহিরের ওখানে যাব। সে আবার অশৌচের মধ্যে পড়েছে—তার উপর বাপের টাকা নিয়ে লাঠালাঠি লাগবার সম্ভাবনা আছে ভাইয়ে-ভাইয়ে। বড় ভাই নিশ্চয় আসবে ভাগ নিতে।

পথে চলতে চলতে বললেন—ওখান থেকে যেতে হবে খিদিরপুরে। মিহির আটকে পড়ে মুস্কিল হয়েছে আমার। লেবার নিয়ে কাজ অত্যন্ত কঠিন। অনেক কষ্টে ওদের যে মনটুকু পেলে—একদিনে একটি গাফিলতিতে সব চলে গেল। তা ছাড়া আরও দলগুলো চেষ্টা করছে। করপোরেশন-ইলেকশন এসেছে তো।

বিমলের হাসি পেল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করলে সে। ধনিক-ভোগ্যা মহানগরীতে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে করপোরেশন-ইলেকশন; শ্রমিকদের প্রতিনিধি! পরিকল্পনা ভাল। রাবণরাজা স্বর্গপুরী পর্যন্ত সিঁড়ি তৈরী করে স্বর্গলোকে গণতন্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন—তারই পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে চিরকাল। এ কথা বললে গোপেনদা ক্ষুণ্ণ হবেন—ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন তার উপর। গোপেনদার স্বপ্ন সম্পর্কে আদর্শ সম্পর্কে তার মনে যতই রহস্যকৌতুক জেগে উঠুক—গোপেনদার ওই ইলেকশনে সাফল্যের কামনা সে অন্তর দিয়েই করে। গোপেনদার এটা পাওনা। সন্ন্যাসী যারা ঈশ্বর সন্ধানে ঘর ছাড়ে—কৃচ্ছ্র সাধন করে,

তারা ঈশ্বর না পেলে ততটা বঞ্চিত হয় না, যতটা বঞ্চিত হয় শেষ বয়সে একটি আশ্রয়—অন্ততপক্ষে গঙ্গার ধারে একটি গাছতলায় ছোট একটি কুঁড়েতে সিঁদুর মাখানো পাথরের সামনে একটি পাকা আসন—না পেলে।

পথের মাঝখানে গোপেনদা বললেন—চা খাবে?

—চা? এই দুপুরে? না দাদা।

—তবে তুমি চল, আমি এককাপ চা আর টোষ্ট খেয়ে নি। মিহিরের ওখানে তো হবিষ্যি!

শ্রীচন্দ্রবাবু খুশীই হলেন। বিমলের লেখা সম্পর্কে গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন—অনেক মারাত্মক রকম ভুল উক্তি করলেন, মধ্যে মধ্যে দু' চারটে রসিকতাও করলেন, যা থেকে খুব খুশী হওয়ার ভাবটা ব্যক্ত হয়ে পড়ল। কালীনাথও তাতে ফোড়ন দিলে।

শ্রীচন্দ্র বললেন—আমি শুনেছি, বুঝেছ কালীনাথ—মেয়েরা যা চিঠি লেখে বিমলকে! ওঃ—সে সব চিঠি কি!

কালীনাথ বললে—তুমি শুনেছ—আমি দেখেছি!

—দেখেছ? বল কি?

—হ্যাঁ গো। জিজ্ঞাসা কর না। সে দিন হঠাৎ এসে পড়েছিলাম এ দিক দিয়ে। পথে হারামজাদা চিত্তর সঙ্গে দেখা। চিত্ত বললে—বিয়ার খাওয়াতে হবে কালীদা। বললাম—পয়সা নেই। চিত্ত বললে—তবে আমি খাওয়াই তুমি খাও। কি করি—রাজী হলাম। কিন্তু ওর ওই ডিপোয় কয়লার ধুলোতে যেতে গা ঘিনঘিন করল। চিত্তই নিয়ে গেল বিমলের ওখানে। গিয়ে দেখি একটি অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে—চমৎকার দেখতে, দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমলের দরজার সামনে। কি ব্যাপার; না—বিমলকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে—ডাকতে এসেছে।

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে কালীনাথ বললে—কি ব্যাপার বলতো বাবাজী? চার খাও খেয়ো—কিন্তু যেন টোপ গিলো না বাবা।

বিমলের সমস্ত অন্তরটা ঘিনঘিন করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধও হয়ে উঠল সে। কানের পাশ দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল, গরম হয়ে উঠেছে কান। জিভের ডগায় অনেকগুলো কটু কথা শানের উপর ক্ষুরের মত দ্রুত এবং চঞ্চলভাবে আসা-যাওয়া করতে লাগল তবুও সে আত্মসম্বরণ করলে।

শ্রীচন্দ্র ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। তিনি বললেন—তুমি বড় ভাল্‌গার কালীনাথ।

কালীনাথ বললে—আমরা পুলিশ শ্রীচন্দ্র।

বিমল এবার বললে—কিন্তু পুলিশ হয়ে জন্মাওনি কালীকাকা, জন্মেছিলে মানুষ হয়ে।

কালীনাথ হেসে উঠল। বললে—তুই প্রেমে পড়ে গিয়েছিস বিমল। রেগে উঠেছিস তুই।

শ্রীচন্দ্র বললেন—তাই প্রেমেই পড় বিমল। ওদের খাতা থেকে তোমার নামটা কাটা যাক।

কালীনাথ বললে—আজকাল প্রেমে পড়লে নাম কাটা যায় না হে। মেয়েটির নামশুদ্ধ লেখা হয়ে যায় খাতায়। প্রীতিলতা, কল্পনা—চিটাগাং আর্মারী রেইড কেসের মেয়ে-আসামীদের নাম শোন নি? লেবংয়ে লাটসাহেবকে গুলী করলে যে দল—তাদের মধ্যে উজ্জ্বলার নাম তো তুমি জান হে। পার্বতীপুরে দার্জিলিং মেল যখন সার্চ হয়—তখন তো তুমি গাড়ীতে।

বিমল উঠে পড়ল। বললে—চললাম আমি।

কালীনাথ বললে—বস্ বস্। রাগছিস কেন?

বিমল বললে—এখনও স্নান করি নি—আর বসা চলে?

শ্রীচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে বললেন—সে কি? আমি জানি—তুমি—।

কথাটা কিন্তু লজ্জায় শেষ করতে পারলেন না। কারণ অস্নাত অভুক্তের যে ছাপটা বিমলের চেহারায় ফুটে উঠেছিল—সেইটাই তাকে মর্মান্তিক ব্যঙ্গে স্তব্ধ করে দিলে। সামনের ঘড়িতে বাজছে

ছুটো। তিনি উঠে এসে বিমলের হাত ধরলেন। বললেন—স্নান কর খাও। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব।

বিমলের অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল। কিছুতেই সে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলে না। তার মনে হল যে ক্ষুধা এখন যা হোক কিছু গ্রাস করবার জন্য আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে—সে ক্ষুধাও এই নিমন্ত্রণের আহ্বানে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে, তার গলায় এবং জিভে যেন অখাদ্যের নামে বমন আক্ষেপ জেগে উঠেছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করবে কি করে? হঠাৎ সে বলে উঠল—উপায় নেই শ্রীচন্দ্রবাবু। আমার নিমন্ত্রণ আছে। তাঁরা আমার জন্য বসে থাকবেন।

—কোথায় নিমন্ত্রণ আছে? আমি টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি—বেলা হয়ে গেছে—

বাধা দিয়ে বিমল বললে—না, সে হয় না। তা ছাড়া সেখানে টেলিফোন নেই।

—বেশ তবে চল—তোমাকে গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না—না। কেন ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি। কাছেই নিমন্ত্রণ। তা ছাড়া আমাকে স্নান করতে হবে।

—স্নান তুমি এখানেই করে নাও। আমি কাপড় দিতে বলছি।

—না না। শ্রীচন্দ্রদা।

—তা হবে না বিমল। আমি জানি আমার জন্যেই তোমার দেরী হয়ে গেছে। আরও জানি তুমি যেখানে থাক—সেখানে স্নানের জায়গা নেই। একটা টবে—তুমি রাস্তা থেকে জল ধরে নাও। জল আছে কি না জানি না। থাকলেও সে জল একেবারে অব্যবহার্য হয়ে গেছে।

কালীনাথ চুপ করে বসে শুনছিল। সে এবারে বললে—ছেড়ে দাও শ্রীচন্দ্র, ওকে ছেড়ে দাও।

শ্রীচন্দ্রবাবু আবার বিমলের হাত ধরলেন। তাঁর এ আন্তরিকতা হয়তো সাময়িক, এবং এই সাময়িক আন্তরিকতাটুকুর উদ্ভব বিমলের প্রতি প্রীতিবশত নয়; সম্পদশালীদের প্রশংসালোলুপ মানসিকতার

উপরেই এর ভিত্তি; তবুও আর প্রত্যাখ্যান করা তার রূঢ়তার সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠল না। সে মিষ্টি করেই বললে—ঝঞ্ঝাট বাড়ালেন আর কি। আমার কাপড় ছেড়ে—আপনার কাপড় পড়ে যাব, সমস্তক্ষণ সাবধানে থাকতে হবে—কোথায় কাঁটা কি খোঁচায় লেগে ছিঁড়বে, বিড়ি খেতে হবে সাবধানে—।

কালীনাথ সোফায় শুয়ে পড়ে একটা সিগারেট মুখে পুরে দেশলাইয়ের কাঠি বের করতে করতে বললে—ভেরী ক্লেভার চ্যাপ।

বিমল তার কথার কোন উত্তর দিলে না।

এগার

স্নান করে কিন্তু সত্যিই খুব আরাম পেলে। সম্পদশালীরা যত সুখ উপভোগ করে এবং এই মহানগরীর স্বাচ্ছন্দ্য-ব্যবস্থার যত রকম আয়োজন আছে তার মধ্যে এই স্নানাগারের আরামটিই বিমলের কাছে সব চেয়ে কাম্য; এইটুকু বললেই যথেষ্ট হল না—ওই ব্যবস্থার প্রতি ওর লোভ আছে। অভিজাত শ্রীচন্দ্রবাবুর স্নানাগারে বড় টব, শাওয়ার বাথ, গরম জল ঠাণ্ডা জল; ব্যবস্থা অনেক। তার উপর নূতন তোয়ালে নূতন সুগন্ধ সাবান; সুগন্ধ তেল শাম্পু করার ব্যবস্থা—ত্রুটি কিছুরই নাই। কাপড় দিয়েছিল নতুন একখানি শান্তিপুরে ধুতি। সম্ভবতঃ রসিকতা করে যে কথা বিমল বলেছিল —তার উত্তরে নিখুঁত ধনিকোচিত ব্যবস্থা।

স্নান করে বেরিয়ে আসতেই শ্রীচন্দ্রবাবু বললেন—নাও চল। কালীনাথকে পৌঁছুতে যাচ্ছি, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব, কোথায় তোমার নিমন্ত্রণ আছে।

কালীনাথ দাঁড়িয়ে আছে, চিন্তা করবার অবকাশ পর্যন্ত নাই।

শ্রীচন্দ্রবাবু জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে অগ্রসর হলেন। বিমল বললে—আপনারা যান। আমি—

কালীনাথ তার হাত চেপে ধরলে। হেসে বললে—যাবি তো সেখানে। আয়। এত লজ্জা কিসের!

বিমলের মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। চিন্তা করবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললে যেন। মধ্যে মধ্যে শুধু ইচ্ছে করতে লাগল, সে চলন্ত মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালিয়ে যায়।

কালীনাথ পথ দেখাচ্ছিল—ডাইনে। আবার ডাইনে। আবার ডাইনে। বাস্।

গাড়ীটা এসে দাঁড়িয়েছে লাবণ্যদের বাড়ীর সামনে। নামল বিমল। মনে মনে ঠিক করলে ওরা গাড়ী নিয়ে চলে গেলে সেও ফিরে আসবে বাসায়। হোটেলে আর ভাত নাই, দোকান থেকে পুরী তরকারী আনিয়ে নেবে। কিন্তু গাড়ী নড়ছে না। ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে কালীনাথ বললে—ডাক না—শ্রীচন্দ্র না দেখে নড়বে না।

মাথাটা ঘুরে উঠল বিমলের। ইচ্ছে হল একখানা আধলা ইট নিয়ে ছুঁড়ে মারে ওদের। মোটরের ষ্টার্ট বন্ধ করে বসে ক্লেদাক্ত হাসি হাসছে।

লাবণ্যদের দরজা আপনি খুলে গেল। বেরিয়ে এল পিনাকী এবং অরুণা। তাদের পিছনে লাবণ্য। অবাক হয়ে গেল বিমল। পিনাকী আজ সাজসজ্জা করেছে, তার দেহের প্রতি অযত্ন এবং অপরিচ্ছন্নতার অন্তরালে যে তারুণ্য চাপা পড়েছিল—সে তারুণ্য আজ ফুটে বেরিয়েছে—বর্ষণ-পরিচ্ছন্ন গাঢ় নীল আকাশের ক্ষীণ-জ্যোতি নীলাভ তারাটির মত। সে আজ চুল ছেঁটেছে—দাড়ি কামিয়েছে, বোধ হয় সাবান মেখে স্নান করেছে—তার উপর স্নোর চিহ্ন সুস্পষ্ট—গায়ে পাটভাঙা লংক্লথের চুড়িদার পাঞ্জাবী, পরনে ধোয়া ধুতি, পায়ে সাদা রঙের ফিতে দেওয়া স্যাণ্ডেল। একটি মিষ্টি

গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অরুণার পোষাকে আতিশয্য নাই—কিন্তু পরিচ্ছন্নতার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল—শুধু চুলে আজ তেল না দিয়ে হয় সাবান দিয়েছে নতুবা শাম্পু করেছে, রেশমের মত নরম কালো চুলের রাশি ফেঁপে পড়ে আছে পিঠের ওপর; এতে তার রূপ যেন বেড়ে গেছে। ওকে আর কালো মেয়ে বলে উপেক্ষা করা চলে না।

পিনাকী একটু হাসল। অপ্রতিভের হাসি নয়। সপ্রতিভ—মিষ্টি অথচ দীপ্ত হাসি হেসে বললে—বসন্ত এসেছে বিমলদা।

অরুণা লজ্জিত হল একটু! সে বললে—জু-য়ে যাচ্ছি আমরা।

পিনাকী বললে—সন্ধ্যেবেলা সিনেমায় যাব। তবে সবই আপনার দৌলতে। সকাল বেলায় পাঁচটা টাকা না পেলে যে কি করতাম আমি—হঠাৎ সে বলে উঠল—হয়তো আত্মহত্যা করতাম কারুর মোটরের তলায় পড়ে। হাসতে হাসতে পিনাকী চলে গেল, অরুণা তার অনুগমন করলে। লাবণ্য সবিস্ময়ে দেখছিল বিমলকে এবং গাড়ীর আরোহীদের।

কালীনাথ নমস্কার করে বললে—ওকে আমরাই আটকে রেখেছিলাম। ওর কোন দোষ নেই, কিছু মনে করবেন না, আপনাদের খাওয়া দাওয়ায় অনেক দেরী করে দিলাম।

বিমল এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে বললে—অত্যন্ত অপরাধ করে ফেলেছি আপনার কাছে। বাড়ীর মধ্যে চলুন—সব বলব।

শ্রীচন্দ্র বললে—চলি বিমল। ভাল মন্দ খেতে খেতে আমাদের স্মরণ করো ভাই।

বিমল তখন দরজার মুখে, লাবণ্য ঘরে ঢুকেছে। সে ওদের কথা শুনে বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—এখনও খান নি?

বিমল বললে—বলছি। ঘরের মধ্যে একটা পা দিয়েও সে থমকে দাঁড়াল, তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে, শ্রীচন্দ্রের গাড়ীখানা দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, সে অনেক কথা। অন্য সময় বলব। এখন আমি যাই।

লাবণ্য ভ্রূ-কুঞ্চিত করে মৃদু হেসে বললে—বসুন। অনেক কথার একটা কথা বুঝতে পেরেছি। ওঁরা যা বললেন, তাতে মনে হয় আপনি ওঁদের বলেছেন, আপনি এখানে খাবেন। ব্যাপার কি বলুন তো?

বিমল বুঝতে পারল না কি বলবে।

লাবণ্য বললে, বলুন না কি ব্যাপার? ভদ্রলোক দুটির একজনকে তো সেদিন আপনার ওখানে দেখেছিলাম। অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল আমার।

—উনি আমার গ্রামের লোক, একজন আই-বি, ইন্‌স্পেক্টর।

—আই-বি, ইন্‌স্পেক্টর?

—হ্যাঁ, আর একজন এই পাড়ারই ধনী ব্যক্তি। উনিও আমার দেশের লোক।

—ওঁদের কাছে আপনি বলেছেন, এখানে খাবেন? হঠাৎ লাবণ্যের কণ্ঠস্বর উগ্র হয়ে উঠল। সে বললে, এটা কি হোটেল বিমলবাবু?

বিমল তার মুখের দিকে তাকালে, অভুক্ত অবস্থায় এই ধরনের তীক্ষ্ণ বাক্যের আঘাতে তার মাথার ভিতরটা ঝিম-ঝিম করে উঠল। মাথার মধ্যে রক্তের ধারা ঠেলে উঠছে। তবু সে নিজেকে সংযত করলে।

লাবণ্য বললে, দেখুন আপনি আমাকে অত্যন্ত বিপদে ফেলেছেন। আপনি বুঝতে পারবেন না কত বড় বিপদ। কিছুক্ষণ আগে পিনাকী আর অরুণাকে নিয়ে ব্যাঙ্কের গিন্নীর বউয়ের সঙ্গে একদফা হয়ে গেছে। কুৎসিত ঝগড়া! আবার—। সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিমল উঠল। বললে—গোড়াতেই আপনার কাছে মার্জনা চেয়েছি। আবার চাচ্ছি। আমি থাকতেও আসি নি খেতেও আসি নি। আপনার এখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে এ কথাও আমি বলি নি। নিতান্তই পাকচক্রে ঘটে গেছে, অত্যন্ত অবাঞ্ছিত অঘ

গলাধঃকরণ করার তিক্ততা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বলেছিলাম আমার নিমন্ত্রণ আছে। কালীনাথ—ওই আই-বি অফিসারটি—ধরে নিলে নিমন্ত্রণ আমার এখানে। সে-ই বললে, এখানে নিমন্ত্রণ বুঝি? আমি ভাবছিলাম কার বাড়ীর নাম করব। কালীনাথের কথায় তাড়াতাড়ির মধ্যে সায় দিয়ে ফেললাম। ওরা ছাড়লে না, গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে গেল। নইলে এখানে আসতামও না। এসেছি, ওরা গেলেই চলে যাব বলেই এসেছি। এটুকুও অপরাধ হয়েছে এটা স্বীকার করছি।

লাবণ্য বললে—কিন্তু তাতে তো আমার ক্ষতিপূরণ হবে না বিমলবাবু।

—ক্ষতি?

—হ্যাঁ। ক্ষতি। ওঁদের হাসি ওঁদের কথার মধ্যে ওঁদের মনের ধারণা তো প্রকাশ হতে বাকী নেই। আমি অভিভাবকহীনা বিধবা—আমি আপনাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবই বা কেন আর ওঁরা এই ধরনের হাসি হাসবেনই বা কেন? এমন বিশ্বাস ওঁদের জন্মাল কেন?

বিমল একটু চুপ করে থেকে বললে—আপনি বিশ্বাস করুন, তাতে আমার কোন অপরাধই নেই।

—তবে কি অপরাধ আমার? আমি ওঁদের বলে এসেছি?

—আপনারও নয়। বিমল হাসলে। তারপর বললে—দোষ মানুষের মনের। বিশেষ করে শহরের লোকের মনের, বিশেষ করে আই-বি, কর্মচারী কালীনাথের মনের দৃষ্টির। যেদিন ও এসেছিল সেদিন আমার নিমন্ত্রণ ছিল আপনার এখানে। আপনি আমাকে ডাকতে গিয়েছিলেন যখন তখন ও দেখেছিল। সেই ভিত্তির উপর পুলিশের লোক কলঙ্কের মনুমেন্ট বানিয়ে তুলেছে। যাক, কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। আমি চলি। নমস্কার।

সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। লাবণ্যও এল পিছনে পিছনে।

ঘরের দরজাটাই সে বন্ধ করছিল। হঠাৎ ঘরের ভিতরে একটি নারী-কণ্ঠধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠল। কথাগুলি বিমলের কানে এসে পৌছল। কথাগুলি শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার চলবার শক্তিও যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

—তারপর লাবণ্যদি; ওই পিনাকী ছেলেটি না হয় অরুণাকে বিয়ে করতে চায়—সেই জন্যই এক ঘরে বসে হা-হা করে হাসছিল। কিন্তু এই ভদ্দরলোকটি? এর সঙ্গে যে এই ভর দুপুরে মান অভিমানের পালা গাইলে—এর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধটা কি শুনি!

লাবণ্য স্তম্ভিত বিমলের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি চলে যান। দাঁড়িয়ে এসব শুনবেন না। বলেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

বিমল পা বাড়ালে। যেতে যেতেই শুনলে—লাবণ্য উত্তর দিচ্ছে—এসব কুৎসিৎ কথার উত্তর আমি দেব না। তুমি যা খুশী তাই মনে করতে পার।

বিমলের যাওয়ার কথা দাদার দোকানে, কিছু খেতে হবে। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে সে এসে উঠল নিজের ঘরে। দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে—আগন্তুকদের জন্য রাখা পুরানো ভাঙা সোফায় বসে পড়ল। মানুষের কদর্যতায় মন তার বিষিয়ে উঠেছে। একটা বিড়ি ধরালে। মনে পড়ল তার পল্লীগ্রামের কথা। পল্লীগ্রামে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে কুৎসিৎ মন নেই এমন নয়, আছে, যেখানে আছে সেখানে হয়তো এই মহা-নগরীর অধিবাসীদের চেয়ে বেশীই আছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভুল করে না। তারা বুদ্ধি দিয়ে অথবা অঙ্ক কষে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নির্ণয় করে না। জীবজন্তুর মত আশ্চর্য একটা বোধশক্তি আছে তাদের। তার মনে পড়ল লালবউয়ের কথা। অভিভাবকহীনা, সন্তানহীনা রূপসী গ্রাম্য ব্রাহ্মণবধূ। তার ভাই ছিল রমজান মের্দা। পাতানো ভাই। রমজান ছিল ভাল ঘরামী এবং

পাকা বাসন চোর। শোনা যায়, এক বর্ষার রাত্রে রমজান এসেছিল লালবউয়ের বাড়ী চুরি করতে। বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি। রমজান উঠানে বাসনগুলি সন্তর্পণে গামছায় বাঁধছে এমন সময় প্রবল বেগে বৃষ্টি। পুরুষ নাই বাড়ীতে, রমজান নির্ভয়ে বৃষ্টি ধরবার প্রতীক্ষায় দাওয়ার এককোণে উঠে গিয়ে বসল। কয়েক মিনিট পরেই সে চমকে উঠল—দাওয়ার চালের কোণ থেকে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল তার মাথায়। সে সরে দাঁড়াল ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই শুনতে পেল ঘরের মধ্যে খস-খস শব্দ। তার সঙ্গে গুন্‌গুন্‌ করে কান্নার আওয়াজও তার কানে এসে পৌঁছুল। কান পেতে শুনে সে বুঝতে পারলে ঘরের মধ্যে জল পড়ছে, জল থেকে বাঁচবার জন্য বিধবা বউটি বিছানা টেনে সরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে আক্ষেপ করে কাঁদছে। রমজান আকাশের দিকে চেয়ে অকস্মাৎ উদাস হয়ে গেল, তারপর একসময় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পথে মনে পড়ল গামছার কথা। আবার ফিরল। ফিরে গামছাখানা খুলে নিতে গিয়ে মনে হল—সে ছুঁয়েছে, এ বাসন পড়ে থাকলে কাল সকালে বিধবা বউটি নিজেই মাজবে। ব্রাহ্মণের ঘরের এঁটোকাঁটা ছোঁয়াছুঁয়ির-বাছবিচারের কড়াকড়ির কথা সে জানত। সে খানিকক্ষণ ভাবলে। ভেবে ঠিক করলে ওর শাস্ত্র ওর ধর্ম ওর কাছে তার নিজের ধর্ম নিজের শাস্ত্রের মতই সত্য! কিন্তু সেই বা এঁটোবাসন মাজবে কেন? অবশেষে মুক্ত উঠানের উপর অবিশ্রান্ত বর্ষণের নীচে বাসনগুলোকে রেখে সে চলে গেল। দেবে ধুয়ে খোদাতালার দেওয়া বৃষ্টি। ওই বৃষ্টির তো এই কাজ, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করাই তো তার ধর্ম।

পরের দিন সকালে সে দাঁড়াল লালবউয়ের দরজায়। সমস্ত রাত্রি বর্ষণ লালবউয়ের জীর্ণ চাল বিপর্যস্ত করে ঘরের মেটে মেঝেতে ডোবা তৈরী করে দিয়েছে। লালবউ বসেছিল গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

রমজান এসে সেলাম করে বললে—সালাম গো দিদি!

তারপর বললে—আল্লার নাম নিয়ে কই দিদিঠারাণ—আমারে সন্দ করবেন না। আমার আপন মায়ে আর আপনকাতে সমান দেখি তবু আপনারে দিদিই বলব। প্রথমেই 'বেরাইছে' মু থেকে—আপনি আমার দিদিই।

লালবউ সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল তার দিকে।

রমজান অকপটে বলে গেল গতরাত্রের কথা। পরিশেষে বললে—দিদিঠারাণ, আপনি আমারে ভাই বলেন। আমি ঘরখানা আপনার ছাইয়া দি। খড় নাই, তালপাতা কেটে আনি—তাই দিয়া দিই ছাইয়া। দেখবেন রমজানের হাতে তালপাতার ছাউনি খড়ের ছাউনি থেকে ভাল হবে। বলেন আমার দিদি হলেন?

কেউ ছিল না সেখানে; শুধু ছিলেন তিনি যিনি সব সময়ে সর্বত্র থাকেন। তিনি হয়তো অহরহ ঘোষণাও করে থাকেন যা কিছু যেখানে ঘটে সব। কিন্তু শুনতে তো পায় না মানুষ। এ ঘোষণা বুঝতে পারে অনুমান করতে পারে তারাই যাদের আছে ওই বোধ শক্তি। পল্লীর মানুষেরা অনুমান করতে পেরেছিল। ওই একটি তরুণী রূপসী ব্রাহ্মণ-বধূ আর এক মুসলমান তরুণ ঘরামী যে সম্পর্ক পাতালে, যার সাক্ষী কেউ ছিল না তাকে বুঝতে অনুমান করতে। তাদের একদিন এক-মুহূর্তের জন্যও ভুল হয় নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লালবউ আর রমজান ছিল দিদি আর ভাই। নিত্য রমজান দিদিকে নির্জলা-খাঁটি দুধ জুগিয়ে এসেছে। রমজান জেলে গিয়েছে, চুরি করে, রমজানের বউ দুধ জুগিয়ে গেছে ঠাকুরঝির জন্যে। লালবউ ভাইফোঁটার ফোঁটা দিয়েছে রমজানের কপালে, কাপড় দিয়েছে। যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয়েছে সে বাড়ীর সন্দেশ মিঠাই লালবউ নিয়ে এসেছে আঁচলে পুরে, রমজানভাইকে দিয়েছে। রমজানের চুরির মালের সম্বন্ধে বারদুয়েক পুলিশ লালবউয়ের বাড়ীও সার্চ করেছে। তবু একটা অপবাদের কথা কেউ কোনদিন মুখে উচ্চারণ করে নি।

মহানগরীর হিসাব অঙ্কের হিসাব। ফরমূলার উত্তর। বাহিরের জগৎ যত বিস্তৃত হয়ে চলেছে উগ্র প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে হৃদয় হয়েছে তত সংকীর্ণ, মন হয়েছে তত বুদ্ধিবৃত্তিতীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ এবং অবিশ্বাসী।

হঠাৎ কারও জুতোর শব্দ বেজে উঠল বাঁধানো গলিটার মধ্যে। চকিত হয়ে একটু সোজা হয়ে বসল বিমল। সেই মুহূর্তে বিড়ির খানিকটা আগুন খসে পড়ল কাপড়ের উপর। প্রায় লাফ দিয়ে উঠল সে এবার। সর্বনাশ! কাপড়খানা শ্রীচন্দ্রবাবুর, নতুন পাট-ভাঙা শান্তিপুরে কাপড়। পুড়ে গেলে শ্রীচন্দ্রবাবু হয়তো ওই অজুহাতে কাপড়খানা বিমলকে দানই করে ফেলবেন, বলবেন—ওটা অগ্নিসাক্ষী করেই দিয়েছিলাম তোমাকে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ছিল। অগ্নিদেব তাঁর সাক্ষ্য জ্বলজ্বলে করে ফুটিয়ে রেখেছেন—পাছে মনের কথাটা ভুলে যাই। ও কি আমি ফিরিয়ে নিতে পারি?

বিড়িটা ফেলে দিয়ে সে দড়ির আলনা থেকে টেনে নিলে নিজের কাপড়খানা।

সেই মুহূর্তেই সেলাম করে দাঁড়াল শ্রী পত্রিকার আপিসের দারোয়ান।

—কি খবর?

—চিট্‌ঠি। হিরণবাবু ভেজিল।

হিরণ লিখছে—পত্রপাঠ চলে এসো। জরুরী দরকার। ক্ষতি হবে। থাক আজ খাওয়া! চল।

ব্যাপারটা জাঁকজমকের ব্যাপার এবং তাকে নিয়েই।

সমারোহ করে লেখক কয়েকজনকে ডেকে তার ওই গল্পটা পড়া হবে। পড়তে হবে তাকেই। বিজয়বাবু জাঁকিয়ে বসে আছেন এবং রসিকতায় মজলিস সরগরম করে তুলেছেন। বিমল যেতেই তাকে তাঁর পাশের চেয়ারে বসিয়ে বললেন—গল্পটা পড়ুন। আপনার মুখে শুনবার জন্যে সব বসে আছে।

বিমল বসল, কিন্তু তার অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল। সে এদের

সকলকেই শ্রদ্ধা করে, কিন্তু এদের গল্প পড়ে শোনাতে তার প্রবৃত্তি নাই। কারণ সে জানে এরা প্রত্যেকে তাকে নিতান্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে। হয়তো পড়তে সুরু করে মাঝখানেই তাকে থামতে হবে—অথবা শেষ করে যখন উঠবে তখন দু' একজন ছাড়া কেউ থাকবে না। সে দু' একজনেরও টাকার দরকার থাকবে—এ্যাডভান্স নেবে, সেই জন্য থাকবে।

বিরজা ঢুলছিল। এরই মধ্যে তার আফিংয়ের নেশা জমেছে: রতন রেসগাইড নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে।

কাব্য-পাগল, দীর্ঘকেশী ভূপেন আঙ্গুলে চুল জড়াতে জড়াতে আপন মনেই ওমর খৈয়াম আবৃত্তি করে চলেছে। একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য, কিছু আঙ্গুর-চোয়ানো সুরা আর প্রিয়া—এই হলেই স্বর্গ।

সদ্য প্রকাশিত কাগজখানা হাতে দিয়ে বিজয়বাবু বললেন—পড়ুন।

বিমল কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললে—পড়ার কি দরকার আছে? ছাপার অক্ষরে যখন বের হল—তখন অবসর মত পড়বেন সকলে।

বিজয়বাবু বললেন—আপনি তাহলে কিছুই জানেন না। সাহিত্যিকেরা কেউ কারও লেখা পড়েন না। পড়ুন, শোনাতে চাই আমি গল্পটা।

রতন রেসের বইটা বন্ধ করে বললে—পড়ুন। তাড়াতাড়ি শেষ করুন। আমাকে একবার চারটের সময় দেবপ্রসাদ এণ্ড সন্স-এ যেতে হবে।

বিরজা সমানে ঢুলছে, কিন্তু শুনছে সব, সে বললে—আমাকেও একবার যেতে হবে। পড়ুন মশায়।

বিজয়বাবু আবার তাগিদ দিলেন—পড়ুন।

বিমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পড়তে আরম্ভ করলে। অবজ্ঞার বিনিময়ে অশ্রদ্ধা দেখানোটাই আত্মম্ভরিতা চরিতার্থ করবার সব চেয়ে সস্তা এবং সহজ উপায়। সাহিত্যিক হিসাবে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত, তারা

শক্তিমান, তাদের শক্তিকে সে নিজেও স্বীকার করে, সুতরাং অশ্রদ্ধা দেখিয়ে সে নিজেকে নিজের কাছে ছোট করবে কেন? সে ধীরে ধীরে পড়তে সুরু করলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরখানি স্তব্ধ হয়ে গেল। মাথার উপরে ইলেকট্রিক পাখার একটা একটানা শব্দ প্রবাহের মত বয়ে চলেছে। মধ্যে মধ্যে দেশলাই জ্বালার শব্দ হচ্ছে, সিগারেট ধরাচ্ছেন; বিরজাবাবু নিজে সিগারেট ধরিয়ে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট খুলে টেবিলের উপর রেখে দিচ্ছেন, যার যখন ইচ্ছে বের করে ধরাচ্ছেন।

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন। বিজয়বাবু বললেন—এক মিনিট। বাইরের আপিস ঘরে তিনি উঠে গেলেন।

বিমল এতক্ষণে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। স্তব্ধ হয়ে সকলে সিগারেট টেনেই চলেছেন। রতন আপন মনেই পায়ের ঠেলা দিয়ে চেয়ারে দোল খাচ্ছে, বিরজা বড় বড় চোখ দুটি মেলে চেয়ে রয়েছে বাইরের দিকে, ভূপেন চোখ বন্ধ করে একহাতে ধরে আছে চুলের গুচ্ছ, অন্য হাতে সিগারেটটা পুড়েই চলেছে। আর কয়েকজন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বিমলের মুখের দিকে।

বিমল দেখলে—সত্য করে প্রত্যক্ষ করলে বাংলার সাহিত্যিক সমাজকে। সকল তুচ্ছতা সকল ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে প্রতিভার মহিমায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে সাহিত্যরসের হবি গ্রহণ করছেন হোমশিখার মত। যজ্ঞকাষ্ঠের অন্তর্নিহিত বহ্নিশিখার মতই তাঁদের আত্মা যেন বেরিয়ে এসেছে মহিমান্বিত মূর্তিতে। সে মনে মনে তাঁদের প্রণাম জানালে।

বিজয়বাবু টেলিফোন রেখে ফিরে এসে চেপে বসলেন। বললেন —পড়ুন। বিমল আবার পড়তে সুরু করলে।

পড়া শেষ হল। বিজয়বাবু হাঁকলেন—চা!

ভূপেন বললে, চা নয় মদ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এমন একটা রসের কারবারের পর ট্যানিক এ্যাসিডে নেশা ছুটে যাবে। গোটা আষ্টেক টাকা খরচ করুন বিমলবাবু।

—বিমলবাবু না, আমি। আমি পনেরো টাকা দিচ্ছি। চল তোমার সাকীর ওখানে, গান শুনব, কাটলেট খাব। রাজী ?

—রাজী।

—বিমলবাবু আপনাকেও যেতে হবে কিন্তু।

—নিশ্চয় যেতে হবে। ভূপেন বললে।

বিমল হেসে বললে—যাব।

রতন অকস্মাৎ বলে উঠল—ভাল হয়েছে গল্পটি। সুন্দর হয়েছে! তারপর উঠে পড়ল সে, বললে—বিজয়দা, কথা আছে।

হেসে বিজয়বাবু বললেন, কোন্ ঘোড়া ? বলেই নোটকেস খুলে দু'খানা দশটাকার নোট বের করে হাতে তুলে দিলেন।

বিমল হিরণের হাত টিপে ইসারা দিয়ে বাইরে এল। বললে, কিছু খেতে হবে। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি।

—সে কি ?

—সে অনেক কথা।

পিছনে ভারী পায়ের শব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল কাঠের মেঝেতে। রতন বেরিয়ে আসছে। লম্বা চওড়া কালো জোয়ান রতন—বাংলা সাহিত্যের ডার্ক হর্স ; কালো তেজি ঘোড়ার মতই চলেছে। পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েও রতন আবার দাঁড়াল। বললে—ভারী ভাল গল্প লিখেছেন বিমলবাবু। বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প।

বিমল একটু হাসল।

হিরণ বললে—আসবেন তো সন্ধ্যেবেলা ?

—দেখি। এখন তো যাব দেবপ্রসাদ এণ্ড সন্সের ওখানে।

—ওরা আপনার একটা বই ছাপলে, না ?

—হ্যাঁ। ওদের 'জন্মভূমি' কাগজে একখানা বই ধারাবাহিক ভাবে বের হচ্ছে। সেটাও ওরা ছাপবে।

বিমল বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব রতনবাবু ?

—কি ?

—আমিও একখানা বই ওদের দিয়েছি। তাই জিজ্ঞাসা করছি। কি টার্মে দিলেন ?

আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। বিমলের মুখের কাছে মুখ এনে অত্যন্ত কদর্যভাবে মুখ নেড়ে রতন বলে উঠল—আপনাকে বলব কেন ?

বলেই সে দ্রুতপদে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। কয়েকটা সিঁড়ি নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে হা হা করে হেসে উঠে বললে—ঠাট্টা করলাম। কিছু মনে করবেন না। তবে সকলকে তো সমান দেয় না! আপনাকে আমার সমান না দিতে পারে। সুতরাং শুনে কি করবেন ?

হিরণ বললে, চল। তুই যেমন! ঘটোৎকচটা এমনই বটে। ও একটা দুর্বার। শক্তিও যেমন, দম্ভও তেমনি।

অদৃষ্ট মানে না বিমল। কিন্তু এক একটা দিন এমনই দুঃখ কষ্ট অপমানের বোঝা নিয়ে আসে যে মানতে ইচ্ছে হয়। অবশ্য বাংলা দেশের লেখকদের পক্ষে নিছক সুখ ও সম্মানের দিন কখনই আসে না। তবুও এক একটা দিনের দুঃখ কষ্ট অপমানের তুলনা হয় না। এ দিনটাই তেমনি একটা দিন বিমলের পক্ষে।

একটা রেঁস্তোরায় খেয়ে শ্রী আপিসে ঢুকতেই একটা বুড়ো মুসলমান তাকে সেলাম জানিয়ে বললে—আপনি বিমলবাবু ? প্রসন্নবাবু একখানা চিঠি দিয়েছেন। বহুকষ্টে পাত্তা পাইছি আপনার।

প্রসন্নবাবু একজন নামকরা সাহিত্যিক-কবি। বিমলের এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিজয়বাবুর সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটেছে সম্প্রতি। এবং বিমলের সঙ্গে বিজয়বাবুর প্রীতি বর্তমানে ঘনীভূত হওয়ায় তিনি বিমলের উপর বিরূপ হয়েছেন। প্রসন্নবাবুর প্রেস থেকেই বিমলের প্রথম বই ছাপা হয়েছে। মুসলমানটি সেই বইয়ের দপ্তরী, প্রসন্নবাবুরই দপ্তরী। প্রসন্নবাবুই বাংলাদেশের এক বড় প্রকাশককে অনুরোধ করে বইখানির প্রকাশক স্থির করে দিয়েছেন। তাঁরা একশো বই নিয়েছেন। বাকী বইয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি, তাঁদের গুদামে নূতন লেখকের রাবিশ রাখবার জায়গা নাই। সোনার ধান বোঝাই করে নেয় যে সোনার

তরী—তাতে যাচাই করা কষ্টিপাথরে-কষা সোনা ভিন্ন অন্য কিছুকে ঠাঁই দেবেন কি করে?

যাক সে কথা। তার জন্যে আক্ষেপ নাই বিমলের। আজ প্রসন্নবাবুর পত্র নিয়ে দপ্তরী তার কাছে এসেছে টাকার জন্য। প্রকাশক আর বই নেন নি, টাকাও দেন নি। প্রসন্নবাবুর কাছে টাকা তার জমা আছে, ছাপার খরচ এবং কাগজের দাম দিয়েও তো কিছু থাকতে পারে, প্রসন্নবাবুর কাগজে সে লিখেছে তার জন্যও সে কিছু প্রত্যাশা করে, কিন্তু সে সব হিসেব নিকেশ সাপেক্ষ বলে প্রসন্নবাবু দপ্তরীকে তার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দপ্তরী বললে—তিনি চিঠিতেও লিখছেন, মুখেও বলে দিছেন তিনি কিছু জানেন না। এরপর সে একেবারে সোজা বলে দিলে—টাকা না-পালি পর আমি ছেঁড়া কাগজের দরে বেচ্যা দিমু কইলাম আপনারে।

বিমলের মুখ সাদা হয়ে গেল।

দপ্তরী বললে—প্রসন্নবাবুরে কইলাম তিনি কইলেন, আমি তো কথা বল্যাই দিচ্ছি কিছু জানিনা, তুমি তার সাথে গিয়া কথা কও, তা বাদে যা খুশী করবারে পার। আমি কইতে যাব না কিছু।

—কত টাকা পাবে তুমি? হিরণ প্রশ্ন করলে।

দপ্তরী পকেট থেকে একটা বিল বার করলে।

—কি হিরণ? সিঁড়ির মাথায় কখন এসে দাঁড়িয়েছেন বিজয়বাবু।

হিরণ তাকালে বিমলের দিকে, সম্ভবতঃ বলবার জন্য অনুমতি চাইলে। বিমল দাঁড়িয়ে রয়েছে মাটির পুতুলের মত, তার বংশগত শিক্ষা দীক্ষা তাকে বলছে—তুমি বল, দিক তাই বেচে দিক। তুমিও ছেড়ে দাও এই দুঃখ দৈন্যের তপস্যা। তুমি অক্ষম তুমি অলস তুমি ভীরু তাই তুমি এসেছ সাহিত্যের পথে, ঘরের কোণে বসে রচনা কর কল্পকথা, কলমের ডগায় খোঁচা মেরে মনে কর তুমি মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছ অন্যায়কে—মনে কর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম

করছ। ভেবে দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও মিথ্যা আত্মতৃপ্তি অনুভব কর।

বিজয়বাবু নেমে এলেন, প্রশ্ন করলেন—ব্যাপার কি?

দপ্তরী উৎসাহিত হল, সম্ভবত সাহিত্যিক সমাজের মাটির জীবনের পরিচয় সে ভাল করেই জানে—জানে একজন অপমানিত এলে এদের অন্য সকলে মনে মনে খুশী হয়ে ওঠে। সে উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করে বললে—কাল সকালে আমি সব বই বেচ্যা দিব মশায়। গুদামে ওই বাজে মাল রাখবার ঠাঁই নাই আমার।

বিজয়বাবুর নাকের ডগাটা স্ফীত হয়ে উঠল। বড় বড় চোখে ফুটে উঠল কঠিন দৃষ্টি; তিনি দপ্তরীর দিকে বার দুয়েক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে—তার হাত থেকে বিলখানা টেনে নিয়ে দেখলেন। তারপর নোটকেস তুলে ছ'খানা দশটাকার নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন—ফেরত দাও চার টাকা। বিল ছাপ্পান্ন টাকার।

দপ্তরী বিস্মিত হয়েতার মুখের দিকেচেয়ে রইল। সে এটা প্রত্যাশা করে নাই। বিজয়বাবু আবার বললেন—থাক টাকাটা, ন শো বই তুমি আমার বাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবে। শ্যামবাজার। বুঝেছ?

তারপর বিমলের হাত ধরে বললেন—আসুন, আজ থেকে আমি আপনার পাবলিসার হলাম।

বিমল কোন কথা বলতে পারলে না। কিন্তু গভীর ভাবাবেগ তার অন্তরের মধ্যে পূর্ণ তিথির সমুদ্রের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। বিজয়বাবু হয়তো নিজেকে আজও আবিষ্কার করতে পারেন নাই কিন্তু সে আজ বিজয়বাবুকে আবিষ্কার করেছে।

চন্দ্রমুখী নামে দেহব্যবসায়িনী কেনাবেচার কদর্যতম হাটের মধ্যে দেবদাসকে ভালবেসেছিল। এমন ভালবেসেছিল যে, ব্যবসা ছেড়ে সে সন্ন্যাসিনী হয়েছিল। সমাজের মধ্যে যাদের স্থান নাই; যুগ-যুগান্তরের ঘৃণার ফুৎকার মানুষেরা যাদের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফুৎকারের আকণ্ঠগভীর একটা খণ্ড সমুদ্র তৈরী করে তুলেছে

তাদের চারিপাশে—তাদের সঙ্গে পরিচয় মানুষের কম। মানুষ চরিত্রবান বলে নয়, এদের সঙ্গে পরিচয় কেনাবেচার রূঢ় বাস্তবতার মত এমনি শুষ্ক এমনি উপর-উপর যে চন্দ্রমুখীকে বিশ্বাস করতে চায়না মানুষের মন। কিন্তু বিমল আজ চোখে দেখলে—চন্দ্রমুখী আছে। শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করলে মনে মনে।

মহানগরীর ডাষ্টবিন এই পল্লী। জীবনের কুৎসিত তৃষ্ণা নিবারণের পল্লী। জীবনের যত কদর্যতা উগরে দিয়ে যায় মানুষ এখানে।

বিজয়বাবু বললেন—এ হল অভিনব গয়াক্ষেত্র বিমলবাবু। মানুষের অন্তরের প্রেতলোক এখানে পিণ্ড গ্রহণ করে।

বিমল মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল। কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করে নাই। কৌতূহলও ছিল। ভূপেনের সাকী শ্রীমতীর ঘরে এসে তাকে দেখে তার কথা-কাহিনী শুনে তার মনে হল আসা তার সার্থক হয়েছে। শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখীকে সে দেখে গেল। তাঁর সে আবিষ্কারকে সে এতদিন শুধু বিস্ময়কর এবং সুন্দর—এর বেশী বুঝতে পারে নি—তাকে সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে।

স্বাস্থ্যবতী শ্যামবর্ণা মেয়েটি। কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট। কথাবার্তা বুদ্ধির বিচারে তেমন মার্জিত হয়তো নয় কিন্তু যত সংযত তত সম্ভ্রমপূর্ণ তত মিষ্ট। শ্রীমতী খ্যাতিসম্পন্না গায়িকা। অভিনয়েও সে যথেষ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু গানের তুলনায় সে কিছু নয়। শ্রীমতীর কণ্ঠ সুধাক্ষরা। ভূপেনকে সত্যই দেবদাসের মত ভালবেসেছে। তার প্রতি অনুরাগের পরিচয় শ্রীমতীর সর্বাঙ্গে, তারই রুচি অনুযায়ী সে বেশভূষা করেছে; ঘরে দুয়ারের সর্বত্রও সেই পরিচয়—রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা গীতবিতান সাজিয়ে রেখেছে, শরৎচন্দ্রের বই কিনেছে, ঘরের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের শরৎচন্দ্রের ছবি টাঙানো, মাসিকপত্র থেকে কেটে বাঁধিয়ে যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছবি। চীনেমাটির বাসনে সাজিয়ে

শ্রীমতী নামিয়ে দিল সিদ্ধ ডিম, ভেজিটেবল্ চপ, কাটলেট ; ভূপেনের হাতে দিলে একটা বাটিতে খানিকটা সুপ। বললে—এটা খাও আগে। ভূপেনের সাহিত্যিক বন্ধুরা আসবে জেনে সে নিজে হাতে পরিচর্যা করে তৈরী করেছে সমস্ত খাবারগুলি।

তারপর আরম্ভ হল গান—বিজয়বাবু বললেন—আপনি বসুন।

ভূপেন গেলাসে মদ ঢালছিল। সে বললে—আপনি কেন ? ওকে 'তুমি' বলুন।

—ঠিক হ্যায়। আপসে ঠিক হো যায়গা।

বিরজা টেনে নিলে গেলাস। বললে—তুই বেটা বেশ আছিস। বলে হা হা করে হেসে উঠল।

ভূপেন বললে—তুই অত্যন্ত ভালগার বুঝলি! সে একে একে গ্লাস এগিয়ে দিল। বিজয়বাবু নিজে নিয়ে বিমলকে বললেন—আপনি একটু জিভে ঠেকান। বাস্।

বিমল কপালে ঠেকিয়ে রেখে দিলে।

সকলে তার দিকে তাকালে। বিজয়বাবু বললেন—ঠিক আছে। বিমলবাবুর ওই হয়েছে। ওর ভাগটা হিরণকে দাও। হিরণ না পারে, রেখে দাও—রতন আসবে। নাও—আরম্ভ কর গান।

শ্রীমতী গান আরম্ভ করলে। রবীন্দ্রনাথের গান। ভূপেন তাকে শিখিয়েছে। শ্রীমতী কীর্তন সবচেয়ে ভাল গায়। এমন কীর্তন-গায়িকা আধুনিক বাংলাদেশে বিরল। কিন্তু তবু সে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেই বেশী ভালবাসে। গাইবার আগে সে ভূপেনকে জিজ্ঞাসা করলে—কোন্ গানটা গাইব ?

ভূপেন সকলের দিকে তাকিয়ে বললে—সুরু হোক রবীন্দ্রনাথে, শেষ হবে চণ্ডীদাস অথবা বিদ্যাপতিতে। কি বলেন ?

—ঠিক হ্যায়। বিজয়বাবু একটা কৃত্রিম কাপ্তেনী উৎসাহ নিয়ে অভিনয় করে চলেছেন।

ভূপেন বললে—আজ সুর বাঁধো আনন্দের তারে। আরম্ভ কর। 'আজ কি বারতা পেলরে'।

হারমোনিয়মে সুর বেজে উঠল, অতি মৃদু স্বরে বাজছে যন্ত্রটা; শ্রীমতীর কণ্ঠস্বরে যন্ত্রের সুর লজ্জা পায়। মানায় একমাত্র বাঁশের বাঁশী। সে আরম্ভ করলে গান—

আজ কি বারতা পেলরে কিশলয়!
ওরা কার কথা কয় বনময়!
এসো কবি এসো মালা পরো, বাঁশী ধরো
হোক গানে গানে বিনিময়।

গানের মধ্যেই ভূপেন উঠে সকলের গলায় পরিয়ে দিল একগাছি করে বেলফুলের মালা। সকলের আগে দিলে বিমলের গলায়।

গানে গানে মনোলোকে সে এক সুরলোক-সৃষ্টি করলে শ্রীমতী। সমস্ত দিনের সকল ক্লেদ সকল গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল বিমলের।

মালাগাছি গলায় দুলিয়েই সে বাড়ী ফিরল। অন্ধকারের মধ্যে মনে হল ময়দানের গাছগুলির শাখার প্রান্তে প্রান্তে যেন মুকুলেরা উদ্গত হচ্ছে। গলার মালার গন্ধের সঙ্গেই মিশে আছে সে গন্ধ। মহানগরীকে সে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিলে। তাকে বন্দনা করলে।

মহানগরী না থাকলে শ্রীমতীকে কেউ জানত না। নিজেকে নিজেই জানত না হয়তো শ্রীমতী। দূর মুর্শিদাবাদের এক নগণ্য গ্রামে তার জন্ম; প্রাচীন নবাবী আমলের কতকগুলি দেহবিলাসী শেঠেরা এনে তাদের বসিয়েছিল সেখানে, দুস্থ অবস্থার মধ্যে তারা আজও সেই জীবন যাপন করছে। তারই মধ্যে উদ্ভব শ্রীমতীর। অল্পস্বল্প কীর্তন গাইতে শিখেছিল; গুণীজন-সন্ধানী মহানগরী তাকে আহ্বান জানালে —সে এল; মহানগরী তার জীবনের আর কোন বিচার করলে না, বিচার করলে গুণের। সেই বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে অকুণ্ঠচিত্তে তাকে দিলে সমাদরের আসন।

চিন্তায় তার ছেদ পড়ল। ট্রাম এসে পড়েছে রাসবিহারী এ্যাভিনুয়ে, দেশপ্রিয় পার্ক পার হয়ে চলেছে। ডাবুর হাউসে আজ এত আলো কিসের? আলো গিয়ে পড়েছে পার্কের মধ্যে। একটা গাছে অজস্র সাদা রংয়ের ফুল ধরে আছে। আশ্চর্য, যাবার সময় চোখে পড়ে নি! মন—সবই মন। মন তখন চোখকে দেখতে দেয় নি। এখন মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠল।

আজ কি বারতা পেলরে কিশলয়।

ট্রাম থেকে নেমে পড়ল সে। গলায় মালাখানি দুলছে।

ওরা কার কথা কয় বনময়!

গুঞ্জন করতে করতে এসে সে দরজা খুললে ঘরের। আলো জ্বাললে। আলোর মধ্যে নজরে পড়ল একখানা খাম পড়ে আছে। দরজার চৌকাঠের কাছে। দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে গেছে। ডাকের চিঠি নয়। কোন এক বাহক এসেছিল। পত্রখানা তুলে নিয়ে সে খুলে ফেললে। কে লিখেছে! নামের জায়গাটাই আগে দেখলে। 'লাবণ্য'।

লাবণ্য লিখেছে! মনটা রূঢ় আঘাত পেলে। ও বেলার জের টেনেছে লাবণ্য।

বার

দীর্ঘ পত্র। প্রায় পূর্ণ তিন পৃষ্ঠা। বার কয়েক চিঠিখানা উল্টেপাল্টে দেখলে দু চারটে লাইন চোখে পড়ল। চিঠিখানা পড়বে কি পড়বে না ভেবে স্থির করতে পারছিল না বিমল। কয়েক জায়গায় অরুণার নাম রয়েছে। সম্ভবত অরুণাকে এনে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য অভিযোগ করে থাকবে। এ অভিযোগ করবার অবশ্যই অধিকার আছে লাবণ্যের। আরও কিছুক্ষণ ভেবে সে চিঠিখানা পড়লে। চিঠি

আরম্ভে কোন পাঠ নেই। সরাসরি লিখেছে—"ও বেলায় আপনাকে যে সব কথা বলেছি—এবং যে ব্যবহার করেছি তার জন্য নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পেয়েছি, নিজেকেই অনেক তিরস্কার করেছি, কিন্তু তাতেও যেন অপরাধের ভার লাঘব হচ্ছে না। সেই জন্যই অনেক ভেবে আপনাকে পত্র লিখছি, পত্রযোগে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। সব চেয়ে দুঃখ হচ্ছে—বেলা দুটোর পর আপনি অভুক্ত জেনেও আপনাকে ঘর থেকে একরকম বের করে দিয়েছি। মানুষের জীবন এবং চরিত্র নিয়ে আপনার কারবার, আপনি এ কথা নিশ্চয় জানেন যে, রাগ করে হোক, ঘৃণা করে হোক, আপনার জন না খেলে—মেয়েরা সব চেয়ে বেশী দুঃখ পেয়ে থাকে। আমার দুঃখের এবং লজ্জার আর সীমা পরিসীমা নেই। আপনি খান নি এ কথা জেনেও আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করি নি, উপরন্তু অপ্রিয় কটু কথা বলেছি। যে সময়ে আপনি এখান থেকে গেছেন তখন বোধ হয় আড়াইটে, তখন কলকাতার কোন হোটেলে ভাত ছিল না। সমস্তটা দিন আপনি নিশ্চয় উপবাসে কাটিয়েছেন। বন্ধু বা আত্মীয় ধনীজন বলে সেখানকার অন্নগ্রহণের অরুচিকর দায় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য যদি বলে থাকেন—আমার এখানে আপনার নিমন্ত্রণ আছে, তাতে লজ্জা পাওয়া বিরক্ত হওয়া আমার উচিত ছিল না। কিন্তু মনের অবস্থা আমার তখন এমনই ছিল যে এমনই একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল স্বাভাবিকভাবে। আমার কোন হাত ছিল না। আমি তখন নিজের উপর সমস্ত সংযম হারিয়ে বসেছিলাম। এর খানিকটা আভাস আপনি নিশ্চয় পেয়ে গেছেন। বাড়ীর ভিতর থেকে ব্যাঙ্কার গিন্নীর পুত্রবধূ যা বলেছিলেন—সে আপনি শুনেছেন। "এই ভর দুপুরে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যে মান অভিমানের পালা গাইলে—এঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি শুনি?" আপনার মনে আছে বোধ হয়! আমার সর্বাঙ্গে কদর্য কাদা মাখিয়ে দেবার যে প্রাণপণ চেষ্টা এই বউটি কদিন ধরে করছে—সে শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

যে দিন থেকে এই বাসায় এসেছি—সেই দিন থেকেই মেয়েটি এই ভাবে আমার পিছনে লেগে আছে। আমার মত অভিভাবকহীনা অল্পবয়সী একটা বিধবা মেয়ে এমনি স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, এটা তার কাছে শুধু অবিশ্বাসের কথাই নয়—অসহ্যও বটে। মধ্যে মধ্যে সে বলে—যে সব মেয়েরা চাকরী করে, এমনি করে সেলাই ফোড়ের ব্যবসা করে তারা আমার দুচক্ষের বিষ। অথচ আশ্চর্যের কথা এই মেয়েটিই পাশের তিনতলা বাড়ীর শিক্ষিতা বউটির কাছে নিত্য-নিয়মিতভাবে সেলাইয়ের কাজ শিখে আসে। শুধু তাই নয়, স্বামীর কাছে রাত্রে পড়াশুনা সুরু করেছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

হয়তো আমার কিছু দোষ আছে। ওঁদের পারিবারিক মনো-মালিন্যের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেছি। বউটির শাশুড়ি তাঁর দুঃখের কথা আমার কাছে বলেন, আমি সান্ত্বনা দিয়ে থাকি, তার বিধবা ননদটি আমাদের কাছে আসে—সেলাই শেখে। তার দুটি কুমারী মেয়েও আমার কাছে পড়ে।

ক্রমে ক্রমে এই বিরোধিতা বেড়েই চলেছে। আমার বহু পরিশ্রমের ফলে আরও তিনজন আমার মতই হতভাগিনী এসে যোগ দিল, ধীরে ধীরে আমাদের কাজের আদর হল, সঙ্গে সঙ্গে বউটিও হয়ে উঠল নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর। তার এই আক্রোশে ঘৃতাহুতি দিলেন আপনি। আরও একটু খুলে বলি। চিত্তদা আপনার দেশের লোক, তাঁকে আপনি ভাল করেই জানেন। সরল দয়ালু মানুষ কিন্তু নেশা করেন এবং শুনেছি আরও অখ্যাতি আছে। যাই থাক—তিনি আমার কাছে একান্ত আপনার জনের মত। এই মানুষটির একটি অদ্ভুত সহজ দৃষ্টি আছে—যে দৃষ্টি দিয়ে মানুষের ভালত্ব-মন্দত্ব এক নিমেষে চিনে নেন। তিনি অনেক সাহায্য করেছেন আমাকে। এই বধূটি তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আমাদের নামে অপবাদ রটনা সুরু করেন। একদিন চিত্তদা বউটির স্বামীকে রাস্তায় ধরে বলেন—'দেখুন—আপনার বউ যদি এমন কথা আর কোনদিন বলে—তবে আপনার দাঁত ভেঙ্গে দেব।

যতবার বলবে ততটি দাঁত আপনার যাবে।' চিত্তদার কথায় এবং কাজে তফাৎ নেই। সে কথা এখানকার সকলেই জানে। ওই তিনতলার মালিক বাবুটি কয়েকদিন আগেই সদর রাস্তার উপর একজন অপরিচিত লোকের হাতে কানমলা খেয়েছিলেন। ঠিক দু'দিন আগেই চিত্তদা তাকে বলেছিলেন 'শহরে কে কার কড়ি ধারে, এমন মেজাজের জন্যে কার কাছে কোনদিন কানমলা খাবেন আপনি।' পাড়ার কয়েকটি তরুণ প্রহার খেয়েছিল কয়লার ডিপোর কুলীদের কাছে। কাজেই তার শাসন-বাক্যকে উপেক্ষা করতে সাহস করেন নি বউটির স্বামী। স্ত্রীকে নিরস্ত করেছিলেন।

হঠাৎ আপনি নিয়ে এলেন অরুণাকে।

চিত্তদা আপনার নাম করে আমার এখানে অরুণাকে নিয়ে এলেন—আমি পরম ভাগ্য বলে মনে করলাম। এতদিন দূর থেকে আপনাকে দেখেছি—আর এবার অরুণার কল্যাণে আপনি কাছে এলেন। প্রথম দিন সেই আনন্দেই আপনাকে নিমন্ত্রণ করে উৎসব করতে চেয়েছিলাম। আপনাদের নামের একটা মোহ আছে। থাক সে কথা। না থাকবেই বা কেন? গোপন করব কেন? সাহিত্যিক শিল্পী দুর্নিবার আকর্ষণে সাধারণকে টানে। আমাকেও টানে। আমার মনে হয় আপনাদের কাছে গেলেই পাব সকল দুঃখের সান্ত্বনা, সকল অভিমান ক্ষোভের অন্তর জুড়ানো স্নেহস্পর্শ; অনাত্মীয়তার রূঢ়তায় রূঢ় এই সংসারে আত্মীয়তার মাধুর্য সম্ভারে সম্ভারে জমা হয়ে আছে—আপনাদের কাছে; অসম্মানিত সাধারণ আমরা আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ে আপনাদের সম্মানের অংশ পাব। এই কারণেই তো ওই পিনাকীকে সহ্য করতে পেরেছিলাম। আমার ভাগ্য, আমার ভাগ্যে তো পরিহাস ছাড়া বিধাতার আর কোন দান নেই; পিনাকী আমাকে ভালবেসেছিল; অকপটে সে ভালবাসার কথা আমাকে পত্রযোগে জানাতেও সে সাহস করেছিল। তার সাহসই বলুন আর ধৃষ্টতাই বলুন—পরিণামে সে বিস্ময়কর। যাক সে কথা।

আপনি কাছে আসাতেই আগুন ধরল। বউটি এবার প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অথচ সে আপনার লেখার খুব ভক্ত। তার স্বামী পাড়ার লাইব্রেরী থেকে যে বই নিয়ে আসেন তার মধ্যে আপনার বই-ই বেশী। প্রথম যেদিন আমার এখানে চা খেয়ে গেলেন—সেদিন সে স্তম্ভিত হয়ে রইল। পরের দিন থেকে আগ্নেয়গিরির মুখ নতুন করে খুলল। আপনার মনেই বকে যেত—কল্পনা করা কুৎসিত কথা। কান দিই নি। কিন্তু আজ পিনাকী ঘটালে বিস্ময়কর ঘটনা। বেলা সাড়ে এগারটায় সে এল অভিনব বেশে।—আপনি নিজের চোখেই তার সে অভিনব বেশ দেখেছেন। আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। চুল ছেঁটে—কামিয়ে প্রসাধন পরিচ্ছন্ন বেশে সে এসে দাঁড়াল—আমার মনে পড়ে গেল রূপকথার বুদ্ধু-ভুতুমের কাহিনী; রাজপুত্রেরা থাকত বানর আর পেঁচার খোলস পরে। সেই খোলস একদিন পুড়িয়ে দিলে তাদের ভাবী বউয়েরা। রাজপুত্রদের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। আমি হেসে তাকে সেই কথাই বললাম। বিনা ভূমিকায় সে আমায় বললে—ঠিক বলেছেন লাবণ্যদি; বড় ভাল বলেছেন। আমি প্রেমে পড়েছি—তাই আমার সকল ময়লা খোলস খসে গেছে। আমি অরুণাকে ভালবেসেছি। কাল সারারাত্রি আমি ভেবে দেখেছি। তাকে আমি ভালবাসি। অরুণাকে আমি বিয়ে করতে চাই লাবণ্যদি। তার চোখ মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলতেও আমার সাহস হয়নি। বরং ভয় পেলাম আমি। পিনাকী বললে—আমি কোন আপত্তিই শুনব না আপনার। আপনাকে মত দিতেই হবে।

আমি বললাম—আমি তো অরুণার অভিভাবক নই পিনাকী, আমি কি বলব? এ কথার জবাব শুধু অরুণাই দিতে পারে।

বিনা বাক্যব্যয়ে পিনাকী উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম—শুধু একটি কথা বলব আমি পিনাকী, তুমি আমাকে দিদি বল—তাই বলব।

সে ঘুরে দাঁড়াল।

আমি তুললাম উপার্জনের কথা, আর্থিক সঙ্গতির কথা। বললাম—কোন্ ভরসায় বিয়ে করবে বলছ—সেটা ভাব। তুমি তাকে ভালবাস, সে-ও যদি তোমাকে ভালবাসে—তবে মনের কথা বলা-কওয়া করে—প্রতীক্ষা কর সুদিনের।

সে বললে—সুদিন তো আসতেও আছে যেতেও আছে লাবণ্যদি। কাল এসে—পরশুও তো চলে যেতে পারে। দুঃখের মুখ তাকিয়ে আজ যদি প্রেমকে উপেক্ষা করি—তবে এর চেয়ে প্রেমের অপমান আর কি হতে পারে? কাল যখন সুদিন আসবে—তখন যদি প্রেমের এ আবেগ না থাকে!

পিনাকী হয় তো পাগল, হিসেবী লোক বিবেচক লোকের কাছে এ-কথাগুলি পাগলামীর কথা ছাড়া কিছুই নয়, উচ্চস্তরের লোকেরা হয় তো বলবেন—প্রেম তো শুধু ভোগের জন্যই নয়, প্রেম যে মানুষকে ত্যাগের পথেও নিয়ে যায়। আরও হয় তো বলবেন—প্রেমের আবেগ যদি সময়ক্ষেপে জুড়িয়েই যায়—তাতেই বা ক্ষতি কি—সেই তো বরং ভাল। আরও হয়তো অনেক কথাই বলবেন—বলতে পারেন; বলুন যাঁর যা খুশী। আমি এর উত্তরে কিছু বলতে পারি নি। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, অরুণার সৌভাগ্যে আমার মন ভরে উঠেছিল, চোখে জলও এসেছিল।

তাকে আমি অরুণার কাছে নিয়ে গেলাম। বললাম—অরুণাকে তুমি বল। তাদের একঘরে রেখে চলে এলাম। শুনে আশ্চর্য হবেন—এর পর অকারণেই আমি কাঁদলাম।

কাঁদছিলাম, হঠাৎ বউটির গলায় শাঁখ বেজে উঠল। আগেকার কালে শাঁখ বাজত যুদ্ধক্ষেত্রে। চীৎকার করে আরম্ভ করলে—কুৎসিৎ কদর্য অভিযোগ। কদর্যতম অভিযোগ বিমলবাবু, বললে ব্যবসায়ের একটা আড়াল তৈরী করে—আমরা পেতেছি একটা দেহব্যবসায়ের আসর। আমাকে বললে—। যাক সে কথা। অবশ্য অনেক শুনেছি

এমন সব কথা! পথে বেরিয়ে পিছনে বলতে শুনেছি, দুই পাশে বলতে শুনেছি মানুষকে। তাদের কথাকে ঘৃণা করেছি, উপেক্ষা করেছি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—এমন বিষ মেশানো কথা কখনও শুনি নি। একে কোন মতে উপেক্ষা করতে পারলাম না। প্রতিবাদ করবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। আমাকে বাঁচালে পিনাকী আর অরুণা। তারা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল—হাসিমুখে মাথা উঁচু করে। অরুণা বউটিকে বললে—কেন এমন ধারা কদর্য কথাগুলো বলছেন আপনি?

বউটি বললে—কদর্য? তোমাদের ওই কদর্য রসালাপের ভাষ্য কি গীতা-ভাষ্যের মত পবিত্র হবে?

অরুণা বললে—আপনার স্বামীর সঙ্গে আলাপ তো আপনিও করে থাকেন। ভালবাসার কথাও বলেন। তাকে কি আপনি কদর্য মনে করেন?

ফুঁসে উঠল মেয়েটি। বললে—কি? আমরা স্বামী স্ত্রী—নারায়ণ সাক্ষী করে—

বাধা দিয়ে অরুণা বললে—আমরাও স্বামী-স্ত্রী হতে চলেছি। অবিশ্যি নারায়ণ সাক্ষী রাখবার ভাগ্য হবে না, তবে রেজিষ্ট্রি করে আমরা বিয়ে করব।

বউটি দমে গেল—তবু বললে—সে বিয়ে—আর এ বিয়ে—

আবার বাধা দিলে অরুণা। বললে—আইন মতে বিয়ে করছি, এ বিয়েকে গালাগালি দিলে আইনের ফ্যাসাদে পড়বেন আপনি।

মেয়েটিকে চুপ করতে হল এরপর।

আমার মুখের দিকে চেয়ে অরুণা বললে—ওই বউটিই আমার সকল দ্বিধা ঘুচিয়ে দিলে লাবণ্যদি। ওকে আমার ঘটকী বিদেয় দিতে হবে। বলে সে হেসে উঠল।

তারপর ওরা মেতে উঠল সমারোহে। অকস্মাৎ ওদের চোখে ধরা পড়ল—কলকাতায় বসন্ত এসেছে। পার্কে পার্কে ফুল ফুটেছে।

খোলা ময়দানে দক্ষিণা বাতাসের প্রবাহ বয়ে চলেছে। পিনাকী বললে—ডালিয়া ফুটেছে অপরূপ হয়ে—চিড়িয়াখানার বাগানে।

বউটির কথাগুলি ফিরিয়ে দিলে সুদে আসলে। হাসতে হাসতে চলে গেল সে বিজয়িনীর মত। কিন্তু আমি? আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বউটির বাক্যকণ্টকবিদ্ধ অন্তর নিয়ে। কাঁটা ফুটে বিঁধে থাকলে রক্ত ঝরে না—কিন্তু দুঃসহ বেদনা হয়। আমার অবস্থা হল তেমনি। অরুণার জীবনে সকল কাঁটা গোলাপ হয়ে ফুটল—দক্ষিণা বাতাস তাদের ডাক দিলে—তারা চলে গেল। আমিই অরুণাকে সাজিয়ে দিলাম, অতীত জীবনের স্বামীসৌভাগ্যের অবশেষের মধ্যে কয়েকখানা শাড়ী আছে, তারই মধ্যে সবচেয়ে যেখানা ভাল তাই তাকে পরিয়েও দিলাম। আমার ভাগ্যে কাঁটা ফুল হয়ে ফুটবার নয়, জীবনে সে বিঁধেই রইল, প্রথম জীবন থেকে যত কাঁটা বিঁধে আছে তাতে তার অবস্থা শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত; কণ্টক শয্যায় অন্তর আমার শুয়ে পড়েছে আজ।

ঠিক এই সময় এলেন আপনি। প্রথমটায় অন্তর আমার পরম আগ্রহে সান্ত্বনার প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম—ভীষ্ম যেমন অর্জুনের কাছে চেয়েছিলেন তৃষ্ণা মেটাবার উপযুক্ত ভোগবতীর জল, তেমনি চাইব আপনার কাছে সান্ত্বনার স্নেহ—নির্ঝরের শীতল স্নিগ্ধধারা। কিন্তু কি জানি কেন চাইতে পারলাম না। সঙ্কোচ হল। তার পরিবর্তে আমার মনের সকল ক্ষোভ বেরিয়ে এল। আঘাত করলাম আপনাকে।"

এরপর অনেকটা অংশ লিখে বারবার দাগ টেনে সযত্নে কেটে দিয়েছে। কৌতূহল হল বিমলের। কি লিখেছিল লাবণ্য? বুকের ভিতরে হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল তার। সে উঠে দাঁড়িয়ে আলোটার খুব কাছে গিয়ে তুলে ধরে চিঠির কাটা অংশটা পড়বার চেষ্টা করলে।

হাত তার কাঁপছে, সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানাও কাঁপছে। চোখের দৃষ্টিতে

যেন কিছু ধরা পড়ছে না। কি লিখেছিল লাবণ্য ? সে কি লিখেছিল—সে তাকে ভালবাসে ?

কিছুই কিন্তু পড়া গেল না। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কেটেছে। পাথরের অথবা ধাতুফলকের উপরের লেখা যেমন উখো দিয়ে ঘষে ঘষে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তেমনিভাবে লেখার উপরে দাগ টেনে টেনে কেটেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বিমল।

অনেকক্ষণ পর শেষ অংশটা সে পড়লে।

"দুর্ভাগ্যের এইখানেই শেষ নয়। যে তিনজন সঙ্গিনী এসে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল—তিনটি বিধবাকে আপনি দেখেছিলেন নিশ্চয়, আশ্চর্যের কথা তারাও বিকেলে আমাকে জানালে তারা আর থাকবে না এখানে, অরুণা এবং আমি যে ভাবে কলঙ্কের ক্ষেত্র করে তুলেছি এই আসরটিকে—তাতে এখানে থাকলে ভবিষ্যতে তাদেরও কলঙ্কের ভাগ নিতে হবে। কিন্তু তার চেয়ে মেয়েদের পক্ষে মরণই মঙ্গল। সুতরাং তারা চলে যাবে। নয়তো—। বুঝেছেন নিশ্চয় নয়তো'র পর কি ? আমি ভাবলাম। ভেবে ঠিক করলাম আমিই চলে যাব। আমি চলে যাচ্ছি। হয়তো জীবনে আর দেখা হবে না। দেখা হলেও যে সব অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আসবে আপনার জীবনে, আমার জীবনে তাতে হয়তো পরস্পরকে চিনতেই পারব না। হয়তো চিনতে পারলেও—পরিচয়কে স্বীকার করাও সম্ভবপর হবে না। ভাবুন তো যদি কোনদিন পথের ধারে আমাকে ভিক্ষুনীর বেশে ভিক্ষা করতে দেখেন তবে চিনতে পারা সম্ভবপর হবে কি ?"

বিমল স্তম্ভিত হয়ে গেল। এতখানি তেজ এত বড় অভিমান এত সাহস যে মেয়ের সে মেয়ে না পারে কি ? কোথায় গেল সে এই রাত্রে ? যতই অসম সাহসিনী হোক লাবণ্য রাত্রির মহানগরীকে সে জানে না। শিউরে উঠল সে। তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছুটে গেল চিত্তরঞ্জনের দোকানে। রাত্রি

অনেক হয়েছে। রাস্তা জনহীন। চিত্তর দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। সে বার কয়েক ডাকলে, কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ভাবলে, চিত্ত এখানে নেই, বাসাতে আছে, সেখানে গিয়ে চিত্তকে ডাকবে? অথবা লাবণ্যদের ওখানে গিয়ে লাবণ্যের নাম ধরেই ডাক দিয়ে যারা আছে তাদের কাছে জেনে নেবে লাবণ্যের সংবাদ! তাতে কলঙ্ক রটনার সম্ভাবনা আছে, হয়তো বাড়ীশুদ্ধ লোকে কুৎসিৎ ভাষায় কদর্য অভিযোগে অভিযুক্ত করবে। এমন কি দুষ্ট লোকের হাতে লাঞ্ছনাও ঘটতে পারে তার।

ঘটুক। যে যা বলে বলুক। সে তাদের সম্মুখীন হবে। সে বলবে—লাবণ্যকে সে ভালবাসে। তারা পরস্পরের কাছে বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। লাবণ্য যদি এখনও না গিয়ে থাকে, তবে তাই না হয় হবে। গ্রহণ করবে সে লাবণ্যকে তার জীবনে। সে আজ যেন অন্তর দিয়ে অনুভব করছে প্রিয়ার গণ্ডের তিলের বিনিময়ে বোখারা সমরখন্দ দান করার কল্পনা কবির অতিশয়োক্তি নয়, ভাবাবেগে হয় তো বটে কিন্তু এ ভাবাবেগ জীবনে সত্য। বাস্তববুদ্ধিতে এই আবেগের সত্যকে যে লঙ্ঘন করে সে জীবনে হয়তো সমৃদ্ধি লাভ করে, সুনাম হয়তো অক্ষুণ্ণ থাকে কিন্তু আত্মাকে লাঞ্ছিত করে, পীড়িত করে, আত্মা তাকে অভিশম্পাত দেয়— "আজীবন মরুতৃষ্ণায় তুমি তৃষিত হয়ে ফেরো।"

সে দৃঢ়পদেই অগ্রসর হল। খানিকটা গিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। লাবণ্যের বাড়ীর ওদিক থেকেই দুজন কারা আসছে। এক মুহূর্ত পরেই সে তাদের চিনতে পারলে। পিনাকী আর অরুণা।

তারা দুজনেও থমকে দাঁড়াল বিমলকে দেখে। বিমল বললে—এ কি? এত রাত্রে কোথায় যাবে?

পিনাকি বললে—আমাদের আজ বাসর বিমলবাবু। বাসর পাততে চললাম। সে হেসে উঠল। তারপর বললে—গিয়েছিলাম চিড়িয়াখানা—সেখান থেকে গঙ্গার ধারে ইডেন গার্ডেনে বেড়িয়ে

গেলাম সিনেমায়। ফিরে অরুণাকে পৌঁছে দিতে এসে দেখি দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে শুনলাম ওখানে অরুণার ঠাঁই হবে না। দরজা খুললেন না। বললেন—আছে একখানা কাপড়—সে এসে কাল নিয়ো।

—লাবণ্য? লাবণ্য দেবী বললেন?

অরুণা বললে—লাবণ্যদি নাকি ওখানে নেই শুনলাম। বললেন—সেও এখান থেকে চলে গেছে। কোথায় গেছেন জিজ্ঞেস করায় বললেন—

—কি বললেন?

পিনাকী বললে—কুৎসিৎ ভাবেই বললেন অবশ্য—বললেন—অরুণার কপালে চিত্রকর জুটেছে—তার কপালে সাহিত্যিক—বিমলবাবুর ওখানে খোঁজ কর গিয়ে।

অরুণা ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলে—লাবণ্যদি কোথায়?

উত্তর দিলে পিনাকী—বললে—লাবণ্যদিকে আমি জানি অরুণা। বিমলবাবুর ওখানে তিনি যাবেন না। তারপর তার সেই স্বভাবগত অপ্রতিভের মত হাসি হেসে পিনাকী বললে—সে ভাগ্য বিমলবাবুর নয়। লাবণ্যদি চলে গেছেন। চল।

তারা অগ্রসর হল।

বিমল দাঁড়িয়েই রইল। তার প্রশ্ন করতে খেয়ালও হল না—ওরা কোথায় যাচ্ছে? সে ভাবছিল লাবণ্যের কথা। কোথায় গেল লাবণ্য?

মনে পড়ল তার মহানগরীর এক বিশিষ্ট রূপের কথা। এই ধরিত্রী বহুরূপা। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে যখন অগ্ন্যুদ্গার হয়—তখন তার এক রূপ—সে তখন জ্বালামুখী। অরণ্যে গলিতপত্রের রাশি থেকে উত্থিত বাষ্পরাশি ও গাঢ় ছায়ার সংমিশ্রণে তার আর এক রূপ—মন্থর গমনে চলে অজগর, দন্ত নখর বিস্তার করে ফেরে শ্বাপদ; পৃথিবীর সেখানে চামুণ্ডা রূপ। মরুভূমিতে তার আর এক রূপ। এই

মহানগরীতে ধরিত্রীর সকল রূপ প্রতিবিম্বিত প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র মানবসমাজের উপরেই হয়েছে—কিন্তু সমাজ সভ্যতার কেন্দ্রস্থল এই মহানগরীতে সে প্রতিফলন সব চেয়ে উগ্র—সব চেয়ে স্পষ্ট—সব চেয়ে প্রদীপ্ত।

লাবণ্য অভিমান করে চলে গেল—একবার ভাবলে না মহানগরীর রূঢ় উগ্র রূপের কথা। তার হৃদয়হীনতার কথা। প্রচণ্ড শক্তি না থাকলে এর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। সে শক্তি কি আছে লাবণ্যের ?

হঠাৎ এরই মধ্যে বিদ্যুচ্চমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল। অভিমানের আবেগ, বেদনার ক্ষোভ যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে মানুষের জীবনে, বিশেষ করে নারীর জীবনে—তখন তাকে হার মানানো যায় না, অনায়াসে সে তখন জীবন মূল্য দিয়েও জয়ের গৌরব অর্জন করতে চায় ; সকল ক্ষেত্রে জয়ের গৌরব হয় তো পায় না, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানিকে নিশ্চিতরূপে উপেক্ষা করতে পারে।

কাছেই লেক। কিছুদিন আগেই এই লেকে একটি মেয়ে এবং ছেলে ডুবে মরেছে। এই সব দৃষ্টান্তগুলি মানুষের কাছে পথচিহ্নহীন প্রান্তরে পদচিহ্ন-ধারার মত। লাবণ্যের এই পায়ের ছাপে পা ফেলে চলা বিচিত্র নয়।

হন্ হন্ করে সে চলল লেকের দিকে।

জ্যোৎস্নালোকিত লেক। ফাল্গুন মাস—এরই মধ্যে লেকের জলের উপরে ধোঁয়ার মত পাতলা কুয়াসার স্তর জেগে উঠেছে। জনহীন—চারি পাশ খাঁ খাঁ করছে। লেকের ধারের ক্লাবগুলিতেও কোন সাড়া নাই। লেকের মধ্যে দ্বীপগুলির গাছপালার মাথায় জ্যোৎস্না চক্‌চক্ করছে। মধ্যে মধ্যে মাছে সাড়া জাগাচ্ছে লেকের জলে।

ওকে! দূরে যেন সাদা মূর্তির মত কেউ বসে আছে—একটা বেঞ্চে। এগিয়ে গেল সে।

লাবণ্য নয়। অরুণা এবং পিনাকী। চমকে উঠল তারা। বিমলও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। এই লেকের ধারে কেন?

পিনাকী বললে—কি করব? এইখানেই রাতটা কাটিয়ে দেব দুজনে।

বিমল বললে—না। চল—আমার ওখানে চল।

পিনাকী রাজী হল না। বললে—বড় ভাল লাগছে। তারপর হেসে বললে—ও বুঝেছি। আপনি সন্দেহ করছেন আমরা মারাত্মক কিছু একটা করে বসব বলে। না না। সে ভয় করবেন না। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'—আমরা মরব না।

বিমল অগত্যা ফিরল।

কিন্তু কোথায় গেল লাবণ্য?

সকালে যখন সে উঠল তখন মন তার উদাস হয়ে উঠেছে। লাবণ্যকে খুঁজে দেখবার মত মনের আবেগ নাই কিন্তু সমস্ত কিছুর উপর থেকে তার আসক্তি চলে গেছে।

চিত্ত এসে হাজির হল এই সময়ে। সে বললে—হ্যাঁ শুনেছি সব। আমার সঙ্গে দেখা করে নি লাবণ্যদি।

তারপর বললে—কে জানে কোথায় গেল। এই শহরে আর তাকে খুঁজে পাওয়া কি সহজ?

আবার বললে—থাক। কতজন আসছে কতজন যাচ্ছে ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন আমি একটা খবর দিতে এসেছিলাম। কাল সন্ধ্যায় দুজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। আবার আসবেন আজ। কি যেন সব কাজের কথা আছে। আপনাকে তাঁদের চাই-ই।

আজ না হয়ে গতকাল বা আরও কয়েক দিন পরে হলে বিমল মনে মনে মহানগরীকে নমস্কার করে বলত—মহানগরী, তোমার জয় হোক!

তের

ডাক দিয়েছেন এক ফিল্ম ডিরেক্টর। বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শক্তি'র সর্বাধ্যক্ষ প্রদোষ চৌধুরী একখানা চিরকুটে লিখে দিয়েছেন—"বিমল, আমার বন্ধু বিখ্যাত শিল্পী এবং ফিল্ম ডিরেক্টর হীরু সেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমাদের কাগজে তোমার যে উপন্যাসটি বেরিয়েছে সেটি তাঁর ভাল লেগেছে। ইতি বুনোদা।"

প্রদোষ চৌধুরী বাংলাদেশে বুনো চৌধুরী নামে পরিচিত। নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চেহারাটাকে চুলে দাঁড়িতে গোঁফে যথাসম্ভব বন্য করে রাখেন। খ্যাতনামা লোক। দেশের সকল আন্দোলনের মধ্যেই তিনি আছেন। শিল্প সাহিত্য রাজনীতি সমস্ত কিছুর সঙ্গেই যোগ ঘনিষ্ঠ। মোটামুটি বেশ লোক। বিমল মনে মনে কৃতজ্ঞতা অনুভব করলে প্রদোষ চৌধুরীর প্রতি।

হীরু সেন থাকেন টালিগঞ্জে। তারই একজন সহকারী বুনো চৌধুরীর চিঠি নিয়ে সকালেই এসে বিমলের কাছে উপস্থিত হল। বিমল মনে মনে প্রতীক্ষমান হয়েই ছিল। এর পর সে এখান থেকে সরে অন্য কোথাও যেতে চায়; যে কাজ নিয়ে রয়েছে তার চেয়েও অধিকতর আকর্ষণ-বিশিষ্ট কোন কাজ সে চায়। লাবণ্যকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল এবং আকস্মিকভাবে ওই ঘটনার যে পরিণতি ঘটল তাতে জীবন একটা নাড়া খেয়ে গেছে। মনে মনে গভীর বেদনা অনুভব করেছে সে; মধ্যে মধ্যে লজ্জাও অনুভব করছে, দশের কাছে লজ্জা নয়—নিজের কাছে লজ্জা, নিজের অক্ষমতার জন্য নিজের কাপুরুষতার জন্য লজ্জা, মধ্যে মধ্যে অনুভব করছে যে, সে অত্যন্ত স্বার্থপর। লাবণ্যকে তার ভালই লেগেছিল, তার রূপ ভাল

লেগেছিল, তার সাহসীকতাপূর্ণ উদ্যমকে ভাল লেগেছিল, তার মর্যাদা-ময়ী সংযত চিত্তকে ভাল লেগেছিল—তার ফলে সে তাকে ভালই বেসেছিল—যে ভালবাসাকে সে জোর করে অস্বীকার করেছে।

এর জন্য দায়ী এই মহানগরীর সভ্যতা। মহানগরীর সভ্যতার অনাড়ম্বর নীড়ের মধ্যে সুখ নাই শান্তি নাই। আদিম কাল থেকে মানুষ প্রেয়সীর জন্য সংগ্রহ করে এসেছে শাঁখের গহনা—পলা পুঁতির মালা; পল্লীর মধ্যে নববধূর জন্য বর আনে কাচের চুড়ি, রূপার হার, মহানগরীর রাস্তার পাশে পাশে সাজিয়ে রেখেছে মণি মুক্তা সোনার আভরণ, বহুমূল্য বিচিত্রবর্ণ বেশভূষা, গৃহসজ্জার শত সহস্র উপকরণ, এই মহানগরীর বুকে যখন বিচিত্র সংঘটনে দেখা হয় প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ার—তখনই প্রিয়াকে, প্রিয়ের মনেও সাধ জাগে, এই নগরীর শ্রেষ্ঠ আভরণে শ্রেষ্ঠ সজ্জায় সাজাবে সে। তাকে নিয়ে সে যে নীড় রচনা করবে সে নীড়টিকে সাজিয়ে তুলবে সর্বোত্তম সুদৃশ্য এবং আরামপ্রদ উপকরণে। প্রিয়ার মনে সেই প্রত্যাশা জাগে—নিশ্চয় জাগে। কিন্তু পরক্ষণেই এই মহানগরীর জীবনযুদ্ধের প্রচণ্ডতাকে এবং নিজের সহায়হীন শক্তিকে স্মরণ করে মাথা নত করে সরে যায় পরস্পরের কাছ থেকে। এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রিয়ার অপেক্ষা প্রিয়েরই বেশী। নারীর ভয় দূর করে পুরুষ, তার সাধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় পৌরুষে। এই লজ্জা আজ আত্মগ্লানি হয়ে বিমলকে পীড়িত করে তুলেছিল। সে বারবার নিজেকে প্রশ্ন করেছে—কেন সে পিনাকীর অরুণার হাত ধরে পথে বেড়িয়ে পড়ার মত বেড়িয়ে পড়তে পারলে না, কেন সে লাবণ্যকে নিয়ে ওদের মত বাসর পাততে পারলে না আকাশের তলায়? মনের এই অবস্থায় সবচেয়ে অসহনীয় হয়ে উঠেছে এই স্থানটি। মানুষের কুৎসামুখর রটনা কাল থেকে যে প্রখরতর হয়ে উঠবে এ সম্পর্কে তার সন্দেহ ছিল না। আরও লাবণ্য এখান থেকে অপমানিত হয়ে চলে যাওয়ার পর এ স্থানটিও তার ভাল লাগছে না। এ ছাঁড়া আরও

আছে। তার মাসিক আয় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশে উঠেছে। সে এখন স্বচ্ছন্দে মাসিক পাঁচটাকা ভাড়ার ঘর থেকে আট দশ টাকা ভাড়ার ঘরে যেতে পারে, অপেক্ষাকৃত ভদ্র পল্লী—টিনের চালের পরিবর্তে—পাকা ছাদওয়ালা ঘর দশটাকায় নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

ঠিক এই কারণেই চিঠিখানা পেয়ে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার জন্যই উঠে পড়ল। বললে—চলুন।

শিল্পী হীরু সেন, বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিদগ্ধ সমাজের মানুষ, বর্তমানে সে সমাজের গণ্ডীকেও অতিক্রম করে ফিল্ম ডিরেক্টর হয়েছেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁর ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। হীরু সেনের চেহারায় শিল্পজনোচিত একটা ছাপ আছে। পোষাকে—চুলছাঁটায়—চোখের দৃষ্টিতে এই ছাপ তিনি সযত্নে পরিচর্যা করে ফুটিয়ে তুলেছেন। সিগার মুখে হীরু সেন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। নূতন একখানি ছবির জন্যে তিনি এক মাড়োয়ারী প্রযোজকের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। সেই ছবির কথা ভাবছিলেন তিনি।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তিনি বিমলের দিকে তাকিয়ে বললেন—এসেছেন আপনি? ভাল হয়েছে। আমি কাজ আরম্ভ করতে চাই কাল থেকে।

বিমল ঠিক এই ধরনের পরিচয়-ভূমিকাহীন আলাপ প্রত্যাশা করে নাই। সে বললে—প্রদোষবাবু আমাকে লিখেছেন—

বাধা দিয়ে হীরু সেন বললেন—হ্যাঁ আমি তাকে বলেছিলাম। আপনার একটা লেখা আমি পড়লাম, ভাল লেগেছে আমার।

বিমল বললে—ও গল্প থেকে ছবি কি ভাল হবে বলে মনে করেন আপনি?

—না। ও গল্প থেকে ছবি নয়। গল্প আমার নিজের। গল্পটাকে ডেভেলপ করে ডায়লগ দিয়ে লিখবেন আপনি। আমি আপনাকে ডিরেকশন দেব অবশ্য। কাল থেকেই লেগে যান আপনি। এই দেখুন গল্পটা।

একখানা ফুল্‌স্‌ক্যাপ কাগজে ইংরাজীতে টাইপ করা এক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ গল্প। একটি ধনী তরুণ তার তরুণী বান্ধবীকে নিয়ে মোটরে গেছে পল্লীভ্রমণে। সেখানে মোটর খারাপ হল। গাড়ীটা থেমে গিয়েছিল একটা গাছের তলায়! সেখানে গাড়ীটা মেরামত করছে ছেলেটি, এমন সময় গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল একটি মেয়ে। নিছক পল্লীবালা। সে গাছের উপরেই ছিল—কাঁচা আমের লোভে উঠেছিল, এমন সময় এসে থামল গাড়ী, গাড়ীটা যখন অনেকক্ষণ নড়ল না তখন সে না লাফিয়ে করে কি! সেই মেয়েটিই তাদের রাত্রে দিল আশ্রয়। তারপর আরম্ভ হল প্রেমের দ্বন্দ্ব। একদিকে পল্লীবালা, অন্যদিকে আধুনিকা, মধ্যস্থলে ধনী তরুণ। অবশেষে অবশ্যই জয় হল পল্লীবালার। তারপর মিলন।

বিমল পড়ছে গল্পটা এমন সময় হীরু সেন বললেন—আমি এই এতক্ষণ বসে বসে ভাবছিলাম একটা chase দিয়ে open করলে কেমন হয়! মনে করুন ওই গ্রাম্য মেয়েটি একেবারে full of vigour প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ মেয়ে তো—ও ধরুন, আম পাড়তে গিয়ে একটি গ্রাম্য ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে মারলে এক চড় তার গালে—তারপর সে তাকে করলে তাড়া, মেয়েটি দৌড়ুল খাল ডিঙিয়ে বেড়া টপকে—ছুটল—এসে পড়ল একেবারে গাড়ীর সামনে। শহরের সোফিষ্টিকেটেড মেয়েটি আঁতকে পা পিছলে একটা খানায় পড়ে গেল। শহরের ছেলেটি মানে নায়ক রাগে লাল হয়ে গ্রাম্য মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি হেসেই খুন। খিল খিল করে হাসি—রূপোর ঘণ্টার আওয়াজের মত হাসি। বুঝতে পারছেন—ছেলেটির মুখে রাজ্যের তেল কালি লেগেছে আর কি!

বিমল অবাক হয়ে হীরু সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হীরু সেন বলেই চললেন—তাঁর কল্পনার কথা। বললেন—কোন কিছু লিখবার আগে কল্পনায় দেখে নেবেন—ছবিটা কেমন হচ্ছে। ভিস্যুয়েলাইজ করতে হবে। এই ভিসন না থাকলে ছবির কাজ হয় না।

বিমল এবার গল্প লেখা ফুল্‌স্‌ক্যাপখানি নামিয়ে রেখে বললে—এই ধরনের গল্প আমি কখনও লিখি নি।

—লিখুন। লিখতে শিখুন। Filmএ এই হল গল্পের ধারা। আপনাদের সাহিত্যের ধারা—ওই যে সব তত্ত্বকথা—ও সব ছবিতে চলে না। আমরা ধরি মানুষের আদিম অস্তিত্বকে, I mean individual-কে। Individual lifeএ আছে শুধু Sex আর Hunger; Hungry People ছবি দেখেনা। তাই ছবিতে Sexটাই হচ্ছে বড়। অবশ্য সাহিত্যেও Sexএর স্থান ছোট নয়—ওই হল আদিরস। অর্থাৎ first; firstও বটে foremostও বটে।

বিমল বলল—আমি আপনাকে ভেবে বলব।

—ভেবে বলবেন?

—হ্যাঁ। ভাবতে হবে বই কি। এ কাজ আমার শক্তিতে কুলোবে কি না, রুচিতে ঠিক খাটবে কি না—ভেবে দেখে আপনাকে জানাব।

হীরু সেন তার মুখের দিকে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—কিন্তু সাহিত্য করে বাঁচতে হবে আপনাকে। এই শহরে থেকে শুধু সাহিত্য করে জীবিকার্জন করা অসম্ভব। সুতরাং এই রকম একটা পথ আপনাকে নিতে হবে। খবরের কাগজের চাকরী অথবা কিছু—অথবা এই Filmএর কাজ। এ দিকে opening পাওয়া সহজ নয়। পয়সা এই দিকেই আছে। তা ছাড়া এই নূতন শিল্পটাকে আপনারা এসে যদি উন্নত করতে পারেন তবে সাহিত্যের চেয়ে অনেক বড় কাজ হবে। এক বছরে—বিশ বছরের কাজ হতে পারে। একটা জাতকে গড়ে তোলার দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে আপনাকে।

এ সব কথার জবাব দেবার ইচ্ছা হল না বিমলের।

হীরু সেন বললেন—অবশ্য এই ছবির কাজে আপনাকে টাকা-কড়ি কিছুই দিতে পারব না আমি। কারণ contract হয়ে গেছে

already। পরের ছবিতে আপনাকে পাইয়ে দেব। এ ছবিতে কোন উপায় নেই। আপনাকে আসতে হবে পর্যন্ত—মানে ট্রাম বাস ভাড়া পর্যন্ত আপনার। আমার এখানে দশটায় খেয়ে-দেয়ে আসবেন। ছটা পর্যন্ত কাজ। এর মধ্যে দু চার কাপ চা আপনি পাবেন। তারপর হেসে বললেন—আমি খুব খোলাখুলি কথা বলি বিমলবাবু। আপনি অনেক কিছু প্রত্যাশা করবেন, শেষে আশাভঙ্গে আমার উপর দোষ দেবেন—এমন অস্পষ্টতা রেখে আমি কথা বলি না, বুঝলেন?

বিমল হেসে ঘাড় নাড়লে। ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে সে বুঝেছে। এ কথা সে ঘরে ঢুকেই যেন অনুমান করেছিল। হীরু সেন নিভে যাওয়া চুরুটটা আবার জ্বালিয়ে নিলেন—তারপর বললেন—তা হলে কাল থেকে লেগে যান। এ ট্রেনিং আপনার জীবনে কাজে লাগবে। আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেই সব শিখে নিলে আপনার worth বাড়বে।

বিমল নমস্কার করে বললে—আমি তা হলে আসি।

কাল দশটা থেকে, বুঝেছেন? হীরু সেন জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন চুরুটটা। ওটাতে আর ধোঁয়া বের হচ্ছিল না।

বিমল ঘরের দরজার গোড়ায় এসে পড়েছিল, সে এতক্ষণে একটা বিড়ি খাওয়ার তাগিদ অনুভব করলে, পকেট থেকে বিড়ি বের করতে করতেই বেরিয়ে এল হীরু সেনের ঘর থেকে। নীচের দরজা অতিক্রম করে পথে নেমে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

হীরু সেনের কথাবার্তায় সে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করেছে। কৌতুক অনুভব করাই উচিত ছিল—কিন্তু তা অনুভব করা সম্ভবপর হয় নি। হীরু সেনের সঙ্গে কথা বলতে তার চোখে পড়েছে হীরু সেনের চারপাশের অবস্থা। গৃহসজ্জার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে দারিদ্র্যের জীর্ণতার পরিচয় বিমলের চোখে পড়েছে। সবচেয়ে পীড়া দিয়েছে ঘর এবং সিঁড়ির পাশের দেওয়ালগুলি। পেরেকে কণ্টকিত দেওয়ালগুলি ময়লা থান কাপড়পরা দরিদ্র মেয়ের বৈধব্য-দশার মত

সকরুণ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে বিমলের চোখে। বিমল অনুমান করতে পারে শিল্পী হীরু সেনের সমৃদ্ধির সময় এই প্রত্যেক পেরেকে টাঙানো ছিল ভাল ভাল ছবি। কত নাম-করা বিদেশী শিল্পীর আঁকা ছবি, দেশের খ্যাতনামা শিল্পীর ছবি, হীরু সেনের নিজের আঁকা ছবি। সেগুলির আর একখানিও অবশিষ্ট নাই। কোথায় গিয়েছে সে অনুমান করতে বিমলের দ্বিধা হল না। ঠিক এই কারণেই হীরু সেনের পারিশ্রমিক দিতে অক্ষমতার কথা শুনে সে বিস্মিত হয় নি। ঘরে ঢুকেই যেন অনুমান করেছিল, অর্থকরী স্বাচ্ছল্যের প্রত্যাশা এখানে নাই।

খানিকটা দূর এসেছে এমন সময় পিছন থেকে তাকে কেউ ডাকলে। ফিরে দাঁড়াল বিমল। হীরু সেনের যে এ্যাসিষ্ট্যাণ্টটি তার কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল—সে-ই এগিয়ে এল। বললে—উনি আবার আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

—বলুন—

—একটা কথা বললেন উনি। মানে ডিসিপ্লিনের জন্যে। ডিসিপ্লিনের জন্যে ওঁর সামনে smoke করা উচিত নয়।

বিমল স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—তার মানে?

এ্যাসিষ্ট্যাণ্টটি বললে—ওঁর ঘর থেকে বের হবার সময় বিড়ি বের করেছিলেন।

—হ্যাঁ করেছিলাম।

—সেই জন্যেই কথাটা বলে দিলেন উনি।

—কিন্তু আমি তো—ওঁর কাজ আমি এখনও নিই নি। আর নিলেও উনি যখন কোন মাইনে দেবেন না—তখন মাইনে নেওয়া লোকের মত আনুগত্য উনি প্রত্যাশা করেন কি করে?

এ্যাসিষ্ট্যাণ্টটি এই উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। সে হতভম্ব হয়ে গেল। কি উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না।

বিমল বললে—আপনি ওঁকে বলবেন, আমি এ কাজ করতে পারব না।

বাসার দরজায় এসে সে বিস্মিত হল।

গোপেনদা বসে আছেন—প্রায় ফুটপাথের উপর। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্লটের সীমানা নির্দেশক C. I. T. লেখা একটা পাথরের উপর চুপ করে বসে আছেন। বিমলকে দেখেই বললেন—কোথায় গিয়েছিলে?

বিমল বললে—সিনেমা ডিরেক্টর হীরু সেনের লোক এসেছিল।

গোপেনদা তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন। বললেন—সিনেমা করতে যাচ্ছ? সর্বনাশ করল ওই সিনেমাগুলো।

বিমল ঘরের দরজা খুলে বললে—ঘরে আসুন। চা খাবেন?

—খাব। নিয়ে এস চা।

দাদার দোকান থেকে কেটলী করে চা এনে কাপে ঢেলে গোপেনদাকে এগিয়ে দিয়ে বললে—তারপর কি হুকুম বলুন।

গোপেনদা বললেন—প্রশংসা করতে এসেছি। তোমার গল্পটা খুব ভাল লেগেছে। মিহিরের বাবাকে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছ সেইটের কথা বলছি। আর—। বিচিত্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিমলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—আমাদের একটা কাগজের ভার নিতে হবে তোমাকে। তুমি সমাজের সংঘাতটা ধরেছ। তাই তুমি কাগজের ভার নিলে আমি ভরসা করতে পারি। আমরা কিন্তু কোন টাকাকড়ি দিতে পারব না।

বিমল বললে—আপনাকে ভেবে বলব দাদা। কয়েকদিন আমাকে সময় দিন।

—কয়েক দিন?

—আমার মন চঞ্চল হয়ে রয়েছে এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয়

কথা হল—এখানে থাকা আমার পক্ষে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। একটা বাসা বা মেস দেখে উঠে যেতে চাই।

—একটা মেস আছে। সেখানে থাকবে? সেখানে ছোট্ট একটা কুঠরী একা পেতে পারবে। সে ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।

—কোথায়?

—বউবাজারে। তবে বাড়ীটার একদিকে থাকে কয়েকঘর বাঈজী, অন্যদিকে মেস। যাবে সেখানে?

চৌদ্দ

বউবাজার স্ট্রীট। কলেজ স্ট্রীট এবং সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুয়ের মধ্যবর্তী অংশ। এরই উপর উত্তরদিকে প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ী। ঠিক সামনে প্রকাণ্ড বড় একটা গির্জা। এ বাড়ীটাও বিখ্যাত বাড়ী। এককালে এটাই ছিল বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সারভেণ্টের'র আপিস। নীচের তলাটায় সবটাই এখন গুদাম, ঠিক রাস্তার উপরের ঘরখানাকে দুভাগ করে একটাতে হয়েছে জুতার দোকান, অন্যটা হল আসবাবের দোকান। উত্তর দক্ষিণে লম্বা বাড়ী, প্রায় মাঝখানে সিঁড়ি, তাই পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ বউবাজার থেকে বাড়ীটায় ঢুকতে গেলে একটা গলির মধ্যে দিয়ে গিয়ে সদর দরজা পেতে হয়; সদর দরজার মুখেই কাঠের প্রশস্ত সিঁড়ি। বাইরে দরজার সামনে খানিকটা উঠানের মত খালি ইটে বাঁধানো জায়গা, তার তিন দিকে বস্তীর ঘরের মত সারি সারি ঘর; এখানে থাকে যত রিক্সাওয়ালা। উঠানে থাকে রিক্সাগুলি, খুপরীর মত ঘরগুলিতে থাকে রিক্সাওয়ালারা।

দোতলায় ছখানা, তেতলায় ছখানা—বারোখানা ঘরে মানুষ বাস

করে। প্রায় মাঝখানে সিঁড়ি, সুতরাং সিঁড়িই বাড়ীখানাকে দুভাগে ভাগ করেছে। ঘরগুলি সাধারণ মাপের ঘর নয়, প্রকাণ্ড হল এক একখানি। দোতলায় তেতলায় রাস্তার দিকের চারখানি ঘরেই থাকে বাঈজী। বাঁয়ের অর্থাৎ পিছনের দিকের দুই তলায় চার চার আটখানা ঘরে মেস হয়েছে। আটখানা ঘরে চারটি মেস। চারতলায় অর্থাৎ ছাদের উপর কাঠ দিয়ে তৈরী সারি সারি খুপরী ঘর, মেস এবং বাঈজীদের রান্না হয় এখানে, আরও কয়েকটা খুপরীতে থাকে কয়েকটি কৃশ্চান, যাদের ব্যঙ্গ করে সাধারণত বলা হয় চুনা গলির ফিরিঙ্গি।

বিমলকে মেস দেখাতে এনেছিল মিহির। গোপেনদা ভার দিয়েছেন মিহিরের উপর। দোতলার দুটি মেসের সঙ্গেই গোপেনদার সংযোগ আছে। একটি মেস সাধারণ মেস অর্থাৎ নানা ধরনের লোক এখানে থাকে। দালাল, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, একটু স্বচ্ছল অবস্থার কেরাণী, দু তিন জন অবস্থাপন্ন ছাত্র, গোটা দুয়েক বাড়তি জায়গাও আছে—মধ্যে মধ্যে মেসবাসীদের আত্মীয় বন্ধু আসেন—দুদিন চারদিন থাকেন, আবার চলে যান। খাওয়া-দাওয়া ভাল, অল্প দামের হলেও খাট টেবিল চেয়ার নিয়ে আসবাবপত্র মেসের পক্ষে মূল্যবান বলতে হবে। সপ্তাহে তিনদিন রাত্রে ফাউলকারী, তিনদিন মাটন, একদিন রাবড়ী। দিনে মাছ ছ'দিন—তাও ইলিস, রুই, ভেটকী প্রভৃতির নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে—এর উপরে মধ্যে মধ্যে আসে তপ্‌সে। একদিন দিনে পায়েস মিষ্টি, রাতে নিরামিষ। অধিবাসীদের বিচিত্র গতিবিধি—শেয়ার মার্কেট ডালহৌসি তো কর্মক্ষেত্র, এ ছাড়া চাঙোয়া, ব্রিষ্টল, মল্টিমার্লে থেকে ফুটবল মাঠের গ্যালারী, ফিল্ম ষ্টুডিয়ো এবং থিয়েটারের গ্রীণরুম পর্যন্ত যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়। সিগারেট ছাড়া বিড়ি এ মেসে নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে কড়া আইন আছে। এদের মেসের কর্তৃপক্ষের মধ্যে দু' একজন আছেন যাঁরা গোপেনদার ভক্ত, গোপেনদার সংকেত বহন করে নিয়ে যে আসে—তাঁরা তৎক্ষণাৎ

সমাদরের সঙ্গে আত্মীয় পরিচয়ে ওই বাড়তি সিটে স্থান করে দেন। আত্মীয়ের খরচ নিজেরাই বহন করেন। প্রয়োজন হলে আত্মীয়কে টাকাও ধার দিয়ে থাকেন। মেসে টেলিফোন পর্যন্ত আছে। ম্যানেজারের নামে আছে, আগন্তুকের সম্পর্কে প্রয়োজন হলে গোপেনদার কাছ থেকে নির্দেশ আসে, প্রয়োজন হলে এঁরাও জেনে নেন ব্যক্তিটি সম্পর্কে এঁদের কর্তব্য।

বিমলের থাকবার ব্যবস্থা এ মেসে করেন নি গোপেনদা, তা হলে মিহিরের আসবার প্রয়োজন হত না, তিনি টেলিফোনে বলে দিতে পারতেন। বিমল সম্পর্কে একটু বিচিত্র ধরনের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। সেই কারণেই মিহিরকে আসতে হয়েছে। বিমল থাকবে চারতলার ছাদের ওই সারিবন্দী রান্নাঘর ও ফিরিঙ্গি বাসিন্দাদের ঘরেরই একপাশের একটা ঘরে। ঘরখানা বাড়ীওয়ালার নিজের প্রয়োজনে লাগে বলে ভাড়া দেওয়া হয় না। বাড়ী মেরামতের সময় ঘরটায় চূণ সিমেণ্ট থাকে, প্রয়োজন অনুযায়ী কাঠ, ইলেকট্রিক লাইনের কেসিং, তার, জাল, রঙ এই ধরনের জিনিষ রাখা হয়, মেরামতের পর পড়ে থাকে রঙের খালি টিন, ভাঙ্গা দরজা জানালার দু একটা টুকরো, পুরানো ইলেকট্রিক লাইন কেসিংয়ের অংশ, বাতিল সুইচবোর্ড, জলের পাইপের টুকরো, ক্ষয়ে যাওয়া জলের কলের কক; আরও দু চারটে জিনিষও থাকে। মেরামতের পর কিছু দিন থাকে—তারপর ক্রমে ক্রমে জিনিষগুলি কমতে সুরু হয়। বাড়ীওয়ালার দারোয়ান, সরকার এরা কিছু বিক্রি করে দেয়, মেসের ঠাকুর; চাকর এবং ওই ফিরিঙ্গি বাসিন্দারাও জানালাটা বিচিত্র কৌশলে খুলে—আঁকশী দিয়ে কতক কতক বের করে ঘরখানাকে পরিষ্কার করে ফেলে। বাড়ীওয়ালা এ সবই জানেন কিন্তু—জুতো পরলে নখের কোণের ব্যথার মত এ হল বাড়ীর মালিকানি সত্ত্বর অনিবার্য উপেক্ষণীয় ব্যাধি—এ নিয়ে কোনদিন প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে তিনি চেষ্টা করেন না। বাড়ীওয়ালা কলকাতার প্রাচীন সম্পত্তিশালী বংশের সন্তান, স্বাভাবিক ভাবেই

মিহিরদের বাড়ীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আছে। আছে বলা অবশ্য ভুল, ছিল বলাই ঠিক। প্রবীণ বাড়ীওয়ালা মিহিরকে চেনেন—স্নেহও করেন, সেই পরিচয়েই মিহির অনেকবার এসে এই ঘরখানি দু মাস চার মাসের জন্য ভাড়া পেয়েছে। ভাড়া দশটাকা। ভাড়ার গোলমাল আজও কখনও হয় নি। সুতরাং মিহির এসে বললেই চাবিটি তার হাতে দিয়ে বলেন—ঘর বোধ হয় পরিষ্কারই আছে, দু চারটে ভাঙ্গা টিন কি কাঠের টুকরো থাকলে এক কোণে ঠেলে দিয়ো। অসুবিধে হলে—বের করে ফেলে দিয়ো, কেউ-না-কেউ বিক্রী করে দেবে।

মিহির ঘরখানা খুলে দিয়ে বললে—নেহাত খারাপ নয়, আপনি যেখানে ছিলেন—তার চেয়ে ভাল হবে। ঘরখানা বড়ও বটে।

—গৌরবে তো অনেক বড়। চারতলা।—আলো চাই—চাই মুক্তবায়ু দাবীটা ষোল আনা মিটে গেল। হাসলে বিমল।

মিহির চকিত হয়ে বললে—ঘরখানা কি—? মিহির অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ। রসিকতা, কৌতুকের অংশ তার জীবনে অত্যন্ত কম। তার উপর সদ্য পিতৃবিয়োগের আঘাতে সে স্বল্প অংশ আরও স্বল্প হয়ে গিয়েছে।

বিমল বললে—না-না। এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে—অন্তত বাংলাদেশের একজন নামহীন নূতন লেখক—এর চেয়ে ভাল কি কল্পনা করতে পারে বলুন? আমি ওটা রসিকতা করলাম।

এবার মিহির একটু হাসলে, বললে—আমি প্রায় মা কালীর মানসিক অবস্থায় এসে পৌঁচেছি। একটু চুপ করে থেকে বললে—জীবনে আশ্বাস খুঁজে পাচ্ছি না বিমলবাবু। এমন জটিল সমস্যার মধ্যে পড়েছি। আপনি তো আমাদের বাড়ীর কথা জানেন। আবার একটু হাসলে সে। হেসে বললে—বাবাকে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছেন ভারী ভাল লেগেছে আমার। এর মধ্যে আমি কয়েকবারই পড়েছি। যখনই বাবার জন্য মন খারাপ হয়—গল্পটা পড়ি। যাক চলুন, এইবার আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দি।

দোতলার দ্বিতীয় মেসটায় বিমলের খাবার ব্যবস্থা করেছে মিহির। প্রথম মেসটার সঙ্গে বিমলের কোন সম্বন্ধ থাকে এ গোপেনদা চান না। তাঁর নিজের দলগত কোন সাবধানতা এর মধ্যে আছে কি নেই সেটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। সে নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতেও বিমলের নিজের কাছেই নিজে অপরাধ অনুভব করে। মিহির বললে, ওদের সংশ্রবে আপনি পড়েন—এটা গোপেনদা চান না। ওদের কথা তো বলেছি আপনাকে। ওদের অধিকাংশ হল snob, আপনাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তা ছাড়া ওদের মেসের চার্জ বেশী। এ মেসটা গরীব কেরাণীদের মেস, চার্জ কম, এদের সাহিত্য সম্পর্কে অনুরাগ স্বল্প কিন্তু সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা করে। সাহিত্যিকেরা যে ওদের চেয়ে পণ্ডিত এটা ওরা বিশ্বাস করে ধনীর ভাগ্যের মত। আপনাকে বিরক্ত করবে না, তর্ক করবে না, বড় জোর দু'চারখানা বই পড়তে চাইবে, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে গল্প শুনতে চাইবে। হয় তো আধুনিক নামকরা লেখকের কথাও শুনতে চাইবে। তবে একটি বিষয় সাবধান করে দি। কদাচ গোপেনদার নাম করবেন না কি কোন বিপ্লবী কর্মীর নাম করবেন না, তা হলে আপনাকে আর কাজ কর্ম করতে দেবে না।

একটু থেমে হেসে আবার বললে—এবং গোটা কলকাতায় রটিয়ে দেবে যে, সাহিত্যিক বিমলবাবু উপরে সাহিত্যিক হলেও ভিতরে ভিতরে সাংঘাতিক এ্যানার্কিষ্ট, টেররিষ্ট, রেভল্যুশনারিষ্ট, যেটা জিভের ডগায় আসবে বলে দেবে। আপনার সম্পর্কে গৌরব করেই বলবে, তার ফলে যদি পুলিশ আপনাকে ধরে তবে আপনার উপর শ্রদ্ধা বাড়বে। কিন্তু শুধু যদি সার্চ করে ক্ষান্ত হয় তা হলে বিপদ, তখন আপনাকে এখান থেকে তাড়িয়ে ছাড়বে।

বিমল বললে—জানি।

মিহির মেসের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে, সকল ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেল। মেসটির সঙ্গে মিহিরের জানাশুনা বা যোগাযোগ বিচিত্র। ম্যানেজার তাকে খাতির করলে বাড়ীওয়ালার মত, অফিস-মাষ্টারের মত। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেস এটি। মফঃস্বলের কোন ধনী ব্যবসায়ীর মালিকানা প্রতিষ্ঠান। হরেক রকম ব্যাপার। অর্ডার সাপ্লায়ি', ষ্টিভাডোর, কয়লা খনি, কণ্ট্রাকটারি, ব্যাঙ্কিং এবং ইনসিওরেন্স। জন তিরিশেক কর্মচারী সমস্ত বিভাগের কাজ চালায়, তার মধ্যে বিশ জন থাকে এই মেসে। বাকী দশ জন কেউ বা বাসা করে থাকে, কারও বাড়ী কলকাতায়, কেউ কেউ অন্য মেসে থাকে। এই মেসের বাড়ীভাড়া দেওয়া হয় আপিস থেকে, ঠাকুরের বেতনও আপিস দেয়। আপিস থেকে আরও একটা টাকা পাওয়া যায়—গেষ্ট চার্জ হিসাবে,—তার জন্য মফঃস্বল থেকে মালিকের কর্মচারী যারা আসে—তারা থাকে খায়—চলে যায়। কোন বাইরের লোক নেওয়া সম্পর্কে আপিস থেকে নিষেধ আছে: তবে মিহিরবাবুর বন্ধুর সম্পর্কে স্বতন্ত্র কথা। বাড়ীওয়ালার মত এই প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সঙ্গেও মিহিরদের পরিচয় পরিবারগত; মালিকদের একটি ছেলেও মিহিরের বন্ধু, সুতরাং পার্থিব জ্যামিতিক নিয়মানুযায়ী মিহির মালিকের পুত্রের মতই শ্রদ্ধেয়! এবং মিহিরই এই ঘর দুখানি ভাড়া করে দিয়েছে আপিসের মালিককে।

ম্যানেজার বললেও সে কথা—দেখুন দিকি, আপনার বন্ধুলোক—তার সম্বন্ধে কথা আছে? তা বেশ! খানিকটা চুপ করে থেকে আবার বললেন—তা ছাড়া উনি শুধু খাবেন আমাদের এখানে। থাকবেন তো আলাদাই, আমাদের মেসে তো থাকছেন না। তা বেশ!

মেসটি প্লেন লিভিংয়ের একটি চরম দৃষ্টান্তস্থল। দেওয়াল ঘেঁষে মাথার দিকে বা পাশে একটি বা দুটি সুটকেশ—তার পাশে মেঝের

উপরেই মাদুর বা সতরঞ্চি বিছিয়ে সিট। আসবাব দূরের কথা—কাপড় জামা রাখবার ব্যবস্থা এখানে দেওয়ালে পেরেক পুতে।

খাওয়ার ব্যবস্থা—ভাত ডাল তরকারী দুটো—আর দুখণ্ড মাছ—তার সাইজ একেবারে মাপা। এর উপরে আপন আপন ব্যবস্থা যার যেমন খুশী করতে পারে, করেও। কয়েকজনই সকালে চা খেয়ে ফেরার পথে নিয়ে আসে চার পয়সার দই, সন্ধ্যায় ফেরার সময় চার পয়সার বা ছয় পয়সার রাবড়ী। দু তিনজন আছে, তারা মধ্যে মধ্যে রেস্তোরাঁ থেকে কোয়ার্টার ডিস কারী এনেও খেয়ে থাকে। মাসে একদিন হয় মেসবরাদ্দ মাংস। যাই হোক, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা পাইস হোটেলের অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা থেকে অনেক ভাল; আরও একটা সুবিধা হল—পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ—উভয় বঙ্গের লোকের রুচির দ্বন্দ্বের আশ্চর্যরকম একটা মীমাংসা আছে এখানে। লঙ্কা এখানে পরিমিত। তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কার বিশেষ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বাজার থেকে কাঁচা লঙ্কা আসে যথেষ্ট, পরিমিত ঝালের বেশী ঝাল যার পক্ষে রুচিকর—সে যতগুলি ইচ্ছে কাঁচা লঙ্কা পাবে। এ দিক থেকেও বিমল খানিকটা আরাম পেলে। শুধু অসুবিধা হল একটি। দিনের বেলা দশটা বাজামাত্র এখানে রান্নাঘরে অলক্লীয়ার বেজে যায়। মেসের ঠাকুর আপিস থেকে মাইনে পায় সাধারণ ঠাকুর থেকে ছ সাত টাকা বেশী, তার জন্য দশটা বাজতেই তাকে বের হতে হয় আপিসের কাজে।

একটু অসুবিধা স্বীকার করেই তারও মীমাংসা হয়ে গেল। স্থির হল খাবার ঢাকা দিয়ে সে উনোনের উপর রেখে যাবে। বিমল প্রয়োজন মত নিজে নামিয়ে নেবে। চাকর একজন আছে, কিন্তু তার ছোঁয়া-নাড়া এ মেসে অচল। ম্যানেজার নিজে জাতিতে সদ্‌গোপ এবং আর এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক—যার-তার ছোঁয়া নিজেরাও খান না, অন্য কাউকেও খেতে দেন না। এ বিষয়ে তাঁদের পক্ষে আছে প্রবলতম সমর্থন যাকে অন্য কেউ উপেক্ষা করতে সাহস

করে না। মালিকপক্ষের সমর্থন আছে। মালিক ঠিক নয়, মালিকের গৃহিণী এবং মালিকের পুত্রের। এরা দুজন গোঁড়া হিন্দু। মালিক নিজে এসব মানে না। গৃহিণী স্বামীকে সংশোধন করতে না পেরে পুত্রকে নিজের মত করে গড়ে তুলেছে এবং তাদের আয়ত্তাধীনে রয়েছে বিশ্বসাম্রাজ্যের যে খণ্ডটুকু তার উপর চালিয়েছে এই পবিত্র সংস্কার আন্দোলন। তবে যদি কেউ বাইরে অখাদ্য খায় বা স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার না করে তার জন্য আইনের কোন কড়াকড়ি নেই। এমন কি কেউ যদি চাকর মারফৎ ফাউল কারি কি এগ পোচ আনিয়ে রান্নাশালার সঙ্গে সম্পর্ক না-রেখে খায় তাতেও নিষেধ নাই। কারণ সাম্রাজ্যবাদী হলেও যুগ এবং স্থান সম্পর্কে তাদের চেতনা যথেষ্ট আছে। এটা বিংশ শতাব্দী এবং কলিকাতা মহানগরী—এখানে চাকরী গেলে মানুষ কষ্টে পড়ে কিন্তু আবার পায় এবং চাকরী গেলেই চাকরে মালিকে কোন তফাৎ থাকে না। মেসের ঘর ভাড়া ঠাকুরের মাইনে এই দুটো দিয়ে সংস্কার আন্দোলন ওর বেশী আর চালানো যায় না। শুধু রান্নাঘর উনান এবং বাসন সম্পর্কে আইন সুপ্রতিষ্ঠিত; সুতরাং এ অসুবিধাটুকু স্বীকার করে নিলে বিমল।

ম্যানেজার বললে—দেখবেন মশায়, কেউ থাকবেনা বলে চাকরকে ছোঁয়ানাড়া করাবেন না!

বিমল হেসে বললে—না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। সে আমি করব না।

—হ্যাঁ। ভদ্রলোক আপনি। তার উপরে লেখক মানুষ—আপনি করবেন কেনে এমন? তবে—। একটু চুপ করে থেকে বললে, আপনাকে তো বলতে হবে না, পাপ মানে না আপন বাপ, ঠিক একদিন দাঁত বার করে আপন চেহারাটি 'দেখায়ে' দেবে। প্রকাশ হয়ে পড়বেই।

ম্যানেজারের বাড়ী বর্ধমান জেলার আসানসোল সাবডিভিশনে।

বাঁকুড়ার সীমার কাছাকাছি। ম্যানেজারের গুপ্তচর আছে। ওই যে তিনটি কালো মেম থাকে এখানে—তাদেরই এক বৃদ্ধা ম্যানেজারের চর। বুড়ীকে সকলে আদর করে—ম্যাগী বলে ডাকে। কথাটা মাগী। য-ফলার নেকটাই পরিয়ে চতুর রূপান্তরে কথাটাকে সাহেবী করে নেওয়া হয়েছে। ম্যানেজার ওকে বলে 'আন্টি' অর্থাৎ 'মাসী'। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ম্যানেজার রান্নাঘরে রান্নার তদ্বির করতে এসে আন্টির সঙ্গে গল্প করে। আন্টি তিনটে ভাষা জানে—ইংরিজী হিন্দী বাংলা। তিনটেতেই সমান দখল। ম্যানেজারের পর্যায়ের বাঙ্গালীরাও ঠিক ওই তিনটে ভাষা জানে এবং এক বাংলা ছাড়া বাকী দুটোতে ওই ম্যাগীর সমান দখল। সুতরাং কথাবার্তায় কোন অসুবিধা হয় না।

বুড়ীর সঙ্গেই প্রথম আলাপ হল বিমলের। এখানেই একখানা তক্তপোষ দুটো সেল্‌ফ একখানা সস্তা ক্যাম্বিসের ইজি চেয়ার কিনে ঘরখানায় আস্তানা পেতে ফেললে। মনোহরপুকুর রোডের জিনিষগুলো চিত্তর জিম্মায় রেখে এসেছে, সেগুলো সে তার সুবিধামত একদিন পৌঁছে দেবে। লরীর ব্যবসায় আছে, লরী যেদিন এ অঞ্চলে ভাড়া পাবে সেদিন বোঝাই মালের সঙ্গে তার সেই পুরনো সোফা আর চেয়ার—এই দুটোকে শাকের আঁটির মত এনে ফেলে দিয়ে যাবে। মেসের চাকরটার নাম পঞ্চানন, নিরীহ ধরনের মানুষ—বয়সে প্রৌঢ়—সে তাকে সাহায্য করলে। তার হাতে একটি সিকি দিয়ে বিমল ইজি চেয়ারটায় হেলান দিয়ে মহানগরীর চারতলার উপর বিপুল তৃপ্তি নিয়ে বসে পড়ল। মনে মনে ধন্যবাদ দিলে, প্রণাম জানালে গোপেন দাদাকে।

বুড়ী ম্যাগী বারকয়েক তার সামনে দিয়ে পায়চারী করে অবশেষে তার কাছে এসে দাঁড়াল। গুড ইভনিং।

বিমলও প্রত্যভিবাদন জানিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বুড়ী বললে—মি লিভ ইন দ্যাত রুম। সে হাসলে। বুড়ী ম্যাগীর একটিও দাঁত নাই। চুলগুলো শনের নুড়ি হয়ে গেছে। তাতে বাঙালী ধরনেই একটা ছোট লাট্টুর মত গোঁজা খোঁপা বেঁধেছে। পরণে ময়লা রঙীন ঝলঝলে পা পর্যন্ত লম্বা সেমিজের মত একটা জামা। গাউন সেমিজ যা খুশী ওটাকে তাই বলা যায়। পায়ে একটা ছেঁড়া নেকড়ার চটি।

এর পর বুড়ী গল গল করে একগঙ্গা কথা বলে গেল। তার অল্প কয়েকটা বিচ্ছিন্ন শব্দ ছাড়া বিমল আর কিছু বুঝতে পারলে না। বিপদে পড়ল সে। ইংরিজীতে সে পারদর্শী নয় কিন্তু কাজ চালাতে কষ্ট হয় না; ইংরিজী বইও পড়েছে, তার মধ্যে গ্রাম্য প্রাকৃত চরিত্রের মুখের ভাষা—ডান্ নো জাতীয় সংলাপ পড়ে অনায়াসেই বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে তার দেশের অনুরূপ জনের মুখের 'মুই জেনে না' কথা মনে পড়ে যায়, কিন্তু এই মহানগরীর এই স্তরের কালো সাহেবদের সঙ্গে তার পরিচয় নূতন—তায় বুড়ী দন্তহীন, তার কথা অনুধাবন করা তার সাধ্যাতীত মনে হল।

বুড়া কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলিকে প্রকট করে বললে—এ্যাংলি? গেতিং এ্যাংলি?

এবার বিমল বুঝলে কথাটা। বুড়ী ধরে নিয়েছে বিমল তার কথা শুনে রুষ্ট হয়ে নিরুত্তর রয়েছে। সে মিষ্ট করে বললে—নো—নো—নো।

—নো?

—না। বাট্ ইউ'ল প্লিজ এক্সকিউজ মি, আই অ্যাম সরি, আই কাণ্ট ফলো ইউ।

বুড়ী ব্যস্ত হয়ে উঠল, নো নো। নো ফলোয়িং? বলেই সে তাড়াতাড়ি আপন ঘর থেকে একটা মোড়া এনে সামনে বসে বললে—ইউ সিত দাউন। মাই লুম বেরী দার্তি।

বিমল বুঝলে বুড়ী 'ফলো' কথাটা অন্য ভাবে ধরেছে। সে আবার

বললে, আই কাণ্ট আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড ইউ। তারপর হিন্দী করে বললে—সমঝমে নেহি আতা!

বুড়ী হেসে সারা হয়ে গেল। তারপর নিজের মুখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—নো তিথ! বেরী ওল্ড। তারপর বিচিত্র বাংলায় বললে—বাংলা বুলি জানে। বাংলা বাত বোলো মহাশা। বলেই আবার হেসে খুন।

বিমলও হাসলে। বুড়ী আশ্চর্য রকমের অনাবিল হাসি হাসছে। বিমলের মনে তার স্পর্শ সংক্রামিত হয়েছে। হেসে বিমল বললে—বাঃ তা হলে তো খুব জমবে। বাংলা জানেন আপনি?

—জানে না? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে বুড়ী; তারপর হেসে চুপি চুপি বললে—জানে। বোলে না।

—কেন? বলেন না কেন?

বুড়ী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল তারপর বললে—সাহিব পিউপিল দোস্ত লাইক ইত। দে হেত ইত। নেতিব নেতিব।

বিমল হাসলে। বুড়ী সত্য কথা বলেছে।

বুড়ী আবার বললে—ইউ হেত আস।

বিমল চমকে উঠল। বুড়ী ঠোঁট উলটে ক্ষোভের সঙ্গে বললে—মেস বাবুজ কল মি ম্যাগী। হামি জানে মহাশা ম্যাগী কিস্‌কে বোলে! হঠাৎ ঘাড় নেড়ে বললে বুড়ী মাগী বালী যাবি? দি মাগীজ লিভ হিয়া, বিলো বিলো। হাতের আঙুল নীচের দিকে করে দেখিয়ে বারবার বুঝিয়ে দিলে বাঈজীদের কথা বলছে সে। অর্থাৎ মাগী কথাটার অর্থ সে জানে। তারপর বললে—ম্যানেজার দ্যাত ফেলা কল মি 'অন্তি', মাছী মাছী? আই নো, নো! হাসলে সে।

বিমল লজ্জায় নীরব হয়ে বসে রইল।

বুড়ীও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—পুওল উয়োম্যান। নো বদি ইন্ দি ওয়ালদ। আই স্মাইল—লাফ। হাত দুটো উল্টে দিলে সে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বুড়ী বললে, ইউ হু হোয়াত ? কোন কাম করেন মহাশা। বিজিনেস ?

বিমল বললে—আই এ্যাম এ লিটারেটিওর। নভেলিষ্ট।

—হোয়াত ?

—নভেলিষ্ট, ষ্টোরি রাইটার। আই রাইট নভেলস, শর্ট ষ্টোরিস—

—তোরিজ নভেলস ? বুড়ীর বার্ধক্যম্লান হলুদ রংয়ের স্তিমিত চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।—ইউ রাইত স্তোরিজ ? হোয়াত স্তোরিজ ? ঘোস্তস ?

—নো নো। আই রাইট ষ্টোরিজ অব রিয়েল লাইফ।

—ইউ গেত মনি ? দে গিভ ইউ মনি ?

—ইয়েস !

বুড়ী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—আই হ্যাভ'নো মনি। আই নেভা বাই বুকজ ! আই দোন্ত রিদ বুকজ ! গত্ ওনলি ওয়ান বুক—হোলি বাইবেল। দোন্ত রিদ ইত। তাচ্ ইত্ অনদি হেদ। বুড়ী মাথায় হাত দিল। তারপর বুকে হাত দিয়ে বললে—অন দি ব্রেস্ত ! কিস্ ইত।

বিমল বললে—হোয়াই ডোণ্ট ইউ রিড ইওর হোলি বাইবেল ?

—কান্ত রিদ। কান্ত সি। অলমোস্ত ফরগতন রিদিং। উদাস ভাবে সে চেয়ে রইল সম্মুখের কলকাতার প্রাসাদশীর্ষময় শূন্যলোকের দিকে। সূর্য পশ্চিমের দিগন্তে বোধ হয় ঢলে পড়েছে। পশ্চিমে ডালহৌসি স্কোয়ারের চারতলা পাঁচতলা বিশাল বাড়ীগুলির অন্তরালে দিগন্ত দেখা যায় না। জেনারেল পোষ্ট আপিসের গম্বুজ, চার্চের মিনার, লাট সাহেবের বাড়ীর গম্বুজ দেখে ওগুলিকে চেনা যায়। ষ্টেটস্ম্যান আপিসের পাশে ভিক্টোরিয়া হাউসের মাথায় কালো গোলকটাকে দেখা যাচ্ছে। এদিকে জোড়া গির্জের মাথা দেখে চেনা যায়। বউবাজার ধরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সামনে পুব দিকে শেয়ালদার মোড়ে আর একটা গির্জে দেখা যাচ্ছে। এদিকে

অর্থাৎ উল্টোর মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীগুলি দেখা যাচ্ছে।

মধ্য কলকাতার বউবাজার।

কলকাতার প্রাচীনতম স্থান। ইংরেজ মহানগরী নির্মাণকালে কি কল্পনা করেছে তার নিদর্শন এখানে চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। ওই গির্জের মাথা, বউবাজারের পাশে চার চারটে গির্জের চূড়া। বিমলের সামনে বসে রয়েছে—

বুড়ী উঠে পড়ল হঠাৎ। বললে—আই গো নাও। আই গো। ইউ আর এ গ্রেত ম্যান। রাইত বুকজ! গেত মনি। গ্রেত ম্যান। ইওর নেম? আপনার নাম কি মহাশা—

—বিমল মুখার্জী।

—বিমল? গুড বেরী সুইত। বেরী সুইত!

—এক্সকিউজ মি, ইওর—

—মাই নেম? বুড়ী হেসে বললে—কল মি ম্যাগী অর অন্তি। দে অল কল মি দ্যাত।

বিমল বললে—নো। আই শ্যাল কল ইউ মা-মি!

মুহূর্ত কয়েকের জন্য বুড়ী যেন কেমন হয়ে গেল। তারপর আবার আগের মতই বললে—ইয়েস। এনি নেম ইউ লাইক। দ্যাতস গুড। ইউ কল মি মা-মি, আই কল ইউ মাই সন্। দ্যাতস গুড। বলতে বলতে সে সচকিত হয়ে উঠল। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ উঠছে। একজন নয়, দুজন তিনজনও হতে পারে। বুড়ী ব্যস্ত হয়ে বললে অ—কেটি কামিং উইদ ফ্রেন্দস। অ—টি নট রেদি। অ—

ঠিক পরক্ষণেই এসে দাঁড়াল একটি স্বাস্থ্যবতী যুবতী কালো মেম সাহেব।

তার সঙ্গে—বিমল বিস্মিত বল—ডিরেক্টর হীরু সেনের দুজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট।

পনর

হীরু সেনের সহকারীদের সহজে চেনার উপায় ছিল না। ওরা বিমলকে দেখে না চমকালে বিমল হয়তো ওদের চিনতেও পারত না এবং চিনতেও চাইত না। একেবারে বউবাজার অঞ্চলের ম্যাগী ও কেটিদের গোষ্ঠীর খাঁটী পিটার-গোমেস সেজে এসেছে তারা। শুধু অবস্থাটা একটু ভাল বলে মনে হয়। সম্ভবত ফিল্ম কোম্পানীর মেকআপ রুমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে বলেই সাজসজ্জা ভঙ্গি এমন নিখুঁত হয়েছে। বিমলকে দেখে ওরা চমকে উঠতেই বিমল ওদের দিকে ভাল করে তাকালে। মনে হল চেনা-মুখ। উপরের দিকটা অর্থাৎ কপালের উপর ফেল্ট হ্যাট বেশ একটু বেশী করে বেঁকিয়ে টানা থাকায় এবং চোখে রঙীন চশমা থাকায় উপরের দিকটা চেনা বলে মনে হয় না কিন্তু নীচের দিকটা দেখে চেনা মনে হল। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওদেরই একজন হেসে টুপিটা কায়দা করে খুলে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানিয়ে বললে—গুড্ ইভ্‌নিং মিষ্টার মুকুর্জী? তারপরই সে চোখের চশমাটা খুলে ফেললে। তার দৃষ্টান্তে অপরজনও টুপি চশমা খুলে একটু হেসে বললে—আপনি এখানে?

কেটি মেয়েটি বিস্মিত হয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ওদের দুজনের হাসি এবং প্রশ্নের অন্তর্নিহিত রঙ্গ বা ব্যঙ্গকৌতুকের সরসতা বাক্য কয়েকটির মূল অর্থকে অতিক্রম করে আরও অনেকগুণ অর্থবান হয়ে উঠেছে। বিমল একটু হেসে বলতে গেল—আমি এখানে ক্ষণিকের বা দুই দণ্ডের অতিথি নই—আমি—। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করলে, শুধু বললে—আমি এখানকার বাসিন্দা হয়েছি সম্প্রতি। নিজের ঘরখানা দেখিয়ে বললে—এই ঘরখানাই আমার বাসা এখন।

দুজনেই ওরা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। বিমল বললে—বসবেন? কিন্তু আমার ঘরে বসতে দেবার মত আসন আর নেই।

একজন একটু ঢোক গিলে বললে—না। ব্যস্ত হবেন না আপনি।

ম্যাগীর মতই কেটি বাংলা বুঝতে পারে। সে সবই বুঝছিল। প্রথমটায় বন্ধুদের সরস ব্যঙ্গ কৌতুকে উদ্বুদ্ধ হতে দেখে সে অধিকতর সরস কিছুর প্রত্যাশায় ঠোঁটের চাপের মধ্যে মৃদু হাসি সিথিল যোজনায় যোজিত করে প্রতীক্ষা করছিল। প্রত্যাশা করছিল এরা এইবারই বুঝি বলে—লেট মি ইনট্রোডিউস্ আওয়ার স্যুইট কেটি টু আওয়ার ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড এণ্ড কমরেড। কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ গিল্‌টী চটা সীসের বাটের মত পরিণতি লাভ করতেই সে ভ্রূকুঞ্চিত করে গম্ভীর মুখে গট গট করে নিজের ঘরে গিয়ে দরজার তালা খুলতে খুলতে সরু গলায় চীৎকার করে উঠল—ম্যাগি! এ! ডোণ্ট ইউ হিয়া—র? ম্যা—গি!

বুড়ী নিজের ঘরের ভিতর থেকেই চীৎকার করে উঠল—হো-য়া-ই দু ইউ—? ন্যাকড়া দিয়ে একটা ডিস মুছতে মুছতে সে বেরিয়ে এল। কেটি ততক্ষণে নিজের ঘরে ঢুকেছে। বুড়ী খুব রেগে গেছে—সে নিজের জরাজীর্ণ দেহখানাকে অন্তরের ক্ষোভের তরঙ্গে আন্দোলিত করে অঙ্গ দুলিয়ে কেটির ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।—হো-য়া-ই দু ইউ তক লাইক দ্যাত? মি-এ মেদ সারবেন্ত? এঁ?

বুড়ীর সঙ্গে বিমলের গ্রামের কুঁদুলী পাঁচী পিসীর কোন পার্থক্য নাই।

হীরু সেনের সহকারীদের একজনের নাম রতু রায়, অপরজনের নাম মণ্টু বোস। রতুর আসল নাম রতন হলেও হতে পারে, মণ্টুর নাম অনুমান করার উপায় নাই। চিত্রজগতে ওই ধরনের কাটাছাঁটা নাম একটা ষ্টাইলও বটে এবং প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপনও বটে। সে কথা

থাক। ওদের দু জনের মুখেই একটু একটু ঝাঁঝালো গন্ধ উঠছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকল সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে বললে—কেটিকে আমরা ছবিতে নেব। একটা ফিরিঙ্গী নার্সের পার্টে নামাব। হাসতে লাগল রতন রায়।

মণ্টু বোস বললে—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়। কিন্তু কতক্ষণ? পিসী যদি পাতের কাছ থেকে না ওঠে? আমি ওসব ভালবাসি না।

রতু বললে—এই মণ্টু!

—ও—নো। শুনুন স্যর। আমরা কেটির এখানে বেড়াতে এসেছি। আমাদের গার্ল ফ্রেণ্ড; আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন! ডোণ্ট ড্রিঙ্ক মিল্ক উইথ ঝিনুক—। রাগ করবেন না যেন।

বিমল বললে—না-না। রাগ করব কেন? বেশ তো বান্ধবীর কাছে এসেছেন—তাতে—

বুড়ী কেটির সঙ্গে কথা শেষ করে গজগজ করতে করতে ঘরে ফিরে গেল—হাউলিং-বার্কিং লাইক এ বিচ। কলিং মি ওল্‌দ উইচ—ইউ ব্ল্যাক ক্যাত—। ইউ দতার অব এ সোয়াইন—হালামজাদী—এক লোজ তুম সমঝেগা।

বুড়ী ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। টং—টং—ঠং—ঠং শব্দে ঘরখানাকে মুখরিত করে তুললে। খুব ক্রুদ্ধ হয়েই কাজ করে যাচ্ছে বুড়ী। কাপ ডিস নামাচ্ছে—সাজাচ্ছে।

কেটি বুড়ীর গালাগালির জবাব দিল না কিন্তু তীক্ষ্ণস্বরে এদের দুজনকে বললে—উইল ইউ কাম ইন অর টক ননসেন্স উইথ হিম অল দি টাইম?

মণ্টু বোস ঘরে গিয়ে ঢুকল। রতু বললে—আপনি এখানে কেন বাসা নিলেন স্যর? এত জায়গা থাকতে বৌবাজারে—চামড়ার গুদোমের গন্ধের মধ্যে—বাঈজী—ফিরিঙ্গী মাগীদের মধ্যে—আমি তো অবাক হয়ে গিয়েছি!

বিমল কপালে হাত দিয়ে বললে—অদৃষ্ট বলতে পারেন অথবা

মহানগরীর আবর্তের আকর্ষণ বলতে পারেন। বাঈজীর কথা জানতাম —তারা একপাশে থাকে—মেস একপাশে। কেটিদের কথা জানতাম না। অবশ্য জানলেও প্রত্যাখ্যান করতাম না।

—এদের লাইফ ষ্টাডি করবেন বুঝি?

—না। না। নেহাৎ স্থান সমস্যাতেই সম্ভবত অদৃষ্টের ফেরে এসে পড়েছি এখানে।

মণ্টু এবং কেটি বেরিয়ে এল, কেটি এবার মাথায় একটা রঙীন রুমাল বেঁধেছে এবং ঠোঁটে গালে আর এক পোঁচ রঙ চড়িয়েছে। সে দরজায় তালা বন্ধ করে ম্যাগীর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। মণ্টু রতুকে হাত ধরে আকর্ষণ করে বিমলকে বললে—চললাম স্যর!

কেটি আগেই গট গট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মণ্টু হেসে বললে—কেটি আপনার উপর চটে গেছে। আমাকে বললে—হোয়াই হ্যাজ মি কাম হিয়ার? বললে, সব জাগামে তুমলোক আয়েগা তো হামলোক কাঁহা যায়েগী?

হাসতে হাসতে তারা কেটির অনুসরণ করলে। সিঁড়ি থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে—ঈ—! হোয়াট—দি—হেল—ইউ আর টকিং? ঈ—।

বুড়ী বেরিয়ে এসে কয়েক মুহূর্ত ওই সিঁড়ির দিকে চেয়ে রইল। তারপর বিমলের কাছে এসে বললে, মাই সন্! গো-এ্যাওয়ে ফ্রম হিয়া। ব্যাদ্ প্লেস—বেরী ব্যাদ। দ্যাত্ গাল্—দ্যাত্ কেটি—দতাল্ অব এ সোয়াইন—হালামজাদী কুত্তি। বহুত কুত্তি হিঁয়া আতা হ্যায়। দে আর বেরী বেরী ব্যাদ্ ম্যান। দেঞ্জারাস পিউপুল। কাম উইথ বিগ নাইফ। সাম্ তাইমস্ দে ড্রাঙ্ক। দ্যাত বিচ ওয়াজ কার্সিং ইউ। আস্কড মি—হোয়াই হি হিয়া? হোয়াই? দিসতারবিং আস? হোয়াই? আ—! লাইক বহুরাণী অব বহুবাজার! অল, অল হাল্ ফাদারস্ পপাটি, হাল হাজব্যাণ্ড পপাটি।

বকতে বকতে ঘরে ঢুকে একটা সস্তা টি-পট হাতে বেরিয়ে এসে

বললে—লুক—লুক হিয়া মাই সন্। ওয়ান পত ফুল তি—অল বরবাদ্।

বুড়ী ওদের জন্য চা করেছিল—কিন্তু কেটি বন্ধুদের নিয়ে চলে গেল, পুরো এক টি-পট চা বরবাদ হয়েছে।

বুড়ী কেটির কেউ নয়। মাসীর সইয়ের বোনপো বউয়ের বোনঝি কি ওই ধরনের সম্বন্ধ একটা আবিষ্কৃত হয়েছে জীবনের এত তরণীতে ভাসতে-ভাসতে। বুড়ীর নেই কেউ। জীবনে সে বিবাহই করে নি। বুড়ীর আসল নাম মিস অ্যানা কুক। প্রথম জীবনটা কেটেছে বহু উন্মাদনার মধ্যে। বউবাজার সংলগ্ন কাপালীটোলায় জন্মেছিল এক কুক পরিবারে। খালি পায়ে ফ্রক পরে কাপালীটোলা বউবাজার বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে খেলা করে ঘুরে বেড়িয়েছে। কাটা ঘুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে। পাদরীদের অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে পড়েছে। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে এসপ্ল্যানেডেও হাজির হয়েছিল। সেখান থেকে ইডেন গার্ডেন—গঙ্গার ধার—কেল্লার আশেপাশে। তখন তার বয়স ষোল সতের। কতজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কতজন টুপি খুলে ইঙ্গিতময় চোখে মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেছে—গুড ইভ্‌নিং মিস—। কতজন! কেল্লার গোরার দল—তাদের আসতে দেখলে ও এবং ওর সঙ্গিনীরা পরস্পরের গা টিপে বলত—ইয়া, দে আ-কামিং দি বয়েজ! কত জেন্টিলম্যান। ওর প্রথম যৌবনকালে মটর ছিল না, ছিল ফিটন। ফিটনে যেতে যেতে—জেন্টিলম্যান মৃদু হেসে টুপি খুলে সম্মান দেখাত, ওরাও হেসে পরস্পরের দিকে চাইত; ফিটন থেমে যেত; জেন্টিলম্যান নেমে আসত; ফিটনে বেড়াবার হোটেলে খাবার নিমন্ত্রণ জানাত। আলোকোজ্জ্বল হোটেল, স্বর্ণাভ পানীয়ভরা কাচের গেলাস, নরম গদীআঁটা চেয়ার, কার্পেটপাতা সরু মেঝে, দেওয়ালে-দেওয়ালে আয়নায়-আয়নায় প্রতিবিম্ব, যন্ত্রসঙ্গীতের ঐক্যতান; তুষারশুভ্র-দেহবর্ণ জেন্টিলম্যানের পাশে বসে কালো মেয়ে

ভুলে যেত কাপালীটোলার এঁদো গলি, মুর্গী-কুকুর অধ্যুষিত নোংরা উঠান, ময়লা বিছানার গন্ধ, ভাঙা দাগিধরা কাচের বাসন, আরও অনেক কিছু। মনে হত স্বর্গে এসেছে।

কাপালীটোলা থেকে—এলিয়ট রোড, সেখান থেকে এণ্টালী, এণ্টালী থেকে বউবাজারের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমা সেরে এসেছে এখানে; এই চারতলার ছাদের উপর সঙ্কীর্ণ কাঠের ঘরে। কেটির সঙ্গে বৎসর দুয়েক আগে আলাপ হয়েছে। পথে আলাপ, কেটির শরীর তখন খুব খারাপ, সবে বেরিয়েছে হাসপাতাল থেকে; আশ্রয় নাই, ঘুরে বেড়াচ্ছিল—ভাবছিল কোথায় যাবে। বুড়ী এ্যানার সঙ্গে দেখা হল হঠাৎ। তাকে দেখবামাত্র ম্যাগী তার অবস্থা বুঝতে পারলে। সে তাকে ডেকে নিজের ওই ছোট কুঠুরীতেই স্থান দিয়েছিল। কিছুদিন সে-ই তাকে খাওয়ালে। এখন কেটি স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে, যৌবন তার এখন পরিপূর্ণ। বেশভূষায় যথেষ্ট খরচ করেও তার কিছু অর্থ বাঁচে। পূর্বের উপকারের কৃতজ্ঞতাবশেই কেটি এখন ম্যাগীর কাছে খায়। বন্ধুবান্ধব এলে ম্যাগী চা দেয়, কেক বা টোষ্ট করে দেয়, আগে বরাত থাকলে মুর্গীর সুরুয়াও বানিয়ে দেয়। উদ্বৃত্ত খাবার থেকেই ম্যাগীর চলে যায়। এর জন্য যে টাকাটা কেটি তাকে দেয় সে তার বাঁচে, তার থেকে ঘরভাড়াটা দেয় কেটির ঘরদোরও সে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে থাকে। তা বলে সে তার ঝি নয়, সেটা সে স্নেহবশেই করে। স্নেহবশে সে কেটিকে অনেক সদুপদেশ দিয়ে থাকে। সুস্থ শান্ত মুহূর্তে কেটির রুখু ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দন্তহীন মুখে স্নেহের হাসি হেসে বলে—কেটি মাই ডিয়ারি—ইউ নতী গাল—লিছেন মি। বে—লি ব্যাদ—দিছ লাইফ; নো হ্যাপিনেছ, নো পীছ! লুক মি, দিছ ওলদ্ আনহ্যাপি উয়োম্যান! লুক!

বলে—কেটি এ পথে শান্তি নেইরে, সুখ নেই আনন্দ নেই, নেই কিচ্ছু নেই। আমার দিকে চেয়ে দেখ, জরাজীর্ণ বৃদ্ধা হতভাগিনী আমার দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই। সমাজে

সকলে ঘৃণা করে, এই বাবুরা বলে ম্যাগী—তার অর্থ বেশ্যা, বলে মাসী —তার অর্থ তরুণী বেশ্যা নিয়ে ব্যবসায়িনী বৃদ্ধা বেশ্যা। দুঃখ দেখ, আজ আমি তোর ঝিয়ের বৃত্তিই অবলম্বন করেছি একরকম। কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখ।

নিজের সেই ঝলঝলে ঘাঘরাটার প্রান্ত টেনে তাকে দেখিয়ে বলে—দার্তি র‍্যাগ! লুক!

কেটি কোন কথা বলে না, সে উপুর হয়ে বুকে বালিশ রেখে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে সামনের সেণ্ট জেভিয়ার্স চার্চের পাশের মেহগনি গাছের সারির মাথার দিকে। কখনও কখনও চার্চের মাথায় ক্রশটার দিকে চায়।

ম্যাগী তাকে বলে—এর চেয়ে বিয়ে করে ঘর বাঁধ। তুইও রোজগার কর, স্বামীও রোজগার করুক। এই সেদিন আমার ছেলেবয়সের সই মেরী এসেছিল, এই শরীর তার, তেতলায় উঠে হাঁপিয়ে সারা; বেশ আছে, মুখে হাসি কত! তার কানে এই মস্ত দুটো সোনার বলইয়ারিং। হাতে দুগাছা করে চারগাছা সোনার চুড়ি। ফ্রকটা দেখলাম চমৎকার দামী ছিটের। সিল্ক সার্টিনের পোষাকও ওর আছে। তার ওলদ্‌ম্যানকে কত বকলে আমার কাছে। ছেলে হয়েছে, তারা চাকরী করছে, মধ্যে মধ্যে কত জিনিষ দেয়, টাকা দেয়; বউ হয়েছে নাতি নাতনী হয়েছে। ছোট বউটা কাছে থাকে। তার বড় ছেলেটাকে নিয়ে বগলস আটা খরম পায়ে—এই বড় ঝোলা হাতে রোজ সকালে বাজারে যায়, দুপুরে পশম নিয়ে মাফলার সোয়েটার বোনে। বললে—অ্যানি, বোনার আর বিরাম নেই আমার। তবে দুপুরটা কাটে ভাল। রবিবারে সুন্দর পোষাক পরে সুন্দরী নাতনী-গুলোকে নিয়ে চার্চে যায়! নাতনীরা বড় বড় হয়েছে, এইতো সামনের লরেটোতে পড়ে; বড়টি লরেটো সেরে নার্সিং শিখছে। মেজটি এবার শেষ করবে লরেটোর পড়া। তারপর সে শিখবে টাইপরাইটিং। কাজের তো অভাব নেই। টেলিফোন আপিসে চাকরী, রেলের বুকিং

আপিসে চাকরী, এগুলোতো আমাদেরই জন্যে। রং যাদের কটা তারা অবশ্যি খাতির বেশী পায় কিন্তু চেষ্টা করলে তোকে জোগাড় করে দিতে পারি কিছু না কিছু। বলিস তো আমি যাই সেণ্ট জেভিয়ারের ফাদারের কাছে! বলি—ফাদার, বি ম্যাস্থিফুল, তেক পিতি অন এ ফলেন গাল! রিপেনতেন্ত গাল। পুয়োল ক্লিচাল। ইউ ত্রাই ফর হার! প্লিজ প্লিজ ফা-দার!

কেটি চুপ করে শুনতে শুনতে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, ষ্টপ—ইউ, ইউ উইচ আই সে, ইউ ষ্টপ!

—হোয়াত?—চমকে ওঠে ম্যাগী।

—ডেভিল মে টেক ইউ, ডোণ্ট ইউ হিয়ার? ষ্টপ, আই সে ইউ ষ্টপ, ইউ ওল্ড হ্যাগ, ন্যাষ্টি ক্রীচার।

ম্যাগী ক্ষেপে যায়—হোয়াত?

কেটি উঠে চুলটায় বার কয়েক চিরুণী বুলিয়ে জুতো পায়ে দিয়ে, হাতব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে খট খট করে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। রাত্রে ফেরে মত্ত অবস্থায়। কেউ সঙ্গী এসে পৌঁছে দিয়ে যায়। বুড়ী সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। রাত্রে ওর ঘুম ভাল হয় না। কেটি যতক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণ ঘুম আসেই না। একটা উদ্বেগ অনুভব করে। হয়তো থানায় ধরে নিয়ে গেছে। অথবা হয়তো কেটি জখম হয়েছে। কাল হাসপাতাল থেকে খবর আসবে। কিংবা হয়তো কেটির আর কোন খবরই পাওয়া যাবে না। মর্গে কয়েকদিন পচবে তারপর যা হোক কোন পরিণতি লাভ করবে। হয়তো তার হাড়গুলো কোন ডোম কোন ছাত্রকে বিক্রী করে দেবে, সে টেবিলের উপর তার হাত অথবা পায়ের হাড় ঠুকবে আর পড়বে। কেটির আত্মা বেদনায় অঝোর ঝরে কাঁদবে! বুড়ো বয়সে ম্যাগী তার শক্তির সঙ্গে জীবনের সকল ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে! মহানগরীর জীবন অবিরল মন্থিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের শাসনত্রস্ত প্রবৃত্তি গুহার অন্ধকারে লুকিয়ে সকল গতিকে পিছন দিক থেকে টানছে।

দুই আকর্ষণে মন্থিত হচ্ছে জীবন, মহানগরীর জীবন। অমৃত উঠছে, বিষ উঠছে। সেই বিষে জর্জরিত হয়ে ম্যাগী পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে এই চারতলার কাঠের কুঠুরীর কোণে। কেটি ছুটে যায় ওই বিষের প্রলোভনে। তাই তার কেটির জন্য এত উৎকণ্ঠা। তাই কেটি এত গালাগালি দেওয়া সত্বেও, সে ফিরে এলেই ম্যাগী সন্তর্পণে উঠে তাকে দেখে আবার শোয়। সে মত্ত হয়ে ফিরে এলে ম্যাগী বেরিয়ে আসে নিজের ঘর খুলে, কেটির ঘর খুলে তার সঙ্গীর সাহায্যে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সঙ্গীটাকে বিদায় করে দেয়। কেটিকে প্রাণভরে গাল দেয়, মাথায় জল দেয়, বাতাস করে, সময়ে সময়ে এই সুযোগে সে তাকে চুচারটে চড় কষিয়েও দেয়। আবার সকালে কেটি উঠলেই তার ঘরে উঁকি মেরে বলে—ফিলিং ওয়েল ?

কেটি একটু হাসে। ম্যাগী বলে—ওয়াশ ইওর হেড, ফেস। আন্দাস্তান্দ ?

একটু পরেই চা রুটি এনে সামনে রেখে পাশে বসে। বলে—বেলী গুড হেলথ! দ্যাতস গুড—নাউ তেক তি।

বিমল উঠল। চা খাবার সময় হয়েছে। মেসে চায়ের ব্যবস্থা নাই। দোকানে গিয়ে সকলে খেয়ে আসে। সমৃদ্ধ অবস্থার বাবুদের মেসের বাবুরাও দোকানে যায়। চায়ের ব্যবস্থা রাখলে আপিসের ভাত হয় না। তাছাড়া মোড়ের মাথায় একটি ভাল চায়ের দোকান আছে, যার আকর্ষণই হল সব চেয়ে বড়। চা থেকে খাবারদাবার চমৎকার তৈরী করে ওরা। পরিচ্ছন্নতাও প্রশংসনীয়। এর সঙ্গে আছে রেস্তোরাঁ সমারোহের নেশা, নগরজীবনের এটা একটা বিলাস। যারা রেস্তোরাঁয় ঢোকে নি তাদের প্রথম ঢুকতে বাধ-বাধ ঠেকে। ঢুকলেই আর রক্ষা নাই। সে তাকে টানবেই।

এ মেসের বাবুরা সাধারণত ও রেস্তোরাঁয় যায় না। যায় পাশের একটা রেস্তোরাঁয়। সেটার জমজমাট কম। খাবার-দাবারের দামও

কিছু কম। চপ কাটলেটে দু পয়সা, কারির ডিস দু আনা, মটন চপ ব্রেষ্ট কাটলেট বড় কেউ একটা খায় না—তা হলেও তার দামও কিছু কম। এ ছাড়া ওখানে ঢুকে এ মেসের বাবুরা মনে মনে একটা জটিলতার পাকে পাক খেতে থাকে যেন ; ঘন ঘন চারিপাশের টেবিলে তাকায়, টেবিলের অধিকারীদের সাজসজ্জা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে—গিলে করা পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতি, স্যুট, রকমারি চশমা, কারও মুখে চুরুট, কারও মুখে সিগারেট, এ সব দেখে নিজেদের লংক্লথের ইস্ত্রি, লাটখাওয়া পাঞ্জাবী ও সাবানকাচা কাপড়ের দিকে চেয়ে।কেমন যেন অস্বস্তি ভোগ করে, চা খেয়ে বিড়ি ধরাতে লজ্জা পায়। তাই তারা পাশেরটায় গিয়ে বসে। বিমল দুটোতেই যাবে অবশ্য। যেদিন যেটার উপযুক্ত সামর্থ্য তার পকেটে থাকবে, সেদিন সেটাতে গিয়ে ঢুকবে।

একবার মনে হল বুড়ী ম্যাগীর সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থাটা করে নিলে মন্দ হয় না। তেতলা সিঁড়ি ভেঙে যাওয়া আসা, কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত হাঁটা, অনেক সময়-সাপেক্ষ। পরমুহূর্তে মনে হল—না, একান্ত বাধ্য হয়ে এদের সঙ্গে যতটুকু জড়িয়ে না পড়ে উপায় নেই তার চেয়ে বেশী জড়ানো ঠিক হবে না। বুড়ী ম্যাগীও আশ্চর্য, পূর্ণ এক টিপট চা তার নষ্টই হল কিন্তু বিমলকে বললে না—এক কাপ তুমি খাও।

চা খেয়ে খানিকটা ঘুরে সে ফিরল। পাড়াটাকে চিনে নিতে চেষ্টা করলে। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট লালবাজার থেকে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু পর্যন্ত প্রাচীন বউবাজার এখনও টিঁকে আছে। নানা জাতের সংমিশ্রণ এখানে, অভারতীয় অনেক, অবাঙ্গালী প্রায় সবাই। বউবাজার স্ট্রীটের দুইপাশে অসংখ্য সরু গলি এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে। এগুলি যেমন সংকীর্ণ তেমনি অপরিচ্ছন্ন, তেমনি জীর্ণ, তেমনি বিপদসঙ্কুল। উর্দুভাষাভাষী মুসলমান, ম্যাগী-কেটির গোষ্ঠী ফিরিঙ্গী, চীনেম্যান, জু, ইয়োরোপের আরও অনেক দেশের অধিবাসী দুজন একজনকে এ অঞ্চলে খুঁজলে পাওয়া যায়। পাড়ার বাড়ীগুলি অধিকাংশই ঊনবিংশ শতাব্দীর। বিংশ শতাব্দীতে ঊনবিংশ শতাব্দী যেন এই প্রাচীন

অঞ্চলটার জীর্ণ ইট-কাঠ-পাথরে জড়িয়ে পড়ে আছে। এখানকার মানুষগুলির অধিকাংশের ওই অবস্থা। উনবিংশ শতাব্দীর আলো নিভে গিয়েছে, বিংশ শতাব্দীর আলো—তার কল্যাণস্পর্শ যেটুকু, তা পায় নি—তারা উনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকারকে আশ্রয় করে রাত্রির মানুষের মত জীবনযাপন করে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ গড়তে চেয়েছিল যে কলকাতা, তারই জীর্ণ টুকরো। আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্র স্থাপন করেই সে ক্ষান্ত হয় নি, সে স্থাপন করতে চেয়েছিল ধর্মে সংস্কৃতিতে সভ্যতায় ইংরেজের একান্ত অনুগত মানুষের বসতি। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বউবাজারে চার-চারটে গির্জা। গির্জার সঙ্গে কৃশ্চান এবং ফিরিঙ্গীদের জন্যে স্কুল। সে নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করে দীক্ষাগুরু হতে চেয়েছিল; ইংরিজী ভাষায় শিক্ষিত করে শিক্ষাগুরু হতে চেয়েছিল; আপিসে ডকে, রেলওয়েতে, কল-কারখানায় তাদের চাকরী দিয়ে তাদের প্রভু হয়েছিল—উনবিংশ শতাব্দীর প্রভু; এদের দুর্দান্তপনা শিখিয়ে পৃষ্ঠপোষোক হয়েছিল এবং এদের দিয়েই বাঙালীকে, বাঙালীর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে দমন করতে চেয়েছিল, দাস করতে চেয়েছিল।

কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। ফিরবার পথে থমকে দাঁড়াল বিমল।

ফিরিঙ্গী কালীর বাড়ীতে আরতি হচ্ছে। মাটির কালীমূর্তির সামনে প্রদীপ ঘুরিয়ে আরতি হচ্ছে। কয়েকটি বুড়ো বুড়ী ফিরিঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে। পরণে হাফপ্যাণ্ট, গায়ে গেঞ্জী, মাথায় হ্যাট। আরতির শেষে বুড়ো বুড়ীরা চলে গেল, একজন বুড়ী একটা পয়সা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মনে মনে বিড় বিড় করে কিছু বলে তবে গেল। ছেলেগুলো এখনও ঘুরঘুর করছে। এক এক টুকরো মিষ্টান্ন প্রসাদের জন্য বোধ হয়! ফিরিঙ্গীকালী, বিচিত্র নাম, হিন্দুদের উচ্চস্তরের লোকেরা অবজ্ঞার চোখেই দেখে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থেরা প্রণামও করে না। কিন্তু তারা জানে না—ফিরিঙ্গীকালী আসলে গির্জের দরজায় দাঁড়িয়ে হিন্দুদের রক্ষাকালীর মত যুদ্ধ করে এসেছে।

সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুয়ের মোড়ে এসে দাঁড়াল বিমল। মহানগরীর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবাদের আবিষ্কারের কল্যাণে সভ্যতার মধ্যে গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল দাবীতে প্রশস্ত আলোকোজ্জল মসৃণ পথ চলে গিয়েছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অভিমুখে।

আশ্চর্য! ঊনবিংশ শতাব্দীর নগরীর অংশটা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা সঙ্কুচিত হয়ে পিছনে হটে গিয়েছে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর দুপাশের স্থান অধিকার করে বড় বড় প্রাসাদ গড়ে তুলেছে মাড়োয়ারী ধনীরা। ওপাশে এগিয়ে এসেছে বাঙালী উচ্চ-বিত্তেরা, স্বচ্ছল মধ্যবিত্তেরা। ইংরেজ ধনীর স্থলে ভারতীয় অবাঙালী ধনীরা জয়লাভ করেছে। অবাঙালীর স্থান অধিকার করেছে।

পথে আরও একটি কালীবাড়ী। সেখানেও আরতি হচ্ছে। সেণ্ট জেভিয়ার্স চার্চের ঠিক সামনেই। চার্চের অঙ্গীভূত সেণ্ট জোসেফ স্কুলের কোথাও ছেলেমেয়েরা কোরাসে গান গাইছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখানে। চীনে-সাহেবরা দোকানে বসে লম্বা পাইপে ধূমপান করছে আরাম করে। এই এক জাত। এদের বোধ হয় কেউ হটাতে পারবে না। ধনশক্তি, সৈন্যশক্তি নিয়ে ওরা আসে নি, ধর্ম প্রচার করতে আসে নি, চীনা সংস্কৃতি বিস্তার করতে আসে নি, এসেছে নিজেদের শ্রমশক্তি ও কর্মনৈপুণ্য নিয়ে; কারও সঙ্গে তাই মানসিক দ্বন্দ্ব নাই, কেউ ওদের শত্রু বলে গ্রহণ করে নি, মিত্র বলেও সমাদর করে স্থান দেয় নি, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ওরা নিজেদের স্থান দখল করেছে। দখল করার মধ্যে দ্বন্দ্ব করে নাই, যে স্থানটা শূন্য হয়েছে সেই স্থানটা পূর্ণ করেছে। ক্ষয়িষ্ণু ফিরিঙ্গী এবং অপসৃয়মান অপর সম্প্রদায়ের স্থান পূর্ণ করে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট থেকে বউবাজার পর্যন্ত নিজেদের প্রসারিত করেছে। মহানগরীর জীবনে ওদের কর্মনৈপুণ্যের শ্রমশক্তির স্থান অপরিহার্য, অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বকর্মা এ পুরীর অন্যতম দেবতা, ওরা তার অনুচর। সেণ্ট জেভিয়ার্স চার্চের

পিছনে এমনি আর একটি সম্প্রদায় বস্তীর অন্ধকারে কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে কলরব করছে। ওড়িয়া শ্রমিকেরা।

বিচিত্র উপলব্ধি নিয়ে সে আপন ঘরে ফিরল।

মেসগুলি তখন গুলজার হয়ে উঠতে সুরু করেছে। বাবু মেসের সভ্যেরা ফিরছে খেলার মাঠ থেকে, চাঙোয়া থেকে, সিনেমা থেকে, এসপ্ল্যানেড থেকে। এ মেসের বাবুরা ফিরছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বক্তৃতা শুনে, গোলদীঘির চারিপাশে পাক দিয়ে, হাড়কাটা গলির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত বারকয়েক টহল দিয়ে।

জনকয়েক ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। দেখবার মত দৃশ্য বটে। চারতলার উপর থেকে রাস্তাটাকে দেখাচ্ছে বিচিত্র। মধ্যলোকে আলোর সারি। তার অপর্যাপ্ত আলোকে অস্পষ্ট রাস্তাটাকে দেখাচ্ছে যেন একটা দীর্ঘ সরল গহ্বর পথের মত, দ্রুত সঞ্চারমান মটরের হেডলাইট ছুটে আসছে —বেঁকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে; যেন পাতালপুরীতে ছুটোছুটি করছে হাজার আলেয়া।

এখানে এসে এক অদ্ভুত সত্যকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। সেই কথাটাই সে ভাবছে। কলকাতায় ইংরেজ হেরে গেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে যে অংশটা প্রত্যক্ষ—তা ছাড়া আরও একটা যুদ্ধ চলে আসছে কতকাল ধরে। ইংরেজ সেখানে হারছে। ইংরেজ এই পাড়াটার উত্তর সীমানায় সেকালে একটা কেল্লা গড়েছিল। স্কুল তৈরী করেছিল, অনুগত দাস তৈরী করবার কারখানা করেছিল। সে কারখানায় তারা বেদখল হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। সেটা সবারই চোখে পড়েছে। কিন্তু সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু-বউবাজারের মোড়ে সে দেখে এসেছে তারা কতটা পিছিয়েছে। কথাটা সে গোপেনদাকে বলবে। মিহিরকে বলবে।

পরদিন সকালে উঠে সে এই কথাটাই লিখতে বসল।

বাইরে থেকে কে বললে—মে আই কাম ইন?

বিমল চোখ তুলে চাইলে; কেটি দরজায় দাঁড়িয়ে। সে উঠে বললে—কাম ইন। ইজিচেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললে—টেক ইওর সীট প্লীজ!

কেটি বললে—আই হ্যাভ সামথিং টু টেল ইউ।

—ইয়েস, আই স্যাল বি—

—নো। আই নো, ইউ আর নট প্লিজড। আই নো।

সে বসল চেয়ারে।

বুড়ী ম্যাগী—এসে মুখ বাড়িয়ে হেসে বললে—গুড মর্ণিং মাই সন্! তারপরেই সবিস্ময়ে বললে—কেটি হিয়া? গ্যাড! দোস্ত কোয়াল—কেটি—দোস্ত!

কেটি বিরক্ত হল। বুড়ী বললে—বি ফ্রেন্দ। তারপর বললে—তি? তু কাপস্ অব তি? এঁ! একমুখ হেসে সে চলে গেল।

ম্যাগী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই কেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ইউ লীভ্ দিস প্লেস।

বিমল তার দিকে তাকালে। কেটির কপাল কুঞ্চিত, চোখের কোণে একটা বিরূপতার ছাপ।

—হোয়াই? বিমল স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলে।

—ইফ ইউ ষ্টে—নো ফ্রেণ্ডস্ কাম্ হিয়ার—ইউ লীভ!

—না। বিমলের কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ দৃঢ়তর হয়ে উঠল। কেটি নিষ্ফল আক্রোশে নিজের ঠোঁট দুটি কামড়ে ধরলে। কণ্ঠা ফুলে পড়েছে। চোখের দু'পাশে অসহায় ক্রোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ছে। বিমল অনুভব করলে, সে থাকলে কেটির ব্যবসায় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। নিশ্চয় রতু আর মণ্টুবাবু স্পষ্টভাষায় জানিয়ে গেছে, বিমল থাকলে তারা আর আসবে না। বিমলকে এ মেস ছাড়তে হবে, নইলে তারা অন্যত্র যাবে।

কেটি অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠল—ইফ্ ইউ ডোণ্ট গো, আই শ্যাল কীল ইউ!

বিমল স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বললে—ডোণ্ট শাউট্।

তার চীৎকারে ম্যাগী ছুটে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দন্তহীন মুখব্যাদান করে প্রাণপণে সন্ধির প্রস্তাব করে—দোন্ত কোয়াল—ফ্রেন্দ্—তি হিয়া—তেক—।

এক ধাক্কায় কেটি চায়ের পেয়ালা ছুটো ফেলে দেয়। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় কাপ ছুটি। ঘরময় গড়িয়ে পড়ে সদ্য তৈরী করা গরম চা।

—আই উইল কল হামফ্রে, হী উইল স্ট্যাব হীম—হী উইল কীল হীম। কেটির কণ্ঠস্বর সপ্তম স্বরে উঠে যায়।

বিমল ভৎর্সনার সুরে বলে, ডোণ্ট শাউট—গো নাউ।

ম্যাগী মাঝখানে এসে উভয়ের বন্ধুত্বের সেতু গড়বার চেষ্টা করে, কিন্তু কেটি ডান হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে, লেখার কাগজপত্র ওলট পালট করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। পাশের ঘর থেকে তার কান্নার অস্ফুট শব্দ ভেসে আসে—ম্যাগী তার পিছন পিছন গিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে—দোন্ত কাই মাই গাল—দোন্ত কাই।

বিমল নিঃশব্দে লেখার কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে তুলতে লাগল।

—কি ব্যাপার বিমলবাবু?

বিমল মুখ তুলে দেখলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেসের ম্যানেজার তুলু বোস। বিমলের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

ষোল

খাঁটি বাঙালী ঘরের মেয়ে কেটি। ধর্মে কৃশ্চান অথচ খাঁটি বাঙালী বিমলের অজানা নয়। এঁদের অনেককে জানে। এঁদের দু তিনজন তরুণ সাহিত্যিককেও সে জানে। নিজের দেশেও সে এঁদের দেখেছে। সেই ঘরের মেয়ে? কেটির নাম কেতকী? সে বি-এ পর্যন্ত পড়েছে? শিক্ষিতা মেয়ে? তার এই পরিণতি? বিমলের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। অবিশ্বাস করবারও উপায় ছিল না। শেষ কয়েকটি কথা কেটি খাঁটি বাঙলায় বিশুদ্ধ বাঙালী উচ্চারণে বলে গেল।—বোস থামতেই সে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলে—তারপর?

—তারপর? একটু দুঃখের হাসি হাসলেন বোস। সে হাসিটুকু তাঁর মুখে লেগেই রইল, বললেন—তারপর কেতকী থেকে হল কেটি, শাড়ী ব্লাউজ ছেড়ে ফ্রক-গাউন পরলে, চুলের লম্বা বেণী কেটে ফেলে বব করলে, কপালে কুম্‌কুমের টিপ ছেড়ে লিপষ্টিক রুজ ধরলে। ধাক্কা খেতে খেতে এখানে এল, নিয়ে এল ওই ম্যাগী। ম্যাগী অবশ্য ওর আসল পরিচয় জানে না, সে ওকে নিজেদের জ্ঞাতিগোত্রই মনে করে। কেটি ওদিক দিয়ে পাকা অভিনেত্রী, আজও এক আমার কাছে ছাড়া বউবাজার অঞ্চলে আর কারও কাছে ধরা পড়েনি।

বিমল প্রশ্ন করে বসলে—আপনি ওকে ধরলেন কি করে? প্রশ্ন করেই সে লজ্জিত হল। বললে—মাফ করবেন আমাকে—প্রশ্নটা করা আমার অন্যায় হয়েছে।

বোস হেসে উঠলেন। বললেন—কিছু অন্যায় হয় নি। যতটা বলেছি তাতে যে কেউ হোক এ প্রশ্ন করতই। প্রশ্নটা এড়াতে গেলে

কথাটা পাড়াই উচিত নয়। এ কথা গোপেনদা, মিহিরবাবু জানেন। আর আপনাকে বলছি। একসময় সন্দেহ হয়েছিল মেয়েটা পুলিশের স্পাই। আমাদের মেসটার সঙ্গে গোপেনদার সংশ্রব সন্দেহ করে তারাই একে এখানে পাঠিয়েছে। আমাদের মেসটার বিচিত্র ধারা-ধরণের কথা জানেন তো।

বিমল ঘাড় নেড়ে জানালে—সে জানে।

বোস বললেন—আমার জন্যেই এটা হয়েছে। আমার পরিচয়টা বলি শুনুন। পয়সাওলা বাপের ছেলে, আমার নাম দিলীপ বোস, ছেলেবয়সে সকলে ভাল ছেলেই বলত। স্বাস্থ্য দেখছেন তো, এমনি স্বাস্থ্য আমার ছেলেবয়েস থেকেই; তার উপর দুর্দান্ত মারহাত্যা আর ফুটবল ক্রিকেট হকিতে ভাল খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিলাম। পড়াশুনাতেও কোনবার ফেল করি নি। কাজেই গোপেনদাদের দল আমার উপর হাত দিলে। আমারও তরুণ বয়স, আমিও ঝুঁকে পড়লাম। তারপর কলকাতায় কলেজে এলাম। তিরিশ সালে জেলও ঘুরে এলাম। তারপর বছর খানেক ডিটেনশন। সেখান থেকে আবার কলেজ। গোপেনদারা তখনও ডিটেনশনে। কলেজে ঢুকে, মানে ল কলেজে, খেলায় মাতলাম। বাস, কেরিয়ার খুলে গেল। কলেজের টিম থেকে নামজাদা বড় টিমে ঢুকে গেলাম। আমার সেণ্টার-হাফের খেলা দেখে ছেলেরা হিরো বানিয়ে ফেললে, মেয়েরা প্রেমে পড়ে গেল, দিলীপ বোস থেকে নাম হয়ে গেল দুলু বোস।

—আপনিই খেলোয়াড় দুলু বোস?

হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বোস বললেন—আপনি মশাই নেহাৎ গোঠছাড়া সাহিত্যিক। সাহিত্যিকদের খেলা দেখার বাতিক বিখ্যাত। খেলার মাঠে বেলা দুটো থেকে তাঁরা বসে থাকেন, এখনও থাকেন বোধ হয়। সাহিত্যিকদের কাছে আমার পরিচয় দিতে হয় না। দেখলেই তাঁরা আমাকে চিনতে পারেন।

বিমল লজ্জিত হল, বললে—খেলা আমি বড় দেখি না, কিন্তু তবু আপনাকে চেনা উচিত ছিল আমার। আপনার ছবি অনেকবার দেখেছি।

—ছবি? হো-হো করে হেসে উঠল ডুলু বোস। ছবি দেখে না চেনার জন্যে নিশ্চয় আপনার অপরাধ নেই। ছবি যারা তোলে তারা আমাকে এমন সুপুরুষ বানিয়ে তোলে যে সে ছবি দেখে আসল আমাকে চেনাই যায় না।

বিমলও হেসে ফেললে।

ম্যাগী উঁকি মারলে এবার—মিস্তার বোস।

বোস মুহূর্তে পাল্টে গেলেন—ভুরু কুঁচকে বাংলাতেই বললেন—কি?

—ওয়ান ওয়াদ। ওনলি ওয়ান ওয়াদ। প্লিজ!

বোস তাকে ধমকালেন, বললেন—বাংলা, বাংলাতে বলো ম্যাগী।

ম্যাগী ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে মিনতিভরে বললে—কেটির পর বহত গোসা আপনি করবেন না বোসবাবু। আনফরচুনেত গাল।

—হ্যাঁ। হতভাগী! সে তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু আজকের ও কেলেঙ্কারীটা তুমি বাঁধালে কেন! ঝগড়ার জন্য তুমিও দায়ী।

—ফর দিস—মুকুর্জী, বোসবাবু, মুকুর্জীবাবুর লিয়ে। মুকুর্জী হামকে বললো মামী। আপনা বেটার মতুন ভালবাসলোঁ আমি। বোসবাবু, কেটি মুকুর্জীকে উপর গোসা করল। কাল রাতে মাতোয়ারা হয়ে আসলো, বহুত গাল দিলো মুকুর্জীকে। হামকে বললো হামফ্রেকে ডাকবে। আজ সকালে উ নিজুসে আসলো মুকুর্জীর ঘর। আই থট বোসবাবু—দিস ইজ যাষ্ট দি টাইম, কেটির সাথ মুকুর্জীর দোস্তি লাগাইয়ে দি। বাট্। হতাশ ভাবে সে ঘাড় নাড়লে। সি ইজ তেরিবল। আই কুদ নত রেজিস্ত মাইসেফ্। দ্যাতস মাই ফল্ত। মাই ফল্ত বোস, দোস্ত গেত অ্যাংরি উইথ পুয়োর কেটি।

বোস হাসলেন। বললেন—আচ্ছা আচ্ছা। কেটিকে কিছু বলব না, তুমি যাও।

—প্লিজ, বোসবাবু প্লিজ! ম্যাগীর যেন বিশ্বাস হচ্ছেনা, আবারও সে মিনতি করলে।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ আমি কথা দিচ্ছি ম্যাগী। তুমি জান আমি কথার খেলাপ করি না। যাও। তুমি এখন যাও।

দন্তহীন মুখে তোষামোদের হাসি হেসে ম্যাগী বললে—আই নো, আই নো দ্যাত বোসবাবু। ইউ আ এ ম্যান অব ওয়ার্দ। এ ম্যান উইথ এ বিগ হাত, আই নো। চলে যেতে যেতে সে আবার ফিরে দাঁড়াল, বললে—তি?

—না না। তুমি যাও এখন ম্যাগী। দেখছ না কথা বলছি আমরা।

ম্যাগী চলে গেল। বোস বললেন—গরীবের জাতও নেই, ধর্মও নেই বিমলবাবু। ও যখন বলছিল—কেটির সঙ্গে মুখার্জির ভাব করিয়ে দি, তখন আমার মনে পড়ে গেল শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের মোক্ষদা ঝিয়ের কথা। সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে এর তফাৎ কোথায় বলুন ত! যদি ভাব হত আপনার সঙ্গে কেটির—তবে দেখতেন ও মদ খেতে চাইত, এবং মদ খেয়ে চীৎকার করত যে মুকুর্জির কাছে কেটির আন্টি হিসেবে টাকা আদায় করে তবে মদ মুখে তুলেছি। কোন তফাৎ নেই।

বিমল বললে—ম্যাগী কিন্তু কেটিকে সত্যিই ভালবাসে।

—তা বোধ হয় বাসে।

—বোধ হয়? সন্দেহ করেন আপনি!

—খানিকটা।

—কেন বলুন তো!

—কেন! হাসলেন বোস। বললেন—কেটির দৌলতে আজ ওর ভাত জুটছে বিমলবাবু। কেটির নাগরদের কাছে টিপস্‌ই হল

ওর প্রধান উপার্জন। কেটি ওর কাছে খায়—লোকজন এলে চা-কেক রুটি দেয়—তার থেকেই ওর আহার সংস্থান হয়। কাজেই কেটিকে ভালবাসার কতখানি ওর প্রয়োজনের খাতিরে, কতখানি অকৃত্রিম এ কথা বলা শক্ত।

বিমল হেসে বললে—প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ মানুষের কাছে আসে দিলীপবাবু, তারপর প্রয়োজনের মেলামেশার মধ্যেই ভালবাসার সুরু হয়।

—অস্বীকার করিনা। কয়লার মধ্যে শুনেছি হীরে পাওয়া যায়। কয়লাই কোন যাদুতে হঠাৎ খানিকটা জায়গায় হীরেতে পরিণত হয়। কিন্তু সে কদাচিৎ। আমার অভিজ্ঞতা অনেক। যাক ওসব কথা। এখন যা বলছিলাম। কি বলছিলাম! হ্যাঁ কেটির কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা বলছিলাম। কয়লার খানিকটা দরকার আছে।

দিলীপ বোস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

—দিলীপ বোস দুলু বোস হয়ে গেল বিমলবাবু। খেলার পিছল মাঠে দৌড়ুতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেলাম। খেলায় স্লিপ জানেন তো, পড়ে তেমনি ভাবে পিছলে একেবারে এসে খানায় পড়ে গেলাম বিমলবাবু। এমন বদভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম সে অভ্যাস আর কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দুলু বোস বললে—সব হারালে সব পাওয়া যায় বিমলবাবু—চরিত্র হারালে আর বোধ হয় পাওয়া যায় না। যারা দুচারজন পায় তারা অসাধারণ। গোপেনদার মত এমন ব্যক্তিত্ব এমন চরিত্র—তিনি ডিটেশন থেকে ফিরে এসে আমায় শোধরাবার জন্যে অনেক করলেন—কিন্তু—। হতাশভাবে ঘাড় নাড়লে দুলু বোস—গোপেনদার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে, দুলু বোস তার নিষ্কলুষ আত্মাকে ফিরে পায় নি।

—তবে এই কলুষ কাজে লাগল অন্য দিকে। ল কলেজে

পড়লাম বছর পাঁচেক—পরীক্ষা অবশ্য দিলাম না। তারপর আরম্ভ করলাম ব্যবসা। দালালী। এই কদভ্যাসগুলো মূলধনে দাঁড়াল। এক এক সময় নিজেই আশ্চর্য হয়ে ভাবি—মা লক্ষ্মী এই অনাচার সহ্য করেন কি করে। অথচ প্রায় গোটা ব্যবসার ক্ষেত্রটাই যেন এই অনাচারের ইঙ্গিতে চলছে। ধরুন—নতুন কণ্ট্রাক্ট পেতে হবে, আপিসের বড় সায়েবকে পার্টিতে নেমন্তন্ন করে আপ্যায়িত করতে হবে। পানীয় না হলে পার্টি হয় না, তার সঙ্গে প্রচারনৃত্য দেখতে হয়।

হাসলে তুলু বোস।

বিমল একটু চুপ করে থেকে বললে—জীবনে সংসারী হবার চেষ্টা করেন না কেন দিলীপবাবু?

নিভে-যাওয়া সিগারটা আবার ধরিয়ে তুলু বোস উপরের দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে বোধ হয় ভেবে নিয়ে উত্তর দিলে—সংসারে কোন মেয়েকে দু দিনের বেশী তিন দিন ভালবাসতে পারি না বিমলবাবু। প্রথম দিন নেশা ধরায়, তারপর দিন সে নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠি, দুদিন তাকে ভালবাসার ভানে ভোগ করার পর তৃতীয় দিন সকালে সে নেশার একবিন্দু আর অবশিষ্ট থাকে না। নিজের উপরেও ঘৃণা জন্মে যায় দিন কয়েকের জন্যে, সে কয়েক দিন কৃচ্ছ্র সাধন করি, তারপর আবার মেতে উঠি নূতনের নেশায়।

বিমল বললে—এ সম্ভবত এক ধরনের ব্যাধি।

—তাতে সন্দেহ নেই। এ থেকে আমার পরিত্রাণ নেই বিমল বাবু। যাক্—তারপর শুনুন। গোপেনদা হাল ছেড়ে দিলেন। আমি নিজেই গোপেনদাকে বললাম—আমার উপর আর পণ্ডশ্রম করবেন না। তবু গোপেনদা সংশ্রব ছাড়লেন না। এই মেস করে দিলেন। বললেন—একটা উপকার হবে আমার। কারও গা ঢাকা দিয়ে থাকার দরকার হলে—নিরাপদেই থাকতে পারবে। সামনে বাঈজীরা থাকে, মেসের বাসিন্দারা রীতিমত বাবু লোক, মালিক

ছুলু বোস—চট করে নজর কারও পড়বে না। এখানকার বিখ্যাত গুণ্ডারা খেলোয়াড় ছুলু বোসকে জানে—তার গায়ের শক্তি, ঘুষির জোরের কথাও জানে, টাকাপয়সার ব্যাপারে দিলদরিয়া মেজাজের কথাও জানে, ভালবাসে, ভক্তি করে, ভয় করে; কাজেই তারা আমাকে জানায় কে কোথায় উঁকিঝুঁকি মারছে। এই অবস্থায় একদিন ম্যাগী নিয়ে এল কেটিকে। রোগা-কালো মেয়েটাকে প্রথমে গ্রাহ্য করি নি। কিছু দিন যেতেই মেয়েটা স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে আমাদের সচকিত করে তুললে। মিহিরবাবু এখানে আসেন যান—তিনিই প্রথম বললেন—দিলীপবাবু এ ফিরিঙ্গী মেয়েটা তো সন্দেহের কারণ হয়ে উঠল। আমার পিছনে ঘুরছে। সেইদিন সন্ধ্যের সময় আমি চৌরঙ্গীতে একটা হোটেলে ঢুকছি—দেখলাম মেয়েটা হোটেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে—লক্ষ্য আমি। মিহিরের কথাটা মনে পড়ে গেল। সন্দেহ হল, মেয়েটা বোধ হয় পুলিশের স্পাই। মিহির আসে, আসে অবশ্য বাড়ীওয়ালার বন্ধুপুত্র হিসেবে, ঘর ভাড়া দেওয়ানেওয়ার অজুহাত নিয়ে। কিন্তু পুলিশের দৃষ্টি অদ্ভুত তীক্ষ্ণ। ছুলু বোস আজকাল প্রতিটি সন্ধ্যা হোটেলে গেলাস রেখে বসে থাকে, ট্যাক্সীতে তাকে তরুণী সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে দেখা যায় কিন্তু একদিন সে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছিল। পুলিশের সন্দেহ করাই স্বাভাবিক। মেয়েটা ফিরিঙ্গী, ঘুরছে মিহির এবং আমাব পিছনে, কাজেই ওই কথাটাই মনে হল। হোটেলে ঢুকলাম, কেটিও ঢুকল। সারাক্ষণ আমাকেই লক্ষ্য করলে। আমি উঠলাম, ও-ও উঠল, বেরিয়ে এসে ট্যাক্সীতে উঠছি, কেটি পিছনে এসে দাঁড়াল। বললে—আমায় একটু সঙ্গে নেবে? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে কঠিনভাবেই বললাম—কেন বল তো? ও বললে—আমাকে কি তুমি চিনতে পারছ না? আমরা একই বাড়ীতে থাকি। আমায় সঙ্গে নিলে একসঙ্গেই বাড়ী ফিরতে পারব। উপেক্ষা করেই চলে এলাম। ট্যাক্সীটা ছাড়ছে সেই সময় ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম

ওর চোখ জ্বলছে। এসে জগুকে বললাম, জগু-গুণ্ডাকে চেনেন তো? এখানে কালীতলায় সিঁদুরের টিপ পরে বসে থাকে। সে আর করিম—এরা দুজন হল এ অঞ্চলটির মালিক। ওদের বললাম —ওর পিছনে থেকে খবর নিতে। খবর জগুয়া দিতে পারলে না—দিলে কেটি নিজেই। কয়েকদিন পর একদিন রাত্রে—ম্যাগীর চীৎকার আর হুটোপুটি শব্দ শুনে ছুটলাম ছাদে, দেখলাম একটা এ্যাংলোইণ্ডিয়ান কেটিকে নির্মম ভাবে ঘুষির পর ঘুষি মেরে চলেছে। আমি তাকে ধরলাম, সে আমাকে আক্রমণ করলে—লোকটা শক্তিমান কিন্তু মাতাল, আমি শক্তিতে তার চেয়ে কম ছিলাম না—তার উপর সেদিন পানীয় পান করেছিলাম মাত্রা রেখে। লোকটা কয়েক মিনিট পরেই শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে ভাল করে দেখলাম লোকটাকে, চেনা লোক, ফুটবলের মাঠে হামফ্রেও নাম-করা হাফব্যাক। মারামারিতে সিদ্ধহস্ত। আমার সঙ্গে মাঠে দু দশবার শক্তি-পরীক্ষা হয়ে গেছে; হামফ্রেও আমাকে চিনলে। বললে—বোস তুমি? তুমি এখানে? সে মার্জনা চেয়ে নেমে চলে গেল। আমি নীচে নামতে যাচ্ছি কেটি এসে আমার হাত ধরলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একটু মায়া হল বিমলবাবু। ঘরে এসে বসলাম। মেয়েটা হঠাৎ পরিষ্কার বাংলায় বললে—বোস তুমি এত নিষ্ঠুর কেন?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—তুমি বাংলা এত ভাল বলতে পার?

কেটি বললে—আমি কেটি নই বোস—আমি কেতকী। আমি কৃশ্চান কিন্তু ফিরিঙ্গী নই। আমি বাঙালীর মেয়ে।

সতের

হুলু বোস কাঠের দেওয়ালের ছোট জানালাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে—সে দিন ছিল শরৎকালের জ্যোৎস্নার রাত্রি। কেটি বললে—বোস, তুমি পাঁচ মিনিট বস। ম্যাগীর ঘরে গিয়ে কয়েক মিনিট পরে সে ফিরল—একেবারে বাঙালী মেয়ের পোষাকে। সাদা ব্লাউজ সাদা মিলের শাড়ী, পায়ে স্লিপার, কপালে কুমকুমের টিপ, মাথার চুলটা অবশ্য বব করা কিন্তু তাতেও সামনের দিকটায় নিখুঁত বাঙালী ছাঁদ। বললে—দেখতো বোস আমি কেতকী কি না?

চোখে আমার নেশা ধরে গেল। সাদা শাড়ীর বেষ্টনীর মধ্যে শ্যামলা রঙের চিরকেলে মিষ্টি বাঙালী মেয়ে।

কেটির সঙ্গে সে অভিসারের রাত্রি আমার চিরদিন মনে থাকবে। হুড খোলা ট্যাক্সী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ডায়মণ্ডহারবারে একটা দোলনায় বসে দোল খেতে খেতে ওকে বললাম—কেতকী তুমি এমন হলে কেন?

কেতকী বললে—আমার পোড়াকপাল বোস—আমি হতভাগী!

সম্ভ্রান্ত দেশী কৃশ্চান ঘরের মেয়ে। বাপ একটা বিলিতী ফার্মের একজন ছোট সাহেব। কেতকী তখন বি-এ পড়ছে। কুমকুমের টিপ পরে বেণী ঝুলিয়ে কলেজে যায়। কলেজের সভা সমিতির পাণ্ডা। সভা-সমিতিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে। গান গায়। নিজেই ও নিজেদের কয়েকজন অন্তরঙ্গের মধ্যে আইন করেছিল—বাংলা কথা বলবার সময় যে ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করবে—তাকে প্রতি শব্দের জন্য এক পয়সা জরিমানা দিতে হবে। সেই সময় হঠাৎ ঘটল এক কাণ্ড। ওদের কলেজের একটা অনুষ্ঠানে এলেন ছোটলাট-মহিষী। সেপাই এল,

সান্ত্রী এল, তাদের সঙ্গে এল একজন তরুণ ইংরেজ পুলিশ কর্মচারী। আই-পি। লাটসাহেবের মেম যাবেন—দুধারে পাহাড়া পড়েছে, পরিষ্কার পথ, সেই পথে একটি মেয়ে ব্যস্ত ভাবে ঢুকে কোন কাজে যাচ্ছিল। ছোকড়া সাহেব—তার হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিলে। মুহূর্তে কেতকী এসে তার সামনে দাঁড়াল। রূঢ়-ভাবে প্রতিবাদ করলে। একে বৃটিশ সিংহশাবক—তার উপর বৃটিশ ভারতের আই-পি, টেগার্টের উত্তরাধিকারী—সে কালো মেয়ের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করবে কেন? সে ওকেও দিলে টেনে সরিয়ে। কেতকী চীৎকার করে বললে—এ অপমানের প্রতিবাদে আমরা এ সভা ছেড়ে চলে যাব। এস, সব বেরিয়ে এস। বেরিয়ে কেউ গেল না। কালটা তখন মেয়েদের পক্ষেও ভয়ঙ্কর হতে সুরু করেছে। বীণা দাস কনভোকেশনে গুলী ছুঁড়েছে। প্রীতিলতা—চাটগাঁয়ে গুলী খেয়ে মরেছে, মেয়েদের জন্যে জেলখানায় পলিটিক্যাল ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েও সকলে মাথা হেঁট করে যে যার জায়গায় বসে রইল; তাদের চোখের উপর সাদা পোষাকে বাঙালী আই-বি বাবু নাম টুকবার জন্যে খাতা পেন্সিল বের করেছে—একা কেতকীই বেরিয়ে এল।

কেতকীর বাপ চটলেন। বললেন—আমরা কৃশ্চান সমাজ নিরপেক্ষ রয়েছি। না থেকে আমাদের উপায় নেই। তুমি এ কি করে এলে?

কেতকী বললে—এই অপমান সইতে হবে?

—নিশ্চয় না। তার প্রতিকার হত। আমরা সভা করে এর প্রতিবাদ করতাম।

কেতকী এ কথার কোন উত্তরই দিলে না। বাপের দিকে একবার বিশ্রী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল রাস্তার দিকের বারান্দায়। বাপ পিছনে পিছনে এসে বললেন—তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায় ?

—আই-বি আপিসে। ডি-আই-জির কাছে নিয়ে যাব। আমাদের বড়সাহেব একটা চিঠিও দিয়েছেন। এ্যাপলজি চাইতে হবে তোমাকে।

কেতকী বললে—না।

—না ? জানো এর ফল কি হবে ?

কি ফল হবে সে কল্পনা করতে হল না ; ঠিক সেই নাটকীয় মুহূর্তটিতেই একখানা মোটর এসে দাঁড়াল ওদের বাড়ীর সামনে। সেই মোটর থেকে নামল সেই তরুণ বৃটিশ সিংহশিশু।

বাপ ব্যস্ত হয়ে নেমে গেলেন। কেতকীর বুকটা মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল, কিন্তু সে নিজে স্থির দৃঢ় করে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে। ধীর পদক্ষেপে সে ঘরে ঢুকল। প্রতীক্ষা করে রইল—পুলিশের আহ্বানের। আহ্বান এল, বাপ হাসিমুখে ব্যস্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকে বললেন—কেটি শিগগির ! শিগগির ! কাপড়টা পাল্টে মাথাটা একটু আঁচড়ে আয় মা। মিষ্টার মরিসন এসেছেন তোর সঙ্গে দেখা করবেন, ক্ষমা চাইবেন।

কেতকী কাপড় পাল্টালে না, চুল আঁচড়ালে না, সে সেই পোষাকেই এল। বিদ্রোহিনীর মন এবং রূপ নিয়েই এল। মরিসন উঠে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা করে সবিনয়ে বললে—আমি সেদিন অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করেছিলাম। আমি জানতাম না যে আপনি কৃশ্চান। আমি ভেবেছিলাম কোন হিন্দু মেয়ে, যারা নাকি আজকাল সন্ত্রাস-বাদীদের দলভুক্ত।

কেতকী তিক্ত হাসি হেসে বললে—কিন্তু তারাও মেয়ে। প্রাপ্য সম্মান তাদেরও প্রাপ্য।

মরসিন ওদিক দিয়েই গেল না সে বিনীত ভাবেই বললে—আপনি বিশ্বাস করুন মিস্ চৌধুরী, আমি অত্যন্ত লজ্জিত। কর্তব্য বড় কঠোর ! সকল সময়ে মেজাজ ঠিক রাখা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত

কঠিন। আমরা পুলিশের চাকরী করি কিন্তু আমরাও মানুষ। কঠোর পরিশ্রম, নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করা—এ যে কি বিরক্তিকর আপনি অনুমান করতে পারবেন না মিস্ চৌধুরী। আর আমরা কি করব? হিন্দু মেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী—তারা কনভোকেশনে গুলী ছোঁড়ে। হয় তো এমন মেয়ে হাজারে একটা কিন্তু আমাদের নজর রাখতে হয় হাজার জনের উপরেই। হাজার জনের যে কেউও একজন হতে পারে।

কেতকীর বাপ মরিসনের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কেতকীর মা চা কেক টোষ্ট ডিম এনে টেবিলের উপর সাজিয়ে দিলে। মরিসন বললে—মিস্ চৌধুরী ক্ষমা না করলে আমি খাব না।

কেতকীকে ক্ষমা করতে হল। শুধু তাই নয় ওই এক প্লেট থেকে খাবারের অংশ নিতে হল। মনে মনে স্বীকার করতে হল মরিসনের যুক্তিকে। এমন মেয়ে হাজারে হয়তো একটা কিন্তু ওদের যে নজর রাখতে হয় হাজার জনের প্রত্যেকের উপর, সন্দেহ করতে হয় প্রত্যেককে। হাজার জনের যে কেউ ওই একজন হতে পারে।

মরিসন গল্প বলে আসর জমিয়ে তুললে। স্বল্পকালের পুলিশ জীবনের কয়েকটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার গল্প বললে সে। চমৎকার গল্প বলতে পারে তরুণ পুলিশ কর্মচারীটি! শুধু তাই নয়—পরদিন সন্ধ্যায় মরিসন পুলিশের পোষাকে না এসে সাধারণ ভদ্রলোকের পোষাকে ওদের বাড়ী এসে প্রমাণ করে দিলে সে প্রিয়দর্শন তরুণ।

মরিসন সেদিন অকপটে স্বীকার করে গেল কেতকীর মত তেজস্বিনী মেয়ে সে বিলাতে খুব কম দেখেছে। এবং তার এই তেজোদৃপ্ততার মধ্যে এমন একটি মনোমুগ্ধকর রূপ আছে যে রূপ অপার্থিব।

ভদ্রভাবে একটু লজ্জার সঙ্গেই বললে—মিস্ চৌধুরী, আশা করি আমার কথার কোন অন্যায় অর্থ আপনি করবেন না। বারবার

আমার মনে হয়েছে আমি যদি চিত্রকর হতাম তবে আপনার রূপের সেই মুহূর্তের ছবি এঁকে রাখতাম।

ভাদ্রমাসের বর্ষণমুখর রাত্রির সদ্যফোটা কেয়াফুলের মতই কেতকী স্নিগ্ধ মনোরমা হয়ে উঠল।

তারপর? তারপর কেতকী সাজলে কেটি।

চুল ছাঁটলে বব করে। লিপষ্টিক রুজ পাউডারে বেশভূষার ভঙ্গিতে সে পুরোদস্তুর মেমসাহেব হয়ে উঠল। ইংরাজীতে কথা বলতে সুরু করলে, কেটির মা-বাপ আশান্বিত হয়ে উঠলেন মরিসনের প্রত্যাশায়। মরিসনের সঙ্গে চৌরঙ্গীপাড়ায় ঘুরতে লাগল কেটি।

হঠাৎ মরিসন দীর্ঘকালের ছুটি নিয়ে একদা জাহাজে চেপে বসল। সকলের অজ্ঞাতসারেই অবশ্য। কেটিরও অজ্ঞাতসারে। কেটি তখন অন্তর্বত্নী। সংবাদ যখন জানলে তখন তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

বাপ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবার, কেটির উপরেই ক্ষিপ্ত হলেন। মা কপাল চাপড়ালেন, গাল দিলেন মেয়েকে—মরে যা—মরে যা তুই।

কেটি গেল পুলিশের একজন বড় কর্তার কাছে, ইংরেজ বড়কর্তা। তিনি বললেন—দেখ আমাদের সব সংবাদ রাখতে হয়। তোমার এবং মরিসনের খবরও আমার অজানা নয়। কিন্তু মেলামেশা ঘোরাফেরা তো তোমার একা মরিসনের সঙ্গেই আবদ্ধ ছিল না মিস্ চৌধুরী। এমন কি বিখ্যাত মুসলমান পুলিশ অফিসার মিঃ সামসুদ্দিনের সঙ্গেও তোমাকে ট্যাক্সীতে ঘুরতে দেখেছে লোকে। তুমি না বলতে পার না।

কেটি পুলিশ-অফিসে সংজ্ঞাহীনের মত বসে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সে নীরবে উঠে চলে এল। প্রতিবাদ করে বললে না সামসুদ্দিনকে মরিসনই অনুরোধ করেছিল—তুমি অনুগ্রহ করে তোমার গাড়ীতে কেটিকে পৌঁছে দেবে? সামসুদ্দিন বলেছিল—আনন্দের সঙ্গে। কেটি রাজী হয় নি।

মরিসন বলেছিল—লক্ষ্মীটি। আমার কাজ রয়েছে। তুমি জান কেটি পুলিশের কত কাজ। গাড়ীতে সামসুদ্দিন তার অভিপ্রায় ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেও মুখের কথায় ব্যক্ত করতে সাহস করে নি। কেতকী সংযত ভাবে মহীমময়ীর মত বসেছিল।

তারপর ?

তারপর—গৃহত্যাগ। তারপর ভ্রূণহত্যা।

তারপর—আত্মগোপন করে নিষ্ঠুর আক্রোশে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মৃত্যু ওকে গ্রহণ করে নি। হাসপাতাল থেকে ফিরে এল। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল। আদালত ওর কাহিনী শুনে ওকে সতর্ক করে ছেড়ে দিলে।

তারপর ধাপে ধাপে পিছলে পড়ে কেটি এসেছে এইখানে। ম্যাগীর পাশের ঘরে।

কেটি সেদিন রাত্রে কেতকী হয়ে ফুটে উঠেছিল ডায়মণ্ড-হারবারের গঙ্গার কূলের কেয়াফুলের মত—জীবনে এ তার দ্বিতীয় দিন ফোটা।

সেদিন কেতকী দিলীপ বোসকে বলেছিল—তুমি কি আমাকে তোমার বাড়ীর দাসীর মত থাকতে দেবে ?

দুলু বোস বললে—বিমলবাবু, আমি ওকে বলেছিলাম—কেতকী, তুমি আমি এই মহানগরীর বলি। আমাদের ঘর বাঁধার নয়। আমাদের ঘর ভেঙ্গে মহানগরী বাড়ে।

মহানগরীর বলি। বিমলবাবু আমরা মহানগরীর বলি।

দুলু বোসের সেই কথা কটি বিমলের কানে অহরহ বাজতে লাগল। দুলু বোসের কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাস ছিল না, মুখের অভিব্যক্তিতেও না, সে বরং হেসেই কথাটা বলেছিল। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুলু বোসের কণ্ঠস্বর যেন করুণ থেকে করুণতর হয়ে উঠতে লাগল বলে বিমলের মনে হতে লাগল। শুধু

তাই নয়, ডুলু বোসের কথা কটি যেন মহানগরীর আকাশে বাতাসে কর্মমুখর কলকোলাহলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হল।

নীচে রিক্সাওয়ালাদের আড্ডায় বোধ হয় বচসা চলেছে; ক্রুদ্ধ চীৎকারের মধ্যে সে শুনতে পেলে ওই কথা! আমরা মহানগরীর বলি।

মেসের ঘরে গান ধরেছে—গানের ভাষা ভাল বুঝা যাচ্ছে না; চট্টগ্রামের ছেলে, কথায় চট্টগ্রামের টান বড় বেশী; তবে সুর শুনে মনে হয় কোন উদ্দীপনাময় গানের সুর। বিমলের মনে হল তার মধ্যেও ওই কথা কটি ধ্বনিত হচ্ছে। 'মহানগরীর আমরা বলি।'

এ পাশের বাঈজীদের ঘরে আজ ধনী অতিথি এসেছে। বিকেল বেলা থেকে সমারোহ পড়ে গেছে। হিন্দুস্থানী চাকরটা বিশবার এল উপরে, দোকান থেকে পান, জরদা, সিগারেট, বেলফুলের মালা, সোডা, লেমনেড, খাবার, বরফের চাঁই কিনে এনে ছাদের এই রান্নাঘর থেকেই ট্রে থালা বের করে সাজিয়ে নিয়ে গেল। সারেঙ্গী বাজছে তবলা বাঁধা হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে ঘুঙুর নাড়াচাড়া হচ্ছে; তার মধ্যেও ওই কথা।

মহানগরীর লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রবৃত্তির ক্ষুধার তৃপ্তি হেতু বলি চাই—এরা তাই! একটি ভাববিচলিত মুহূর্তে বিমলের মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই উপলব্ধি চীৎকার করে উঠল, তারই প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল কলকাতার কলরব কোলাহলের মধ্যে। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা। দিবা দ্বিপ্রহরে বিদেশ যাত্রার আয়োজন যখন প্রস্তুত—তখন অবুঝ বালিকা কন্যা এসে কাতর ভাবে বলল—যেতে দেব না, যেতে নাহি দিব। স্নেহকাতরতার পবিত্র বেদনায় মুহূর্তে পিতা শুনতে পেলেন ধরিত্রীর আর্তনাদ—যেতে নাহি দিব; তুচ্ছ তৃণটির জন্যও ধরিত্রীর যে বেদনাময় ক্রন্দন বিরাট বনস্পতির জন্যও ঠিক সেই ক্রন্দন। এই ক্রন্দন ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তির মধ্যে পরিধির মধ্যে আর কোন ধ্বনি নাই আর কোন

অভিব্যক্তি নাই। বিমলের কাছেও মহানগরীর সকল আয়োজন—সমস্ত পরিধির মধ্যে ঠিক তেমনি—আজ এই মুহূর্তে ওই কথাটিই অবিরাম ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

একটা গভীর যন্ত্রণায় সে যেন পঙ্গু হয়ে পড়েছে! মনে পড়ল বৎসর কয়েক আগে দেশে একদা রাত্রে গ্রামপ্রান্তে বাউড়ীপল্লীর মধ্যে প্রচণ্ড কোলাহল শুনতে পেয়ে ছুটে গিয়েছিল সেখানে; মদ খেয়ে নেশায় উন্মত্ত বাউড়ীদের ঝগড়া হচ্ছিল—লাঠি কাটারী দা নিয়ে ঝগড়া; ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করেছিল সে—তার ফলে একজন নেশায় উন্মত্ত বাউড়ী প্রতিপক্ষ ভ্রম করে তার গলা টিপে ধরেছিল। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল; সেই যন্ত্রণার কথা মনে পড়ল। সে ভেবে পেলে না কোথায় গেলে সে মুক্তি পাবে—শান্তি পাবে।

ভেবে পেলে না, তবু সে বেরিয়ে পড়ল। এখানে সামনে তার কেটির ঘর, পাশে ম্যাগী একটা কম-জোরের চিমনী জ্বেলে বসে আছে। কেটির ঘরে ইলেকট্রিক কনেকশন আছে কিন্তু ম্যাগীর ঘরে নেই। চিমনীর রক্তাভ আলো ম্যাগীর মুখের উপর পড়েছে, বার্ধক্যের রেখাজর্জর পাণ্ডুর মুখ ঘোলাটে চোখ। মনে পড়ে গেল কালীপূজার রাত্রি। কার্তিক মাসের শেষ রাত্রে হাড়িকাঠে বাঁধা বলিগুলির কথা। পাটকাঠির লাল আলোর সামনে ভিজে গায়ে অন্যান্য বলির মধ্যে বলির মেষটা ঠিক এমনি চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত!

সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। রাজপথের উপর হঠাৎ নজরে পড়ল একটা ট্যাক্সী। ট্যাক্সীতে অরুণা আর পিনাকী। হাসি লেগে রয়েছে দুজনের মুখেই। দুজনেই মহানগরীর প্রসাদ পেয়েছে। বিমল মনে মনে মহানগরীকে প্রণাম জানায়।

চৈতালী ঘূর্ণি

অনাবৃষ্টির বর্ষার খররৌদ্রে সমস্ত আকাশ যেন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে; সারা নীলিমা ব্যাপিয়া একটা ধোঁয়াটে কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব; মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বাতাস, হুহু করিয়া একটা দাহ বহিয়া যায়।

গোষ্ঠ মাঠের কাজ সারিয়া ঘরের দাওয়ায় কোদালখানি রাখিয়া কলিকায় তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল; টানিয়াই যায়, আর কি যেন ভাবে।

পত্নী দামিনী হাতাখানা পুড়াইয়া ডালের মধ্যে সশব্দে ডুবাইতে ডুবাইতে কহিল, কি ভাবছ বল তো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গোষ্ঠ কহে, হুঁ, ভাবছি—ভাবছি কি জান, তুমিও তো অনেক দিন এসেছ, বল দেখি, গাঁ-খানা কি ছিল আর কি হ'ল?

দামিনী কহে, তা সত্যি বাপু, সেই গাঁ—সবারই ঘরে গোলাভরা ধান, যাত্রা, মচ্ছব কত; বছর বছর নটবরের যাত্রা হয়েছে; আর এখন আজ খেতে কারু কাল নাই।

গোষ্ঠ বলে, জান আজ মাঠ থেকে ফিরতে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে গা শিউরে উঠল। সমস্ত গাঁটা যেন আবছা ধোঁয়াতে ছেয়ে গিয়েছে, নদীর বুকে বাতাসে তপ্ত বালি হুহু করছে, নদীর ওপরেই শ্মশানের ছাই উড়ছে, শেয়াল কুকুর শকুনি চেঁচাচ্ছে; গাঁয়ের মাঝ থেকে একটা সাড়া নাই কারু, যেন সব ম'রে গিয়েছে; আমার বুকখানা কেমন করে উঠল বাপু।

দামিনী ভয়ে শিহরিয়া উঠে; তরুণীটির সদাহাস্যময়ী মুখখানি মলিন হইয়া উঠে, উহারও তরল মনের বুকে ভাবনার বোঝা চাপিয়া বসে।

সত্যই বিভীষিকা জাগে।

গ্রামে ঢুকিতে প্রথমেই একটা নদী।

নদী ঠিক নয়, একটা মরুভূমি, লম্বা একটানা একটা বালুকার প্রবাহ, জল নাই ; অন্তত বৎসরের মধ্যে আটটি মাস জলধারা বয় না, বয় একটা অদৃশ্য অগ্নিলীলা, খররৌদ্রে হুহু করে মরীচিকার ধারা।

আর ওই মরীচিকা, ওই নৃত্যশীল অদৃশ্য অগ্নিধারা, ও তো মিথ্যা বা মায়া নয়, ও শুষ্কবক্ষ মাটির তৃষ্ণা ; নিদারুণ রুক্ষতায় হাহা করে।

নদীর পরই চরের উপর শ্মশান।

এখানে অগ্নিলীলা অদৃশ্য নয়, রাশি রাশি অঙ্গারে, চিতার লকলকে রক্তরাঙা বহ্নিশিখায় বাস্তবে মূর্ত।

জীবন্তের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু উত্তাপ, অগ্নি, অঙ্গার, কঙ্কাল, শব।

জীবন্তের মধ্যে, আকাশের বুক হইতে তীক্ষ্ণ চীৎকারে শকুনির পাল শবগুলার বুকে গলিত দেহের লোভে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বীভৎস দুর্গন্ধময় বিশাল ডানা দুইখানার ঝাপটে এ উহাকে তাড়ায়, ও উহাকে তাড়ায়।

আর আসে শৃগালের দল, শবগুলার বুকে পা রাখিয়া রক্তহীন মাংসের পিণ্ডে দাঁত বসাইয়া কুকুরগুলা গোঙায়—গোঁ-গোঁ।

শৃগালের দল দূরে আর একটা শবের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। তীক্ষ্ণ রোমাঞ্চকর কোলাহলে চরখানা মুখর হইয়া উঠে। গাছের ছায়ায় পূর্ণ-উদর তন্দ্রাচ্ছন্ন কয়টা কুকুর শবগুলার পানে চাহিয়া থাকে পূর্ণ উদর, লোভের অন্ত নাই, লোলুপ লোভে মুখগুলা হাঁ করিয়া থাকে, লম্বা করকরে জিভগুলা ঝুলিয়া পড়ে, আর তাহাতে অনর্গল গড়ায় লালসার লালা।

বায়ু, যে বায়ু মানুষের জীবন, সেও এখানে ভয়াল, সেও পাগলের মত অবিরাম আপন অঙ্গে মাখে চিতার ছাই, গলিত শবের দগ্ধ দেহের বিকট বীভৎস দুর্গন্ধ।

শ্মশানের পরই খান তিরিশেক মাঠ, তাহার পর গ্রাম। গ্রামের

প্রান্তে শ্মশানটা, যেন জীবনের রাজ্যে মরণের অভিযান; পল্লীটার দ্বারপ্রান্ত অবরোধ করিয়া যেন মরণের কটকথানা বসাইয়াছে।

মাঠের ফসল শ্মশানের প্রান্ত পর্য্যন্ত জাগিয়া উঠে, কিন্তু নীচে শুষ্ক নদীর টানে মাঠের রসটুকু চোঁয়াইয়া ওই রাক্ষসী বালুকা-প্রবাহের বুকে মিশিয়া যায়।

কঠিন রসলেশহীন মাটির বুকে শীর্ণ পাংশুটে গাছগুলি তবু অতি কষ্টে বাঁচিয়া থাকে, যেন শুষ্কবক্ষ কঙ্কালাবশেষা নারীর সন্তান সব; মরণের শোষণে রসময়ী ধরণী মা, সেও বুঝি বন্ধ্যার মত শুষ্কবক্ষা হইয়া উঠিল। বাতাস বয়, সঙ্গে সঙ্গে চিতার ছাই উড়ে; এদিকে গাছগুলা দোলে, উহাদের পাতায় ছাইগুলা জড়াইয়া যায়; যেন মুমূর্ষু জীবন মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করে, শ্মশানটাকে অগ্রগমনে বাধা দেয়।

অন্ধকারের মাঝে প্রেত নাচে; তাই অন্ধকারের মাঝে জীবন্ত মানুষকেও প্রেত বলিয়া ভ্রম হয়, আর প্রেতত্ব পায়ও মানুষ; তাই অন্ধকারের মাঝেই মানুষ চোর, মানুষ ঘাতক। বাহিরের ওই মরণের রাজ্যের ছায়ায় গ্রামখানাও ঠিক যেন মৃতের রাজ্য।

মানুষ তো নয় সব, হাড়-চামড়া ঝরঝর করে, কঙ্কালসার মানুষ অতি ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়; বাড়িঘরের অবস্থাও তাই, দেওয়ালগুলার লেপন খসিয়া গিয়াছে, যেন পঞ্জরাস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে; চালও তাই, খড় বিপর্য্যস্ত, কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে। অবরুদ্ধ জীবন্তের রাজ্যের টুকরাখানা বুঝি আর থাকে না।

কে রক্ষক?

রক্ষক ভগবান কত দূরে, কে জানে!

লোকে ভগবানকে ডাকেও।

কিন্তু সে ডাক বুঝি ততদূর পৌঁছায় না।

কিংবা সে বুঝি অতি নিষ্ঠুর।

তবু উচ্চকণ্ঠে ওরা প্রতি সন্ধ্যায় তাকে ডাকে—

"ও তার নামের গুণে গহণ বনে, মৃত তরু মুঞ্জরে,
নামের তরী বাঁধা ঘাটে ডাকলে সে যে পার করে।"

ওই বিশ্বাসটুকুর আশ্বাসেই উহারা বাঁচিয়া আছে, ওইটুকুই জীর্ণ স্বর্ণসূত্রের মত এই জীবনের মালাখানি আজও গাঁথিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ও আশ্বাসও আজ অতি ক্ষীণ, অতি দুর্বল; তাই উহারা মুখে বলে, হরি হে, যা কর। কিন্তু মন ঠিক ওই কথাটা মানিয়া লইতে চায় না, সে কবিরাজের 'ডাক্তোরখানা' পর্য্যন্ত ছুটায়, বটিকা পাঁচন মুখ খিঁচাইয়া গিলায়।

বাঁচিলে দেবতার পূজা দেয়; না বাঁচিলে বলে, পাথর, পাথর, দেবতা-ফেবতা মিছে কথা।

মোট কথা, ভগবানকে উহারা মানে, কি মানে না, সেটা আজ একটা অমীমাংসিত সমস্যা।

ডাকিতেও মন চায় না, না ডাকিলেও মন খুঁতখুঁত করে।

উপলব্ধ সত্য আর যুগযুগান্তের সংস্কারে এখানে প্রবল দ্বন্দ্ব; ব্যর্থতায় বুকের ভিতর ক্ষোভ জাগিয়া উঠে—সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ঝ'ড়ো হাওয়ার মত।

কিন্তু সে চৈত্র-প্রান্তরের ঘূর্ণির মতই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী, উঠিয়াই মিলাইয়া যায়।

শ্মশানখানা যেন দিন দিন আগাইয়া আসিতেছে। সুদূর আফগানিস্থানের কাবুলীর দল শকুনির মত তীক্ষ্ণ চীৎকারে খাটো খাটো ভাঙা বাংলায় হাঁকে, এ গুণ্ঠা মুড়ার, আরে এ—

দামিনীর তখন ওই বিভীষিকাময়ী ভাবনায় দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে কহিতেছিল, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে, তোমার হ'ল তাই। গাঁয়ের ভাবনা ভাবতে লাগলে—

সহসা বাহির হইতে ওই কাবুলীওয়ালার ডাক।

দামিনী কহে, ওই নাও, যা বলছিলাম তাই, এখন কি করবে কর।

বাহির হইতে হাঁক আসে, এ গুষ্ঠা, আরে এ—! সঙ্গে সঙ্গে দরজায় লাঠিগাছটা ঠোকে, ঠকঠক।

গোষ্ঠের দেশের ভাবনা কোথায় উবিয়া যায়, হুঁকা টানিতে টানিতে সে আঁতকাইয়া উঠে।

আবার লাঠি ঠোকার শব্দ হয়।

গোষ্ঠ অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া কোণে লুকাইয়া বসে, হুঁকা পর্য্যন্ত টানে না।

দামিনীও সঙ্গে সঙ্গে যায়; দামিনীর বুকখানা গুরগুর করিয়া উঠে, বলে, কি হবে গো?

গোষ্ঠ ফিসফিস করিয়া বলে, বল, ঘরে নাই।

দামিনী চাপা গলায় তাড়াতাড়ি বলিল, না না, আমি পারব না। গোষ্ঠ হাতজোড় করিয়া মিনতি করে, হেই গো, তোমার পায়ে পড়ি।

দামিনী স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তিরস্কার করে, ছি, কি বল তার ঠিক নাই; আক্কেলের মাথা খেয়েছ একেবারে?

ওদিক হইতে আবার হাঁক আসে, আরে এ গুষ্ঠা, হারামজাদা, বদমাশ, বাহার আসো।

গোষ্ঠ আবার কাকুতি করিয়া বলে, লক্ষ্মীটি, বল বল, নইলে বেটা আবার ঘরে ঢুকবে।

দামিনীর বুক গুরগুর করে, সে চাপা গলায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠে, তখন যে কাপড় কিনতে মানা করেছিলাম। ধারে পেলেই কি হাতী কিনতে হয়?

গোষ্ঠ বলে, সে তো তোমার জন্যই—

দামিনী জ্বলিয়া যায়, কিন্তু কিছু বলিবার আগেই দরজার মুখে নাল-মারা নাগরা আওয়াজ দিয়া উঠে।

দামিনী তাড়াতাড়ি ঘরের দরজার শিকল দিয়া বাহিরে আসিয়া ঘোমটা টানিয়া মৃদুকণ্ঠে বলে, ঘরে নাই গো।

ভাঙা বাংলায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে কাবুলী কয়, আরে, তুমি কৌন্ আসো, তুম্‌হি—

দামিনী ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হয় না, তাড়াতাড়ি শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিতে চায়, দেখে ভিতর হইতে খিল আঁটা।

ওদিকে নাগরার আওয়াজ উঠানের বুক অবধি আগাইয়া আসে।

দামিনী ভয়ে এক পাশে সরিয়া দাঁড়ায়।

কাবুলী কয়, তুমি কৌন্ আসে? উস্কো কৌন্? জরু? বহু আসো?

দামিনী ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ।

কাবুলী কয়, তব তো তুম্‌হি টকা দিবিস; পন্‌রা টকা, পন্‌রা টকা, দশ আওর পান লিয়ে আন।

দামিনীর গলা শুকাইয়া যায়, তবু আর্ত্তস্বরে কহে, ঘরে নাই, আসুক।

কাবুলী দাঁত বাহির করিয়া বলে, তব তুম্ আসো, তুম্‌কো লিয়ে যাবে।

দামিনী ভয়ে চেঁচাইয়া উঠে।

কাবুলি হিহি করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়, আপন ভাষায় গোটা জাতটাকে গালি দেয়।

দামিনী কাঠ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকে, চোখ দিয়া জল পড়ে, তবু সে চোখ আগুনের মত জ্বলে।

কতক্ষণ পর দরজা খুলিয়া গোষ্ঠ বাহিরে উঁকি মারিয়া বলে, গিয়েছে বেটা শকুনি?

দামিনী কথা কয় না, চোখের জলের প্রবাহ দ্বিগুণ হইয়া বয়, মুখখানা কঠিন হইয়া উঠে।

গোষ্ঠ আড়-চোখে দামিনীর মুখপানে তাকাইয়া কয়, একদিন এমন ঠেঙান ঠেঙাব।

এই নির্লজ্জ আস্ফালন কানে আগুনের হল্কার মতই ঠেকে, সে মাটির উপরেই সজোরে ফুৎকার নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

ঘরের ভিতর পাঁচ বছরের ছেলেটা জ্বরে ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে চেঁচায়, ক্ষিঁধে লেঁগেচে—এঁ—এঁ—এঁ—।

দামিনী তীব্রকণ্ঠে বলে, মর, মর, আমার হাড় জুড়োক।—বলিয়া একথালা মুড়ি সশব্দে, ছেলেটার মুখের কাছে নামাইয়া দিয়া আবার বলে, নাও, গেলো, গিলে যমের বাড়ি যাও।—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চোখ মোছে, কিন্তু সে জল মুছিয়া শেষ করিতে পারে না।

গোষ্ঠ সভয়ে কহে, মুড়ি কেন? সাবু সাবু—

দামিনী কথা কাড়িয়া বলে, সাবু আমি রোজগার ক'রে আনব, নয়?

গোষ্ঠ চুপ করিয়া যায়, ক্ষণেক পর আপন মনেই কয়, তা পুরনো জ্বর বটে, তা খা, দুটো মুড়ি খা। কত আর সাবু খাবি?

ছেলেটা কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট হয় না, মুড়ি ছড়াইয়া ফেলিয়া চেঁচায়, ভাঁ—আঁ—আঁ—ত খাঁ—আ—বো—ও—ও—

চীৎকারে বিরক্ত হইয়া গোষ্ঠ উঠিয়া যায়।

কোথায় যাইবে? নিরানন্দ এ পুরীতে কোথায় আনন্দ? গোষ্ঠ মাঠের পথ ধরে, ওই হোথায় গিয়া আশার আলো নজরে ঠেকে, শেষ আষাঢ়ের সবুজ মাঠ, কচি কাঁচি লকলকে ঘন সবুজ ফসলের ডগাগুলি হেলে দোলে আর যেন কত কথা বলে, ধানের ডগাগুলি যেন বলে—

"ধান, ধান, ধান—ধানে রাখবে জান,
ঋণ শোধিব খাজনা দিব
ধানে রাখবে আমার মান।
নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন
এই যেন খেতে পাই জন্ম জন্ম।"

গোষ্ঠ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ঘন সবুজ ধানের পানে তাকাইয়া থাকে। ইচ্ছা করে, এইখানেই দিবারাত্রি কাটাইয়া দেয়।

ওদিক হইতে আখের পাতাগুলি ইশারা করিয়া দুলিয়া দুলিয়া যেন ডাকে, গোষ্ঠ আগাইয়া চলে, আর আপন মনেই গুনগুন করিয়া বলে—

"কাজুলি রে কাজুলি,
তোর পায়ে এবার আমার
বউ পরাবে মাদুলি।"

তকতকে নিড়ানো ক্ষেতে বসিয়া গোষ্ঠ বিনা কাজে হাতে করিয়া ভুরার মত গুঁড়া মাটি পেষে, সারা অঙ্গে মাখিতে ইচ্ছা করে।

মাঠের আলপথে ভিন্ গাঁ হইতে দোকান সারিয়ে ফিরিতেছিল ভোলা ময়রা। সে কহিল, কি গোষ্ঠ, রোদে বসে কি হচ্ছে? সত্য কথা বলিতে কেমন লজ্জা করে, আমতা আমতা করিয়া বলে, এই খুড়ো, ব'সে আছি।

ভোলা খুড়া কহে, সে আমলের ক্ষেপা মোড়লের মত ধান-বাড়াচ্ছিস নাকি? ক্ষেপা মোড়ল কি করত জানিস? দিনে, দুপুরে, সন্ধ্যেয় বাড়ির কাজে খোলসা পেলেই মাঠে এসে নিজের ধানের ডগায় হাত দিয়ে বলত, কন্—কন্—কন্,—ওঠ্—ওঠ্—, কন্—কন্ ক'রে বেড়ে ওঠ্। আর পরের ধানের মাথায় হাত দিয়ে নীচে দিয়ে নামিয়ে বলত, কন্—কন্—কন্, ব'সে যা, নেমে যা।

গোষ্ঠ গল্প শুনিতে শুনিতে ভোলা খুড়ার সঙ্গ ধরিয়াছিল। গোষ্ঠ কহিল, খুড়ো, ক্ষেপা মোড়লের অবস্থা বুঝি ভাল ছিল না? খুড়া চ্যাঙারিসুদ্ধ মাথা ঘুরাইয়া গোষ্ঠর পানে তাকায়; তারপর বলে, হ্যাঁ, অবস্থা তার ভাল ছিল না, তবে আজকালকার সবার চেয়ে ভাল ছিল।

গোষ্ঠ কহে, আচ্ছা খুড়ো, সে সব ধান ধন গেল কোথায় বল দেখি? ঠিক পাশের আখের ক্ষেতটার ভিতরে শব্দ উঠে মড়মড়

খসখস ; গোষ্ঠ কহে, কে, আখ ভাঙছে কে রে, কে ? কচি আখ ভাঙে কে ?

ভিতর হইতে সে লোকটা হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠে, তো বাপ রে হারামজাদা।

গোষ্ঠ কিল খাইয়া কিল চুরি করে, গালিটা নির্বিবাদে হজম করিয়া চলে, গতিটা একটু বাড়াইয়া দেয়, আপন মনেই বলে, বাঘে ধান খায়, তো তাড়ায় কে ? ভাঙ বাবা, জমি শুদ্ধ, তুলে নিয়ে যা।

যে লোকটা আখ ভাঙিতেছিল, সে জমিদারের চাপরাসী। খুড়া খানিকটা আগাইয়া আসিয়া কহে, দেখলি গোষ্ঠ, ধন ধান গেল কোথা ? ওই দশজনে লুটেই খেলে।

গোষ্ঠ ও কথাটার উত্তর দেয় না, আপন মনেই বলে, দেবতা-ফেবতা মিছে কথা—মিছে কথা খুড়ো, ওসব আঁকা চোখে ফাঁকা চাউনি, দেখতে কেউ পায় না।

মোড় ফিরিবার মুখে খুড়া কহে, চ্যাঙারিটা একবার নামিয়ে ধর তো গোষ্ঠ।

গোষ্ঠ চ্যাঙারিটা নামাইয়া ধরিলে একমুঠা বাতাসা লইয়া খুড়া গোষ্ঠর আঁচলে দিয়া বলে, ছেলেটাকে দিস। ক্ষণিকের এই ক্ষীণ সহানুভূতিতে গোষ্ঠের প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

* * *

ওদিকে ছেলেটা ভাত খাইবার বায়নায় কাঁদিতে কাঁদিতে নেতাইয়া পড়ে। দামিনী দাওয়ার উপর কাঠের মত বসিয়া ছিল, সহসা সে ছেলেকে কোলে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরে।

চোখের প্রবাহ প্রবল হয় ; মনে মনে শতবার ষষ্ঠীকে স্মরণ করিয়া ছেলের মাথায় সে হাত বুলায়।

ছেলেটা তবু কাঁদে,—ভাঁ—আঁ—ত খাঁ—বো—ও।

স্নেহসর্বস্বা অশিক্ষিতা নারীর মন বলে, আহা, দুটি খাক।

পুরনো জ্বরে তো লোকে খায়। ভাত খাইয়া ছেলেটার ক্ষুধার কান্না থামে, কিন্তু যাতনার কান্না বাড়ে, বমি হয়, জ্বর বাড়ে।

মায়ের মন সেই গাল দেওয়ার কথাটাই স্মরণ করে; ভাতের কথাও মনে হয়, কিন্তু সে যে এত কয়টি, মাত্র দুইটি গ্রাস।

গালটাই মনে প্রবল হইয়া জাগে, দেবতার উদ্দেশে মাথা ঠুকিয়া কপালটা ফুলিয়া উঠে।

সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজকেও স্মরণ করা হয়।

কবিরাজ ডাকিবার জন্য দামিনী ক্রমে ব্যাকুল হইয়া উঠে।

কিন্তু সে যে নারী! ডাকিবে যে, সে কোথায় কোন্ আড্ডায় একটু তামাকের আশায় স্ত্রী-পুত্র সব ভুলিয়া বসিয়া আছে।

ব্যাকুল মন সঙ্গে সঙ্গে বিষাইয়া উঠে, সে বিষের ঘোরে ভাল মন্দ জ্ঞান যেন সব লোপ পায়।

তাই যাহাকে সে দূরে রাখিতে চায়, যাহার পরম দাস্যভাব সে ঘৃণা করে, সেই সুবল দাসের কাছে ছুটিয়া গিয়া হাতের পৈঁছা জোড়াটি খুলিয়া দিয়া কাকুতি করিয়া কহিল, আমাকে দুটি টাকা দাও, আর কবরেজকে একবার ডেকে দাও।

তরুণ সুবল মুগ্ধ দৃষ্টিতে দামিনীর মুখপানে তাকাইয়া আবার সলাজে মুখ নামাইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, পৈঁছা তুমি রাখ, টাকা আমি দিচ্ছি।

বিষের ঘোরের মাঝেও যাতনার দাহে চেতনা ফিরিয়া আসে, সুবলের সহানুভূতি দামিনীর বুকে সেই দাহের কাজ করিল, দামিনী ঝাঁঝাইয়া উঠিল, শুধু তোমার টাকা নোব কেন আমি?

সুবল বিবর্ণ হইয়া অনুনয় করিয়া কহিল, সধবা মানুষ তুমি, খালি হাতে—। সুবলের জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল।

জীর্ণ কাপড়ের পাড়খানি ঝাঁঝের মুখে এক হাত ছিঁড়িতে, তিন হাত ছিঁড়িয়া হাতে জড়াইয়া কহিল, এই আমার সোনার কাঁকন, তোমার পায়ে পড়ি মহান্ত; এ দুটো নিয়ে আমাকে টাকা দাও,

ছেলেটা বুঝি আর বাঁচে না। দীপ্ত কণ্ঠস্বর স্নেহের দুর্বলতায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, চোখের কোলে কোলে জল টলমল করিয়া উঠিল।

সুবল ব্যস্ত হইয়া পৈঁছা জোড়াটি ঘরে তুলিয়া টাকা আনিয়া দামিনীর হাতে আলগোছে দিতে গেল, কিন্তু কেমন হাত কাঁপিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট টাকা দুইটি মাটিতে পড়িয়া গেল। সুবল লজ্জায় একরূপ ছুটিয়াই পলাইল, কহিল, কবরেজকে ডেকে আনি আমি।

ঘর-দ্বার সব খোলা পড়িয়া রহিল।

দামিনী শেষে দরজায় শিকলটা তুলিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিল।

মনটা কিন্তু কেমন ছি-ছি করিতেছিল।

একের লজ্জা অপরকেও লজ্জিত করে যে সংক্রামক ব্যাধির মত; যাহাকে দেখে, তাহার লজ্জায় যে দেখে সেও লজ্জা পায়, হউক না কেন দ্রষ্টার মন ফুলের মত পবিত্র।

দামিনী ওই কথাই ভাবিতে ভাবিতে ফিরিতেছিল। বাড়ীর দুয়ারে তাহার চমক ভাঙিল একটা কাঁসার মত তীক্ষ্ণ উচ্চ কর্কশ কণ্ঠ শুনিয়া।

লোকটা উচ্চকণ্ঠে কহিতেছিল, ও চালাকি চলবে না হে বাপু, সুদের টাকা আমাকে মাস মাস মিটিয়ে দেওয়ার কথা, দাও, দিতে হবে।

লোকটা মহাজন।

দামিনীর সর্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

দামিনী ভাল ঘরের মেয়ে, পড়িয়াছিলও ভাল ঘরে।

গোষ্ঠর অবস্থা চিরদিনই এমন ছিল না, তাহার বাপের আমল পর্য্যন্তও গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গাই, পুকুর-ভরা মাছ—পল্লীর ঐশ্বর্য্য যা কিছু সবই ছিল।

কিন্তু সে শ্রী আর নাই, সব গিয়াছে।

থাকে কি করিয়া? মূল মরিলে কি ফুল বাঁচে!

পল্লীর শ্রীই যে গিয়াছে।

এখন অভাবের মাঝে শুধু অতীতের প্রাচুর্য্যের স্মৃতিই সম্বল; ছেলেকে পর্য্যন্ত ওই স্মৃতিকথার মালায় সান্ত্বনা দেয়—

"আয় চাঁদ আয় আয়, গাই বিয়োলে দুধ দোব,
ভাত খেতে থালা দোব, রুইমাছের মুড়া দোব,
আম-কাঁঠালের বাগান দোব, চাঁদের কপালে
একটি টিপ দিয়ে যা।"

* * *

দামিনী এ বাড়ীতে আসিয়াছিল আট বছরেরটি; আজ বয়স তাহার বাইশ। ইহারই মধ্যে এই সংসার কতরূপেই না তাহার চোখের উপর ফুটিল। প্রথম প্রথম এ গৃহ কারা মনে হইয়াছে, মায়ের জন্য কাঁদিয়া দিন গিয়াছে; তারপর এ সংসার কৈশোরের প্রারম্ভে যেন পুষ্পিত উদ্যান, স্বামী কত ভালবাসিয়াছে, কত গোপন উপহার, মনসার মেলায় গভীর রাত্রে ঘুমন্ত দামিনীর মুখে গরম বেগুনি গুঁজিয়া দেওয়া।

দামিনী জাগিয়া উঠিয়া কহিত, দূর।

গোষ্ঠ কহিত, আমি তো দূর, ওদিকে তো বেশ মুড়মুড় শব্দ উঠছে।—বলিয়া ঠোঙা সুদ্ধ সম্মুখে ধরিত।

দামিনী হাসিয়া ফেলিত।

গোষ্ঠ সম্মুখে মেলিয়া ধরিত কত উপহার—ফিতে, চিরুনি, তেল, আয়না, সাবান।

দামিনী আয়নাখানা তুলিয়া মুখের সামনে ধরিত।

গোষ্ঠ হাসিয়া কহিত, নিজের রূপ কি নিজে দেখে, পরকে দেখাতে হয়।

দামিনীর মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিত, কানের পাশ পর্য্যন্ত গরম। সে আয়নায় মুখখানা ভাল করিয়া ঢাকিত।

গোষ্ঠ কহিত, রাত্রে আয়না দেখলে কি হয় জান তো?

কি ?

কলঙ্ক।

দামিনী চট করিয়া আয়নাখানা ঘুরাইয়া গোষ্ঠর মুখের সামনে ধরিত।

গোষ্ঠ কহিত, আমি চোখ বন্ধ করেছি।

দামিনী গলা জড়াইয়া ধরিয়া চোখ খুলিবার জন্য চেষ্টা করিত। শেষে মিনতি করিয়া কহিত, লক্ষ্মীটি চোখ খোল।

গোষ্ঠ চোখ খুলিলে দামিনী কহিত, এইবার ?

কি ?

তোমারও কলঙ্ক হবে।

আমরা পুরুষ, সোনার গহনা, কলঙ্ক আমাদের হয় না, বিপদ তোমাদের।

দামিনী হাসিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া কহিত, ভারি বুদ্ধি! ওই জন্যে বুঝি আয়না দেখালাম ?

তবে কি ?

কলঙ্ক হয় তো তোমার সঙ্গেই হবে, তোমাকে সাথী ক'রে রাখলাম।

দূর, আমি তোমার আয়ান ঘোষ।—গোষ্ঠ ইঙ্গিত করিয়া হাসিত।

দামিনী আবার রাঙা হইয়া কহিত, চোরের মন পুঁইমাচাতে, কলঙ্ক বুঝি আর কিছু হয় না ?

কি শুনি ?

এই লোকে বলবে, অমুক কি মেগো, আর মাগীও কিছু জানে বাপু, অত বড় জোয়ানটাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে গো!

তা কর নি নাকি ?—বলিয়া গোষ্ঠ পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইত।

সে এক দিন গিয়াছে। এখনও সেদিন মনে পড়িলে দামিনীর চোখ ছলছল করে।

তারপর এই ভরা যৌবনেই অভাবের দাহে সুখের ঘর পুড়িয়া গেল। উত্তাপে বুঝি প্রেমের স্রোতও শুকাইয়া গেল।

গোষ্ঠও মনের মত কিছু দিতে পারে না বলিয়া মরমে মরিয়া থাকে, অমনোমত কিছু দিতেও মন উঠে না। দামিনীও তাহা বুঝে, তাই সেও কিছু চায় না।

কিন্তু তাহাও গোষ্ঠর প্রাণে বাজে, সে ক্ষুণ্ণস্বরে কয়, কখনও দেখলাম না যে, কিছু চাইলে তুমি।

একমুখ হাসি ভরিয়া দামিনী কয়, বা, বেশ লোক তো তুমি, না দরকার হ'লেও চাইতে হবে? কি নাই আমার, সবই তো রয়েছে।

হাসিটি ছলনার সত্য, কিন্তু বড় সুন্দর, গোষ্ঠ অতৃপ্ত নয়নে মুখ-পানে চাহিয়া থাকে।

তারপর আপন মনেই নিজের সামর্থ্যের সঙ্গে দামিনীর অভাবের সূচী মিলাইয়া যায়, শেষে বাহির করে একখানা গায়ের কাপড়; কাবুলীর কাছে ধারে পাওয়া যাইতে পারে, তাই সে বলে, কই, গায়ের র‍্যাপার তো নাই তোমার?

দামিনী তাড়াতাড়ি কয়, না না, ও আমি গায়ে দিতে নারি; মাগো, যে সুড়সুড়ি! ও কিনো না তুমি।

গোষ্ঠ মানে না, কিনিয়া আনে।

দামিনী ঝগড়া করে, বললাম, এনো না।

গোষ্ঠ অপ্রস্তুতের মত কয়, রাগ কেন, আনলাম। আবার কখনও বা দুইটা আম, দুইটা কাঁঠাল কিনিয়া আনে, কিন্তু দামিনী তাহা খায় না, স্বামী-পুত্রকেই বাঁটিয়া দেয়।

গোষ্ঠ অনুযোগ করিয়া কয়, আমাকে কেন, তোমার তরে আনলাম।

এই স্নেহে দামিনীর চোখে জল আসে, তবু সে হাসিয়া কয়, তুমি খাও, আমার আছে।

গোষ্ঠ প্রতিবাদ করে, এ তো আমাকেই সব দিয়েছ, তুমি—

তাড়াতাড়ি কথাটা শেষ করিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে দামিনী বলিয়া উঠে, ও আমি খেতে পারি না।

সঙ্কোচে মন শুধু সঙ্কুচিতই হয় না, শঙ্কিতও হয়। গোষ্ঠও নিজের অমনোমত উপহারের জন্য শুধু সঙ্কুচিতই হয়, প্রত্যাখ্যানের শঙ্কায় শঙ্কিতও হইয়া থাকে। তাই সে ভাবে, এ অরুচি দামিনীর রসনায় নয়, তুচ্ছ বলিয়া তাচ্ছিল্যের অরুচি এ!

এ তাচ্ছিল্য মনে বড় লাগে, ক্ষোভে দুঃখে অন্তর মথিয়া বিষ ফেনাইয়া উঠে, গোষ্ঠ মুখের আহার সাব-ডোবায় ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া যায়। দামিনীর মনে হয়, আম ফেলিয়া দিল না, আমাকেই ফেলিয়া দিল। চোখে জল আসে, অন্তর জ্বলিয়া যায়।

এমনই নিরন্তর দাহে উত্তপ্ত অঙ্গার বুকের মাঝে স্তূপ বাঁধিয়া উঠে, শ্মশানের অঙ্গার-স্তূপের চেয়ে কম নয়।

এই অশান্তির মাঝে আর এক দারুণ অশান্তি জুটিয়াছিল, প্রতি-বেশী সুবল দাস। আট বছরের বউ দামিনী যখন এ বাড়ী আসে, তখন তাহারও ঠিক অমনই বয়স।

আট বছরের বউ ঘোমটা টানিয়া বসিয়া আছে, ফুটফুটে ছেলেটি আসিয়া মুখের ঘোমটা খুলিয়া ডাকিল, বউ!

দুইজনেই ফিক্ করিয়া হাসিল।

তারপর। ছেলেতে মেয়েতে মিতালি হইতে কতক্ষণ!

ঠিক মিতা নয়, বউটির দাস হইল সে; ফুল তুলিয়া, ফল পাড়িয়া বউটির মন যোগানোই ছিল তাহার কাজ।

সুবল দামিনীকে প্রথম দিনই ডাকিয়াছিল, বউ! এখনও তাই বলে।

দামিনী বলিত, সুবলো। এখন বলে, মহান্ত।

বাউলের ছেলে সুবল দাস, মহান্ত খেতাব তাহাদের।

কৈশোরের প্রারম্ভে দামিনীর দেহে যৌবনের মুকুল দেখা দিলে গোষ্ঠ আসিয়া তাহার হাত ধরিল, দামিনীরও তাহা লাগিল ভাল; সে গোষ্ঠর পানে মুখ ফিরাইল।

তখন এই লাজুক কিশোরটি দামিনীর পানে, বিদায়-নেওয়া প্রিয়জনের পানে মানুষ যে দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে তেমনই সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সে দৃষ্টি দেখিয়া দামিনীর করুণা হইত।

ফাঁক পাইলেই সুবল আসিয়া কহিত, বউ, কুল পাড়তে যাবে ভাই?

এদিক ওদিক চাহিয়া দামিনী কহিত, না ভাই, বকবে।

সুবল নতদৃষ্টিতে চলিয়া যাইত, দামিনীর তাহাও প্রাণে বাজিত, সে ডাকিয়া কহিত, আমাকে দুটো দিয়ে যাস ভাই, আমি খাব।

সুবল কৃতার্থ হইত।

আঁচল ভরিয়া পাকা জাম, কাঁচা আম, ট'কো কুল সুবল গোপনে আনিয়া দিত; দামিনী হাসি মুখে গ্রহণ করিয়া কাঁচা আমে কামড় মারিয়া শিহরিয়া উঠিয়া কহিত, মাগো, কি টক! টাকরায় সে টোকার মারিত। সুবল তাড়াতাড়ি দামিনীর আঁচল টানিয়া বাছিয়া একটা আম লইয়া কহিত, এইটে খাও, কাঁচামিঠে আম, কাঁকুড়ের মত।

কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে সম্মোহনের আবেশময় রাজ্যে উভয়ে প্রবেশ করিতেই দুইজনের এই প্রীতি কেমন টুটিয়া গেল।

দামিনীর মনে হইল, ওই শান্ত লোকটির একান্ত মুগ্ধ দৃষ্টির দীপ্তি যেন বড় প্রখর, দীপ্তিতে যেন একটা দাহ। সে দাহ দামিনী তাহার সর্বদেহে অনুভব করিল।

সুবলের পরম দাস্যতা-ভরা ব্যবহারের মাঝে একটা সবল শক্তি যেন দামিনীকে আকর্ষণ করিল; তাহার ওই সলাজ নীরবতার মাঝে যেন দূরত্বের সৃষ্টি করিল।

সুবল দেখিল, দামিনী পর হইয়া গেল।

শাস্ত্রে বলে, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ, কিন্তু সুবল দেখিল, ভিক্ষায়াং বসতে লক্ষ্মী।

* বাউলের ছেলে সুবল গান গাহিয়া ভিক্ষা করে, গায়ে আলখাল্লা, পায়ে, নূপুর, হাতে তাহার একতারা।

ভিক্ষার চাউলে তার পাঁচ-সেরি ঝোলাটা ভরিয়া উঠে; একটা পেটে লাগে আর কত—বড় জোর এক সের, বাঁচে চার সের।

ওই চার সের জমিয়া জমিয়া ভিক্ষুককে মহাজন পর্য্যায়ে দাঁড় করাইয়া দিল।

লোকে বলে, মহান্ত, আর কেন?

মহান্ত হাসিয়া বলে, বাপ রে, পিতিপুরুষের বেবসা, কুলকর্ম, ও কি ছাড়তে আছে?

দামিনীর দুঃখের দিনে কিন্তু সুবল সত্য সত্যই মহাজন হইতে ভিক্ষুক পর্য্যায়ে নামিতে চাহিল; কিন্তু মুখ যুটিয়া বলা যে যায় না! আর বুক বাঁধিয়া তাহার সঞ্চয় সম্বল দামিনীর পায়ে ঢালিয়া দিতেও সাহস হয় না। হয়তো দামিনী লাথি মারিয়া ফিরাইয়া দিবে।

প্রথম প্রথম সে লুকাইয়া কুলুঙ্গির উপরে, কোন দিন বা চৌকাঠের ফাঁকে, দুয়ারের প্রবেশমুখেই টাকাটা সিকিটা রাখিয়া আসিত। দামিনীর নজরে ঠেকিলে সে আঁচলে বাঁধিত, আর আপন মনেই বকিত, এই আলবোড্ডেমিতেই তো গেল সব; কাজ দেখ দেখি, কুলুঙ্গির ওপরে টাকা, যদি কেউ দেখতে পেত!

ওটুকুও কিন্তু সুবলের সহ্য হইত না, আর অসহ্য হইত যখন গোষ্ঠ আসিত।

দামিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া স্বামীকে কহিত, কারও কিছু হারিয়েছে?

গোষ্ঠ চমকিয়া স্মরণ করিতে চাহিত, জিনিষটা কি? শেষে বলিত, হ্যাঁ হারিয়েছে, আমার—

কি?

আমার মন।

দূর। সে তো আমারই, দত্ত জিনিষে স্বত্ব কি? এই দেখ।

বলিয়া সে বাঁধা খুঁট দেখাইত। গোষ্ঠ অবাক হইত; আবার ভাবিত, হবে হয়তো, বনিয়াদী ঘর তো, কোন পিতৃপিতামহের সঞ্চয় ইঁদুরে কোন গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়াছে। চোখে জল আসিত।

সুবলের কাছে সমস্ত সংবাদ তিক্ত হইয়া উঠিত।

সর্বস্ব দিয়াও সুবল আপন হওয়ার সুযোগ পাইল না।

কখনও কখনও সাহস করিয়া নতমুখে গিয়া কহিত, বউ!

রুক্ষস্বরে উত্তর আসিত, কি? কি কাজ কি, আগুন নেবে নাকি?

সব সুবলের হারাইয়া যায়, ঝঙ্কারের ঝঞ্ঝায় সব বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়: তবু চুপ করিয়া থাকাও তো যায় না! অতি কষ্টে সে কহে, হাঁ।

দামিনী হাতার টানে আগুন টানিয়া ফেলিয়া দিয়া কহে, নেবে কিসে? কি আবাঙ তুমি, সঙ নাকি? সঙ্গে সঙ্গে হাসেও: সুবলের অবস্থা দেখিয়া না হাসিয়া পারে না।

প্রতিবেশিনী সাতু-ঠাকুরঝি আসিয়া বলে, কে লো?

দামিনী কহে, ওই দেখ না মাইরি, আগুন নেবে, তা শুধু হাতে এসেছে; দিই কিসে বল তো?

সাতু বেশ ভাল মানুষের মতই বলে, ভিক্ষের ঝোলাটা আন গিয়ে মহান্ত, আগুন নিয়ে যাবে।

দুই সখী দুইজনের মুখপানে চায়।

এই অবসরে সুবল রণে ভঙ্গ দেয়, সহসা পিছন ফিরিয়া পলায়।

দুই সখীতে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

সাতু বলে, মরণ! বোবা পুরুষ কি ভাল নাকি, ও বিধেতার অলক্ষুণে ছিষ্টি।

* * *

বাড়ির বাহির হইতেই উচ্চকণ্ঠে শোনা যাইতেছিল, ও চালাকি চলবে না হে বাপু, সুদের টাকা আমাকে মাস মাস মিটিয়ে দেবার কথা; দিতে হবে, দাও।

গোষ্ঠর মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল, বর্ষার ক'মাস মাপ করুন দত্ত মশাই, ক'মাস নারব।

দত্ত, রসিক দত্ত গ্রামের মহাজন, লোকে কহে মহাযম। তীক্ষ্ণদন্ত শৃগালের মতই কঙ্কাল-ঢাকা চামড়াটুকু লইয়া টানাটানি করে: দত্ত তীক্ষ্ণ চীৎকার করিয়া উঠিল, গা জল হয়ে গেল মাইরি: কাঁহুনি ছাড়, টাকা আন।

দামিনী ধীরে ধীরে আসিয়া দাওয়ার উপর উঠিল, ভিতরে ছেলেটা জ্বরে গোঙাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাহার পা উঠিল না, দুনিয়া ভুলিয়া শঙ্কিত বক্ষে দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়াই রহিল।

গোষ্ঠ কাকুতি করিয়া কহিল, দোহাই দত্ত মশায়, খেতে জুটছে না—

দত্ত ভেঙাইয়া কহিল, খেতে জুটছে না তো আমার কি রে জোচ্চোর? খেতে জুটছে না!

ভঙ্গীতে সে কি বীভৎস, কণ্ঠস্বর সে কি নির্মম!

দত্তর খর জিহ্বা সাপের জিহ্বার মতই তীক্ষ্ণ, ঘন ঘন লকলক করিয়া নড়ে।

ঘটি-বাটি বাঁধা দাও, না থাকে পরিবারের শাঁখা-খাড়ু বেচ, কোথা পাবে সে আমার দেখবার দরকার নাই: আমার পাওনা আমায় পেতে হবে, দাও।

গোষ্ঠ জোড়হাত করিয়া কাঁদিল।

দত্ত কহিল, বেটারা শুধু কাঁদতেই জানে।

কথাটা ঠিক।

চির নত যে দুর্বাদল সে পদদলনে পত্রপুষ্প হারাইয়া বিদ্রোহ করে, শুষ্ক তৃণাঙ্কুর পায়ে ফোটে।

এরা কিন্তু তাহাও পারে না; হয়তো বুঝি বা বুকের মাঝে রাগও জাগে না। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সমাজে রাষ্ট্রে পিষ্ট হইয়া বুঝি পাষাণ হইয়া গিয়াছে। না; পাষাণও রৌদ্রে আগুনে উত্তপ্ত হয়।

ইহারা তবে কি? ইহারা প্রকৃত স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, অস্বাভাবিক ইহারা। মানুষের সৃষ্টি-করা সভ্যতার চাপে ধ্বংস-হওয়া মানুষের তুলনা বিধাতার সৃষ্টির মাঝে নাই।

গোষ্ঠ কাঁদিয়াই কহিল, ওই দেখুন, পয়সা অভাবে ছেলেটা ওষুধ পায় নাই।

পাথর জলে গলে না, দত্ত খিঁচাইয়া উঠিল, তা সে পয়সাও আমাকে লাগাবে নাকি, বলছ কি?

ইহার উত্তর কি? গোষ্ঠর অভিধানে অন্তত তা নাই, চোখ দিয়া শুধু জল পড়িল।

মহাজন বলিয়াই চলিল, থাক, এই মাসেই নালিশ করব আমি; যত বেটা বজ্জাতের পাল্লায় প'ড়ে মাটি হলাম আমি। ইঃ, এদিকে পরিবারের পরনের কাপড়ের বাহার দেখ না! ঢাকাই, না শান্তিপুরে হে গোষ্ঠ?

পরনের কাপড় জোটে নাই, তাই শ্বশুরের দেওয়া অতি পুরাতন পোশাকী কাপড়খানা দামিনী সেদিন পরিয়াছিল।

দত্তর কথায় ওই ছিন্ন-পাড় জীর্ণ কাপড়খানা অঙ্গে কাঁটার মতই বিঁধিতে লাগিল; লজ্জায় অপমানে বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল, আঁচলটা মুখে পুরিয়া ত্বরিত পদে ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল; অবশ হাত হইতে অতর্কিতে টাকা দুইটা মাটিতে পড়িয়া বাজিয়া উঠিল, ঠনঠন।

শব্দ দত্তকে ফিরাইল, সে কোলাহল করিয়া উঠিল, ওই যে, ওই যে টাকা! হুঁ হুঁ বাবাঃ, মহাজনের কথা মিথ্যে হবার কি জো আছে রে বাবা? সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে কেন? আন্ গোষ্ঠ, টাকা আন্।

গোষ্ঠ দামিনীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

কথা না কহিতেই, দামিনী টাকা দুইটা মুঠার ভিতর সজোরে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া জবাব দিল, না, আমি কবরেজকে দোব।

গোষ্ঠব তখন যেন সব সহিত, মানের দায়ে প্রাণ তুচ্ছ হইয়া উঠিয়াছিল। কণ্ঠে তাহার বাক সরিতেছিল না, সে অতি রুক্ষস্বরে শুধু কহিল, দাও।

কাকুতি করিয়া দামিনী কহিল, না গো, না, তোমার পায়ে পড়ি।

গোষ্ঠর সেই এক বুলি, দাও। সেই কণ্ঠ, সেই ভঙ্গী, যেন আরও উগ্র।

দামিনী কাঁদিয়া কহিল, ছেলেটার পানে তাকাও।

দত্ত তাগিদ করিল, গোষ্ঠ, আমাকে অনেক জায়গা ঘুরতে হবে।

গোষ্ঠ পাগলের মত কহিল, মরুক ছেলে।

দামিনী টাকা দুইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

শুধু টাকা নয়, মনে হইল ঘর-দ্বার এই দরদহীন বিশ্বসংসারটা পর্য্যন্ত এমনই করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যদি কোথাও স্থান থাকে সেথা সরিয়া দাঁড়ায়। ছেলেটা কাতরাইয়া উঠিল, মা গো!

দামিনী মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া শান্ত উদাস কণ্ঠে কহিল, আর দেরী নাই, সব ভাল হয়ে যাবে ধন, সব ভাল হয়ে যাবে। তুমিও জুড়োবে, আমিও।

আমি জুড়োব—এ কথাটা বুঝি মায়ের মুখে বাহির হয় না, বুকে উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠে, সব ভাসাইয়া দেয়; দামিনী হু-হু করিয়া কাঁদে।

গোষ্ঠ টাকা দুইটা দত্তর পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া দিয়া দাওয়ায় উঠিয়া কাঠের উপর বসিয়া রহিল।

দামিনীর কান্নায় তাহারও চোখে জল আসিতে চাহিল; চোখের জল ছোঁয়াচে, একের কান্না অপরের সংযমের বাঁধ টলাইয়া দেয়—প্রায় ভাঙিয়াই দেয়।

মুখখানা বিকৃত করিয়া গোষ্ঠ উদ্যত অশ্রু গোপন করিতে চাহিল। দত্ত টাকা দুইটা বাজাইতে বাজাইতে কহিল, কি পাজী রে তোরা

মাইরি, অ্যাঁ! টাকা থাকতে বলিস, নাই, উশুল উড়বে কার বাবা? আমার, না তোর?

* * *

কই মোড়ল, ছেলের অসুখ কদিন?

কবিরাজ অশ্বিনী সিং আসিয়া বাড়ি ঢুকিল, পিছনে পিছনে সুবল, অতি সঙ্কোচে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

পত্নীর বাল্য-সাথীর উপর বিরূপ সংসারে হাজারে ন শো নিরেনব্বই জন। মনের গতি মানুষের বাঁকা; আর প্রীতি ও পিরিতির মাঝে ভেদ করা বড় কঠিন, বিশেষ পুরুষ ও নারীর মাঝে।

গোষ্ঠও সুবলকে সুচক্ষে দেখিত না, বাড়ি আসিলে যেন বিরক্ত হইত, কারণে অকারণে ঝাঁঝিয়া উঠিত।

সুন্দর তরুণ সুবলকে দূরে রাখিয়া নিজের আড়ালে দামিনীর দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিত।

সুবলও তাহা বুঝিত, তাই তার এ সঙ্কোচ।

গোষ্ঠ কহিল, তুমি কেন হে মহান্ত, কি কাজ কি?

কবিরাজ উত্তর দিল, ওই তো আমায় ডেকে নিয়ে এল।

গোষ্ঠ কহিল, এস কবরেজ, এস, ছেলেটার কদিন থেকে 'উন্দো ধুন্দো' জ্বর, চেতনা নাই; দেখ ভাই একবার।

ভিতর হইতে দামিনী পাগলের মত কহিল, না না, দেখতে হবে না; টাকা নাই, টাকা নাই আমার।

গোষ্ঠ মিনতি করিয়া কহিল, দোব দোব, টাকা দোব ভাই কবরেজ; দুদিন আগে আর পিছু; দেখ ভাই, দেখ।

কবিরাজ সুবলের পানে চাহিল।

বিবর্ণমুখ সুবল সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, কিন্তু মনের কথা তো বলা যায় না। হয়তো দামিনী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে; গোষ্ঠ কি কথায় কি ধরিয়া বসিবে! সহসা ঘরের ভিতরে দামিনীর মুখখানা চোখে পড়িল, দামিনীর চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে।

বেদনায় মূকের মুখও ফুটে, ভাষা না হউক, যাতনায় স্বর ধ্বনিয়া উঠে।

সুবলের মুখও ফুটিল, সে মূকের মতই জড়িতকণ্ঠে কহিল, টাকা দেবে কবরেজ মশায়, টাকা দেবে।

কবিরাজ বাজাইয়া লইল, না দিলে—না দিলে আমি তোমার কাছে নোব, তুমি সে দেখে নিও।

সুবল কহিল, তাই দোব, আমিই দোব।

দীনতার মত মনুষ্যত্বনাশী এতবড় ব্যাধি আর দুনিয়ায় নাই, দীনতার চাপে হীনতা আসিবেই।

আজ এই দীনতার চাপে সুবলের অনুগ্রহ গোষ্ঠকে মাথা পাতিয়া লইতে হইল : সে কহিল, তাই দেবে, সুবলই তোমাকে দেবে, আমি সুবলকেই দোব : এই চার-পাঁচ দিনেই দোব।—বলিয়া সে সুবলের মুখপানে চাহিল।

সুবল সান্ত্বনা দিয়া কহিল, না না, তাগিদ নাই আমার, যখন হবে দিও।

কবিরাজ হাসিয়া কহিল, আর না হয় নাই দিলে, মহান্ত মহাজন ভাল।

সুবল কোঁচড় হইতে টাকা খুলিয়া কবিরাজকে দিল, কহিল, আর যা লাগবে দোব।

কবিরাজ টাকা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে কহিল, নগদ বিদেয়, তা ভাল। তা মহান্ত, তোমার তেজারতি সেরেস্তায় উশুলের ঘর বুঝি শূন্য ?

সুবল লজ্জিত ও ম্লান হাসি হাসিল।

কবিরাজ কহিল, এবার তুমি মানুষ কোরোক কর মহান্ত ; না দিলে মানুষ ধ'রে নিয়ে যাবে, ঘরে খেতে পরতে দেবে, তেজারতি তোমার আরও ফলাও হবে।

আপন রসিকতায় কবিরাজ আপনি হা-হা করিয়া হাসে ;

বদিকে এই তরল কথাটা গাঢ় কঠিন হইয়া আর একজনের কানে ওজে, ঘরের মাঝে দামিনী হাঁপাইয়া উঠে, তাহার মনে হয়, ওই টাকাটা দেনাও নয়, দানও নয়, ও দাদন—তাহারই উপরে দাদন। কোরোকী পরোয়ানার লেখার রেখা সুবলের বুকের মাঝে আঁকা, যেন সে দেখিতে পায়। সে কণ্ঠস্বর চাপিতে ভুলিয়া গেল। উচ্চ আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না না, না গো, কবরেজ দেখাতে হবে না, ধার করতে হবে না ; ছেলে ভাল আছে, ছেলে ভাল আছে আমার।

গোষ্ঠ ধমক দিয়া উঠে, থাম থাম, কত্তাতি ফলাতে হবে না, থাম।

মুখ থামিলে রব থামে, কিন্তু রোদন ত থামে না।

দামিনী নীরব হইল, কিন্তু শ্বাসরুদ্ধের মতই পাগল হইয়া উঠিল।

মরণ টুঁটি চাপিয়া ধরে, রোগীর শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে ; সে সমস্ত অঙ্গের শিথিলতম বাঁধনটুকু পর্য্যন্ত কাটিতে চায়, যেন ওইটুকু টুটিলেই সে আরামের শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। তেমনই অস্থিরতায় দামিনী আপনার সারা অঙ্গের মাঝে যদি কোথাও কোন সোনা-রূপার বাঁধন থাকে, তাহার খোঁজ করিয়া যায়।

নাই, মেলে না ; চোখে পড়ে রোগা ছেলেটার সরু লিকলিকে হাতে শতচ্ছিদ্র জীর্ণ রূপার বালা দুইগাছা।

দামিনী তাই খুলিয়া লয়, ছুঁড়িয়া সুবলের দিকে ফেলিয়া দেয়। ছেলেটা শ্রান্ত সরু গলায় কাঁদিয়া উঠে, আমার গন্না—আঁ—আঁ।

গোষ্ঠও একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, তাই রাখ ভাই, তাই রাখ ; শুধু হাতে কারবার ভাল নয়, কিছু থাকা ভাল।

ছেলেটার কান্না কিন্তু থামে না, সে কাঁদিয়াই চলে, আমার গন্না—আঁ—আঁ।

দামিনী পাষাণের মত বসিয়া রহিল, ছেলেটাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। করিল না নয়, বোধ হয় পারিল না।

গোষ্ঠ কহে, দূর, শুধুই আঁ — আঁ। সে উঠিয়া চলিয়া যায়

মাঠের পানে। দাওয়া হইতে নামিয়াই নতদৃষ্টিতে পড়ে ছেলেটার জীর্ণ বালা দুইগাছা, সুবল ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে।

দয়া! সর্বাঙ্গ তাহার রি রি করিয়া উঠে; বালা দুইগাছা হাতে তুলিয়া সে সঙ্কল্প করে, সুবলের মুখে ছুঁড়িয়া মারিয়া আসে। আবার মনে হয়, কত দাম ইহার, বড় জোর বারো গণ্ডা পয়সা; সঙ্গে সঙ্গে আপনিই সে হাসে, বড় দুঃখের হাসি। চারিটা টাকা দিয়ে বারো আনার দ্রব্য বিনিময়, যদি নাই লয় সে। বালা দুই গাছা সে ছেলেটার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া মাঠের পথ ধরে। ছেলেটা বালা দুইগাছা বুকে চাপিয়া ধরে, মানিকের মত নাড়ে-চাড়ে: ওইটুকু যে এ বিশ্বে উহার আভরণের গৌরব।

সবুজ মাঠে গোষ্ঠের বুকখানা জুড়াইয়া যায়; সে ভাবে, আশা বোধ হয় সবুজ-বরণী।

হালে পোঁতা তরকারির বীজের চারার কাছে বসিয়া আঙ্গুলের ডগা দিয়া সন্তর্পণে মাটি সরায়, একটি প্যাঙাশে নরম অঙ্কুরের প্রত্যাশায়।

তরুণী নারী যেমন ভাবী সন্তানের স্বপ্ন দেখে।

অঙ্কুর উঠে নাই, মরা মন লইয়া বেচারী উঠিয়া দাঁড়ায়, একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ে; আপন মনেই বলে, মোটে তো আজ তিন দিন, আর দু-তিন দিনে বেরুতেই হবে। আর ও কটা যদি নাই হয়, তাই বা কি, ধানেই এবার ছয়লাপ।

আল-পথের উপরে দাঁড়াইয়া ধানী জমির পানে তাকায়, চোখ যেন জুড়াইয়া যায়, সে বলে, বলিহারি, বলিহারি, কি রং মাইরি, কালো, আঁধার, যেন আষিঢ়ে মেঘ নেমেছে জমিতে।

সে মনের আনন্দে গান ধরে, "ও কালো কালিন্দী-কূলে দেখ সখি কালো মেঘ নেমেছে।"

ওদিকের রাস্তা হইতে কে হাঁকে, গোষ্ঠ! গোষ্ঠ!

ও গাঁয়ের সতীশ সরকার, জেলার সদরে থাকে, পাঁচজনের মামলায় তদ্বির করে: বেঁটে খাটো চেহারা, পেটটা মোটা, কবিরাজ বলে—পাঁচসেরী পিলে ওটা। সতীশ তবু ওষুধ খায় না। বলে, কচু জান তুমি, ও আমার বুদ্ধির গেঁড়ো, ওরই জোরে ক'রে খাই বাবা।

লোকে বলে, ও একরকম ভুঁড়ি, বদহজমের ভুঁড়ি, বেটার টাকা হজম হয় না, তাই ভুঁড়িটা অমনই।

গোষ্ঠ অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া কহে, সরকার মশায়, তা সব কুশল তো? সরকার কুশলের ধার দিয়া যায় না, সোজাসুজি কাজের কথা পাড়ে, মামলাকে এত ভয় করলে চলবে কেন গোষ্ঠ?

গোঁফ তাহার ঘন ঘন এপাশে ওপাশে নাচে; ওইটা তাহার মুদ্রাদোষ। গোষ্ঠ কথাটার মাঝে গুরুত্ব খুঁজিয়া পায় না, সে হাসিয়া কহে, মামলাকে কি আর ডরাই সরকার মশায়, ডরাই যত আমলাকে, খাঁই আর মেটে না।

কথাটা সরকারের গায়ে বাজে, সেও ওই শ্রেণীভুক্ত যে; সে তীব্রকণ্ঠে কহে, শুধু পয়সা কেউ চায় না রে, শুধু পয়সা কেউ চায় না, তারা তো ভিখিরী নয়। এই তো বাবা, নিলে বেটা দত্ত নিলেম ক'রে তোর জোতকে জোত। সে মামলা করলে, ডিক্রী করলে, নিলেম করলে, জানতে পারলি? আমলারা পয়সা খেয়ে নেমখারামি করে না, যার পয়সা খায় তার কাজ বজায়, বুঝলি?

গোষ্ঠর মাথায় যেন কে মুগুরের ঘা মারে, সব যেন গোলমাল হইয়া যায়। তাহার জমি, তাহার অন্নদাত্রী মা ভূমিলক্ষ্মী। তবু সে স্বস্তির আশায় কথাটা অবিশ্বাস করিতে চায়, কহে, আজ্ঞে না, তাই কি হয়, আজই যে দু'টাকা সুদ নিয়ে গেল।

সরকার হাসিয়া ওই সরল বিশ্বাসের জন্য গোষ্ঠকে গালি দেয়,

চাষা কি সাধে বলে রে, বুদ্ধিগুণেই চাষা বলে ; হুঁ, তোমার দোষ কি, বল ? ন চাষা সজ্জনায়তে—এ যে শাস্ত্রবাণী। বলি নাই আমি একবার, ওরে গোষ্ঠ দত্ত নালিশ করেছে, একটা জবাব দে। তুই বললি, টাকা নিয়ে আর জবাব কি দোব সরকার মশাই ? তবে ধ'রে পেড়ে দেখি, দত্তকে এখন থামাই ; তুই ধরলি পাড়লি, দত্তকে মুখে রাজীও করলি, কিন্তু আদালত তো ছাঁটলি না, মামলাটা তুলে নিলে, কি না নিলে, তা দেখলি না। ভয় হ'ল আমলার হাঁ দেখে। নে, এখন তার ফল দেখ্।

গোষ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল। চোখে তাহার দৃষ্টি জাগ্রত ছিল, কিন্তু দৃশ্য সমস্ত যেন অর্থশূন্য বোধ হয়।

সরকার কহে, তুই নিলেম রদের মামলা কর্। দেখ্, বেটা চামারকে কেমন ফাঁসাই, তদ্বিরের ভার আমার, সে তোকে ভাবতে হবে না। ও বেটা বেণে, আমিও কায়েত।

কথা গোষ্ঠর কানে যায় না, তাহার বুকের মাঝে ক্ষোভে দুঃখে ক্রোধে একটা ঘূর্ণি জাগিয়া উঠে।

একটি বিধিবদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচারে নিঃশেষিতপ্রায় মানবাত্মার যেটুকু অবশেষ ওই নিরীহের বুকে ছিল, সে বুঝি বিদ্রোহ করিয়া উঠে : বাহিরের দেহেও তাহার বিকাশ হয়, দীর্ঘ মোটা মোটা হাড় বাহির করা দেহখানার শিথিল পেশীগুলার মাঝে একটা চাঞ্চল্য বহিয়া যায়, কাঠিন্য ফুটিয়া উঠে, শিরাগুলা মোটা হয়, বোঝা যায়, রক্তের স্রোতে জোর ধরিয়াছে।

মানুষকে সে আর বিশ্বাস করিতে চায় না, তাহার ঘৃণা-ভরা সন্দিগ্ধ চোখে সরকারের মতলব আজ ধরা পড়ে, সে হাসিয়া কয়, মামলার খরচ কে দেবে সরকার, বুদ্ধি তো তোমার কায়েতের বটে, কিন্তু যাতে রস, ওই জমি আমার লক্ষ্মী মা, ও গেলে খরচ যোগাবে কে ? তুমি দেবে ?

সরকার কহে, ওরে, কায়েতের বুদ্ধিতে সব আছে, জমিতে তুই

দখল দিবি না : জমি তো তোর দখলে, বাঁশগাড়ি করতে যায়, তুলে ফেলে দিবি।

কথাটা ক্রোধতপ্ত কানে লাগে ভাল, গোষ্ঠ কহে, দখল আমি ছাড়ব না সরকার। যা হয় হবে, আমার জমিতে গেলে ওকে আমি গোটা রাখব না। মামলা-ফামলা যা করতে হয় ও করুক।

সরকার শিহরিয়া কয়, সর্বনাশ সর্বনাশ, জেল হয়ে যাবে ; মামলার বল না নিয়ে কি ফৌজদারী করা হয় ; অথ না হ'লে শুধু সামথ্যে কি হয় ?

গোষ্ঠ কহে, তা অথ নাই যখন, তখন সামথ্য ছাড়া উপায় কি ?

সরকার চোখ দুইটি বড় করিয়া কহে, বেটা ডাকাত রে ! বলে কি ? খবরদার, মরবি, মরবি। ওরও লাঠি আছে, ও শালা কি কম ধূর্ত্ত, শালা ধূর্ত্ত শেয়াল, টাকায় জমিদারকে বশ করেছে ; দেখেছিস তো, জমিদারের চাপরাসীর পেতলে বাঁধা লাঠি ?

যুগ-যুগান্তের, পিতৃ-পিতামহের পুষিয়া-রাখা জমিদার-ভীতির সংস্কার বুকের মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। বুকের ঘৃণিটার বল, বেগ ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

এই সেদিনই সে যে কথাটা বলিয়াছিল, সেই কথাটা তাহার মনে পড়ে, বাঘে ধান খায় তো তাড়ায় কে ?

সরকার বলিয়াই যায়, তার চেয়ে শোন্ ; খরচ বেশি হবে না, পাঁপরের মকদ্দমা ক'রে দোব, হাকিমকে এক দরখাস্ত দোব, হুজুরের অধীন গরিব, মামলা-খরচের সামথ্য নাই—

গোষ্ঠ যেন কূল পায়, সে ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠে, তা হয় সরকার মশায়, হয়, অ্যাঁ ?

সরকারের গোঁফ-নাচানো মুদ্রাদোষটা প্রবল হইয়া উঠে, সে হাসিয়া কহে, হয়, না হয় সে আমার ভার, তার ভাবনা তোর না ; আসছে সোমবার ক'রে তুই গোটা দশেক টাকা নিয়ে সদরে যাস। আমার বাসা জানিস তো—বাসা ? আচ্ছা, না জানিস, নাই, ওই

হোটেলে নেমে তুই আগে খেয়ে নিবি, তারপর ওইখানেই থাকবি, আমি খুঁজে নোব, বুঝলি ?

গোষ্ঠ হতাশ হইয়া পড়ে, দশ টাকা যে তাহার পক্ষে দুই শো, দুই হাজার বলিতেও ক্ষতি নাই ; সে ম্লানকণ্ঠে কহে, দশ টাকা যে আমাকে কাটলে বেরুবে না সরকার মশায় ; ধারও মিলবে না।

সরকার এবার খিঁচাইয়া উঠে, তবে কি মামলা তোমার অমনই হবে, তোমার চাঁদ-বদন দেখে নাকি ?

ওই যে বললেন, পাঁপরে দরখাস্ত দিলেই হবে ?

খরচ হবে না ব'লে কি একেবারে তিন শূন্যতে চলে বাবা ? দরখাস্ত দিতে খরচ নাই ? এই ধর্ না, হিসেব তোর মুখে মুখেই হবে—উকিল পাঁচ টাকা, মুহুরী সেও পাঁচ সিকের কম ছাড়বে না, কোট-ফী এক টাকা, ডেমি দু পয়সা ; ম্যাদ আট আনা, বিত্তি চার আনা, আর এদিক ওদিক বাজে খরচ সেও তোর দু'টাকার কমে তো হয় না, এই তো তোর দশ টাকা দু'পয়সা, তা ডেমির দু পয়সা তোকে লাগবে না, ডেমি আমি দোব।

গোষ্ঠর চোখ দিয়া জল পড়ে, সে ঘাড় ফিরাইয়া জমিগুলার পানে চায়, দূর হইতে ঘন সবুজ ধানগুলি সত্য সত্যই কালো মেঘের মত দেখায়।

সরকার কহে, আচ্ছা, এক কাজ কর, তোর ওই নাখারাজ গড়েটা—ওইটা বাঁধা দে, টাকার বন্দোবস্ত আমি ক'রে দোব। যাস সোমবারে, বুঝলি ? সবই হবে সেই দিন, বন্ধকী দলিলও হবে, দরখাস্তও দেওয়া হবে, কি বল্ ?

তখনও গোষ্ঠর চোখ ফেরে নাই, মমতায় সারা বুক টনটন করিয়া উঠে, সে কহে, তাই যাব সরকার মশায়, কিন্তু দেখবেন যেন ফিরতে না হয় ; এ বিপদে আপনাকে রাখতেই হবে।

সরকারের পা দুইটা সে চাপিয়া ধরে।

মন বিশ্বাস করিতে চায় না, ভরসা হয় না।

কিন্তু মাটির পরে চাষীর মমতার মোহ কহে, তবু যদি।

সরকার ভরসা দিয়া আপন পথ ধরে, গোষ্ঠ ফিরিয়া আপন জমির আঙুলের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ধানের পাতা নাড়ে-চাড়ে, কচি কচি সতেজ ধানগুলি হাওয়ায় লুটোপুটি খেলে, গোষ্ঠর গায়ে পড়ে, পায় পড়ে। যেন দুরন্ত চঞ্চল শিশুর দল।

সহসা গোষ্ঠ নারীর মত ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

পথে যোগী মোড়লের বৈঠক; সেথায় গোষ্ঠ আসিয়া বসে।

মাইনার-পাস ছোকরা রমাপতি মাষ্টার সেখানে পাঠশালা করে। মোড়ল-কর্ত্তার সাপ্তাহিক খবরের কাজ পড়ে, আগে নারী-হরণের কলম—দিবা দ্বিপ্রহরে নারী হরণ, পাশবিক অত্যাচার, বাড়িতে পুরুষ কেহ ছিল না, চারিজন বদমাইস ঘরে প্রবেশ করিয়া—

মোড়ল কর্ত্তা চেঁচাইয়া উঠে, ওরে মদনা, মদনা, ওরে শালা ডোম!

মদনা বাড়ির রাখাল, সে উত্তর দেয়, কিন্তু মোড়ল-কর্ত্তার কানে যায় না।

মদনা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়।

মোড়ল-কর্ত্তা খিঁচাইয়া উঠে, বলি, লবাব, ছিলেন কোথা, রা দাও না যে?

মদনা বলে, বলি, রা মানুষকে কবার কাড়ে, রা তো দিলাম।

আবার মুখের উপর মুখ! কর্ত্তা ঠেঙাগাছটা হাতড়ায়, হাতে টেকিতেই সে গাছটা ফাবড়াইয়া দেয়। মদনার লাগে না, তবু সে বলে, মেলে তুমি আমাকে?

কর্ত্তা কহে, বেশ করেছি। বলিয়া হুঁকা টানে, ক্ষণেক পরে আবার কহে, বুড়ো মানুষের রাগ তো জানিস; তুই স'রে গেলি না কেন? তা বিকেলে এক সের চাল নিস্, মদ খেলেই গায়ের বেথা সেরে যাবে। যা দেখি, রতে ছুতোরকে ডেকে আন, বল্, খিল আঁটতে হবে দুয়ারের। আর হরিশ, ব'লে দাও চব্বিশ ঘণ্টা দুয়ারে খিল—। শালারা, দিবা দ্বিপ্রহরে, আয় শালারা—

আবার লড়াইয়ের সময় মাষ্টার লড়াইয়ের খবর পড়ে, ম্যাপ আঁকিয়া লাইন বুঝায়, বলে, এই দেখ কর্ত্তা, এই হ'ল ফ্রান্স, এই তোমার জার্‌মানি, আর এই রুশ।

বুড়া বলে, এতো শুধু দাগ হে মাষ্টার, নক্সা এঁকে লড়াই বোঝা যায়? এখন কে হারল তাই বল, এ সায়েবরা, না উ সায়েবরা?

মাষ্টারের বয়সী বাগাল রায় বলে, বুঝতে কেনে নারবে খুড়ো, এই দেখ, এই হ'ল ফেরান্স।

বুড়া বিরক্ত হইয়া কহে, রাখ্ বাপু তোর ফেরাঙ টেরাঙ, ওসব তোরা বোঝ্ গিয়ে। এখন কাপড় সস্তা কখন হবে তাই বল হে মাষ্টার?

মাষ্টার বলে, তবে ডুবো-জাহাজের ঠেলা কত্তা, মাল নিয়ে ভাসা-জাহাজের কি পার আছে? মাল নিয়ে জলে ভেসেছেন কি দুই তিন কোশ দূর থেকে তাল মেরে, চোল—চোল—মারা ডুঁ, আর এক ডুঁতেই বাস্ চিচিং ফাঁক, জলের তলায় ভরভর—ফস।

বাগাল বলে, তবে ডুবো-জাহাজের টিরিক-ফিরিক ম'ল এইবার, আকাশে ফরফর উড়বে আর কলকাতায় এসে নামবে তোমার: কাটুক শালা ডুবো-জাহাজ জলের তলে বুটবুটি।

বিস্ময়ে বুড়ার চোখ দুইটা ভাঁটার মত পাকাইয়া উঠে, সে কহে, উড়বে কি ক'রে বাপু; গরুড়পাখীর বাচ্চা ধরেছে নাকি অ্যাঁ?

মাষ্টার হাসিয়া বলে, না কত্তা, কল, কল, কলে উড়বে—অ্যারোপ্ল্যান।

কাগজে অ্যারোপ্ল্যানের ছবি আঁকে, ছবিটা দাগে দাগে হয় একটা বৃত্ত।

বুড়ো বলে, দূর, এ কি হ'ল, রসগোল্লা আবার ওড়ে?

মাষ্টার বললে, কেন কত্তা, রাহুর ছবি, চাঁদের চেহারা দেখ নি? ওই সব থেকেই ওরা এই সব করলে; সব আমাদের নিয়ে, আমাদের পুষ্পক রথ—

বুড়া চটিয়া কহে, সবই তো শুনি তোদের, ও ছিল-ফিল বুঝি না, করতে পারিস তো বুঝি, পারিস বানাতে ওই কি বলছিল এলাং-পেলাং নাকি ?

বর্ত্তমানের নগ্ন রিক্ততায়, দারিদ্র্যে, মরণ-দ্বারের বৃদ্ধের পর্যন্ত অতীতের পানে চাহিবার অবকাশ নাই।

তরুণ চাহে ভবিষ্যতের পানে, সে স্বপ্ন হয়তো।

বাগাল কহে, হবে বইকি খুড়ো, আমাদেরও হবে।

সে সব পুরানো কথা।

আজ মাষ্টার পড়িতেছিল, অসহযোগ আন্দোলন, বক্তৃতার সুরে সে পড়িতেছিল, মহাত্মার বাণী, স্বরাজ আসিবে, স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার, শুধু বাণী পালন কর। বুঝবে কত্তা, স্বরাজ হলেই আর চাই কি !

স্বরাজ মানেটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পার, তবে তো বুঝি ব্যাপারটা কি ?

মানে, বুঝলে না কত্তা ? আমরাই আমাদের মালিক—রাজা, ওই ওতেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে কত্তা।

তাই কি হয় মাষ্টার ? রাজা থাকবে না—

বহুযুগ নিরক্ষরের কানে কথা বিস্ময়ের মত ঠেকে।

তরুণ রক্ত, যুগের হাওয়ায় উষ্ণ চঞ্চল ; বাগাল কহে, কেন হবে না খুড়ো, এই তো ফেরান্স, অ্যামেরিকা—

কর্ত্তা চটিয়া যায়, তুই থাম্ বাপু, তুই আর পাকামি করিস না, মাষ্টার বলছে তাই বলুক, না খালি ফেরান্ ফেরান্ ! হ'লি কি রে বাপু, বাপখুড়োর খাতিরও করবি না ?

ও পাড়ার গণেশ দেবাংশী কহে, যা বলেছ ভাই, আমাদের আমল পালটিয়ে গেল ; সে সব আর কিছু রইল না।

মাষ্টার বলে, তফাত তো হবেই কত্তা, তোমরা হ'লে পুরনো, আমরা নতুন।

গোষ্ঠর দুঃখার্ত মন দুঃখদূরের কথাটা ভোলে না, সে কহে, জমিদার-মহাজন উঠবে বলতে পার ?

অন্তর-ফাটা বাণী, আন্তরিকতার গাম্ভীর্য্যে এত গম্ভীর যে, মজলিসের চটুল ভাবটুকু উবিয়া গেল। মরুর বুক-চেরা ঝঞ্ঝা বায়ু-স্তরের রস পর্য্যন্ত যেমন শুষিয়া লয়।

সবার বুক চিরিয়াই দীর্ঘশ্বাস বহে।

যোগী বলে, ওই যা বলেছে গোষ্ঠ, স্বরাজ-ফরাজ বুঝি না আমরা, যমের হাত হতে বাঁচি কিসে তাই মহাত্মা বলুক। হ্যাঁ, চাচা আপন জান বাঁচা।

অতকালের অত্যাচারে, অনাহারে অতীতের সব—দেশ, ধর্ম, সমাজ, সমস্ত ইহাদের কাছে বুঝি তুচ্ছ হইয়া উঠিতেছে। শুধু জীব-জগতের একমাত্র জন্মগত প্রেরণা, বাঁচিবার চেষ্টায় কঙ্কালগুলা পাগল।

কিন্তু ক্লান্ত মস্তিষ্কে উপায় আসে না ; শ্রান্ত দেহ এলাইয়া পড়ে।

কে যে ইহাদের জীবন অদৃশ্যভাবে যুগযুগান্তর ধরিয়া শোষণ করিয়া লইতেছে, তাহাও ইহারা জানে না ; বিধাতা, না মানুষ ?

আর সে জীবন ফিরিয়া চাহিতে চীৎকার করিতেও বুঝি ক্লান্তি আসে। তবে তাহা চায় তাহারা ; মাটির তলের অঙ্কুর যে সুরে যে ভাষায় আলো বাতাস চায়, সেই সুরে সেই ভাষায় ইহাদের সে চাওয়ার বাণী বুকের মাঝে অহরহ বাজে।

কয়দিন পর।

গোষ্ঠ মাঠ হইতে ফিরিয়া বাড়ির ভেজানো দুয়ারটা খুলিতেই মনে হইল, ওদিকের দুয়ার দিয়া কে বাহির হইয়া গেল, আবছা দেখা, ঠিক চেনা গেল না, কিন্তু মনে হইল, সুবল।

গোষ্ঠ ত্বরিত পদে অনুসরণ করিয়া খিড়কির দুয়ারে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না; ঠিক পাশেই সুবলের দুয়ার বন্ধ, শিকলটি পর্য্যন্ত নড়ে না। গোষ্ঠ বাড়ি ফিরিয়া হাঁকিল, ওগো!

কেহ সাড়া দিল না।

ভিতর-ঘরের দরজা খুলিয়া দেখিল, রুগ্ন ছেলেটা অকাতরে ঘুমাইতেছে, দামিনী নাই। দাওয়ার উপরে কোদালিটা রাখিয়া হুঁকা হাতে চলিল মোড়ল-কর্তার দলিজার পানে; কিন্তু মনের কোণে একটা অস্বস্তি জাগিয়া রহিল, কে গেল?

দামিনী জল আনিতে গিয়াছিল।

ঘড়া কাঁখে বাড়ি ফিরিয়া দুয়ারের পাশে কোদালি দেখিয়া বুঝিল, গোষ্ঠ মাঠ হইতে ফিরিয়াছে। কিন্তু গেল কোথায়? হয়তো নেশার আড্ডায় গিয়াছে।

মনটা কেমন হইয়া উঠিল।

এমন করিয়াই কি মানুষ নেশায় মজে? ঘরে রোগা ছেলে, তার খোঁজ লওয়া নাই, মুখে কিছু দেওয়া নাই, আর এ কদিন আবার সবই বেশি বেশি! আর মাঠেই বা এত কাজ কি? নিড়েন তো হইয়া গেল!

বিরক্তিভরে দামিনী ঘড়াটা রাখিয়া আপন মনেই বকিতে বকিতে কোদালিখানা ঘরে ঢুকাইতে সেখানা তুলিয়া সোজা হইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল সম্মুখের কুলুঙ্গির উপরে।

রঙিন কাগজে মোড়া কি ওইটা?

দামিনী কোদালি ছাড়িয়া মোড়ক খুলিয়া দেখে—একজোড়া শাঁখা।

লাল রঙের উপর সূক্ষ্ম তুলির রেখার হলুদ রঙের নক্সা, দামিনীর চোখ ফিরিল না। রূপার পৈঁছার চেয়ে শাঁখার রূপখানি যেন শতগুণে অপরূপ। এ তো শাঁখের শাঁখা নয়, এ তাহার সোনার কাঁকন।

শাঁখা জোড়াটির রক্ত-রাগটুকু মুহূর্তে অনুরাগ হইয়া সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

আশ্চর্য্য মানুষের মন, আবার দুই ফোঁটা জলও চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল; অধরে অতি মৃদু ম্লান হাসি।

ওই নিরুপায় মানুষটির অক্ষমতার বেদনা শতগুণ হইয়া মনে বাজিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি সাতু ঠাকুরঝির বাড়ি শাঁখা পরিতে ছুটিল।

ঠাকুরঝি, শাঁখা জোড়াটি পরিয়ে দাও ভাই।—বলিয়া কাপড়ের পাড়-জড়ানো হাত দুইখানি নিঃসঙ্কোচে বাহির করিয়া দিল।

সাতু কহিল, পৈঁছা কি হ'ল লো, হাতে পাড় জড়ানো?

দীর্ঘ অনশনের পর অর্দ্ধাশনের তৃপ্তিতেই মানুষ ক্ষুধার দুঃখ ভোলে; শাঁখা দিয়াছে—এই সুখে, পৈঁছা গিয়াছে—এ দুঃখ, দামিনীর মনে ঠাঁই পাইল না; সে অম্লান বদনে মিথ্যা বলিয়া গেল, খিল ছেড়েছে, তাই খুলেছি।

সাতু মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, যাই বলিস ভাই বউ, গোষ্ঠদাদা বড় মেগো।

কেন লা?

এই দেখ্ না, পৈঁছা খুলতে না খুলতে রাঙা শাঁখা, বোন হ'লে পাঁচ দিন লাগত। এই বলিয়া সাতু ছড়া কাটিয়া উঠিল—

"রাঙা হাতে রাঙা শাঁখা দেখতে ভাল বাসি হে।"

দামিনী আনন্দ-কৌতুক কোপ করিয়া উঠিল, মর্, মর্ ভাই-স'গী।

সাতু আবার ছড়া কাটিয়া লইল—

"ভাইয়ের সোহাগ বউ নিয়েছে, বোন হয়েছে সুখের কাঁটা।
বউয়ের বেলা শাঁখা শাড়ি, বোনের পিঠে ঝাঁটা।"

মর্, এতও জানিস।

না জানলে বউ জব্দ হয় কি ক'রে? কই, হাতা দে দেখি, বেলা

থাকতে পরিয়ে দেই; ল্যাম্পোর আলোতে রাঙা হাতের শোভা দেখে দাদার আশ মিটবে কেন?

দামিনী হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল, ভারী দুষ্টু হয়েছিস, দাঁড়া, এবার নন্দাই আসুক, ব'লে দোব।

সাতু শাঁখা পরাইতে পরাইতে কহিল, কি বলবি?

বলব,—উঃ, আস্তে আস্তে লো,—ব'লে দোব, সাবধান হ'য়ো ভাই, তোমার গিন্নীর ভারী নজর ভাইয়ের ওপর। দেখবি, আর পাঠাবে না। উঃ উঃ, না না, আর বলব না, উঃ।

কথার মাঝেই সাতু বলিতেছিল, বলবি, বলবি আর, বল, নইলে আরও জোরে—এ—এই হয়েছে, নে চোখ মোছ।

শাঁখার চাপে দামিনীর চোখে জল আসিয়াছিল।

সাতু কহিল, মাইরি বউ, তোকে যা লাগছে ভাই, কি বলব! মুখখানা সিঁদুর-মাখা, চোখের পাতা ভারী! যা যা, ছুটে যা, এই রূপ নিয়ে দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়া; আর শাঁখা-পরা রাঙা হাত ছুতোনাতা ক'রে মুখের উপর নেড়ে দিগে। উঃ।

দামিনী সাতুর পিঠে একটা কিল বসাইয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

সাতু কহিল, বটে, এই বুঝি শাঁখা পরানোর বানি?

গোষ্ঠ দাওয়ায় বসিয়া ধার-করা তামাকটুকু টানিতেছিল আর ভাবিতেছিল, লোকটা কে? সুবল? কিন্তু সুবলের দুয়ার তো বন্ধ, শিকল পর্য্যন্ত নড়ে না। সে হইলে দুয়ার বন্ধ করার শব্দ তো হইত, অন্ততঃ শিকলটাও নড়িত। তবে কে?

দামিনী সাতুর বাড়ি হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়াই গোষ্ঠকে দেখিয়া সানন্দ কৌতুকে থমকিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া কহিল, দ্যাৎ, সাড়া দেয় না, এমন লোক!

গোষ্ঠ উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখে, দামিনীর পিছনে কে।

দামিনী কিন্তু ওদিকে খেয়াল করে না। মনে তাহার তখন রসের মাতামাতি!

রূপের উপচারে দেবতাকে অঞ্জলি দিতে সাধ হয়, শাঁখা-পরা হাত দুইখানি মেলিয়া দিয়া কহিল, দেখ দেখি, কেমন হয়েছে!

বীণার আ-বাঁধা তার ঘা খাইলে বেসুরা ঝঙ্কারই তুলিয়া থাকে, গোষ্ঠর সন্ধান-ব্যগ্র সন্দিগ্ধ মন শাঁখা দেখিয়া শোভায় মুগ্ধ হইল না, বাঁকা চোখে তীব্র দৃষ্টিতেই চাহিল। পাইল কোথা? সম্বল তো সবই জানা। চট করিয়া মনে পড়িল, আবছা-দেখা লোকটাকে সুবল বলিয়াই মনে হইয়াছিল; তবে শাঁখার গায়ে এখনও অস্পষ্ট হাতের ছাপ—ও সুবলের ছাপ বলিয়াই গোষ্ঠর প্রত্যয় জন্মিয়া গেল।

সে দামিনীর হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

দামিনীর লাজ-রক্তিম আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি মুহূর্তে শবের মত বিবর্ণ হইয়া গেল।

ভিতরে রুগ্ন ছেলেটা একটা গভীর যন্ত্রণাকাতর শব্দ করিয়া উঠিল, উঃ, মা গো!

দামিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরের দিকে চলিল।

উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপে চলিতে দুয়ারের চৌকাঠে হুঁচোট খাইল, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিবার তাহার অবসর ছিল না; সে আর্ত কণ্ঠে কহিল, কি হ'ল ধন, আজ যে ভাল ছিলে বাবা।

ছেলেটা ওই যে 'মা গো' বলিয়া ডাকিল, ওই শেষ ডাক, তারপর আর ডাকিল না।

এমন একটা প্রবল জ্বর আসিল যে, কঙ্কালসার দেহখানা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, নাভি হইতে বুক পর্য্যন্ত দুঁপিয়া দুঁপিয়া উঠে; শীর্ণ হাতখানায় বুঝি অবশিষ্ট সব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেহের সকল আবরণ ঘুচাইতে চাহিল; যেন ওই তুলার আবরণ পাষাণের ভারে বুকে চাপিয়া বসিয়াছে।

বসিয়াছিল সে মরণ।

তিলে তিলে বিন্দুর পর বিন্দু ভার বাড়াইয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় দেহখানার সকল স্পন্দন নীরব করিয়া দিল।

দামিনী বুক চাপড়াইয়া মেঝের 'পরে আছাড় খাইয়া পড়িল, আর্ত মাতৃকণ্ঠে মরণের বিজয়বার্তা ঘোষিত হইয়া গেল; নিশীথে নিস্তব্ধ পল্লীটার আকাশ বাতাস শিহরিয়া উঠিল।

গোষ্ঠ উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, রাক্ষুসী, সর্বনাশী, তুই আমার ছেলে খেলি: তোর পাপেই আমার ছেলে গেল। সর্বনাশী, ছেলের চেয়ে তোর সুবল বড় হ'ল, একজোড়া শাঁখা বেশি হ'ল?

ওই একটা কথায় নারীর সন্তানের শোক পর্য্যন্ত মূক হইয়া গেল, কে যেন বুকের উপরে পাহাড় চাপাইয়া দিল।

অসাড় নিস্পন্দ পাষাণপিষ্টের মত যেখানে পড়িয়া ছিল, সেইখানেই সে পড়িয়া রহিল, মৃত সন্তানটাকে বুকে টানিয়া লইতে পর্য্যন্ত পারিল না।

রাঙা শাঁখা জোড়াটা অন্ধকারের মাঝেও আগুনের মত জ্বলিতেছিল, না, দামিনীর মনের মাঝে জ্বলিতেছিল, কে জানে! সহসা শাখা জোড়াটা আপন কপালে সজোরে ঠুকিয়া সে ভাঙ্গিয়া দিল।

তারপর আবার অসাড় নিস্পন্দ।

শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস-মাখানো একটি মৃদু কথা বুঝি জোর করিয়াই বাহিরে আসিতেছিল, মা, উঃ মাঃ!

বাহিরে ঝরিতেছিল জল। বর্ষণমুখর শ্রাবণ রজনীর ওই মৃদু কণ্ঠ ঘরের দাওয়ায় গোষ্ঠর কান পর্য্যন্তই পৌঁছিতেছিল না, তা পাড়া-প্রতিবেশীর নিদ্রাভঙ্গ হয় কি করিয়া!

আসিল শুধু সাতু। দামিনীর প্রথম বুকভাঙ্গা আর্তস্বর তাহার কানে গিয়াছিল, সে যখন আসিল তখন দামিনীর কান্না থামিয়া গিয়াছে, সে পাথরের মত পড়িয়া আছে।

আরও একজন আসিল, সে সুবল।

সে সাতুরও আগে আসিয়াছিল, কিন্তু প্রবেশমুখেই উন্মত্ত গোষ্ঠর কথা কয়টা শুনিয়া আর ঘরে ঢুকিতে সাহস করে নাই, ঘরের পিছনে ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়াছিল।

সাতু কহিল, বউ, একটু কাঁদ্ কেন ভাই।

দামিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, না ঠাকুরঝি, আমিই খোকাকে মেরে ফেলেছি।—বলিয়াই হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, নীরব রোদন, অশ্রুরই ধারা শুধু।

সাতু সান্ত্বনা দিল না, দিবার প্রয়াসও করিল না।

কতক্ষণ পরে আবার দামিনী কহিল, ঠাকুরঝি, জল হচ্ছে বুঝি?

সাতু কহিল, আড়া-বিষ্টি জল, মাঠ ঘাট ভেসে গেল। পুকুর গড়ে সব ভ'রে উঠেছে।

দামিনী ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, আমাদের গড়েও তবে ভরেছে?

শঙ্কিত কণ্ঠে সাতু তিরস্কার করিল, পোড়ারমুখী দাদার হাতে শেষে কি দড়ি পরাবি নাকি? ছি!

তারপর সব চুপ, কথা যেন সব হারাইয়া গেল।

শুধু কয়টি প্রাণীর দুঃখদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস, সে যেন শ্মশানের বুকে কঙ্কালের মালার মাঝ দিয়া বায়ুপ্রবাহ।

জীর্ণ কাঁথার উপরে ছেলেটার শব।

শ্মশানখানা যেন ঘরের বুকেই প্রকট হইয়া উঠিল।

জীবন তাহা সহিতে পারে না, দূরে সরাইয়া দিতেই হইবে।

আগে কহিল সাতু, দাদা, ছেলেটার তো একটা গতি করতে হবে।

গোষ্ঠ কহে, হ্যাঁ, কিন্তু যে জল—

দামিনী কথা কহে না, মা—হয়তো সন্তানের শব সবার শেষ পর্য্যন্ত বুকে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে, কিন্তু অবশেষে তাহাকেও তাহা ত্যাগ করিতে হইবেই।

জীবন মরণের ভয়েই অস্থির, তাহার সান্নিধ্য সহিবে কেমন করিয়া ?

সাতু কহে, পাড়ায় ডাক।

বর্ষণের পানে আঙুল দেখাইয়া গোষ্ঠ বলে, বাইরেও কি হচ্ছে দেখছিস ?

তা ব'লে তো বাসী ক'রে ফেলে রাখে না। দাঁড়াও, আমি ডাকি।

সাতু উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল, মহান্ত !

দামিনী দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, না।

গোষ্ঠ কহিল, দাঁড়া, আমি পাড়ায় ডাকি।

সাতু কহিল, ডাকলেই আসবে ?

দামিনী কহিল, আর কেউ আসবে না।

সাতু কহিল, এলে ওই আসবে ; এ জলে আর কেউ আসবে না।

ততক্ষণে লোকটি আসিয়া পড়িয়াছে ; ভিজিতে ভিজিতে সুবল আসিয়া কহিল, আমাকে ডাকছিলে ?

ছেলেটা নষ্ট হয়েছে, তার গতিটা ক'রে দাও ভাই।

আর কে যাবে ?

দাদাই যাবে, আর কে যাবে বল ? এস, নাও, তুলে নাও, আর দেরি ক'রো না।

সুবল বিব্রত হইয়া কহিল, তুমি এনে দাও মায়ের কোল থেকে।

সাতু কহিল, এস তুমি। বউ মরার মত প'ড়ে আছে এক পাশে !

সুবল ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সত্য সত্যই দামিনী মড়ার মত পড়িয়া !

তাহার চোখে জল আসিল ; তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বিছানা শুদ্ধ ছেলেটিকে তুলিতেই চোখে পড়িল কয়টা শাঁখাভাঙা টুকরা, রাঙা টকটকে, আগুনের মত ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে যেন।

ধকধকে টুকরা কয়টা অঙ্গারের মত দাহে বিছানা ভেদ করিয়া তাহার অঙ্গ যেন পোড়াইয়া দিল।

ইচ্ছা করিল, ওই মরা ছেলেটাকে দামিনীর বুকে আছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়, বলে, উপেক্ষার বিনিময়ে কি উপকার পাওয়া যায়?

সাতু পিছন হইতে বলে, নিয়ে যাও মহান্ত, নিয়ে যাও, মা কি ওই দেখতে পারে! বউ কেমন করছে।

সুবলের আর চিন্তার অবসর থাকে না, অন্ধকার বর্ষণমুখর শাঙন-রাতির সেই তাণ্ডবের মাঝে শব বুকে সে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সাতু কহিল, দাদা।

গোষ্ঠ সুবলের পিছন ধরিয়া কহিল, চল মহান্ত।

সাতু দামিনীকে ঠেলা দিয়া কহিল, বউ, বউ, বউ!

উত্তর নাই।

মুখে চোখে জলের ছাঁট দিতে দিতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সাতু কহিল, জাগিস নে হতভাগী, আর জাগিস নে।

ভাগ্য নিষ্ঠুর, দামিনীর জুড়ানো হয় না; সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জাগে।

গোষ্ঠ ও সুবল রাস্তায় জল ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে শ্মশানের দিকে চলিয়াছিল।

মাথার উপর অবিরাম বর্ষণ আর দুরন্ত বাতাস; হাড়ের ভিতর অবধি কনকন করিতেছিল।

খান বিশেক মাঠ পার হইয়াই আর পথ নাই, মাঠ নাই, জল—শুধু জল, আর জলপ্রবাহের একটা কল-কল্লোল।

সুবল কহিল, বান।

পায়ে কাঠকুঠার মত কি সব ঠেকিতেছিল, বিদ্যুৎচমকে সেগুলা চেনা যায়—পোড়া কাঠ, অঙার রাশি, ওই যে একটা কঙ্কালও।

গোষ্ঠ কহিল, শ্মশানে এসেছি না কি মহান্ত?

না, বানের ঠেলে শ্মশানটা এগিয়ে এসেছে। কথাটা শেষ হয় না, ওইটুকু বলিয়া বক্তাও শিহরে, শ্রোতাও শিহরে।

সুবল আবার বলে, তা—হ'লে—

স্বর বুঝিয়া গোষ্ঠ উত্তর দিল, হ্যাঁ, দাও তা হ'লে এইখানেই—

সুবল নামিয়া গিয়া বন্যার প্রবাহের মুখে শবটা ছাড়িয়া দেয়।

গোষ্ঠ গম্ভীর কণ্ঠে কহে, যা, চ'লে যা, তুইতো জুড়লি। আমার বুকে জ্বলে চিতে জ্বলুক।

ভাবুক বাউল উদাস সুরে গান ধরিল, "শ্মশান ভালবাসিস ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি।"

গোষ্ঠ ধীরে প্রশান্ত কণ্ঠে কহে, শ্মশান তো বুকে বুকে, ঘরে ঘরে, কিন্তু মা আসে কই, নাচে কই মহান্ত? ফাঁকি, ও সব ফাঁকি, ও সব মানুষের মন-গড়া কথা।

দুঃখের দিনে চরম নগ্ন বাস্তবতার মাঝে, মানুষের আশা-প্রত্যাশা আকাঙ্ক্ষা, সর্বরিক্ত মন, পরম প্রত্যক্ষ সত্যের সন্ধান চায়।

যুগে যুগে পিষ্ট দারিদ্র্য দেবতার সন্ধান পায় না, সে কয়, সব ফাঁকি, মানুষের রচা কথা ওসব।

গোষ্ঠ আবার বলে, এ এইবার সবাই বুঝেছে, সবাই বলবে, দেখো।

ওই উপলব্ধি হয়তো সত্য: ওই বাণী বলিবার জন্যই যেন বিশ্ব-মানবের অন্তর প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছে।

মানুষ জন্মায় ক্ষুধা লইয়া, সে ক্ষুধা তাহার মরণ অবধি মেটে না; মরণেও তাহার লয় নাই; মানুষ মরে, অতৃপ্ত ক্ষুধা তাহার ধরণীর বুকে হা-হা করিয়া বেড়ায়, তাহার পর পুরুষের বুকে আশ্রয় লয়। এমনই করিয়া মানুষের ক্ষুধার আজ অন্ত নাই। দিনে দিনে সে অসহ লোলুপ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে।

আদি যুগে উদরের ক্ষুধায় মানুষে মানুষের মাংস খাইয়াছে, আজ ভোগের অতৃপ্ত ক্ষুধায় একটি জাতি অপর জাতির বুকের রক্ত অদৃশ্য শোষণে হরণ করে, আজ একটা মানুষেরই ক্ষুধা বোধ করি সমগ্র দুনিয়া গ্রাস করিয়াও মেটে না। ক্ষুধার তাড়নায় একের অপরের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ নাই; মানুষের ক্ষুধার তাড়নায় যীশুর সাধনা আজ ধর্মযাজকের কোমরে বাঁধা লোহার ক্রুসে নিস্পন্দ, ব্যর্থ; বুদ্ধের বাণী আজ পাষাণের গায়ে আখরের রেখায় মূক।

দিন দুই পর, তখনও গোষ্ঠর চোখের কোল হইতে অশ্রুর রেখা মুছে নাই, তাহার দুয়ারের সম্মুখ দিয়া ঢোল পিটিয়া দত্ত গোষ্ঠর জমি দখল করিতে চলিল।

অপরিসীম শোকের রুক্ষতায় বুকটা হু-হু করিতেছিল।

তাহার উপর বঞ্চনার, প্রতারণার ক্ষোভে সেথা জাগিয়া উঠে বিপুল ক্রোধ, সে যেন একটা ঘূর্ণি।

আগুনের শিখা যেন পাক খাইয়া মাথার দিকে ছুটে, জ্ঞান-বিবেচনার অবসর থাকে না। গা-ঝাড়া দিয়া গোষ্ঠ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে, ত্রস্ত পদক্ষেপে এদিক ওদিক কি সন্ধান করিয়া ফেরে। চায় সে লাঠি; মেলে না।

সে ছুটিয়া গিয়া উঠে ঠিক পাশের গাঁয়ের ভল্লাপাড়ায় রাম ভল্লার বাড়ি।

রাম লাঠি-খেলায় ওস্তাদ; সে জেল-খাটা দাগী, ভাল লোকে বলে, সে ডাকাত।

রাম বলে, বলুক, ভদ্দরলোককে না মানলেই সে ডাকাত। তা ডাকাত আমি।

ঝড়ের মত গোষ্ঠ আসিয়া কহে, ওস্তাদ, একগাছা লাঠি—

কথা শেষ করিতে পারে না, বুকের মোটা মোটা পাঁজরগুলা লাফাইতে থাকে।

পাঁচ হাত লম্বা মানুষটি, দেহে ভোগালো মাংস নাই, সব যেন হাড়, কিন্তু সেগুলা বাঁশের মত মোটা, বোধ করি লোহার মত শক্ত।

রাম বসিয়া তামাক খাইতেছিল।

সে জিজ্ঞাসাও করে না, কেন, কি বৃত্তান্ত। নির্বিকারভাবে আঙুল দেখাইয়া বলে, ওই মাচায় দেখ।

গোষ্ঠ মাচায় উঠিয়া লাঠি লইতে লইতে কহে, শালা দত্ত ফাঁকি দিয়ে ডিক্রী ক'রে আমার জমি দখল করছে ওস্তাদ।

রাম সেইরূপ নির্বিকারভাবে বলে, দুনিয়াসুদ্ধু ওই হাল গোষ্ঠ, সব যে পারে কেড়ে নেয়; সব ওই। একা আর ওর দোষ কি, আর দোষইবা কার; তুই আমি সবাই তো ওই চাই, তবে নিই না পয়সা নাই ব'লে, পারি না ব'লে।

সত্যই বুঝি ইহার জন্য মানুষকে দায়ী করা যায় না।

এ বুভুক্ষা যে তাহার সহজাত, এ ক্ষুধা তাহার জীবনের ধর্ম। তবে দায়ী কে?

রাম বলে, আমি দোষ দিই ভগবানের, চন্দ্রসূর্য্যির মত বড় বড় চোখ নিয়ে সে দেখছে কি? তার রাজ্যিতে এমন হয় কেন?

সত্য কথা, ইহার জন্য দায়ী জীব-জগতের জীব-ধর্মের স্রষ্টা যদি কেহ থাকে, সে। শিল্পের খুঁতের জন্য শিল্পী দায়ী, শিল্প নয়। সে শুধু অঙ্গহীন।

রামের মেয়ে হিমি গোষ্ঠর সমবয়সী, সে পাশের বাড়ি হইতে আসিয়া পিছন হইতে কহে, লাঠি হাতে যে; লাঠি কি করবে মোড়লদা?

তিক্তস্বরে রাম কহে, তোর মাথায় মারবে, লাঠি নিয়ে বেটাছেলে কি করবে!

কৌতুকে খিলখিল শব্দে হাসির কলরোল হিমির কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্তেই সে হাসি নীরব হইয়া গেল, যেন ঝরনা ঝরিতে ঝরিতে শুকাইয়া গেল।

গোষ্ঠ হিমির পানে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সে রুক্ষ মুখ, চোখের কোলের ওই কালো রেখা দেখিয়া হিমির হাসির ঝরনা শুকাইয়া গেল; সে শিহরিয়া কহিল, ও কি মোড়ল-ভাই, এ কি চেহারা?

গোষ্ঠ লাঠিগাছটা মাটিতে ঠুকিয়া দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতে করিতে কহিল, ছেলেটা, পরশু রেতে গেল।

হিমি আর্ত স্বরে কহিল, অ্যা! খোকা!

রাম ধমক দিয়া কহিল, হিমি, প্যানপ্যান এখন নয়, পরে করবি; মরদ লাঠি হাতে করলে কাঁদতে নাই। যা গোষ্ঠ, বেরিয়ে পড়্, দেখ, সঙ্গে যাব?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোষ্ঠ কহিল, ওস্তাদ, বড় ভাল হয়।

আর একগাছা লাঠি টানিয়া লইয়া রাম দাঁড়াইয়া কহিল, চল্।

রসিক দত্ত বাঁশের লগির মাথায় লাল পতাকা বাঁধিয়া গোষ্ঠর জমিতে পুঁতিয়া দখল লইতেছিল, বাঁশগাড়ি করিতেছিল। সঙ্গে জমিদারের নগদী, আদালতের পেয়াদা, নিজের রাখাল আর চুলী।

দত্ত মনে করে, এই বাহিনীই তাহার বিশ্বজয় করিবে; সে বলেও, জোর কি আমার রে, জোর আদালতের।

খাতকে কিছু বলে না, কিন্তু ছেলের দল ছাড়ে না, উত্তর দেয়, আর আদালত টাকার, তবে আর দত্তকে ঠেকায় কে?

শুধু টাকায় হয় না ধন, মামলায় মাথা চাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বকের মত লম্বা গলার উপরে ছোট্ট টেকো মাথাটি টিকটিকির মত নড়ে।

তা তোমার খুব আছে, বেড়ালের মত চোরা বুদ্ধি তোমার খুব; কাঁকুড়চুরি করা ক'রে চাকলার জমিটা নিলে বাবা। ম'রে যে কি হবে তুমি—

আর একজন বলে, বেণে ম'রে জোনাক পোকা, করে টিপির টিপ।

কেউ বলে, যখ, যখ হয়ে মাটির তলায় ব'সে টাকা গুণবে।

কেউ বলে, বাদুড়, বাদুড়, উল্টোমুখ ক'রে গাছে ঝুলবে।

কেউ বলে, সে তো ফিরে জন্মালে? যমপুরীর কথা বল, সেই গরম তেলে, ছ্যাঁক কলকল। তবে তো চামড়া উঠবে।

দত্তের ভয় এইখানে—গরম তেলের নামে লম্বা লিকলিকে শরীর-খানা আহত সরীসৃপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠে, গায়ে কাঁটা দেয়,

সে তাড়াতাড়ি বলে, ও হাসি তাম্‌সা নয়, বাবা হাসি তাম্‌সা নয়. ছাড়ান দাও, ছাড়ান দাও।

কেউ বলে, নয়ই তো, এ তো শাস্ত্রের কথা, খোদ বেদব্যাস।

দত্ত তাড়াতাড়ি পথ ধরিয়া কহে, যাস যাস, তামাক খাওয়াব, ভাল তামাক খাওয়াব—কাষ্ঠগড়ার, আট আনা সের।

একটা ছেলে পেছন হইতে এক আঁজলা জল দত্তর গায়ে ছিটাইয়া দিয়া কহে, ছ্যাঁক কলকল।

দত্ত আতঙ্কে লাফাইয়া উঠে, ইরেঃ, বাবাঃ!

দত্তর মন দমে, কিন্তু ক্ষুধা কমে না, সে বাড়িয়াই চলে।

আদালতের পেয়াদা কহে, কই দত্ত, নিশেন দেবে কে?

খোদ জমিদারের নগদী। কই রে, কত দূর আর?

নগদী কহে, হুই—ওঃ, বেঁকী লম্বা ফালিখানার উতোর মাথায়, হুই আঠারো কাঠা বাকুড়ি, কসকসে কালো ধান।

ঢুলিটা ঢোল পিটিয়া উঠে, ডুগডুগ।

দত্ত তাড়া দেয়, ম'ল রে বেটা মুচীর ডিম, ঢোল পিটতে লাগলি যে? ঢোল গলায় ঝুলিয়ে এসেছিস ঝুলিয়ে চল্, আসবার সময় গাঁয়ে একবার পিটেছিস, যাবার সময় একবার দু ঘা, বাস্, আইন রক্ষে।

গোপনের একটা অজ্ঞাত প্রয়াস কেমন আপনি আসে; মানুষের মন তো, বুকে একটু অপহরণের লজ্জাও জাগে, তারই তরে উচ্চ-ধ্বনিতে অধিকার ঘোষণা করিতে বোধ করি কেমন কেমন লাগে।

দত্ত বলে, হ্যাঁরে গোবিন্দে, জোলের সেই চার বিঘে বাকুড়ি, সেথায় চল্ না আগে।

নগদী বলে, চার বিঘে বাকুড়িতো গোষ্ঠর নয়, ও তো দেবেন্দ পালের, তারই ওপরে গোষ্ঠর বারো কাঠা একখানা।

অ্যাঁ, ওটা গোষ্ঠর নয়? ওই বাকুড়ির তবেই তো তোমার

এত আটুবাটু ; বলিস কি ? না না, তুই জানিস না, ও গোষ্ঠরই বটে।

তবে দাও গা তুমি ওই জমিতেই বাঁশ গেড়ে, তোমার তো কাজই ওই।

দত্ত খিঁচাইয়া উঠে, উঃ, বেটা আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে !

সহসা একটা ভীষণ রুদ্র গর্জ্জনে সব কয়টা লোক চমকিয়া উঠে। উঠিবারই কথা, এমন হাঁক মানুষের কণ্ঠনালী দিয়া বাহির হয় না।

সব চারিদিকে তাকায়, দুইটা লোক তীরের মত মাঠের পথে ছুটিয়া আসিতেছে, হাতে লাঠি, আর কণ্ঠে ওই হাঁক। ঢোলটা বগলে চাপিয়া মুচীটা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে, সঙ্গে সঙ্গে দত্তর রাখালটা, তাহার পিছনে পিছনে জমিদারের নগদী।

সে বলিয়া যায়, পালাও দত্ত পালাও, গোষ্ঠ আর রাম ভল্লা, দাগী ডাকাত, পালাও।

. আর সে কি বলে, শুনিতে পাওয়া যায় না।

দত্তর সম্মুখের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল আদালতের পেয়াদা, ঝপ করিয়া পাশের জমিতে লাফাইয়া পড়িয়া কাদায় কাদায় ছুটে। বকের মত লম্বা পায়ে ধানের পাতা জড়াইয়া জমির কাদার জলে দত্ত পড়িয়া গেল। উঠিবার অবকাশ হইল না, পাঁকে জলে পাঁকালমাছের মতই বেচারী হাঁপাল মারিয়া চলিতে চায়। বহু ব্যগ্রতায় উঠিয়া আবার ছুটে ; মুখের একপাশে কাদা লেপিয়া গিয়াছে, চোখে কাদা, দেখিতে পায় না, মুখে কাদা, থু-থু করিয়া ফেলিতে ফেলিতে ছুটে, দেখব শালাকে, থু, এমন কাণ্ড, থু, আদালতের হুকুম, অ্যাঃ থু-থু গোবর, না কি আর কিছু, অ্যা হ্যা-হ্যা থু-থু। যাঃ শালা, খোট খুলে গেল।

বিপদের উপর বিপদ। জলে কাদায় ভারী কাপড় লিকলিকে কোমরে থাকে না, কাছা খুলিয়া যায়, বেচারী দুই হাতে কোমরের

কাপড় চাপিয়া ধরিয়া ছুটে, ওদিকে ভিজা কাপড়ে পায়ে পা জড়ায়, শেষে দত্ত কাপড় বগলে পুরিয়া ছুটে।

রাম ভল্লা হা-হা করিয়া হাসিয়া সারা; পুত্রশোকের মাঝেও গোষ্ঠের হাসি পায়।

ওস্তাদ কহিল, তারপর, এইবার জমিদারের পালা, পারবি সামলাতে? না পারিস তো স'রে যা কোথাও।

গোষ্ঠ কহে, তুমি?

আমার কথা ছাড়, আমি ভিন গাঁয়ের; তার ওপর লোকে শুধু আমাদিগে ঘেন্নাই করে না, ভয়ও করে। তা হ'লেও আমিও দুদিন সরব, হিমিকে নিয়ে জামাইয়ের বাড়ি যাব।

তাই দেখি। কণ্ঠটা কেমন হতাশায় হিম, তাহার উত্তেজনা শীতল হইয়া আছে! আকাশপাতাল ভাবে, যাইবে কোথায়?

রাম কহে, ভাবছিস কি? না হয় গাঁ থেকে চ'লে যাবি। বলে না সেই, 'সমুদ্দে পাতিয়া শয্যা শিশিরে হ'ল ভয়'; তোর হ'ল সেই বিত্তান্ত।

গোষ্ঠ তবু নীরব, সে ভাবে।

রাম কহে, আর কি নিয়েই বা থাকবি গাঁয়ে, মেমতাই বা কিসের তোর? জমি তো তোর যাবেই, যমে ছুঁলে আঠার যা—তা এ তো মহাযম।

তবু ওস্তাদ, গাঁয়ে মায়ে সমান কথা।

তা হ'লে বাবা, আমার মত হতে হবে, বুকের পাটা আর লাঠি এই আশ্রয়, এই ছাড়া উপায় নাই।

তাই, তাই হবে ওস্তাদ।

গ্রাম প্রবেশমুখে ও পাড়ার নবীন মোড়ল কহে, গোষ্ঠ, পঞ্চাশ টাকা।

কি?

জরিমানা, গোমস্তা করেছে। আবার শেয়াল বেটা জমিদারের

বাড়ি তাকাত যাবে। তা দিলি দিলি, বেটার বগের মত ঠ্যাং দুটো সেরে দিতে নারলি? উই, উই যে বেটা, আড়ে আড়ে সরছে। ও দত্ত! দত্ত! দত্ত!

আবার বুকটা কেমন দমিয়া যায়, গোষ্ঠ বাড়ি আসিয়া সদর দরজায় খিল আঁটে।

চৈত্রের ঘূর্ণি ক্ষীণজীবি যে; আকাশ বাতাস ধরণী সব আগুন না হইলে ঝড় পরমায়ু পাইবে কোথা?

শ্রাবণ-গগনে মেঘ যেন পাগল হইয়া উঠিল।

বর্ষণ-মুখর মেঘলা দিনে মন আরও উদাস হইয়া উঠে, শোকাহত দুইটি প্রাণীর দিন নীরবে অতি দীর্ঘ হইয়া কাটে।

দামিনী ঘরের মাঝে, গোষ্ঠ দাওয়ায়; খাওয়ার উদ্যোগ পর্য্যন্ত নাই, বুভুক্ষা পর্য্যন্ত যেন মূক হইয়া গিয়াছে।

তারাহীন মেঘাচ্ছন্ন তামসী রাত্রি, দীপহীন গৃহ, সেও অমনই ধারায় কাটে।

তন্দ্রাচ্ছন্নতার মাঝে মেঘ ডাকে, গোষ্ঠ চমকিয়া উঠে।

দুয়ারে কে ঘা মারে না? ভ্রম ভাঙিলে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

দুয়ারে ঘা পড়িল; প্রভাত না হইতে জীর্ণ দ্বার সবল দম্ভ-ভরা আঘাতে ঝনঝন করিয়া উঠিল, মোটা গলায় হাঁক আসে, গোট্যা, আরে এ গোট্যা, হারামজাদা বদমাস!

প্রভাতের তন্দ্রা, সদ্য-যাওয়া ছেলেটার স্মৃতি, স্বপ্নে-দেখা তাহার কচি মুখ, শোক, শক্তি সব যেন ঝ'ড়ো হাওয়ার যুল-ঝরার মত ঝরিয়া পড়িল, গোষ্ঠ বিহ্বলের মত বলিয়া উঠিল, জমিদারের প্যায়দা, আমাকে ধরতে এসেছে।

দামিনী নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল, কিন্তু কথা কহিল না, ছেলে যাওয়ার চেয়েও যেন বড় বিপদের আশঙ্কায় বুকটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল।

দুয়ারে আরও জোরে ঘা পড়িল, শূয়ারকি বাচ্চা, খোল্ কেঁয়াড়ি।

গোষ্ঠ অস্থির হইয়া উঠিল, মনে পড়িল, হাতের উপর ইট, নাল-মারা জুতা, বুকে কাঠ, ওঃ, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে যে!

আবার খাজনা, তাহাও বাকি; মনে পড়ে খাজনা, মামুলী চাঁদা, সেস, সুদ, চেকের দাম, নজরানা, তলবানা, তহুরী, আমলা-খরচ, থিয়েটারবৃত্তি।

বাবের আর অন্ত নাই, সে বাবের এক কানাকড়িও মাফ নাই। সব লোলুপ গ্রাসে হাঁ করিয়া বসিয়া আছে, অনন্ত ক্ষুধায় শ্মশানের কুকুরগুলার মতই জিভগুলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, লালসায় উষ্ণ বিষের মত লালা গড়াইতেছে।

গোষ্ঠর দেহের হাড়গুলা অবধি কনকন করিয়া উঠিল, উঃ। এতগুলা তীক্ষ্ণ হিংস্র দন্তপাটিতে এই জীর্ণ হাড় কয়খানা পিষিয়া ফেলিবে যে!

সে ত্বরিত পদে খিড়কির দুয়ারপানে ছুটিল, মৃদুকণ্ঠে কহিল, ব'লো, ঘরে নাই, কোথা জানি না।

মায়ের বুকেও সন্তান য়াওয়ার বিপুল বেদনা উবিয়া গিয়া আশঙ্কার মেঘ গুরুগুরু করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

দামিনী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, ততক্ষণে আত ন্তর্পণে খিড়কির দুয়ার খোলার শব্দ উঠিল।

দামিনী চীৎকার করিয়া ডাকিতে যাইতেছিল, ওগো!

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে জীর্ণ দুয়ারখানা মড়মড় শব্দে ভাঙিয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে দরজা মাড়াইয়া ঘরে ঢুকিল জমিদারের খোট্টা চাপরাসী।

বিভীষণ হিংস্র চেহারা, মুখখানা হইতে দেহের কাঠামো পর্য্যন্ত হিংস্র বুল্‌ডগের মত, মুখখানা থ্যাবড়া, দেহখানা বেঁটে-বেঁটে, গিঁট গিঁট পা দুই পাশে বাঁকা-বাঁকা। গলায় আওয়াজ পর্য্যন্ত ওই কুকুরগুলার মত মোটা বীভৎস।

সে বলিতেছিল, লুকইয়ে রইবি, লুকইয়ে বাঁচবি শালা, হাঁড়ি পাকড়কে লুকইয়ে বাঁচবি, ·মতলব তেরি?—বলিতে বলিতে সে সটান ঘরে ঢুকিয়া চারিদিকে দেখে।

কাঁথা বিছানা বালিস উল্টাইয়া দেয়, মাচার জিনিষগুলা টানিয়া নীচে ফেলে, লাঠির ডগায় হাঁড়ি উল্টাইয়া ভাঙিয়া ঘরখানাকে তছনছ করিয়া ফেলে।

আরে, এ শালা তব্ গেইলো কোথা? ভাগলো, না কা?

কণ্ঠে তাহার যেন লুকোচুরি-খেলার কৌতুক ঝরিতেছিল।

দামিনী এই অবসরে উঠানে নামিয়া কোথায় যাইবে ভাবিতেছিল, সহসা পিছন হইতে খোট্টাটা অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া উঠিল, তুহভি ভাগবি মতলব, তোক্রাকে হামি লিয়ে যাবে কচহারি, চল্।

বলিয়া হাসিতে হাসিতে জিভ বাহির করিয়া আগাইয়া আসে, শ্মশানের কুকুরগুলা ঠিক অমনই ভাবেই লোল জিহ্বায় কোলাহল করিতে করিতে শবগুলার পানে আগাইয়া যায়।

কঙ্কালের মধ্যে যেটুকু· জীবনের অবশেষ অশেষ কষ্টে বাঁচিয়া থাকে, সেইটুকুই চিৎকার করিয়া উঠে, যতটুকু শক্তি তাহার থাকে, নিঃশেষে প্রয়োগ করিয়া ছুটে।

কোথায়? কোন্ দিকে?

পথহারা নারী, গোষ্ঠের পদরেখা ধরিয়া খিড়কির পানেই ছুটিল।

দুর্বলা, আত্মহারা নারী, তাহার গতি কতটুকু, ওই হিংস্র জানোয়ারটার সলক্ষ অনুসরণের কাছে কতক্ষণ?

খিড়কির ঘাটের কাছেই খোট্টার বীভৎস হাসিটা ঠিক কানের কাছেই বাজিয়া উঠিল; উপায়হীনা দামিনী সুবলের ঘরেই ঢুকিয়া পড়িল।

প্রাণের দায়ে মানের জ্ঞান হাজার-করা একটা লোকেরও থাকে কি না সন্দেহ।

সকল সংসার ডুবিয়া যায়; জীব জীবধর্ম লইয়া জাগে সেখানে।

খোট্টার ভয়ে দামিনী মানমর্য্যাদা সব ভুলিয়া সুবলকে সবলে জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, মহান্ত, আমাকে বাঁচাও।

সুবল সকল হিয়া উজাড় করিয়া দিল, ভয় কি, ভয় কি?

ওদিকে খোট্টাটা দাঁড়াইয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছিল আর কহিতেছিল, হামরাকে ধর গো হামরাকে ধর, ঐসিন করকে হামরাকে ছাত্তি' পর আ যাও, ডর কুছ রহবে না।

ওই একটা কথায় স্থান কাল পাত্র সমস্তটার রূপ পাল্টাইয়া যায়; শুধু বাহিরের নয়, অন্তরের মাঝেও আর একটা পর্দ্দা খুলিয়া যায়, হৃদয়ের সমস্ত কদর্য্যতা অস্থির হইয়া উঠে।

দামিনী সুবলকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়; সুবলের বুকের ভিতরটা একটা উদ্দাম ক্ষুধায় তোলপাড় করিয়া উঠে।

দামিনীর অঙ্গের ওই কোমল স্পর্শ শিরায় শিরায় আগুন ধরাইয়া দেয়, সে খোট্টাকে কহে, মেয়েমানুষকে—

আর মেইয়ামানুষ, ওক্‌রাকে হামি জরুর লিয়ে যাবে, ওক্‌রা ভাতারকে জরমানা কৌন্ দিবে? উ শালা ভাগিয়েসে তো ওক্‌রাকে হামি লিয়ে যাবে।

দামিনী অস্থির হইয়া উঠে।

সুবলও জরিমানার টাকা কয়টা দিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠে। এ যেন দামিনীকে কিনিবার একটা সুযোগ।

খোট্টাকে একটা টাকা দিয়া সে কহিল, চলো সিংজী, ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি দিয়ে আসছি। কত জরিমানা?

টাকাটা বাজাইতে বাজাইতে খোট্টা কহে, পচাশ—পচাশ রূপইয়া, কৌড়ি না কম। আউর খাজনা, উ ভি পচিশ তিশ হোগা।

আর সে তাগিদ করে না, হাসিমুখে চলিয়া যায়। ঠিক যেমন চীৎকার-রত কুকুরকে, এক টুকরা হাড় ছুঁড়িয়া দিলে সকল রব বন্ধ করিয়া হাড়মুখে রাস্তা ছাড়িয়া সে চলিয়া যায়, তেমনই ভাবে।

দামিনী কহিল, টাকা তো নাই মহান্ত।

সুবল সলজ্জ অস্থিরভাবে কহিল, তার জন্যে তু—তুমি ভেবো না।

তা—তা সে কথা কি কাউকে বলে? বলিয়া সে লজ্জায় রাঙা হইয়া টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

পাপ, সাপের মতই তাহার প্রকৃতি, গোপনতার মধ্যে তাহার বাস, তাই মানুষ গোপনতার আড়ালে যে ক্রিয়া দেখে, তাহাকেই পাপ বলিয়া সন্দেহ করে।

দামিনীও সুবলের এই টাকা দেওয়ার সত্য গোপনের প্রয়াসে পাপের ছাপই দেখিতে পাইল, তুনিয়ার দয়াধর্ম সব যেন বীভৎস কুৎসিত কালিতে কালো হইয়া গেল।

বুকখানা কেমন অস্থির হইয়া উঠে, বিনিময়ে সে যে দিবার কিছু খুঁজিয়া পায় না।

তবে?

নিরুপায় মন বলিয়া উঠে, তবে আর কি, এ তো ঋণ লওয়া হইল না, সেদিনের মত তুইটি টাকার দাদনও এ নয়—এ দাম, দাম, তোমার দাম, বিকাইলে, তুমি বিকাইলে।

দামিনী যেন উন্মাদ হইয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া উঠিল, না না না, মহান্ত না।

কিন্তু কোথায় মহান্ত, সে তখন চলিয়া গিয়াছে।

দামিনী ছুটিল, না না, মহান্ত, না। খিড়কির ঘাটে আসিয়াও দেখিল, সুবল নাই; দামিনীর ইচ্ছা হইল, ওই ভরা ডোবাটার বুকে লুকায়।

কিন্তু কে যেন পিছন হইতে টান দিয়া কহিল, বিকাইয়াছ যে!

দামিনী বিহ্বলার মত ফিরিতেই দেখিল, আঁচল টানিয়া ধরিয়াছে সাতু।

ছিঃ বউ!

দামিনীর বুকখানা গুরগুর করিয়া উঠিল।

সাতু ছিছিকার করে কেন? তবে কি এই বিকিকিনির কাহিনী—

দামিনীর বাক্য ফুটিল না, সাতুর মুখপানে চাহিয়া রহিল—বিহ্বল দৃষ্টি।

সাতু কহিল, ছি বউ, দাদার কি সর্বনাশই করবি, হাতে দড়িই দিবি? গাছের সব ফল কটাই কি থাকে? ভাগ্যে আমি গলা শুনে এসেছিলাম, নইলে কি হ'ত বল্ দেখি? ভগবান রক্ষে করেন, কাল থেকে আমি ও-পাড়ার মাসীর বাড়িতে ছিলাম, এসে কেবল বাড়িতে পা দিয়েছি, আর শুনি 'মা মা' ব'লে তুই চেঁচাচ্ছিস। সব্বনাশ, সব্বনাশ। আয়, ঘরে আয়, বুক বাঁধ্, সব হবে আবার।

দামিনী সাতুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল, কি হবে ঠাকুরঝি?

মাথায় হাত বুলাইয়া সাতু কহিল, হবে আবার কি, সব হবে, একবার যখন কোঁক ফলেছে, তখন আবার হবে, খোকা তোর বেড়াতে গিয়েছে। নে, বুক বাঁধ্, সব হবে। ও মা, চুলে যে জট পড়েছে লো, আয় দেখি, চুল কুঁড়ুলে দি, ব'স।

চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া ফাঁস ভাঙিতে ভাঙিতে সাতু গল্প করে, দামিনীর কিন্তু কানে যায় না, সে যেন ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠে।

সাতু যাইবার সময় কহে, এই নে, এ দুগাছা রাখ্, ভাল কাজে দিস, তার ভাল হবে, না হয় মা ষষ্ঠীকে নোটন গড়িয়ে দিস, সেদিন আমি নিয়ে রেখেছিলাম। ছেলেটার সেই জীর্ণ বালা দুইগাছা। সাতু দামিনীর আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া যায়।

এদিকে আকাশে বুঝি ভাঙন ধরে—ঝরঝর অবিরাম ধারা।

দামিনী আশ্বাসে বুক বাঁধিতে চায়, কিন্তু বাঁধা যায় না। উপায়ের বাঁধ পাইলে তো নিরুপায়ের ভাঙন বাঁধা যায়, কিন্তু উপায় যে দামিনী পায় না। মনে হয়, স্বামী শোধ দিবে।

পরক্ষণেই মনে পড়ে, কাবুলীর ভয়ে ঘরে খিল দেওয়া, সন্তানের চিকিৎসার সম্বল মহাজনের হাতে সঁপিয়া দেওয়া, জমিদারের ভয়ে পালানো—হতাশের ভাঙন দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়।

মনে হয়, সুবল আসিয়া হয়তো—। দামিনীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতে চায়, কিন্তু সে শক্তিও যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

খুটখুট।

বুকের স্পন্দন বুঝি নিস্পন্দ হইয়া গেল, বুঝি সে আসিল।

অতিকষ্টে ফিরিয়া দেখে, কাকটা ঘর-নিকানো পেলেটার কানায় বসিয়া সেটা উল্টাইয়া দিল।

স্বস্তির একটা নিশ্বাস বুকখানাকে হাল্কা করিয়া দেয়। আঃ! চিন্তায় চিন্তায় চিন্তার বস্তু হারাইয়া যায়, লক্ষ্যশূন্য একাগ্র দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া থাকে।

আবার শব্দ হয়, দামিনী চমকিয়া যেন জাগিয়া উঠে, এবার রোঁয়া-ওঠা শীর্ণ কুকুরটা ঘরে ঢুকিয়া গিন্নীপনা করিতেছে দেখা যায়। মর্মদাহী চিন্তার গুমোটের মাঝে স্বস্তির বাধা পাইয়া দামিনী যেন বাঁচিয়া যায়, যতক্ষণ পারে অবসরটুকু ধরিয়া রাখিতে চায়।

কুকুরটাকে তাড়ায়, দূর দূর।

পরমুহূর্তেই আবার চিন্তায় ডুবিয়া যায়; কুকুরটা বাহির হইল কি না, সে খেয়াল আর থাকে না।

ওই বাধার ক্ষণটুকু জলমগ্নের প্রাণপণে মাথা তুলিয়া নিশ্বাস লওয়ার মত ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী।

ক্ষণের পাখায় সময় চলে, সে বোধও নারীটির থাকে না।

আবার শব্দ হয়, এবার সত্য সত্যই সুবল আসিয়া দাঁড়ায়;—অস্থির ভঙ্গী, দৃষ্টি কেমন।

সমস্ত শরীর দামিনীর কেমন করিয়া উঠে।

সুবল কহিল, দিয়ে এলাম।

উত্তর যোগায় না, কণ্ঠ যেন রুদ্ধ, একটা কাজ পাইবার জন্য দামিনী ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এই রসিদ।—একখানা কাগজ সুবল নামাইয়া দেয়।

দামিনীর হাত যে অবশ, কাগজখানা পড়িয়াই রহিল।

তবুও যে সুবল যায় না।

তবে ?

বিনিময় চাহিবে, দাম দিয়াছে, দেহ চাহিবে !

বউ !—সুবলেরও কথা যোগায় না, কানের পাশ দিয়া আগুন ছুটে, বুকের ভিতরটা টগবগ করিয়া ফুটে।

বউ ! এবার সুবল দামিনীর হাতখানা চাপিয়া ধরে, সুবলের হাতে যেন আগুন ছুটিতেছে, আর এ যেন হিম, অহল্যার দেহ বুঝি পাষাণ হইতে শুরু করিয়াছে।

তবু দামিনী অস্থির চঞ্চল কণ্ঠে কহিল, তোমার পায়ে পড়ি, এখন যাও।

সুবল বেত্রাহতের মত পলাইয়া গেল।

সুবল গেল, কিন্তু সুবলের অস্তিত্বের আভাস গেল না ; ও-বাড়িতে খুট শব্দ হয়, অস্থির পদশব্দে তার বুকের কথা দামিনীর কানে বাজে।

সে শব্দ খিড়কির দুয়ার পর্য্যন্ত আগাইয়া আসে, কখনও গোষ্ঠর বাড়ির দুয়ার পর্য্যন্ত, আবার ফিরিয়া যায়।

এমনই সারাটা দিন, সন্ধ্যায়ও তাহার বিরাম নাই।

গ্রাম নিষুতি হইয়া আসিল, পদশব্দ আরও আগাইয়া আসে, রাত্রি অন্ধকার, দামিনী কাঠের মত বসিয়া।

নীরবে দুইখানা হাত দামিনীর হিমানী-শীতল দেহখানা জড়াইয়া ধরিল, সর্বশরীরে সে যেন ক্লেদাক্ত সরীসৃপের স্পর্শ। নারী দেহখানা আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিল।

* * * *

রাত্রি শেষ হইয়া আসে, দামিনী তেমনিই নিস্পন্দ বসিয়া।

কিন্তু অন্ধকার যত তরল হইয়া আসে, দামিনী তত অস্থির হইয়া উঠে, মাটির বুকে লুকাইতে সাপের গর্ত্তের মত একটা গর্ত্ত খোঁজে, স্যাঁৎসেঁতে, ময়লা, ছোট। কিংবা এই রাত্রিটা যদি প্রভাত না হয়, এই অন্ধকার যদি বৎসর, যুগ, না, প্রলয়ান্তব্যাপী হয় !

আঃ, তাহা হইলে বাঁচে সে।

সম্মুখেই সেই কাগজখানা পড়িয়া, সুবলের দেওয়া সেই রসিদটা, সেটা সে স্পর্শ করিতে পারে না। এক দৃষ্টে দেখে।

মনে হয়, ওই কালো কালো গুটি গুটি দাগের মধ্যে তাহার ওই ইতিহাস লেখা আছে।

শরীর মন শিহরিয়া উঠে।

আবার কাহার টিপিয়া টিপিয়া পা ফেলার শব্দ হয়; দামিনীর বুকে আর উদ্বেগ জাগে না।

বাবা, যে বান! কে?

শ্বেতবস্ত্রাবৃত দামিনীকে দেখিয়া গোষ্ঠ চমকিয়া উঠে; তারপর চিনিয়া বলে, ও, তুমি! খোট্টা আর আসে নাই?

দামিনী কথা কয় না।

একবার মনে হয়, ওই রসিদখানা আগাইয়া দেয়, চীৎকার করিয়া অভয় দেয়, ভয় নাই ভীরু, ভয় নাই।

আবার নিজেরই ভয় হয়, অতি যত্নে কাগজখানাও লুকাইয়া ফেলিতে ব্যগ্রতা জাগে। কিন্তু দুটোর একটাও হয় না, কাগজখানা স্পর্শ করিতে পারে না; অন্তরের অহল্যা বুঝি পাষাণই হইয়া গিয়াছে।

গোষ্ঠ বলে, যে বান, গাঁয়ে ঢুকল ব'লে। ক্ষণপরে আবার কহে, আর গাঁয়ের পিতুল নাই, বানের আগে শ্মশান এসে গাঁয়ে ঢুকছে।

ব্যগ্রভাবে দামিনী প্রশ্ন করে, আর কত দেরী?

প্রশ্নটার তাৎপর্য্য গোষ্ঠ বুঝিতে পারে না, দামিনীর মুখপানে চাহিয়া থাকে।

আবার বর্ষণ প্রবল হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো ক্ষ্যাপা হাওয়া।

পশ্চিমের দিগন্তে বুঝি কোন ঘুমন্ত সুবিশাল অজগর সদ্য জাগিয়া ধরণীগ্রাসে আগাইয়া আসিতেছে।

কালো মেঘের বুক চিরিয়া তাহার রক্তজিহ্বা ঘনঘন লকলক করে; সমস্ত সৃষ্টিটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠে: আকাশস্পর্শী বৃক্ষশীর্ষ, তাহার বিষনিশ্বাসে মাথা আছড়াইয়া মরে; উচ্চ গৃহচূড়ের পাশ দিয়া সে নিশ্বাস গর্জ্জিয়া যায়—গোঁ-গোঁ, পাষাণপুরীর অন্তস্থল পর্য্যন্ত চাড় খাইয়া চড়চড় করিয়া উঠে। বৃষ্টির ছাঁট—হাওয়ার দাপটে অসহ তীক্ষ্ণ, সে যেন বিষের ছিটা, মৃত্যুর হিমানী মাখা।

দাওয়ার উপর এমনই একটা দাপটে গোষ্ঠ ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলে, ঘরে এস গো, ঘরে এস।

দামিনীর এ প্রলয়তাণ্ডবে কেমন একটা উল্লাস জাগে, সে কথা কহিল না, শুধু সমস্ত অন্তর উন্মুখ করিয়া ওই প্রলয়লীলার উন্মত্ত আলিঙ্গনের মাঝে নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়া দিতে চাহিতেছিল।

ঘরখানার চালের পাশ দিয়া আবার একটা প্রবাহ বহিয়া যায়, সে বিষনিশ্বাসে ঘরখানার হাড়-পাঁজর মড়মড় করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, চাল করিয়া উঠে মচমচ।

গোষ্ঠ শিহরিয়া ত্রস্তভাবে ক'হে, পিঁড়েখানটা কই গো, পিঁড়েখানটা পবন-দেবতাকে বসতে পেতে দি উঠোনে।

পিঁড়িখানা গোষ্ঠ উঠানে পাতিয়া দেয়, বলে, শান্ত হয়ে ব'স ঠাকুর, শান্ত হয়ে ব'স।

দেবতা শান্ত হয় না; আবার ঝড় গোঙায়, দামিনীর পাশ হইতে রসিদখানা ঝড়ে উঠিয়া যায়।

দামিনীর বুকখানা কত হাল্কা হইয়া উঠে!

গোষ্ঠ আর্ত্তকণ্ঠে ডাকে, হে ভগবান্, রক্ষে কর প্রভু, রক্ষে কর। আবার কহে, ডাক গো, ভগবানকে ডাক এ সঙ্কটে।

না।—অতি স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

গোষ্ঠ হতভম্বের মত দামিনীর পানে তাকাইয়া বলে, ক্যানে? কি হবে ডেকে?

প্রশ্নের উত্তর নাই, নির্বাক বিস্মিত নেত্রে গোষ্ঠ দামিনীর পানে

চায় ; বৃষ্টির দাপট স্বামী-স্ত্রীকে ভিজাইয়া, দাওয়ার দেওয়াল পর্য্যন্ত ভিজাইয়া দেয়, গোষ্ঠ ত্রস্ত শিশুর মত ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া বসে, দামিনীকেও ডাকে, এস, এস ঘরকে এস গো।

দামিনী কথাও কহিল না, উঠিলও না, বসিয়াই রহিল।

গোষ্ঠ এবার বিরক্ত হইয়া কহিল, তোমার হ'ল কি বল দেখি ? দুঃখ কি আমার হয় নাই, না কি তোমার একারই হয়েছে ?

দামিনী উন্মাদের মত কহে, কত দুঃখ, কত দুঃখ তোমার হয়েছে ? মরতে মনে হয় তোমার ? হয় ?

হা-হা করিয়া হাসিতে ইচ্ছা করে তাহার ; ওপাশ হইতে একটা বিপুল আর্ত্তনাদ, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভয়ার্ত্ত চীৎকার ; ওই চীৎকারে তাহার সম্বিৎ আবার ফিরিয়া আসে।

বুকের মানুষটি একেবারে মরে না।

দেহের কষ্টে, মরণের ভয়ে যে গোষ্ঠ শিশুর মত চারিখানা দেওয়ালের ভিতর মাটি-মায়ের কোল খুঁজিতেছিল, সেও ওই বিপুল আর্ত্তনাদে ছুটিয়া গিয়া বাহির-দুয়ারে দাঁড়ায়।

বৃষ্টির আবরণ ভেদিয়া সকল শক্তিপ্রয়োগে তীব্র বিস্ফারিত-দৃষ্টি হানে ; সব আবরিত করিয়া বর্ষার শুভ্র ধারা, কিছু দেখা যায় না।

আন্দাজ করিয়া বলে, কার ঘর উড়ল, টিনের শব্দ, টিনের ঘর ! কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গীতে আর সে কাতরতা নাই, পরের অবস্থা দেখিয়া সেও যেন প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

সে নিজের ঘরের পানে তাকায়, ঘরখানা এক-একবার ঝড়ের বেগে দেওয়াল ছাড়িয়া উঠে।

বাহির-পথ হইতে হাঁক আসে, এ গুষ্টা, গুষ্টা !

জমিদারের খোট্টা চাপরাসী।

মুহূর্ত পরেই ভাঙা দুয়ার দিয়া খোট্টা আসিয়া গোষ্ঠের হাত ধরিয়া টানে ; বলে, আও, কোদারি লেকে আও, কচহারিমে বান উঠিয়েছে।

জমিদারের ভয়ের চেয়ে ভীষণতর ভয় গোষ্ঠর সম্মুখে, সে তাহারই জন্য বুক বাঁধিয়াছিল।

আজ খোট্টার রক্ত-আঁখি তাহার তুচ্ছ ঠেকিল, সে হাত টানিয়া মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, আর ঘর উড়ুক, ঘর-সংসার ডুবে মরুক; পারব না যেতে আমি।

গালি দিয়া খোট্টা দরিদ্রের ঘাড়ে মারে, চল্ শালা চল্।

রিক্ততা শুধু বঞ্চনাই করে না, সর্বপ্রকার সঙ্কোচ হইতে মুক্তও করে মানুষকে; উলঙ্গ শক্তি লইয়া রিক্ত জন মরিয়া হইয়া জাগে।

বুকের মাঝে আবার ঘূর্ণি জাগে, সমস্ত শরীরের রক্ত ঝাঁঝিয়া উঠে, গোষ্ঠ ঘুরিয়া খোট্টাকে নিঃসঙ্কোচে সজোরে ধাক্কা মারে; পিছল মাটিতে ধাক্কার বেগে সে মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে।

বিপুল ক্রোধে খোট্টা উঠিয়া বসিতে না বসিতেই হাতের লাঠি হানিল। বেকায়দায় হানা দুর্বল লাঠি গোষ্ঠ সহজেই ধরিয়া লইল, বিদ্রোহী ঝড়ের ছোঁয়াচে মরিয়া মস্তিষ্কে তাহার যেন খুন চাপিয়া যায়, সজোরে সেই লাঠি খোট্টার মাথায় বসাইয়া দিল।

বৃষ্টির জল লালচে হইয়া গেল, ফিনকি-দেওয়া রক্তের ধারায় মাটির খানিকটা উপরের বৃষ্টির ফোঁটা কয়টা পর্য্যন্ত।

রক্ত দেখিয়া গোষ্ঠ শিহরে না, স্থির দৃষ্টিতে দেখে। দামিনীরও ভয় হয় না, মনে তৃপ্তি যেন জাগে, লাঞ্ছিতা নারীর বুকে দুঃশাসনের রক্তে পাঞ্চালীর উল্লাস জাগিয়া উঠে।

আইনে অত্যাচারীকে হত্যার অধিকার নাই।

গোষ্ঠ বসিয়া ভাবে।

ক্ষণপরে আপন মনেই বলে, সেই ভাল, কিসের তরে থাকব, জমি গেল, ছেলে গেল; দুটো পেট যেখানে খাটাব, সেইখানে ভাত। এখানেও খাটা, বাইরেও খাটা। ঘর? গাছতলা তো আছে।

আবার ঝড় গোঙায়।

উঠানের ওপাশের বড় আমগাছটি শিকড় শুদ্ধ উপড়াইয়া পড়িল। সে কি শব্দ! গাছটার মরণের আর্ত্তনাদ যেন!

তলার আগাছার দল, হাওয়ায়, জলে, মেঘলা দিনের ম্লান আলোকে উন্মত্ত পুলকে লুটাপুটি খাইয়া মরে।

উঠানে জল ঢোকে, গোষ্ঠ কহে, বান।

খোট্টার দেহটা টানিয়া ওপাশের সার-ডোবায় ফেলিয়া দিয়া দামিনীর হাত ধরিয়া বলে, এস।

নিঃসঙ্কোচে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া দামিনী উঠিয়া দাঁড়ায়, প্রশ্ন পর্য্যন্ত করে না, কেন, কোথায়?

পাতানো ঘরসংসারের পানে ফিরিয়া তাকায় না পর্য্যন্ত; গোষ্ঠও না।

মুক্তির কামনায় মায়া টুটে।

দামিনী আগে পা বাড়াইয়া বলে, চল।

উন্মত্ত ঝড়বৃষ্টির মাঝে ওই আগাছাগুলার মত লুটাপুটি খাইতে খাইতে পথে বাহির হয়, নূতন আশ্রয়ের তরে।

কোথায় সে আশ্রয়? বন-জঙ্গল হয়তো।

চলিতে চলিতে গোষ্ঠ বলে, এস, ওই বটতলাতে দাঁড়াই, এমন ক'রে ঝড়ে জলে মরার চেয়ে চাপা পড়া ভাল।

আবার ক্ষণপরে কহে, ঠিক বলেছ, কি হবে ভগবানকে ডেকে? ভগবান নাই, নইলে একজন অট্টালিকায় ঘুমোয় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে বাদলে মরে?

দামিনী কথা কয় না, দাঁতে দাঁতে তাহার একটা শব্দ হয়; সে শীতের কম্পন, না আক্রোশের ঘর্ষণ, কে জানে!

আধা শহর

কালো কালো পাথরের কুচি দেওয়া চওড়া রাস্তা। দুই পাশে দোকান—পান-বিড়ি, মিষ্টি, মনিহারী, চকচকে ঠুনকো জিনিষে ভরা, সবারই মাঝে একটা বহিঃসৌন্দর্য্যের আস্ফালন।

ওপাশে রেলষ্টেশনের ধারে স্তূপ বাঁধা কয়লার ডিপো, কালিতে রাস্তাঘাট কালিমাখা, সব যেন রুক্ষ, রৌদ্রে কয়লার স্তূপ ঝাঁঝে ভরা আশপাশ পর্য্যন্ত ওই উত্তাপে তপ্ত।

লোহার দোকান, শুধু ঝনঝন শব্দ, মাটির বুক ফালি ফালি করিয়া ফাঁড়িয়া ফেলিবার কত অস্ত্র—টামনা, গাঁইতি, শাবল, সব যেন তীক্ষ্ণ হিংস্র, রৌদ্রের আলোয় চকচক করে।

ধারে ধারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা ঘিরিয়া ধানের কল, বয়লার আঁচে গরম জলের ভাপে সব যেন আগুন।

দুইটা বাজারের মাঝে ষ্টেশন, মস্ত জংশন।

সারি সারি কালো কালো সুকঠিন লোহার লাইন, মাটির বুক চিরিয়া পাতা; লোহার বাঁধনে দুনিয়াটাকে বাঁধিবার কি সে উদগ্র চেষ্টা! দূর—সুদূর পর্য্যন্ত কালো কালো লাইনের দাগের রেশ চোখে বাজে, মনের চোখে আরও দূর পর্য্যন্ত, দুনিয়ার সীমারেখা পর্য্যন্ত—ওই রেশ আগাইয়া যায়।

মাঝে মাঝে সিগ্‌নালের স্তম্ভগুলা যেন লোহার বিশ্বজয়ের বিজয়-নিশান।

রাত্রের অন্ধকারে ওগুলার মাথায় আবার রক্ত-রাঙা জ্বলজ্বলে, আলোর সারি ধকধক করে।

ও যেন মানুষের উদগ্র বুভুক্ষার উগ্রতা, রাত্রে ঘুমন্ত বিশ্বেও সে জাগিয়া আছে; আপন উগ্রতার জ্বালায় ও আপনি জ্বলে। দিন নাই, রাত্রি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ও আপন তৃপ্তি হেতু আপন গ্রাসের কাজ চালাইয়াছেই; রেল চলে, টেলিগ্রাম চলে, মানুষ কাজ করে, বিশ্রামের হুকুম দেয় না ও। চব্বিশ ঘণ্টাই শহরটা ধ্বনিয়া রেলের বাঁশীর অশ্রান্ত তীক্ষ্ণ চীৎকার, তন্দ্রা টুটিয়া যায়, অন্যমনস্ক চমকিয়া উঠে, মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরাগুলা পর্য্যন্ত ঝনঝন করে; সকল শান্তি তৃপ্তি যেন শিহরিয়া উঠে। গাড়ী কাটে, গাড়ী টানে, শান্টিং হয়, গাড়ীতে ধাক্কা মারে—ঘড়াং, ঘড়াং; আশে-

পাশের মাটি কাঁপে, ধরণী-মায়েরও বুঝি ভার লাগে, হাড়পাঁজরা মড়মড় করে যেন।

দারুণ বুভুক্ষায় মাতৃস্তন্যে তৃপ্তি হয় না উহাদের, মায়ের বুক চিরিয়া নিঃসঙ্কোচে রক্ত শোষণ করে।

মালের গাড়ী সব বোঝাই হয়, ধানে চালে আহারের সামগ্রীতে বোঝাই করে, আহার যাহাদের জোটে না তাহারাই।

মাটিতে মাথা বুঝি ঠেকিয়া যায়, কাঁখ বাঁকাইয়া গরুর গাড়ী হইতে তুইমণে বস্তাগুলা গাড়ীতে বোঝাই করে অর্দ্ধাহারী মজুরের দল।

পাশে গাড়ীর গরুগুলার মুখে ফেনা ভাঙে, শ্রান্তিতে হাঁপায়, গায়ে সোঁটা সোঁটা চাবুকের দাগ, বিশ-পঁচিশমণ বোঝাই গাড়ীগুলা ওই পাথরের রাস্তার উপর দিয়া জিভ বাহির করিয়া টানিয়া আনিতে কষ্ট হয়, তাই মানুষ এদের চাবকায়। নির্মমভাবে গুঁতা মারে, তাহাতে মাথা নাড়ে পাছে, তাই নাকে দড়ি দিয়া টানে।

মজুরগুলারও গা হইতে টসটস করিয়া ঘাম পড়ে, দাঁড়াইয়া দম লইতে গেলে মাড়োয়ারী মহাজন গালি দিয়া তাড়া দেয়, এ শালালোক বদমাস, চালাও চালাও; দের হোনেসে গাড্ডিমে ড্যাম্‌রেজ লাগেগা, চালাও চালাও।

মারিতে তাড়াও করে।

পশুর উপরে মানুষ যে অত্যাচার করে, মানুষের উপরেও তার চেয়ে কম অত্যাচার করে না; আট আনা, দশ আনা মজুরীতে ইহাদের সাত আট ঘণ্টার বিকায়। এই সাত-আট ঘণ্টার মাঝে এদের বাঁচিবার প্রয়াসে নিঃশ্বাস লইবার অধিকার নাই।

মজুরগুলার বাস ওই উত্তাপ, ওই লৌহ-বন্ধনের মাঝে, লাইনের ধারেই ছোট ছোট পায়রা-খুপীর মত ঘর—ওই মজুরের বস্তি, সমাজের আঁস্তাকুড়, অর্থশালীর ডাষ্টবিন। পূর্ব দিকে কলের সারি, কালো কালো লম্বা লম্বা চিমনি, সারাদিন ধোঁয়া উদ্গীরণ করে।

উত্তরেও তাই। পশ্চিমে রেলের মালগুদাম। মহাজনকে টাকা আনিয়া দেয়, আর ইহাদের আলো-বাতাসের পথ রোধ করে। রেল-ইঞ্জিনও ধোঁয়া ছাড়ে। ওদিকে দক্ষিণে মদের ভাঁটি; হতভাগ্যদের আয়ুবিক্রয়-করা পয়সাগুলা লুঠ করে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশ পর্য্যন্ত কেমন ঘোলাটে, দীপ্ত রৌদ্র পর্য্যন্ত এখানে ম্লান।

কেমন একটা অভিভূতি আসে, মদের গন্ধে ম্লান আলোয় সব যেন কেমন নেশায় বিকারগ্রস্ত।

তবু এখানকার মানুষগুলি তন্দ্রালু নয়—জীবনের দুরন্তপনার সাড়া পাওয়া যায়, সে দুরন্তপনা বিচিত্র।

এতকালের বিশ্বের সঙ্গে মেলে না। হয়তো বা প্রেত ইহারা, কিন্তু প্রেত জীবনে জীবন্ত।

* * * *

পড়ন্ত বেলা।

গোষ্ঠ আর দামিনী ওই ষ্টেশনটির ধারে একটা বটতলায় আশ্রয় লইয়াছিল। গোষ্ঠ পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল, সে যেন নিশ্চিন্ত। আর দামিনী বটগাছের একটা শিকড়ে হেলান দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, অন্তহীন অর্থহীন চিন্তা। কুলী-মজুরের দল, ঘরের দিকে ফিরিতেছিল।

কর্মক্লান্তির অবসাদের মাঝে খলখল উচ্ছৃঙ্খল হাসি, ইহাদের বেতালা পায়ের মলের মতই বাজিতেছিল।

মেয়েরা গান ধরিয়াছিল—

ধকধকিয়ে আগুন জ্বলে ভকভকিয়ে ধুমা,
মিস্ত্রী বলে, বয়লার আড়ে দে লো একটা চুমা।

একজন পুরুষ বলিতেছিল, দোব মাইরি এইবার শালার মাথাটা ফেড়ে, এক শাবলের ঘা, বাস্, ডিমফাটা হয়ে যাবে; বাবু হ'ল তো হ'ল কি!

অপর জন কহে, শালা রোজ আমাদের হাজরি চুরি করে। উঃ, আমরা শালারা খেটে মরব আর হাজরিবাবুর পরিবারের শাঁখের শাঁখা সোনার হবে, ইঃ—রে ?

নারীকণ্ঠের সমবেত তীক্ষ্ণ উচ্চসুরে গোষ্ঠ জাগিয়া উঠে, বিস্মিতের মত ইহাদের পানে চাহিয়া থাকে।

ওই বেতালা চাল কেমন নূতন ঠেকে, মনে খট করিয়া বাজে ; আবার ওই বিচিত্র নূতন ধারার কোন সূক্ষ্মতম সুর তাহাকে আকর্ষণও করে।

সহসা পিছনের পানে একটা কোলাহল উঠে, দুইটি সমান উত্তেজিত কণ্ঠে। মজুরের দল ঘুরিয়া দাঁড়ায়, গোষ্ঠও ফিরিয়া তাকায়।

উত্তরদিকের কলের ফটকে দুইজন লোক,—একজন জামা কাপড় জুতায় বাবু, আর একজন মজুর, গায়ে হাতকাটা কামিজ, হাফপ্যাণ্ট, সারা অঙ্গে তেল-কালি মাখা, হাতে একটা হ্যামার। সে কহিতেছে, আমার খুশি আমি 'ওপরটায়েন' খাটব না।

মজুরের দল কহে, ছোট মিস্ত্রী আর ক্যাশবাবু, শালা ভুড়েও কম নয়, সবেই শালা পাক মারে।

ওখানে ক্যাশবাবুটা বলে, অঙ্গ জল ক'রে দিলে আর কি আমার ; পাম্প না সারলে কল যে কাল বন্ধ থাকবে, তার কি ? সে লোকসান দেবে কে ? তুমি সিরাজউদ্দৌলার নাতি লবাব সফফরাজ খাঁ ! বলি, মালিকের মাইনে খাও না ? কল বন্ধ হবে আর লবাব ঘরে ব'সে আরাম করবেন !

মাগনা মাইনে দেয় আমায়, নয় ? দাতাকর্ণ রে আমার ! গতর খাটাই, পয়সা নিই ; বাঁধা টায়েনের কাজ না করি, বলতে পার ; ওপরটায়েন খাটা আমার গতরে পোষাবে না, আমি খাটব না, সিধা বাত।

সে দুই পা আগায়।

পিছন হইতে ক্যাশবাবু ক্রোধে ভুঁড়ি নাচাইয়া, হিন্দী বাত

ছাড়িয়া দেয়, আলবৎ খাটনে হোগা, তোমার ঘাড়কে খাটনে হোগা, উল্লুক গিধ্বড় কাঁহাকা।

হাতের হ্যামার উঁচাইয়া ছোট মিস্ত্রী কহিল, খবরদার, মু সামাল করো।

বাবু দশ পা পিছু হটিয়া যায় আর কহে, মারবি নাকি, মারবি নাকি রে বাপু?

ওদিকে পিছনে হাত বাড়াইয়া কলের ফটক খোঁজে।

মজুরদের একজন শূন্যে হাত হানিয়া কহে, লাগাও হ্যাম্মর, ফটাং ভস, আণ্ডা তোড় যায়।

জনকয় হাততালি দিয়া উঠে, যেন এ রুদ্র সঙ্গীতে তাল দিয়া যাইতেছে।

একজন প্রৌঢ়, সেও তেল-কালি-মাখা, সে আসিয়া ছোট মিস্ত্রীর উদ্যত হাতখানা ধরিয়া নামাইয়া লয়, মানাইয়াও লয়।

মজুরের একজন কহে, বড় মিস্ত্রী।

ওদিকে বাবু ফটক বন্ধ করিয়া শাসায়।

কাল যদি হামারা কল্‌মে মাথা গলায়েগা তো জুত্তি লাগায়ে গা, পুলিশমে দেগা। জবাব তোমারা।

বড় মিস্ত্রীর আকর্ষণের মাঝেও ঈষৎ পাশ ফিরিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া ছোট মিস্ত্রী কহে, নেহী মাংতা হ্যায় তুমহারা নোকরি, কিস্মৎ থাকে আমার, কাল আবার তোরাই ডাকবি।

আপন বুকে ঘা মারে, দম্ভের ঘা।

গোষ্ঠ দাঁড়াইয়া উঠে, তাহার মনের দ্বিধা টুটিয়া যায়, সকল অন্তর তাহার যেন ওই ভাবধারা বুক পুরিয়া লইতে চায়।

দামিনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠে। জ্বলে, কিন্তু ওই জ্বলনের মাঝেও প্রসন্নতার আভাস পাওয়া যায়।

ঘাড়ে পাষাণ চাপানো নতদৃষ্টি বন্দী যেন ঊর্দ্ধে নীলাকাশের পানে, আলোর পানে চাহিবার উপায় দেখিতে পায়।

গোষ্ঠ কহে, বেশ ঠাঁই, হেথায় থাকা যাক্, কি বল ?

দামিনীর মুখপানে সম্মতির জন্য তাকায়।

দামিনীরও বেশ লাগে, হউক এ জীবন প্রেতের, কিন্তু বন্ধহীন, হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিতে পারা যায়; সেও ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দেয়, বেশ।

গোষ্ঠ আগাইয়া চলে মিস্ত্রী দুইজনের দিকে।

ওদিকের ঝগড়া মিটিয়া গেল দেখিয়া মজুরের দল বস্তির পানে পথ ধরে।

দামিনী বসিয়া রহিল, অবসন্ন দেহে—শ্রান্তিতে, ক্ষুধায়; কাল হইতে একটা দানাও পেটে পড়ে নাই, মানুষের ভয়ে লোকালয় দিয়া পথ দিয়া হাঁটে নাই, আসিয়াছে প্রান্তরে প্রান্তরে রেখাচিহ্নহীন বিপথ ধরিয়া।

হাওয়ায় ঘোমটা খসিয়া পড়ে, সেটা তুলিয়া দিতেও হাত উঠে না; অবসাদ আসে; অবসন্ন দৃষ্টিতে সম্মুখের ছবি বেশ ধরা পড়ে না, যেন ক্ষণে ক্ষণে মুছিয়া যায়, আবছায়ার মত কাঁপে।

সমস্ত অন্তরাত্মা তাহার একটি দানার জন্য কাঁদে।

তন্দ্রার মত একটা আচ্ছন্নতা সর্বদেহ ব্যাপিয়া ফেলে, মাথাটা ঝুঁকিয়া পড়ে, ইচ্ছা করে ঘুমায়।

বউ!

দামিনীর ওই তন্দ্রা টুটিয়া যায়, পিছন হইতে কে যেন ডাকে, বউ! ফিরিয়া, দেখে সুবল।

তেমনই সলাজ নত দৃষ্টি, কুণ্ঠিত ভঙ্গী।

দামিনীর সর্বদেহে একটা উত্তেজনা বহিয়া যায়; ঋণমুক্ত খাতক যে উগ্রতায় মহাজনের সম্মুখে দাঁড়ায়, সেই উগ্রতায়, সেই ভঙ্গীতে কহে, কি ?

ওই একটি কথায় সুবল কাঁপিয়া উঠে, সে কথা কহিতে পারে না, শুধু হাতটি বাড়াইয়া সম্মুখে ধরে, সে হাতও থরথর করিয়া

কাঁপে। হাতে একটি ঠোঙা, তাহার মধ্যে খাবার, সে কত কি! যত ভাল যত রকম মেলে, তত ভাল, তত রকম উপচারে সাজানো।

দামিনীর কথা ফুটে না।

তাহার সকল ক্ষুধা উন্মুখ হইয়া ওই উপচার ধরিতে চায়, ইচ্ছা করে, একই লোলুপ বিপুল গ্রাসে ওইগুলি গ্রাস করিয়া ফেলে।

তবু যেন কিসে বাধে; সে একাগ্র বিস্মিত দৃষ্টিতে সুবলের পানে চাহিয়া থাকে; ক্ষুধার তাড়নায় সে দৃপ্ত মহিমা আর থাকে না!

দামিনীর ওই একাগ্র দৃষ্টি, এই নীরবতার মাঝে কি যেন সাহস পায়, সে কথা কয়; বলে, ছেলেবেলার কুল খাওয়ার কথা মনে পড়ে না?

দামিনী হাত বাড়াইয়া ঠোঙাটি ধরে, সে যেন বারো বছরের অনভ্যস্তা বধূটির বয়সে ফিরিয়া যায়।

তারপর সে কি বুভুক্ষার গ্রাস, সে যেন গিলিয়ে খাওয়া!

সুবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে কহে, বউ, আমিও হেথায় থাকব, আমার আর সেথায় কে আছে; আমি তোমাদের সঙ্গেই এসেছি।

দামিনীর অবসর হয় না, সে খায়।

সুবল সাহস পাইয়া কত বকিয়া যায়।

আমার তো যেখানে থাকব সেইখানেই ঘর, এইখানেই ভিক্ষে করব।

দামিনী এতক্ষণে কহে, ছিঃ, ভিক্ষে!

সুবল কহে, তবে মুড়ি-মুড়কির দোকান করব, অ্যাঁ, কি বল বউ? তুমি মুড়ি ভেজে দিও।

দামিনী কহে, বানি দিও। হাসিয়া দামিনী মাথায় কাপড় টানিতে খুঁট খসিয়া পড়ে, হাতে বাজে সেই সাতুর বাঁধিয়া দেওয়া বালা দুইগাছা।

সুবলের ইচ্ছা করে, মুখে তুবড়ির মত কথার ফুলঝুরি ছুটাইয়া

দেয়; কিন্তু পারে না; কথা যোগায় না; শুধু অনেক চেষ্টায় বলে, সবই তোমাকে দোব বউ।

ক্ষুধার নিবৃত্তিতে দামিনীর সহজ বৃত্তি জাগিয়া উঠে, তাহার মনে পড়ে সে দিনের কথা।

সে যেন পাগল হইয়া উঠে, হাতের অর্দ্ধভুক্ত ঠোঙাটি মাটিতে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কহে, আবার?

একদিনের ভুল ভুলে যাও ভাই বউ।

সুবলের চোখ ছলছল করিয়া উঠে, দামিনীর পা ধরিতে যায়; সর্পস্পৃষ্টার মত দামিনী পিছাইয়া যায়, বলে, ছুঁয়ো না তুমি আমাকে।

চোখে তাহার আগুন জ্বলিয়া উঠে।

সুবল নত নেত্রে চলিয়া যায়।

দামিনী হাঁফ ছাড়ে, মনে বল পায়, অপরাধ যেন তাহার লঘু হইয়া গিয়াছে; কিন্তু উত্তেজনাটা কাটিয়া যাইতেই মন কেমন ম্লান হইয়া পড়ে।

সে বসিয়া ভাবে, ঠিক ভাবা নয়, কথাগুলা মনের মাঝে ঘোরাফেরা করে।

সুবলের যাওয়া-পথের পানে উদাস দৃষ্টিতে তাকায়, দেখা মেলে না; মনে পড়ে, আমার আর সেথায় কে আছে, আমি তোমাদের সঙ্গেই এসেছি।

দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

অনেকক্ষণ পর গোষ্ঠ ফেরে, চোখ দুইটা লাল, হাত পা নাড়ে একটু বেশি, কথা কয় বেশি।

দামিনী বুঝিল, নেশা মিলিয়াছে।

গোষ্ঠ সোল্লাসে কয়, উঠাও তল্পি।

দামিনি মুখের পানে চায়, গোষ্ঠ বলে, ঘরদোর কাজকম্ম সব ঠিক। কলে কাজ, ফিটার-মিস্ত্রীর কাছে; ছমাস পরে পঞ্চাশ ষাট দিয়ে পায়ে ধরবে লোকে। তার ওপর মহান্তকে পেলাম, ভালই

হ'ল, গাঁয়ের লোক, গাঁয়ে মায়ে সমান কথা, কি বল? কই, গেল কোথা? ওই যে ফিটার-বুড়োর সঙ্গে কথা কইছে। মহান্ত, ও মহান্ত, এস এস, এই হেথা বউ রয়েছে।

আজ এই নিরাশ্রয়ের মাঝে আশ্রয়প্রাপ্তিতে মেজাজটা গোষ্ঠর দিলদরিয়া, ঈর্ষা-দ্বেষের কথা মনে জাগে না; আর বিদেশে এই স্বদেশের অপ্রিয় জনটিও পরম প্রিয় আত্মীয় হইয়া উঠে।

গোষ্ঠ হাতছানি দিয়া সুবলকে ডাকে; সুবল ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসে।

দামিনী ঘোমটা টানিয়া দিয়া তাহার পানে তাকায়, আবার সেই উগ্র দৃষ্টি, সুবলকে দেখিয়া আবার দামিনীর অন্তর বিরূপ হইয়া উঠে।

গোষ্ঠ আবার বলে, মহান্তও আর গাঁয়ে ফিরবে না গো, হেথা মুড়ি-মুড়কির দোকান করবে, তা বেশ হবে, কি বল? তুমি মুড়ি ভেজে দেবে, বানি পাবে; দুজনার রোজগার, আমাদের ভাত ভূতে খাবে এইবার।

দামিনী মুখ ফিরাইয়া লয়।

মহান্ত, বউকে নিয়ে এস ভাই, ঘরটা আমি দেখে নিই, মাসে দু'টাকা ভাড়াই নেবে।—বলিয়া গোষ্ঠ আগাইয়া চলে।

দামিনীও গোষ্ঠর পিছন ধরিয়া চলে, সুবলের পানে ফিরিয়া চায় না পর্য্যন্ত; লাজুক লোকটি সঙ্গ ধরিতে সাহস করে না, তেমনই দাঁড়াইয়া থাকে।

অনেকক্ষণ পর বলে, যা চ'লে, বয়েই গেল; এবার ম'লেও চেয়ে দেখব না। আমি মরব না, সব চেয়ে দেখব। কত হবে, এই তো কলির সন্ধ্যেবেলা।

কতক দূর গিয়া গোষ্ঠ পিছনে দামিনীকে দেখিয়া কহে, ওই!

কথার শব্দে ফিটার-বুড়া চোখ ফিরায়, ঘোলাটে চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি; ছোট মিস্ত্রীর রক্তবর্ণ চোখের দৃষ্টি ধকধক করে।

দামিনী মুখ ফিরায়।

ফিটার-বুড়া চোখ ফিরাইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে; ছোট মিস্ত্রীর চোখ ফেরে না, গোষ্ঠর সম্মুখেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, সঙ্কোচও নাই।

গোষ্ঠ কহে, মহান্ত কই?

জানি না। দামিনীর কথার সুরে সুরে একটা ঝাঁজ। উচ্ছৃঙ্খল আনন্দের একটা পিচ কাটিয়া ছোট মিস্ত্রী সোল্লাসে কহে, ভারী ঝাঁজালো বউ হে; বাঃ। চলিতে চলিতে মাথা নাড়িয়া যেন উপভোগ করিতে করিতে সে আবার কহে, ঝাঁজালো মেয়েলোকই ভাল হে; তা না প্যানপ্যান—চোখের কোণে নোনা পানি, দূর! ঝাড়ু মার, দু'চক্ষে দেখতে পারি না আমি।

দামিনীর পানে আবার সেই রক্তবর্ণ লোলুপ দৃষ্টি হানে।

দামিনীর ইচ্ছা করে, চোখ দুইটি টিপিয়া গালিয়া দেয়।

বড় মিস্ত্রী শুধু বলে, আঃ!

বড় মিস্ত্রী হি-হি করিয়া হাসে, বলে, বাবা, মাছ সব পাখীতেই খায়, মাছরাঙাই ধরা পড়েছে, দোষ আমাদের—ঢাকু ঢাকু করি না, পেটেও যা, মুখেও তাই।

দামিনী থমকিয়া দাঁড়ায়।

গোষ্ঠ বলে, এস।

না, আমি যাব না।

কি? হ'ল কি?

আর কোথাও চল।

গোষ্ঠ বিষম চটিয়া কহে, ট্যাঁকে আমার ট্যাঁকশাল ঝমঝম করছে, আর কোথাও চল! ব্যাড়ব্যাড় করতে হবে না, এস। ওদের কথা অমনই।

ছোট মিস্ত্রী তবু হাসে।

মজুরের বস্তী, কুলী-হাট সব

ছিটে-বেড়ায় ঘেরা, উলুখড়ের ছাউনি ; ছোট ছোট ঘর, শুইলে এ দেওয়ালে মাথা ঠেকে, ওদিকের দেওয়ালে পা ঠেকে ; দাঁড়াইলে চালে ঠেকে মাথা, একেবারে মাপা, যে লোক বেশি লম্বা, সে নাকি অনাসৃষ্টির সৃষ্টি, সৃষ্টিছাড়া।

এক এক আঙিনা ঘেরিয়া তিন-চারি ঘরের বাস ; এক একজনের দুটি কুঠরি, একটি বারান্দা, তাই ঘেরিয়া রান্না হয়।

উহারই ভাড়া মাসে দু'টাকা ; কলের মালিক মাস মাস বেতন হইতে কাটিয়া লয়।

এ আঙিনায় থাকে তিন জন ; পূর্বদিকে ফিটার-বুড়া, দক্ষিণের ভাগটায় ছোট মিস্ত্রী, পশ্চিমের খালি ভাগটা মিলিল দামিনী আর গোষ্ঠর অদৃষ্টে।

দামিনী কহে, এ যে অন্ধকূপ, আলো নাই, বাতাস নাই, ভিজে জ্যাবজ্যাব করছে।

এরই ভাড়া মাসে দু'টাকা—বত্রিশ আনা—একশো আটাশ পয়সা। যেখানকার যা, শহরের এই বটে।

ঝাঁটা মার শহরের মুখে, এ যে বুকে চেপে ধরেছে !

তাও ভাল, ঘাড় তো ধরছে না কেউ।

ওপাশ হইতে ছোট মিস্ত্রী নেশার ঝোঁকে মাটিতে চাপড় মারিয়া কহে, কভি নেহি, কোইকো এক্তিয়ার নেহি হ্যায়।

গোছগাছ কর তুমি।

দামিনী সংসার পাতিতে বসে।

ঘরের মাঝে সে শুধু বসিয়া ভাবে, অভাব যে ষোল আনার—চাল, ডাল, জল, হাঁড়ি কলসী, থাল, বাটি, সব কিছুরই।

শুধু সে খুঁটে বাঁধা সেই বালা দুইগাছা নাড়ে-চাড়ে আর কাঁদে।

ওপাশে গোষ্ঠ ছোট মিস্ত্রীর সঙ্গে বসিয়া গল্প করে, ওই সেই কথা। ছোট মিস্ত্রী বলে, মালিক কই নেহি।

উত্তেজনায় বাঙালী হিন্দী বাত ঝাড়ে।

গোষ্ঠ বলে, মালিক ভগবান !

নেহি, ভগমান কৌন হ্যায়,' ভগমান রহনেসে দুনিয়াকো এইসা হাল হোতা, কেউ দুধে ভাতে খেত কেউ এঁটো পাত চাটত ?

গোষ্ঠ চুপ করিয়া যায়, মন যেন সায় দেয়, কিন্তু স্বীকার করিতে ভয় হয়, সংস্কার চোখ রাঙায়।

বস্তির প্রতিবেশীর দল আসিয়া জুটে, ফায়ারম্যান, রেলের পয়েণ্টসম্যান, জমাদার, পদস্থ কুলীর দল সব।

ছোট মিস্ত্রী পরিচয় করাইয়া দেয়, এ ফয়রমন, এ পাইণ্টমন, ই—

পয়েণ্টসম্যান গান ধরিয়া দেয়—

বৃন্দাবনের কিষণলাল মথুরার রাজা,
সেথায় খেতেন লঙ্কা ছাতু হেথায় খান গাঁজা।

ফায়ারম্যান ঢোলকটা পাড়িয়া ধমাধম বেতালা বাজনা জুড়িয়া দেয়।

আর একজন মাথায় হাত দিয়া নাচে।

এমনই তাণ্ডবের মাঝে পরিচয় হয়। গোষ্ঠর অন্তর কেমন কাঁপাইয়া উঠে। জমাদার চেঁচায়, এ বইঠ যাও, বইঠ যাও।

শেষে নৃত্যপর ব্যক্তিটির হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিয়া কহে, গাঁজা তৈয়ার করো।

পয়েণ্টসম্যান সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ করিয়া হাত পাতে, গাঁজা টিপিতে টিপিতে টেপার সঙ্গে জোর দিয়া কহে, সা-ত কা-ট, ন-য় টি-প, ত-বে হ-বে গাঁ-জা ঠিক।

ফায়ারম্যান এতক্ষণে গোষ্ঠর সঙ্গে আলাপ করে, বাড়ি কোথা ভাই ?

সে অনেক দূর, খাটতে এসেছি খাটব, থাকব, বাস্।

তবু কি নাম গাঁয়ের ?

সে কথা আর ছেড়ে দাও, সেথার সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে এসেছি আমি।

তবু—

এবার চটিয়া গোষ্ঠ কহে, বাড়ি আমার নাই।

ও বাবাঃ, চটছ কেন হে? আঃ আঃ, উ কি করলি, কাট্, গাঁজাটা কাট্, তবে তো ঠিক হবে। তা নামটি কি তোমার?

গোষ্ঠ নামটা গোপন করিতে চায়, মনে মনে একটা নাম খোঁজে।

গাঁজার কলিকা চলে।

টানিতে টানিতে গোষ্ঠ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলে, কাঙালী, আমার নাম কাঙালী; হাম কাঙালী তো হ্যায়, হামারা নাম কাঙালী ঘোষ। বাড়ি হ্যায় নিশ্চিন্দিপুর—নিশ্চিন্দিপুর। বলিয়া আপন মনেই হা-হা করিয়া হাসে।

ফায়ারম্যান বলে, সচ বাত নেহি হ্যায়; কাঙালীভি ঝুটা, নিশ্চিন্দিপুরভি ঝুটা।

পয়েন্টস্‌ম্যান বলে, ফেরারী নাকি হে?

খবরদার!—গোষ্ঠ মারিতে উঠে।

গাঁজায় দম দিতে দিতে পয়েন্টস্‌ম্যান কহে, ঠারো ঠারো, ইষ্টিম হামকো লেনে দাও। আও, আব চলা আও।

ফায়ারম্যান হাততালি দিয়া উঠে, লাগে পালোয়ান লাগে।

মিস্ত্রী হাত ধরিয়া গোষ্ঠকে মানাইয়া লয়, ব'স ব'স, ভাই বেরাদারের সঙ্গে ঝগড়া করে না।

জমাদার বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মান যাও ভাই, মান যাও।

ফায়ারম্যান দাঁত মেলিয়া হাসে, পয়েন্টস্‌ম্যানও হাসে, যেন কিছুই হয় নাই।

চীৎকার শুনিয়া দামিনী বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।

ফায়ারম্যানের দৃষ্টি সে দিকে পড়ে, চোখ দুইটা জ্বলজ্বল করিয়া উঠে; সে শুধু আঙুল দেখাইয়া কহে, আরে!

জমাদার কহে, এ ভেইয়া, ই কাঁহাকা আমদানি?

একজন গান ধরিয়া দেয়, গোবর-বনে কোন্ কারণে ফুটল কমলফুল!

পয়েন্টস্‌ম্যানটা চিত হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলে, জান গিয়া মেরা, জান গিয়া। কথাগুলা প্রায়ই সব একসঙ্গে উপরে উপরে পড়ে।

গোষ্ঠ আবার লাফাইয়া উঠে, পয়েন্টস্‌ম্যানটাকে বিশেষ করিয়া শাসায়, জিভ ছিঁড়ে নেবে।

ওদের ভয়ও হয় না, লজ্জাও হয় না, হি-হি করিয়া হাসে; যুগান্তব্যাপী তমসার মাঝে ওই নির্লজ্জ হাসির কুৎসিৎ রূপ যে উহাদের চোখে কখনও পড়ে নাই।

পয়েন্টস্‌ম্যান আবার বলে, এ তুমি খাঁটি কারও কপালে তেঁতুল গুলেছ বাবা।

গোষ্ঠ আর সেখানে দাঁড়ায় না, দামিনীকে টানিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবে। দামিনী নির্বাক।

তখনও ওদের কথা শোনা যাইতেছিল, পঞ্চাশ টাকা বাজি, ফেরারী না হয়তো কি বলেছি!

এত কোলাহলেও বাহির হয় না বড় মিস্ত্রী।

লোকটা যেন কেমন, কাজের শেষে ঘরে আসিয়া ঢোকে, আবার বাহির হয় কাজের সময়। বাঁধাধরা কাজ কয়টি ছাড়া আর যেন দুনিয়ায় কিছু নাই, লোহার মতন শরীর, লোহা পেটা কাজ, যেন একটা যন্ত্র, ও যেন বস্তির অতীতের ধারা, বর্তমানকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া ক্ষীণ যোগসূত্রের মত পড়িয়া আছে।

তবু লোকটার মাঝে কি আছে, ওই নিস্পন্দতার মাঝখানে যেন বিপুল উদ্দাম কিছু আছে। দেখলে ভয় হয়।

সহসা গোষ্ঠ কহে, নাঃ হেথা আর থাকব না।

দামিনী অকূল চিন্তার মাঝ হইতে কহে, কোথায় যাবে? যেন সে কূল পায় না।

গোষ্ঠও হতাশ হইয়া কহে, কোথায় বা যাব! সবারই গতিক যে ওই! রাস্তায়, ঘাটে, সবখানে, দেখলে না ভদ্দরলোকদের চাউনি?

নিরাশ্রয় দুটি নরনারী ব্যাকুল অন্তরে অন্তর্দৃষ্টি হানিয়া একটা নিরুপদ্রব নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বিশ্বসংসার খুঁজিয়া ফেরে।

হঠাৎ গোষ্ঠ আগুন হইয়া কহে, ফের যদি তুই বাইরে বেরুবি তো খুন ক'রে ফেলব বললাম।—বলিয়া সে দুয়ারটায় শিকল দিয়া বাহির হইয়া যায়।

ঈষৎ ম্লান হাসি ক্ষীণ রেখায় দামিনীর অধরপ্রান্তে আসিয়া আবার মিলাইয়া যায়।

নিরুপায় ওই আশ্রয়টুকুই আঁকড়াইয়া ধরে।

আধার ভেদে আধেয়ের রূপ পাল্টাইয়া যায়।

এই দুইটি নরনারীর জীবনধারা যেন কাঁদনভরা করুণ কীর্ত্তনের সুরে চলিতে চলিতে সহসা খেয়ালের সুরে চলিতে সুরু করিল।

অন্ধকার ঘরে দামিনী তাহা অনুভব করিল, কিন্তু গোষ্ঠের কোন ভ্রূক্ষেপ হইল না।

সে কলে খাটে, বয়লারে কয়লা ঠেলে, বাঁকানো হাঁটুর উপরে কনুইয়ের চাপ দিয়া হাতলভরা কয়লা তোলে, আর বয়লারের অগ্নি গহ্বরে ঝপাঝপ মারে, শেষ হইলে ঘড়াং করিয়া মুখের ঢাকনিটা বন্ধ করিয়া মাথায় জড়ানো গামছাটায় কপালের স্বেদ মুছে, পা দুইটি ছড়াইয়া বিড়ি টানে।

জ্বলন্ত আগুনের সঙ্গে লড়াই, ভ্রূক্ষেপও নাই, আক্ষেপও নাই।

গোষ্ঠ বলে, আমার বেশ লাগে।

গাঁজাটা যেদিন বেশী টানে, সেদিন বুকের তাণ্ডব যেন বাড়িয়া উঠে, কহে, বহুৎ আচ্ছা, এই তো আগকে সাথ ফাগ খেলা রে ভাই। আমি দিই কয়লা, ও ছিঁটোয় আঁচ। মার ফাগ, হেঁই রে।

সে কয়লা মারে, হুহু করিয়া আগুনের আঁচ আগাইয়া আসে। গোষ্ঠর কৌতুক লাগে, সে হাসে।

ওই উত্তাপে সব যেন আগুন হইয়া উঠে, বক্ষে রক্ত, চক্ষে ধরা শরাখানার মতনই তুচ্ছ ঠেকে।

ওদিকে হাউজের ধারে মেয়েরা সব কাজ করে, ষ্টীম-পাইপের গোল হাতলটা ঘুরাইয়া হাউজের মুখে গরম ভাপ ছাড়িয়া দেয়। মেয়ের দল ছুটিয়া পালায়, উ উ বাবাঃ লো!

গোষ্ঠ হাসে, ছোট মিস্ত্রী হাসে।

মেয়েরা গালি দেয়, মর মুখপোড়া, উ কি আমোদ নাকি? উহাদের আমোদ বাড়ে।

কাজের শেষে, কয়লায় কালো, আগুনে ঝলসানো দেহ, শুষ্ক বক্ষে মরু তৃষ্ণা লইয়া সে যখন মদের দোকানের পানে ছুটে, তখন সে যেন একটা অর্দ্ধদগ্ধ শব, প্রেতত্ব লইয়া চিতা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

সমগ্র বিশ্বমানব-সভ্যতার ধারা এ মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ করি শিহরিয়া উঠে। এ যে তাহারই আর একটি অন্য দিকের রূপ।

ওই উন্মত্ত আচরণ বুঝি বিশ্বসভ্যতার কাহিনী কয়।

ওই সুপ্রকট কঙ্কালের মালার আখরে বুঝি তাহার ব্যর্থতার ইতিহাস লেখা।

সে কপট ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া ওই দৃশ্য দেখিতে বাঁচিয়া থাকে। কলের ঘরে তখন তহবিল মিল হয়, টাকা বাজে ঝমাঝম।

গোষ্ঠর মজুরি মিলে বারো আনা।

অর্দ্ধেক তার নেশায় যায়, বাকী ছয় আনা দামিনীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহে, ওই নে।

আর 'তুমি তোমার' নয়, এখন 'তুই তোর'; বুকে মুখে সবেই আগুন ধরিয়াছে, ভাষা পর্য্যন্ত ওই আগুনের আঁচেই বুঝি উগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যায় এ রূপ আরও বিকট ভয়াল হইয়া উঠে; এই শিক্ষা-দীক্ষাহীন মানুষগুলার বুকের নগ্ন পশুত্ব বিপুল তাণ্ডবে জাগিয়া উঠে; জাগে তো অবিরাম, কিন্তু অন্ধকারে বুঝি আবরণের সুযোগ পায়; উন্মুক্ত আলোকে লজ্জা হয়। এতটুকু লজ্জার রেশ আজও

আছে; ওইটুকুই বুকের মানুষটির আত ক্ষীণ অবশেষের পরিচয় দেয়, ওই এতটুকুই আজও আছে যে।

ওপাশে বাউরীপাড়ায় সে কি কোলাহল! ঢোল বাজে এক তালে গান হয় অন্য তালে, এক সঙ্গে চার-পাঁচজন গায়। রাখনা গায়, ইস্কাতনের টেক্কা রে প্রাণ রুহিতনের টেক্কা! নিতাই ধরে, বনের ফল খাও রে কানাই, ফল এনেছি চেখে চেখে। শশন ওরফে শশধরের আজ আধবাটি মদ পড়িয়া গিয়াছিল, সে সেই তখন হইতেই করুণ সুরে গাহিতেছে, আধ বাটি মদ প'—ড়ে গে—ল আধ বাটি প—ড়ে গে—ল হায় গো! ওই তাহার গান, তাহার বিরাম নাই।

মেয়েরা রাস্তার ধারে বসিয়া জটলা পাকায়, পরনে এখন চওড়াপাড় মিহি শাড়ি, অল্প চুলে যোগান দিয়া খোঁপা বাঁধা, দীপ্তিহীন চক্ষে অন্ধকারের মাঝেও বক্ষের উদগ্র ক্ষুধা জ্বলজ্বল করে। কিন্তু ওই জ্বলজ্বলে চক্ষু শুধু তো মানুষের পথ পানে চায় না, চায় সে রজতের ঔজ্জ্বল্যের পানে। চক্ষে ওই জ্বলজ্বলে দৃষ্টির মাঝে শুধু বুকের ক্ষুধাই নাই, পেটের জ্বালায় ভোগের লিপ্সাও জ্বলে।

ওরা বলে, কত ভাগ্যে মনুষ্য জন্ম, পেটে খাব না, গায়ে পরব না তো করব কি?

লক্ষ্য যে ওদের অন্ধকারে ঢাকা। ওদের পাপের ভয় শুধু দেবতার ঘরে উঠিতে, পূজা-করা ফুল পায়ে ঠেকিলে।

আর কোন পাপ ওদের মনে ছাপ মারে না; জীবনের ধারার জন্য দুঃখ নাই, অনুশোচনা নাই, আসলে পাপপুণ্য মানে না।

সাবি কপালে হাত বুলাইয়া বলে, উঃ কপালটা ফুলে উঠেছে ভাই, পাশের বাড়ির মেজো বউ—

মাতুরী চিবাইয়া চিবাইয়া বলে, কার পায়ে মাথা ঠুকে লো?

সাবি ঠোঁটের ডগায় তাচ্ছিল্যের পিচ কাটে। এত নেকন, বলে যে সেই—পায়ে ধরতে পারলে সখি, ঘুঁটে কুড়োতে প'ড়ে থাকি!

তবে ?

ওই মুখপোড়া বুড়ো ভালুক খাতাঞ্চী লো।—বলিয়া হাসিয়া সারা, কৌতুকে কথা আর শেষ করিতে পারে না, ঠুই ক'রে ঢেলিয়ে দিলে, আর চোখের সে কি ইসেরা, সুয্যিমামা ডুবুডুবু। আবার হি-হি হাসি।

তুই কি বললি ?—কৌতুকব্যগ্র প্রশ্ন হয়।

সন্ধ্যাবেলায় টাকা-ভরা বাক্সটা দেবে ? অমনই মুখখানা চূণ, বিড়বিড় করতে করতে চ'লে গেল।

পাড়ার ভিতর পাঁচীর ঘরে কোলাহল উঠে, জমাদার আর ফায়ারম্যানের গলা শোনা যায় !

খবরদার।

খবরদার।

সব ছুটিয়া যায়; তখন যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে, জমাদারের হাতে ঝাঁটা, ফায়ারম্যান একখানা বাঁখারি লইয়া, পরস্পরকে মারে।

সকলে হাততালি দেয়, হাসে। পাঁচী গালি দেয়, নেমে যা বলছি আমার ঘর থেকে, বাঁশমুখো কালোমুখো। কি বিপদ মা ঝাঁটা গাছটা সুদ্ধু নিয়েছে, দে তো ভাই পরী, তোর ঝাঁটাগাছটা—

কে শুনিবে ?

পশ্চিম পাড়ায় উচ্চতর শ্রেণীর বাস, সেখানে আড্ডা বসে কোন দিন ছোট মিস্ত্রীর ঘরে, কোন দিন ষ্টেশনের ধারের সেই বটতলায়। গল্প করে বুড়া ড্রাইভার; খালি গা, পরণে চৌকোণা ঘরকাটা লুঙ্গি, গলায় কালো করে বাঁধা রূপার তক্তি, বাহুতে একটা; দক্ষিণ মণিবন্ধে শুধু কার চার ফেরা করিয়া বাঁধা. প্রত্যেক পেশীটি সুপ্রকট, বুকখানা বোধ করি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ ইঞ্চি।

দেখো ভাই, হামারা উমর হুয়া বহত, দেখা হায় বহত। কেতনা ধরমঘট হুয়া পহেলে, কেতো আদমী ভুঁখাসে মর গিয়া, দানা নেহি মিলা, পানি—শুধু পানি পিয়ে ধরমঘট চালায়া ; আখের মে হুয়া কি ;

কোইকো নোকরি গিয়া, কোইকো জেহেল হুয়া, যিসকো নোকরি নেহি গিয়া উসকা তলব কম হো গিয়া।

ছোট মিস্ত্রী বলে, সে তো বটেই, প্রথম যারা কষ্ট ক'রে গিয়েছে, তাদের দৌলতেই আজ যেটুকু হয়েছে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ফেলে সবাই। সে দীর্ঘশ্বাস বোধ করি অতীতের সহকর্মী নির্য্যাতীত বন্ধুদের প্রতি উহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ফায়ারম্যান বলে, আরে আজকাল তো বহুত সুবিধা, ধরমঘট বললেই হ'ল।

ছোট মিস্ত্রী বলে, হ্যাঁ, এখন আর—

কথার উপর দিয়া গোষ্ঠ বলে, এখন আর তখন—এ তফাত বড় কিছু হয় নি ভাই। তখন ধমক দিয়ে কাজ সারত, আর এখন ফন্দি ক'রে—

ফন্দি-টন্দিতে বড় কিছু হবে না, আর, সে গুড়ে বালি—

বালি দিলে ওরা জলে গুলে গুড়ের পানা ক'রে নিতে জানে। আচ্ছা, মুখে তো বল, হীরে আর জিরের দামের তফাত মানুষের করা—

আরে সে তো বটেই, জানের দামতো সবারই সমান। তবে সমান দামে আমরা বিকুতে পারি না, সে দোষ কার বলব?

নসিবের!

কে জানে। ছোট মিস্ত্রী বসিয়া ভাবে, কথাটা তার মনে ধরে না, দুর্বল রিক্ত মস্তিষ্কও ইহার সমাধান করিতে পারে না; তাহার পর সমস্ত সংস্কারের তমসায় আচ্ছন্ন, দৃষ্টি আর যায় না।

গোষ্ঠ বলে, দাদা রে, বুদ্ধি যার বল তার, আর দুনিয়ার মালিক সে চিরদিন।

ড্রাইভার বলে, জরুর, বুদ্ধিকে মারে সব হোতা হ্যায়। একদফে কেয়া হুয়া শুনো। হুয়া কি, এক দরখাস হামলোক দিয়া কি,

দেশোয়াল ড্রাইবর, ফয়ারম্যানকো গ্রেড বাড় যায়, ডিপার্টমেণ্টকো সব কোইকো সাথ সমান হো যায়; নেহি তো হামলোক কাম ছোড় দেবে।

ধর্ম্মঘট হ'ল তা হ'লে?

নেই হ'ল, দরখাসকে আচ্ছা হুকুম নেই হোনেসে হোবে এই ঠিক হ'ল। হাঁ, উসকে বাদ তিন ডিবিসনকে তিন ডি, টি, এস বাহাল হ'ল, দরখাসকে হাল মালুম করনেকে লিয়ে।

হ্যাঁ, হ'ল তো ঘোড়ার ডিম?

না ভেইয়া, বহুত বাত আছে; হাঁ, হুয়া কি, ওহি তিন সাব লোক হুকুম দিয়া কি, সব ডিবিসনসে দেশোয়াল আদমীর তিন তিন সর্দ্দার হাবড়েমে ভেজ দেনা, হুঁয়া সাব লোককা সাথ বাত হোগা। হাঁ, দেশোয়াল লোক তো গেইলো, থাট কিলাসমে; ময়লে ওদের লুগা, বিড় পিতা, উ লোক জরুর থাট কিলাসমে যাবে। হাঁ, হাবড়েমে মুলাকাত তো হুয়া। দেশোয়াল লোক বোলা, সাব দেখো, ভুঁখামে ময় লোক মর যাতা, লুগা না মিলতা; মে-লোগনকো তিয়াষকো পানি না মিলি, দেশোয়াল মাটি পাথল তোরকে লাইন বানাতা, উসকে শিরমে লোহে গিরতা, কাঠ গিরতা, জান দেতা, আওর—, সাব বোলা, ই তো ঠিক বাত, জরুর তুমাহারা তলব বাড় যায়গা।

গোষ্ঠ বলে, বাস্ ওই ব'লে ভুস্কি দিয়ে চলে গেল।

নেহি, উস বখৎ টিফিনকা টায়েম হুয়া রহা, সাব বোলা, বহুত আচ্ছা টিফিনকো বাদ ইয়ে বাত হোগা, যাও বাবালোক, তুম লোগভি টিফিন করকে আও। সাব সব কইকো এক এক রূপৈয়া দিহিস। টিফিনকে বাদ সাব পহিলে পুছা কি, তুম কেয়া খায়া, কেতনেকো খায়া, কোই খায়া, চার পয়সেকা সত্তু, এক পয়সেকা নিমক, পয়সে ভর মরচাই; কোই খায়া চার পয়সেকা চানা। লেকেন দো আনেকা জাস্তি কোই নেই খায়া, আওর চৌদ্দ আনা

কোই জেবমে, কোই লুগামে বাঁধ্‌লিয়া। সাব বোলা, ময় কেতনোকা খায়া জানতা—চার রূপৈয়া। ওহিমে বস্‌ সব মাটি হো গিয়া, তলব কুছ যাস্তি মিলা, লেকেন সমান না মিলা।

বাঃ রে! আমার মেহন্নত, তার দাম আমি পাব, সে পয়সা খরচ করি না করি আমার খুশি।

বেশি খেতে, ভাল খেতে কেউ জানে না, ভাল বাড়িতে থাকতে কেউ ভালবাসে না!

ওহি তো ভেইয়া, খায়া নেহি কাহে? রূপৈয়া ভোর খানেসে তো জরুর বহুত জাস্তি তলব মিল জাতা।

নেহি মিলতা, টাকা ভর খেলে কি বলত জান, বলত, যত পাবে ততই খাবে: পয়সা তোমরা রাখতে জান না, দিয়ে কি হবে?

আরে বাপু, এতদিন না খেয়ে যে পেট ম'রে আছে, আজ যে খেতে ভয় লাগে, হজম হবে না; মনে যে হয়ই না, এমনই ভাল চিরদিনই খেতে পাব।

ভেইয়া, হুয়া তো লেকিন এহি; আর ইয়ে হাল উলট যাগা কব, কৌন জানতা!

ছোট মিস্ত্রী কহে, আবার তোমরা বল—

বাত চলতা হ্যায়, মালুম হোতা ধরমঘট চলেগা, তামা—ম দেশোয়াল এক সাথমে কাম ছোড় দেগা। চার বাবু আয়াথা উ রোজ, মুশকিলকে বাত ইয়ে হ্যায় কি, গরিব আদমী তামাম, ধরম-ঘটকে বখত খানে নেহি মিলতা। বাবুলোক কুছ কুছ দেতা হ্যায়, হাম লোককা তরফসে বাতভি করতা হ্যায়; আওর কোই কোই ঘুষভি খা লেতা হ্যায়।

উ লোক জরুর ঘুষ খায়েগা ভাই;। বিনা গরজে ওরা এক পা হাঁটে না।

গোষ্ঠর মনে জাগে জমিদারের কথা, মহাজনের কথা সকলেরই মনে জাগে।

দোষ নাই; যুগ-যুগান্তর যাহারা ইহাদের লুটিয়া খাইয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস করিবার মত শক্তি ইহাদের নাই। কথাটা এত খোলাভাবে ইহারা বুঝে না, কিন্তু জন্মগত সংস্কার, অহি নকুলের জন্মগত বিরোধের মত।

হঠাৎ ছোট মিস্ত্রী বলে, তোমরাও লাগাও, আমরাও লাগাব, ধর্ম্মঘট করব, জরুর করব; সারাদিন খেটে এক টাকা, বার আনা, আট আনা পয়সা, নেহি চলেগা। জরুর ধর্ম্মঘট করব।

গোষ্ঠ কহে, মুশকিল ওই বাউরী বেটাদের নিয়ে; কিছুতেই ঘামবে না, ওরা বলবে, বেশ চলছে ভাই, কে হাঙ্গামা করে!

না করে তো মজা দেখাব।

রাত্রের কথা, রাত্রের অন্ধকারেই ডুবিয়া থাকে, না অভাবের তাড়নায় বুকের মাঝে কর্মের সময়ে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, কে জানে!

প্রভাতে আবার সব কাজে ছোটে।

সারাটা দিন আবার গা দিয়া ঘাম ঝরে, দুরন্ত রৌদ্রে দেহ তাতিয়া উঠে, আগুনের আঁচে ঝলসায়, বুকের রক্ত শুকায়।

কাজের শেষে, বেলা চারটায়, আবার অবসন্ন দেহে আসিয়া অফিস-ঘরে হাত পাতিয়া দাঁড়ায়।

খাজাঞ্চীর তবু অবকাশ হয় না, বলে, দাঁড়া রে বাপু, ঘোড়ায় চ'ড়ে এলি যে সব! তিন পয়সা আর দুই পয়সা পাঁচ পয়সা— আরে গেল, এই চাপরাসী, ই লোককে ভাগা দেও তো।

অফিস-ঘরের ঘড়িটা অবিরাম চলে টুকটাক টুকটাক; সে হিসাব দেয়, দিনের এগারো ঘণ্টা, বারো মিনিট, ছত্রিশ সেকেণ্ড গেল—

গোষ্ঠ বলে, চারটে বেজে বারো মিনিট, গোটা দিনটাই গেল—

ছোট মিস্ত্রী বলে, একটা দিন যায়, আর আমাদের পেরমাই যায় কদিন, তার হিসেব ও ঘড়িতে মিলবে না।

সত্য কথা, ইহাদের জীবনের যে কত ঘণ্টা গেল, তাহার হিসাব ওই ঘড়িটা দিতে পারে না, সে গতিতে ছুটিতেও পারে না।

সেদিন তখন দশটা বাজে।

বয়লারের গর্ভে আগুন জ্বলে, উৎপাদিত বিপুল শক্তি গুমগুম শব্দ করে।

শ্রমিকের দল আপন আপন কাজে লাগিয়া যায়।

কলের ছোট বড় চাকাগুলা ঘুরিতে শুরু করে, প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত—দ্রুততর!

দাঁতওয়ালা চাকাগুলা দাঁতে দাঁত মিলিয়া অবহেলে ওই বিরাট লোহার রাজ্য চালাইয়া চলিয়াছে, শ্রান্তি নাই, বিরক্তি নাই, অবসাদ নাই।

গোষ্ঠ বয়লারটার পানে তাকাইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে আপন মনেই বলে, ঠিক ওই ভুঁড়ে মালিকদের মত, দুনিয়াটা দাঁতে দাঁতে টেনে গিলেই চলেছে, গিলেই চলেছে; অরুচি নাই, বিরাম নাই, অবিরাম।

একটা ছেলে আসিয়া কয়খানা কাগজ দিয়া যায়, গোষ্ঠ কহে, কি রে?

ছেলেটা সরিয়া যাইতে যাইতে কহে, চুপ। ম্যানেজার দেখতে পাবে, প'ড়ে দেখ না।

গোষ্ঠ কাগজটা পড়ে, শ্রমিক মিলিত হও।

গোষ্ঠ তাচ্ছিল্যভরে কাগজখানা বয়লারের মুখে ফেলিয়া দিল. সেখানা অগ্নিগর্ভ লৌহপুরীটার আঁচেই হইয়া গেল তামাটে, সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়াইয়াও গেল। এমন কাগজ প্রায়ই পাওয়া যায়, ওই বাবুরা দেয়।

অন্য একজন ফায়ারম্যান কিন্তু সেটা মন দিয়া পড়ে।

এমন সময় সেখানে আসিয়া পড়িল মাদ্রাজী ম্যানেজার।

ম্যানেজার আসিয়াই কহে, সব ঠিক হ্যায় টিণ্ডাল?

হেড ফায়ারম্যান—টিণ্ডাল, সে সেলাম বাজাইয়া কহে, হাঁ হুজুর, সব ঠিক হ্যায়।

ষ্টীম কেতনা?—বলিয়া ম্যানেজার নিজেই উপরের মিটারটার পানে চাহিয়া দেখে।

সহসা ম্যানেজারের নজরে পড়ে ওই ফায়ারম্যানের হাতের কাগজখানা, উত্তপ্তকণ্ঠে সে কহে, উ কেয়া হ্যায়?

ফায়ারম্যানটি কহে, একঠো কাগজ হুজুর।

কেয়া লিখ্‌খা হ্যায় উসমে, মিল তোড় দেও, ষ্ট্রাইক চালাও?

নেহি হুজুর, এক সাথ মিলনেকো লিয়ে লিখ্‌খা হুয়া হ্যায়।

হাঁ হাঁ, ওহি বাত হ্যায়, ইউনিয়ন করনেকা লিয়ে লিখ্‌খা হ্যায়। কোন্ দিয়া হ্যায়?

রাস্তামে মিল গিয়া হুজুর।

লায়ার, ঝুটা বাত, সচ কহো।

এবার সাহেব মাটিতে পা ঠোকে।

অগ্ন্যুত্তপ্ত শ্রমিক, তাহারও প্রাণে এ আঘাত সয় না, তাহার মনে হয়, ও লাথি মাটির বুকে তো নয়, উহাদেরই বুকে পড়িল। গোষ্ঠ গম্ভীর কণ্ঠে কহে, গালি মত দেনা হুজুর।

ছোট মুখে বড় কথায় ম্যানেজারেরও মেজাজ গরম হইয়া উঠে, সে হাতের বেতটা সপাং করিয়া গোষ্ঠর পিঠে বসাইয়া দিয়া চলিয়া যায়।

যাইতে যাইতে কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পকেট হইতে একটা টাকা গোষ্ঠের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার চলিয়া যায়, যাইবার সময় মোলায়েম সুরে বলিয়া যায়, ওইসিন কাগজ মিলনেসে বয়লারকো অন্দর ফেক দেনা, মগজ বিগড় যায়েগা।

বেতের জ্বালায়, অপমানের দাহে গোষ্ঠ গুম হইয়া বসিয়া থাকে। ওই বয়লারটার শব্দ যেন ওর আহত বুকের মাঝে বাজে; ক্ষণপরে সহসা বয়লারটার ঢাকনিটা খুলিয়া, অপমানের দাম, ওই তাচ্ছিল্য-

ভরে ছুঁড়িয়া দেওয়া টাকাটা বিরাট অগ্নিতাণ্ডবের ভিতরে ফেলিয়া দেয়।

রূপাটা গলিয়া গলিয়া গড়াইয়া জ্বলন্ত কয়লার চাপের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া যায়, গোষ্ঠ একদৃষ্টে তাই দেখে।

টাকাটার ওই গতিতে তবু তাহার মনে সান্ত্বনা আসে।

মুক্ত দ্বারপথে বয়লারের আগুন যেন বিকট শব্দে বিশ্বগ্রাসে আগাইয়া আসিতে চায়।

রক্তচক্ষে গোষ্ঠ আপন মনেই কহে, পারবি, বাইরে এসে সারা সৃষ্টিটা অমনই ক'রে গলিয়ে ফেলতে পারবি? দূর দূর, লোহার ঢাকনিটাই ফাটাতে পারিস না, তা সৃষ্টি! মানুষের গোলাম তুই; আবার বলে, আগুন দেবতা!

অসম্ভব জোরে সে লোহার দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, বলে, মর, ওরই ভেতর গুম্‌রে গুমরে মর।

অন্য সঙ্গি কয়টি তাহারই পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে, একটা সহানুভূতির দৃষ্টি সকলেরই চক্ষে, কিন্তু সান্ত্বনা দিবার ভাষা যেন পায় না, অক্ষমতার দোহাই দিয়া সান্ত্বনা দিতে মন বুঝি উহাদের আর উঠে না, গোষ্ঠ আপন মনেই বুকের উষ্ণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া যায়, ঠিক, আমাদেরই মত, বুকের আগুন বুকের মাঝে অমনই গুমগুম করে, বেরিয়ে আসতে পারে না।

এইবার টিণ্ডাল একটা কথা খুঁজিয়া পায়, কহে, আসবে রে আসবে একদিন; বাবুরা বলে শুনিস নি?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে গোষ্ঠ বলে, হ্যাঁ, বেরুবে যেদিন, সেদিন আর এই হাড়পাঁজরাগুলো থাকবে না। আমাদের পোড়াতে আর আগুন লাগবে না, আর পোড়াবেই বা কে? টেনে ফেলে দেবে, মাটিতে হাড়গুলো মিশে যাবে, মাংস খাবে শেয়াল-শকুনি।

টিণ্ডাল সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলে, নাঃ, এর বিধান করতেই হবে।

গোষ্ঠ হাসে অবিশ্বাসের হাসি।

টিণ্ডাল বলে, চল্, আজ বাবুদের কাছে যাব। ওরা বলে, সভা করলেই এর উপায় হবে; সব কেঁচো হয়ে যাবে।

অন্য একজন ফায়ারম্যান বলে, হ্যাঁ, ওদের কাছে যাবি, ওরা তোদের বুকের ওপর ব'সে খাবে, আমি দু-দুবার দেখেছি, আমাদের দিয়ে ধর্ম্মঘট করালে, আর শেষে ওরাই ঘুষ খেয়ে আমাদের সর্বনাশ করলে। বাবা, সাপের দুটো মুখ, যেমন মালিক, তেমনই ওই বাবুরা।

টিণ্ডাল ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া কহে, না না না, ওই যে শিবকালী আর সুরেনবাবু, ওই যে রে খদ্দর পরে, আমাদের পাড়ায় যায় মাঝে মাঝে, ওরা তা নয়। পাপী আদমীর চেহারাই আলাদা হয় রে, মহাত্মাজীর শিষ্য ওরা! এই ছোকরা এই!

ও পাশের কর্মরত ছোকরাটা এ পাশ ও পাশ চাহিয়া দেখিয়া ছুটিয়া আসে। হেড ফায়ারম্যান বলে, যা তো, বড় মিস্ত্রী, ছোট মিস্ত্রী আর রামকিষণ—এদের ব'লে আয়, যেন টিফিনে সব এইখানে আসে, কাজ আছে, বাড়ি না যায়।

ছোকরাটা বলে, সায়েব যদি দেখে?

টিণ্ডাল কলে দিবার তেলের চুঙ্গিটা ওর হাতে দিয়া কহে, এইটে হাতে ক'রে যা।

ছোঁড়াটা চুঙ্গি হাতে চলিয়া যায়।

বারোটায় ভোঁ বাজে—টিফিনের ছুটির সিটি, সিটিটা আজ হয় অনাবশ্যক দীর্ঘ, আর ঘন ঘন; ফায়ারম্যানগুলির মন যেমন উৎকণ্ঠিত-ভাবে বলে, সাথীরা আয় আয়। বয়লারের বাঁশীর সুরে তেমনই ভাষা উহারা ফুটাইতে চায়, মনে করে, এই অভিনবত্বের মাঝে আহ্বানের ইঙ্গিতটা সাথীরা বুঝিবে।

বড় মিস্ত্রী আসে, তেমনই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, যন্ত্রচালিতের মত ভাব। ছোট মিস্ত্রী আসে গান ধরিয়া, আর বাঁশী বাজাও না শ্যাম।

কি, সব খবর কি? কিছু পেয়েছিস নাকি, খাওয়াবি?

গোষ্ঠ বলে, ভাগ নিবি? এই দেখ।—বলিয়া পিঠটা খুলিয়া দেখায়, রক্তমুখী দড়ির মত দাগ। কথায়, চোখে তাহার ব্যথার জ্বালা ফুটিয়া বাহির হয়, যেন বয়লারের মুখেই ঢাকনিটা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহার আঁচলটা উহাদেরও উত্তপ্ত করিয়া তোলে।

বড় মিস্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে কহে, কে মেলে?

ছোট ম্যানেজার!

চল্, বড় সায়েবের কাছে যাব।

টিণ্ডাল বলে, হ্যাঁ, ওদের কাছে গিয়ে তো সব হবে, সব মুখ শোঁখাশুঁখি হয়ে যাবে, ও হবে না।

তবে?

আমি বলছিলাম, চল্, বাবুদের কাছে চল।

ছোট মিস্ত্রী ঘৃণার ভঙ্গীতে কহে, দূর, ওরা আমাদের চেয়েও ভেড়া।

হেড ফায়ারম্যান বলে, তবু ওরা আমাদের দিকে তাকাবে, ওরাও চাকর, আমরাও চাকর, বুঝলি? আর যদি ঠকায়ই ওরা, তা হ'লে ওদের উপকার তো হবে।

অসহিষ্ণুভাবে ছোট মিস্ত্রী কহে, তা হবে না বাবা, ওসব আমি বুঝি না, যদি ঠকায় আমাদের, তবে জান নেব, স্পষ্ট কথা আমার; রাজি হও, তবে আমরা ওদের কাছে যাব।

টিণ্ডাল বলে, না রে, শিবকালীবাবু, সুরেনবাবু ঠকাবার আদমী নয়, ওরা মহাত্মাজীর চেলা।

ছোট মিস্ত্রী বলে, বিশ্বাস আমি কাউকে করি নে, সে চেলাই হোক আর ফেলাই হোক! আমাদের ভাতে মারে, আমরা হাতে মারব—এই বোঝাপড়া হয়, রাজি আছি।

তোর মনের দোষ, বুঝলি।

ঠ'কে আর ঠেকেই মানুষ শেখে ; মুখ দেখে মন বোঝা যায় না, বুঝলি ? বিশ্বাসের কাল নাই আর, যাকে বিশ্বাস করবি, সেই ঠকাবে ; খাঁটী কথা। আর দোষ দিস আমার ?

কথাটা সত্যই খাঁটী, দোষ কাহার ?

বঞ্চিতের, না বঞ্চকের ?

যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই ক্ষুধাতুরের দল শুধু যে স্বার্থেই বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহা তো নয় ; যে বিশ্বাস মানুষের জীবনের একটা পরম আশ্বাস—শান্তি, সেটুকুতেও দুনিয়া ইহাদের নিঃস্ব করিয়া তুলিয়াছে।

তাই এই রত্নভরা সারা বসুন্ধরা উহাদের চোখে আজ শুধু মেকী আর ফাঁকি ছাড়া কিছুই নয়।

যুগ-যুগান্তরের বঞ্চনায় আজ উহারা অন্তরে বাহিরে রিক্ত ; হাহাকার আজ উহাদের বাণী।

বঞ্চনার ভয়ে ওরা ত্রস্ত।

অবিশ্বাস আজ উহাদের সংস্কার।

বড় মিস্ত্রী বলে, ওরে, এতটা অবিশ্বাস ভাল নয়।

উহার সংস্কারগত বিশ্বাস আজও মরে নাই। বড় মিস্ত্রী আবার বলে, দুনিয়াতে আর বিশ্বাস রইল না, এর পর বাপও আর ছেলেকে বিশ্বাস করবে না।

ছোট মিস্ত্রী বলে, করবে নাই তো, তোমাদের সে এক কাল গিয়াছে, লোকে বিশ্বাস ক'রে ঘরের কোণে লুকিয়ে টাকা ধার দিয়ে এসেছে ; পাওনাদার ম'রে গিয়েছে, দেনাদার তার ওয়ারিশকে টাকা দিয়ে এসেছে ; আর আজ, ঘোর দেখি সারা বাজারটা, একটা লোক সত্যি কথা কয় ? দোকানী দাম বলে চার ডবল, খদ্দের তাতেই রাজি। মতলব হচ্ছে তার ফাঁকি দেবার, মিথ্যে বই সারা বাজারটার কিছুই নাই। আর আমরা, আমাদের গলা তো সবাই কাটে, মালিক কাটে, খাজাঞ্চী কাটে, দোকানী কাটে, তুমি আমার কাট, আমি তোমার কাটি। অবিশ্বাসের দোষ আছে ?

বড় মিস্ত্রী ভাবে : সমস্ত শ্রোতার দলও নির্বাক হইয়া ভাবে।

হেড ফায়ারম্যান নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহে, তা বেশ তো, আমাদের ওদের সঙ্গে মিলে কাজ কি আছে, ওদের পরামর্শ নিতে তো দোষ নাই, ওদের একটু খাটিয়ে নে না।

বড় মিস্ত্রী বলে, সেই ভাল. চল, ওদের দুজনকে সন্ধ্যেতে আমাদের ওখানে যেতে ব'লে আসি। দল বাঁধিয়া সব বাবুদের বাসার দিকে যায়। শিবকালী কেরানী, আর সুরেন টাইপিষ্ট।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স ; শতকরা আশীজন বাঙালীর ছেলের মতই দুর্বল দেহ · কিন্তু চোখে স্বপ্ন, বুকে আশা। চোখ হইতে মাঝে মাঝে আগুনের ঝলকও বাহির হয় ; সহকর্মীরা শিহরিয়া উঠে, কিন্তু আড়ালে ব্যঙ্গ করিয়া বলে, ভারত-উদ্ধারের দল।

সুরেন বলে, আমরাই তার ভিত্তি গেড়ে যাব। সুগভীর বিশ্বাস উহার বাক্যের প্রতি অক্ষরের মধ্যে রনরন করিয়া বাজে, সে ঝঙ্কারে সহকর্মীদের ব্যঙ্গ মূক হইয়া যায়।

শিবকালী বলে, সে শুভ্র প্রভাতের আলোর রেশ আকাশে লেগেছে, আকাশ লালচে হয়ে উঠেছে। এত বড় দুর্দ্দশা, একটা এমনই বড় উন্নতির ইঙ্গিত নিশ্চয় করছে।

ওর কথার বেশ অর্থ হয় না, তবু সহকর্মীদের কেমন ভয় করে, অদূরভবিষ্যতে একটা জীবন-মরণের যুদ্ধের ছবি মনে জাগিয়া উঠে।

আবার বুকের এক কোণ হইতে লুপ্তপ্রায় একটা উত্তাপও যেন জাগিয়া উঠে, খানিকটা উত্তেজনাও যেন লাগে, তারাও ভারত উদ্ধারের কথা কয়।

নাঃ, আর বেশি দেরী নাই।

একজন বৃদ্ধ কহে, তাও আমাদের নাতির আমলের আগে নয়।

দেশবন্ধু থাকলে কিন্তু আরও আগে হ'ত।

মহাত্মাই কি করেন দেখ।

খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক একটি ছোকরা বলে, মহাত্মা কি হে, অর্দ্ধ-উলঙ্গ রাজদ্রোহী ফকির বল।

থিয়েটারে হিরোয়িনের পার্ট করে রমেশ, সে ভাবাবেগে গান ধরে,আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, আমরা ঘুচাব মা তোর ক্লেশ।

একজন বলে, আন্, ডুগি তবলা আন, হারমোনিয়ম আন, আসর পাত্, তা না, ভারত আর ভারত। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজে কাজ কি বাপু? ভারত উদ্ধার হলে তোদের কী রাজ্যলাভ হবে শুনি?

খবরের কাগজের পাঠক ছোকরা উষ্ণ হইয়া কহে, কি বললে, কিছু হবে না?

কি হবে শুনি? জিওগ্রাফিতে পড় নি ধনমণি যে, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না; কেমন, না একটি বলের উপর একটি পিপীলিকা ছাড়িয়া দিয়া উহাকে যে ভাবেই ঘুরাও না কেন, পিপীলিকা তাহার গতি বুঝিতে পারে না। বাবা, আমরা হলাম পিপীলিকা।

স্বাধীনতা অধীনতায় কোন ভেদ নাই দাদা, কোন ভেদ নাই।
কলম পিষিয়া যাই, কলম পিষিয়া খাব।
বাঁশরী বাজাব শুয়ে যেমন বাজাই।

ইহার পর আর মতভেদ থাকে না, ওরা বাঁশীই বাজায়। স্বপ্নপ্রবণ তরুণ দুইটি তখন ঘরের মাঝে বসিয়া শ্রমিক-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার কর্মপন্থা ছকে।

শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিবার চেষ্টাও উহাদের ছিল, গোষ্ঠ এখানে আসিবার পূর্বে উহারা দুইজনে শ্রমিকদের আড্ডায় যাইত; উহাদের মত হইয়া মিলিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু মিলিত না। উহারা যাইতেই গায়কের গান বন্ধ হইয়া যাইত, কিষণলাল ঢোলকটা পাশে সরাইয়া রাখিত।

সুরেন কহিত, রাখলে কেন, লাগাও, আমরাও শুনি।

উহাদের বিছানাতেই বসিয়া পড়িত, কিন্তু তাহাদের তাহাতে বিষম আপত্তি।

বড় মিস্ত্রী একখানা ময়ূর-আঁকা জাপানী মাদুর বিছাইয়া কহিত, ওখানে নয়, বাবু, এখানে বসুন, এখানে বসুন।

ব্যবধান একটা থাকিয়াই যায়।

ফিরিবার পথে দুই বন্ধুতে তাই লইয়া আলোচনা হইত।

সুরেন কহিত, এ ব্যবধান আমাদেরই স্বখাত-সলিল। যাক, এ ব্যবধান পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অসহিষ্ণু হ'লে চলবে না, দশ দিন, বিশ দিন, দু'মাস, ছ'মাস—একদিন ভুল ভাঙ্গতে বাধ্য। হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে, হতাশ হয়ে, অসহিষ্ণু হয়ে ফিরিয়ে নিলে চলবে না, একদিন ওরা সে হাত ধরবেই।

শিবকালী কহে, নিশ্চয়, এই যে একটা স্বাতন্ত্র্য, এই সে মিলনের সূচনা; দুনিয়াতে প্রত্যেক জিনিষেরই একটা প্রতিক্রিয়া আছে; বৈশাখের শুষ্ক নদী শ্রাবণের বন্যার পূর্বাভাষ।

ইহাদের এই আসা-যাওয়াটা কিন্তু শ্রমিকদের বেশি দিন ভাল লাগিল না; সন্দিগ্ধ চক্ষে, অধঃপতিত মনে নানা কথা জাগিয়া উঠিল; ফলে এমন কুৎসা তাহারা রটাইল যে, সুরেন-শিবকালীকে যাওয়া-আসা বন্ধ করিতে হইল, কিন্তু রাগ করিল না।

সহকর্মীরা ইঙ্গিত করিল, বাবা, সিংকিং সিংকিং ওয়াটার ড্রিংকিং!

সেটা কিন্তু প্রত্যক্ষে নয়, পরোক্ষে।

সুরেন সে শুনিয়া আগুন হইয়া উঠে; শিবকালী কিন্তু ফুৎকারে কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিয়া কয়, ডোণ্ট বি সেণ্টিমেণ্টাল।

সে দিন শিবকালী আর সুরেন টিফিনের ছুটিতে মেসে বসিয়া ওই কথাই কহিতেছিল, ও ঘরে বাবুরা বসিয়া তামাক টানিতেছিল, এমন সময় শ্রমিকের দল আসিয়া সেলাম জানাইল।

শিবকালী আপনার ও সুরেনের বিছানা দুইটা টানিয়া পাতিয়া দিয়া কহে, ব'স ব'স মিস্ত্রী ব'স সব।

বড় মিস্ত্রী জোড়হাত করিয়া কহে, মাপ করবেন বাবু, তেল কালী কয়লায় গায়ে একটা খোলস প'ড়ে গিয়েছে, বসলে বিছানাই মাটি হবে, আমরা এসেছি, একবার সন্ধ্যেবেলায় আমাদের ওখানে পায়ের ধূলো দিতে হবে।

সুরেন কহে, ব্যাপার কি হে মিস্ত্রী ?

আজ্ঞে, সেইখানেই বলব সব, যাবেন তা হ'লে, যেতে বলতে মুখ তো আমাদের নাই।

শিবকালী হাসিযা কহে, সেজন্যে লজ্জিত হ'য়ো না মিস্ত্রী, পাঁচ-জনের মন তো সমান নয়, তাই পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়; তা যাব আমরা। তবে কি জন্যে যেতে হবে জানা থাকলে সুবিধে হ'ত।

ছোট মিস্ত্রী কহে, আমরা একটা সভা গড়তে চাই, তবে আপনারা শুধু গ'ড়ে দেবেন, আপনাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

শিবকালী ছোট মিস্ত্রীকে আবেগে আলিঙ্গন করে।

বড় মিস্ত্রী কহে, কালি লাগবে বাবু, কালি লাগবে।

শিবকালী কহে, মিস্ত্রী, কালি-লাগা জামাটা আমি রেখে দেব। এ কালি আমি মুছব না।

সুরেন কহে, আর আমাদের গায়ের কালি বড় মিস্ত্রী, এ যে চামড়া না তুললে উঠবে না; কালিতে লজ্জাই বা কি, আর ক্ষতিই বা কি ?

ছোট মিস্ত্রী বলে, আমরা কিন্তু কিছু জল খাবারের ব্যবস্থা করব। সরল ব্যবহারে, ছোট মিস্ত্রীরও উহাদের বেশ ভাল লাগে।

সুরেন বলে, বেশ বেশ, বহুত আচ্ছা, খেতে আমি খুব ভালবাসি।

শিবকালী কহে, আর আমি বুঝি বাসি না, আমি বুঝি মার খেতে, গাল খেতে ভালবাসি ?

সকলে হাসিয়া উঠে, লঘু হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়া সকলে কেমন একটা সরল আত্মীয়তার সরল সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায়;

ওই লঘু-হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়াই বুঝি প্রথম আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়, ক্রমে সে গভীরতার মধ্য দিয়া সুদৃঢ় বিরাট হয়।

বীজ উপ্ত হয় স্বল্প মাটির নীচে, গাছ বড় হয়, তখন মূল চলিয়া যায় মাটির গভীরতা ভেদ করিয়া সুদূর অন্তরে—অন্তরতম প্রদেশে।

ওদিকে সিটি বাজে—কাজ, কাজ, কাজ।

শ্রমিকদের দল চলিয়া যায়।

হেড ফায়ারম্যান বলে, দেখলি কেমন লোক।

বুড়া মিস্ত্রী বলে, ওরা বুকে ক'রে নিতে চায়, আমাদেরই বিশ্বাস হয় না, আর আমাদের বুকে কাঁটা আছে, সহ্যও হয় না।

ছোট মিস্ত্রী বলে, পাড়াগাঁয়ের বাবু বোধ হয়; তাই এমন ধারা। পাড়াগাঁয়ের মুচীও গ্রামসুবাদে মামা হয়।

গোষ্ঠ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আজ তাহার গ্রামকে মনে পড়ে, রমাপতি মাষ্টার, মুদী খুড়ো, যোগী কত্তা; সত্য, সেখানে অভাব থাক, নিদারুণ হতাশা থাক, তবু মমতা ছিল।

আবার আপন কাজে লাগিয়া যায়।

ওই আগুনের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে মন আবার হালকা হইয়া উঠে। গোষ্ঠর মুখেও গান আসে, হাসি ফোটে।

এতক্ষণে সে হেড ফায়ারম্যানকে বলে, যাই বল বাপু, এও বেশ, খাই দাই কাম বাজাই, ধার কারুর ধারি না। আর এ কাম কি, একটা দৈত্যের সঙ্গে লড়াই!

কর্মের মাঝে একটা আনন্দ আছে, আত্মপ্রসাদ আছে যে।

সেই দিনই সন্ধ্যায় শ্রমিকসঙ্ঘ গঠিত হইয়া যায়; বড় মিস্ত্রী ছোট মিস্ত্রী, টিণ্ডাল, কিষণলাল, গোষ্ঠকে লইয়া এক পঞ্চায়েত গঠিত হয় উহাদের।

কত নূতন নিয়মকানুন হয়।

বেশ একটা আনন্দও পায়। কি যেন গভীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করে।

বাবুরা বলে, মাটির বুক চিরে ফসল ফলায় কারা ?

তোমরা।

আগুনের সঙ্গে লড়াই ক'রে কল চালায় কারা ?

তোমরা।

মাটির ভেতর খনির অন্ধকূপে, সোনা রূপো হীরে জহরৎ খুঁড়ে বের করে কারা ?

তোমরা।

তোমরা হচ্ছ দুনিয়ার হাত, তোমরা দুনিয়ার মুখে আহার তুলে দাও, তবে দুনিয়া খায়।

কথাটায় মনের ভিতর উহাদের অহঙ্কার জাগে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের এত বড়, এত শক্তিমান ভাবিতে বুক কাঁপিয়া উঠে, নিজেকে যেন নিজেরই ভয় হয়।

বুড়ী সাবি বাউরিনী বলে, না বাপু, ও আবার কি কথা, আমরা গরিব মানুষ, গরিবের মত থাকব—না বাপু, ভয় লাগছে আমার।

সভার কাজ সারিয়া তরুণ দুইটিও ফেরে নীরব নিস্তব্ধ। তাহারাও ভাবে।

সহসা সুরেন কহে, ওদের এখনই চাই সেলফ-কন্‌শাস্‌নেস্‌ : আত্মবিস্মৃতি না টুটলে জাগরণ আসবে না ; শিক্ষার ব্যবস্থা না হ'লে তা হবে না, নাইট স্কুল ষ্টার্ট ক'রে ফেলা যাক।

শিবকালী বলে, এদের জন্যে তার প্রয়োজন নেই, সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। লঘু মেঘ, সে হ'ল বাষ্প, তার মধ্যে শত সাধনাতেও বজ্রের সন্ধান পাবে না, কিন্তু ঝড় এসে তাদের মিলিত ক'রে দেয়, বর্ষণে বজ্রে ধরণী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।

যুগ-যুগান্তরের উচ্ছৃঙ্খল শক্তি কিন্তু একদিনে সংযত হয় না, দূর-দূরান্তরের প্রবাহমানা নদীর ঘূর্ণিভরা বন্যা সহসা বাঁধনে বাঁধা যায় না।

উহাদের আজন্মের উদ্দাম প্রকৃতি নিয়মের বাঁধন মানিতে চায়

না। দল আবার ভাঙ্গিতে শুরু করে, একদিনের কথার ঘায়ে জাগানো অনুভূতি ধীরে ধীরে সুপ্ত হইয়া পড়ে।

বাউরীর দল আগে ভাঙ্গিল।

একদিন উহারা আসিয়া কহিল, তোমাদের সঙ্গে আমরা আর নাই বাপু।

বড় মিস্ত্রী বলে, কি হ'ল কি, কেন, থাকবি না কেন শুনি?

মানতে হয় আমরা মালিককে মানব, তোমাদের কেন মানব? খেতে পরতে দাও তোমরা?

আরে, শোন্ শোন্, তোরাই সব পঞ্চায়েত হবি আয় না, আমরা ছেড়ে দিচ্ছি।

কে সে কথা শুনে, উহারা কিছুতেই মানে না, জবাব দিয়া চলিয়া যায়, তখন পাড়ায় উহাদের মহোৎসব চলিতেছে, মালিক-পক্ষ আজ মদের জন্য করকরে দশ টাকা বকশিশ করিয়াছে।

সুরেন আবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু কিছু হয় না; ভাঙা দল আর জোড়া লাগে না।

শিবকালী কহিল, কেন মিছে চেষ্টা করছ সুরেন, চাপ না পড়লে ওরা এক হবে না; দেখেছ; আকাশে মেঘ আসে, চ'লে যায়, কিন্তু যেদিন বায়ুপ্রবাহ চাপ দেয় সেদিন বিচ্ছিন্ন মেঘমালা জমাট বেঁধে এগিয়ে আসে।

সুরেনও যাওয়া-আসা ছাড়িল।

আবার যা ছিল তাই; সেই নেশা, নাচ, গান, তাণ্ডব, কোনরূপে জীবনটাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া, জীবনের দিন কয়টাকে ক্ষয় করা।

হঠাৎ কাজের চাপ পড়ায় কোম্পানি শ্রমিকদের কাজের সময় সামগ্রিকভাবে একঘণ্টা বাড়াইয়া দিল, মজুরিও বাড়িল, কিন্তু সে বাড়া অতি সামান্য, বিশেষ সারাটা দিন পরিশ্রমের প্রচণ্ড ক্লান্তি, অবসাদের মধ্যে আরও একঘণ্টা পরিশ্রমের বিরক্তি—ক্লান্তির তুলনায় তাহার মূল্য নগণ্য, মজুরদের তাহাতে তৃপ্তি হইল না।

একটা অসন্তোষ, মনের মধ্যে সহিয়া যাওয়া পুঞ্জীভূত অসন্তোষের উপরে আসিয়া সে অসন্তোষকে নাড়া দিয়া যেন সজীব করিয়া তুলিল।

মদের দোকানে ভিড় বেশি জমিতে শুরু হইল; এই অবসাদ এই ক্লান্তি দূর করিতে, সারাদিনের আয়ুর দামে অমৃত্যু-করা বিষ উহারা আকণ্ঠ গিলিতে শুরু করিল।

গোষ্ঠ যেন মদে পাগল হইয়া উঠিল; কোনদিন মজুরির অর্দ্ধেক যায়, কোনদিন বা বারো আনার ষোল আনাই নেশায় চলিয়া যায়।

সেদিন গোষ্ঠ শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিয়া ভাম হইয়া দাওয়ার উপর এলাইয়া পড়িল।

দামিনীর তখনও রান্না চাপে নাই, গোষ্ঠই রোজ ফিরিবার পথে বাজার করিয়া আনে, আজ তাহার শূন্য হাত আর নেশার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কা হইল।

চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল, আজ মনে হয়, শত দীনতা, শত নির্যাতনের মধ্যে সেই ছোট গ্রামখানি, সে ছিল ভাল।

মনে পড়ে সাতু ঠাকুরঝিকে, এমন দিনে দুই মুঠা চালের অভাব সেখানে কোনদিন হইত না। এখানে লোকের নিজেরই বুলায় না, অপরকে দিবে কোথা হইতে?

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, খরচ—?

গোষ্ঠ মুখ বাঁকিয়া কহে, কেয়া খরচ, বিস্‌কে খরচ, খরচ হমরা নেহি হ্যায়, জমা কর লেও, সব জমা হোগা; সেরেফ হামকো খরচ লিখ্ দেও।

চোখ মুছিতে মুছিতে দামিনী গোষ্ঠর মুখে চোখে জল দিয়া বাতাস করিয়া বলে, ওগো, রান্না হবে কিসে, খরচ কই, খরচ?

দুই হাতেরই বুড় আঙুল দুইটা প্রবলভাবে নাড়িয়া গোষ্ঠ কহে, ফক্কা, ফক্কা।

দামিনীর সারা অঙ্গ যেন হিম হইয়া যায়, উদরের মাঝে ক্ষুধার অগ্নিদাহ দাউদাউ করিয়া জ্বলে, সে তো উপেক্ষার নয়, ক্ষুধার তাড়নায় জননী সন্তানের মাংসও খাইয়াছে; সে উন্মাভরে কহে, তারপর পেট—পেট চলবে কিসে?

গোষ্ঠ হাত পা ছুঁড়িয়া খুব উৎসাহের সহিত চেঁচায়, আগুন জ্বালাও, পেটমে আগুন জ্বালাও।

দামিনী আর কথা কয় না; ঘরের মেঝের উপর কাপড় বিছাইয়া শুইয়া পড়ে, পেটে তো নয় তাহার ইচ্ছা করে সংসারজীবনে আগুন দিতে। ইচ্ছা করে, যাই মহান্তর কাছে। শুধু একটি মিষ্ট কথার অপেক্ষা: ওই কথাটির দামে সে যাহা দিবে সে অনেক, এই স্বামীর ঘরে তাহা কল্পনার বস্তু।

দামিনী যায়ও ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত; কিন্তু কেমন যেন আর পা উঠে না; মনে পড়ে তার দৃষ্টির লোলুপতা।

সারা অঙ্গ তাহার ঘিন ঘিন করিয়া উঠে।

সে আবার ফিরিয়া আসিয়া শোয়।

উপবাসের অবসাদে দামিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সারাটা দিন সে শুধু জলের উপর আছে, ওবেলা ঘরে যাহা ছিল, তাহাতে গোষ্ঠর জলখাবারও পুরা হয় নাই।

তন্দ্রার ঘোরে সে স্বপ্ন দেখে, মহান্ত তাহাকে ডাকে, সম্মুখে তাহার—থালার উপর নানা উপচারে সাজানো নৈবেদ্য, পাশেই একখানি সুন্দর আসন পাতা, যেন সে বলে, এস, দেবীর মতই তোমায় পূজা করিব। সহসা একটা প্রবল আকর্ষণে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া যায়।

মাতাল গোষ্ঠ তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিয়া কহে, এই, ভাত দে—ভাত।

আগুনের দাহে নেশার বিষে এতক্ষণে তাহার উদরে বিশ্বগ্রাসী আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

দামিনী রুক্ষ দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চায়, স্বপ্নেও সুখ এ তাহাকে দিবে না ?

বুভুক্ষু মদ্যপের কাছে এ নীরবতা অসহ্য বলিয়া বোধ হয়, গোষ্ঠ একটা চড় কষাইয়া কহে, লবাবের বেটি, হারামজাদী—

শরমস্তব্ধ নারীকণ্ঠ একবার অতর্কিতে ফুটিয়া, আবার নীরব হইয়া যায় ; শুধু চোখের জল বাঁধ মানে না।

সম্মুখেই ও ঘরে বসিয়া ছোট মিস্ত্রী ব্যাপারটা অনুভব করিয়া গোষ্ঠকে তিরস্কার করে, এই উল্লু, এই গোষ্ঠ, কি, হচ্ছে কি ? মেয়েলোকের গায়ে হাত ? খবরদার—

গোষ্ঠ ঘরের ভিতর হইতেই পড়িয়া পড়িয়া আস্ফালন করে, উঠিতে পারে না।

নারীকণ্ঠের চাপা-ক্রন্দনের আভাস তখনও পাওয়া যায়।

ছোট মিস্ত্রী আসিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারে ; চোখে পড়ে দামিনী।

দামিনী বড় বাহির হইত না, ইহাদের এই লোলুপ দৃষ্টি যেন তাহাকে বিঁধিত। সামনের বারান্দায় গোষ্ঠ আবার একটা অবরোধ তুলিয়াছিল। দামিনীকে দেখিয়া ছোট মিস্ত্রীর দৃষ্টি আর ফিরিল না, লোলুপ উদগ্র ক্ষুধা তাহার মত্ত চোখে জ্বলজ্বল করে। অবরোধের মাঝে থাকিয়া দামিনীর রং আরও খুলিয়াছে, অশান্তি-অভাবের পীড়নে সে শীর্ণ হওয়ায় তাহাকে যেন লম্বা দেখায়, কিন্তু মানায় যেন বেশি, বেশ ছিপছিপে দীর্ঘ দেহ।

দামিনী মিস্ত্রীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিতে গেল, কিন্তু শতছিন্ন কাপড়খানার এক পাশ টানিতে আর একপাশ নগ্ন হইয়া পড়ে ; সেদিকে দামিনীর ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সে মুখখানা ঢাকিল, কিন্তু অঙ্গের ওই একটা দিকের নগ্ন সৌন্দর্য্যেই মাতাল ছোট মিস্ত্রী উন্মত্ত হইয়া উঠে ; সে হাত বাড়াইয়া দামিনীকে ডাকে, একটা পা ঘরের মধ্যেও আগাইয়া দেয়।

ভয়ে দামিনীর বুক কাঁপিয়া উঠে, সে ছুটিয়া গিয়া ওই জ্ঞানশূন্য স্বামীকে জড়াইয়া ডাকে, ওগো, ওগো, ওঠ গো, ওঠ।

ছোট মিস্ত্রী এবার পালায়, বলিতে বলিতে যায়, শালার ফাঁসি দিতে হয়, এমন পরিবারের গায়ে কাপড় না দিয়ে শালা মদ খায়।

দামিনী এবার উঠিয়া তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়; ওই মুহূর্ত্তটুকুতে সে দেখে, আরও একজনের দৃষ্টি তাহারই উপর আবদ্ধ, সেই ঘোলাটে চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি।

দামিনীর আপন দেহের 'পরে ধিক্কার জন্মিয়া যায়।

সে ফিরিয়া গিয়া আবার শোয়।

আরও এক জোড়া দৃষ্টি তখন দামিনীর 'পরে আবদ্ধ ছিল; পিছনের ছোট ঘুলঘুলির মধ্য দিয়া পিপাসিত চক্ষু জাগিয়াছিল সুবলের।

পান-বিড়ি, মুড়ি-মুড়কির দোকান ফেলিয়া সে দিনে দশবার সেথায় আসিয়া চোখ পাতিয়া থাকিত, বউকে একটি পলক দেখার জন্য।

ষ্টেশনের জমাদারকে কহিত, দেখো তো দাদা দোকানটা, আমি এলাম ব'লে, বিড়ি খাও ততক্ষণ।

ঘুলঘুলি তো নয়, যেন তমসার দ্বারপথ, অন্ধকার—সব অন্ধকার; দৃষ্টি শিহরিয়া উঠে, চোখের তারা শঙ্কা পায়, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুবল ফিরিয়া আসিত। আবার হয়তো ঘণ্টা খানেক পরে, বালতির জলটা ফেলিয়া দিয়া আপন মনেই কহে, এঃ ময়লা কত! জল পালটে আনি, দোকানটা দেখো তো ভাই পানিপাঁড়ে।

পানিপাঁড়ে হাসিয়া কহে, এ যে জল ফেলে জল আনতে যাওয়া হে, বলি, কোন্ ঘাটে হে, এ পাড়া না নাম-পাড়া? বাউরিপাড়ার পানে আঙুল দেখায়।

সুবলও আর সে সুবল নাই, এই মুখর আবহাওয়ায় সে বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, মুখ ফুটিয়াছে, ছলনায় আর বাধে না; সে কহে, ঘাটে নয় হে, কলের মুখে।

পিরীত করবি, গোপনে করবি, তবে তো থাকবি সুখে, বেশ বেশ বেঁচে থাক কালাচাঁদ।

দেখ, এই দেখ, জলে পোকা দেখ।

জল-ফেলা জায়গায় কয়টা পিঁপড়ে নড়ে, সুবল তাহাই দেখায়। তারপর ত্বরিত পদে সে চলিয়া যায়।

আজিও এমনই একটি গোপন চোখ-পাতার অবসরে এই ঘটনাটি তাহার চোখে পড়িল; অন্ধকারের মাঝে দামিনীকে উজ্জ্বলভাবে দেখা না গেলেও দামিনীর আর্ত্ত কণ্ঠ, গোষ্ঠর গালিগালাজ, ছোট মিস্ত্রীর ওই কাপড়ের কথা সুবলের কানে গেল; তাহার অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল অনাহারক্লিষ্টা, শীর্ণা, অবসন্না, অশ্রুমুখী দামিনী, পরনে জীর্ণ বাস; লাজত্রস্তা নারী এ পাশ আবরণ করিতে ও পাশ নগ্ন হইয়া যায়। সে বুঝি মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া ধরিত্রী জননীর কোলে আশ্রয় চায়।

সুবলের আর জল লওয়া হইল না, সে ফিরিল।

কিছুক্ষণ পরেই সে একটা চাঙারি মাথায় করিয়া গোষ্ঠদের বাড়ী ঢুকিয়া হাঁকিল, কই হে, মোড়ল কই?

ছোট মিস্ত্রী দাওয়ায় বসিয়া কহে, কি হে দোকানী?

এই ভাই একটা সিধে আছে, মোড়লের বাড়ী দিতে হবে; অনেক দিন থেকেই মনে করছি, দোকান করলাম, মোড়ল গাঁয়ের লোক, একদিন খাওয়াব; তা ভাই, আমার কে রাঁধে-বাড়ে, তাই সিধে দিয়েই সারি। কই, মোড়ল কই?

বলিয়া সুবল গোষ্ঠর বারান্দায় উঠিয়া রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে।

ধীরে ধীরে দুয়ারটা খুলিয়া দিয়া দামিনী সরিয়া দাঁড়ায়, সুবল সম্ভারপাত্রটি মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া মৃদু কণ্ঠে কহে, এমন দিনে আমাকে একটা খবর দিলেও তো পার।

দামিনী উত্তর দিতে পারে না, কাঁদিয়া ফেলে।

দামিনীর চোখে জল দেখিয়া সুবলও কাঁদিয়া ফেলিয়া কহে,

বউ!—বলিয়া সে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে দামিনীর হাত দুইটি ধরিতে যায়, মুহূর্ত্তে দামিনী হাত দুই পিছাইয়া গিয়া তাহার পানে তাকায়, সজল চোখেও দামিনী ঝলকিয়া যায়।

সুবল পলায়। গোষ্ঠর তখন নাক ডাকে, যেন মরণ-ঘুম।

দামিনী ঘরে খিল দিয়া ওই আহার্য্যসম্ভারের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

ভোরে উঠিয়া গোষ্ঠ ক্ষুধার যাতনায় চারিদিকে চায়, দামিনী তখন ওপাশে ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

চোখে পড়ে সেই খাবারের চ্যাঙারিটা।

গোষ্ঠ সেটা কাছে টানিয়া জলখাবারের আয়োজনটুকু গোগ্রাসে গিলিতে থাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে পিছন ফিরিয়া সে দেখে, দামিনী তাহারই পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

গোষ্ঠ ধীরে ধীরে তাহার পানে ফিরিয়া বসিয়া লজ্জিতভাবে কহে, কাল কি তোমাকে মেরেছিলাম?

দামিনী কথা কয় না।

গোষ্ঠ কহে, আমাকে মাপ কর, করবে না?

দামিনী আবেগরুদ্ধ আব্দার-ভরা সুরে কহে, ওগুলো আর খেও না।

এইগুলা গোগ্রাসে গিলিয়া গোষ্ঠ কলের পানে ছুটে; ভোরবেলা হইতেই ফায়ারম্যানের বয়লারে আগুন দিতে হয়, হাতলের পর হাতল ভরা কয়লা অগ্নিগহ্বরে নিক্ষেপ করে, দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলে, চিমনি দিয়া রাশি রাশি কালো ধোঁয়া প্রভাতের স্বর্ণ-আলোর পথ রোধ করিয়া সমস্ত স্থানটা ম্লান ছায়াচ্ছন্ন করিয়া তোলে।

বয়লারটা আপনার তেজে আপনি কাঁপে, গোঙায়—গুমগুম, গুমগুম।

সাতটায় সিটি পড়ে, ভোঁ—ভোঁ।

গোষ্ঠ হাসে আর বয়লারটাকে তারিফ করিয়া বলে, বাঃ বেটা, বাঃ বেশ বলছিস, ভোঁ—ভোঁ, দে সব ভোঁ-দৌড়।

কুলী-মজুরদের দল সিটির শব্দে কলের পানে ছুটে 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া; মুখের রবে কথাটা রটে না বটে, কিন্তু তাহাদের ওই ত্রস্ত ভঙ্গিমার গতিতে তাহা ফুটিয়া উঠে।

কল চলে। বয়লার গোঙায়, ইঞ্জিনের সঘন সুউচ্চ নির্ম্মম শব্দ ষ্টীমের ফোঁসানি, বেল্‌টিঙের টানে বড় বড় চাকাগুলা অবিরাম ঘুরপাক খায়: শব্দ হয় একটা আনুনাসিক ঘন—ঘন ঘং, ঘন—ঘন ঘং; বিপুল বিচিত্র বিকট শব্দ।

মজুরেরা কাজে মাতে; ওই শব্দরাজ্যে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে কিনা বোঝা যায় না; মন্ত্রের মত কাজ করিয়া চলে; ওই নির্ম্মম বিরাট শব্দে একটা অনুরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

ওই আবহাওয়ায় মানুষের বুকে হৃৎপিণ্ডের কোমল নৃত্য ক্রমশ কঠোর প্রবল হইয়া উঠে, ওই ইঞ্জিনটার সঙ্গে তাণ্ডবের তাল রাখিয়া ধকধক করিয়া চলিতে শুরু করে।

শ্বাস-প্রশ্বাস মুখ দিয়া হা-হা করিয়া পড়ে, যেন ঐ ষ্টীমের ফোঁসানির সঙ্গে সমতা রাখিতেই হইবে।

পেশীগুলা ওই যন্ত্রের মতই কঠিন হইয়া উঠে।

মানুষের অন্তর, ওই দাঁতওয়ালা চাকাগুলার মতই নির্ম্মম, কঠোর হইয়া উঠে।

একটা ছোঁড়া আসিয়া হেড-ফায়ারম্যান টিণ্ডালকে কি ফিসফিস করিয়া বলিয়া যায়।

গোষ্ঠও ভুরু তুলিয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে, কি?

টিণ্ডাল বলে, শিবকালীবাবু এসেছিল বড় মিস্ত্রীর কাছে, বলছে যে আজ থেকে আর ওভারটাইম খাটব না।

গোষ্ঠ কহে, তারপর?

না শোনে, ধর্ম্মঘট হবে, বাউরী শালারাও রাজি হয়েছে, ব'লে গেল।

আবার ছোঁড়াটা আসে, বলে, সব ঠিক, সবাই রাজি হয়েছে। আর আজ রাত্তিরে বটগাছতলায় সভা হবে, ব'লে দিলে। সব ব'লে এলাম।

সবারই বুকে যেন একটা আনন্দ জাগিয়া উঠে।

দুনিয়াতে বড় কাজের একটা আনন্দ আছে; শক্তিরও একটা আনন্দ আছে।

আজ পরস্পরের পানে তাকাইয়া উহারা মিষ্ট হাসি হাসে।

অতীতের ছোটখাটো মনোমালিন্যের কথা মনেই পড়ে না।

বেলা বারোটায় আবার সিটি বাজে; টিফিনের ছুটি। সব দলে দলে বাড়ি পানে চলে, মৃদু গুঞ্জনে সবাই আজ ওই কথাই বলে।

গোঠ চলে সবার শেষে; ফায়ারম্যানদের তাই নিয়ম। ওদিকে অগ্নিগর্ভ বয়লারটা শুধু ফোঁসায়।

দামিনী সেদিন শুইয়াই ছিল। আগের দিন উপবাসে গিয়াছে, এঁটো-কাটা নাই, বাসন মাজা নাই; আর ঘরেও আপনার বলিতে কিছু নাই, যাহা দিয়া নূতন করিয়া উনান জ্বালে। যাহা আছে, তাহা সুবলের দেওয়া, কিন্তু সে স্পর্শ করিতে মন চাহিতেছিল না; বিশেষ করিয়া গোঠের সেই নির্লজ্জ খাওয়াটায় পেটের জ্বালার উপর তাহার ঘৃণার অন্ত ছিল না।

এক-একবার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল আত্মহত্যার প্রয়াস; আবার মনে হইতেছিল, ওই উপচারে পরিপাটি করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া খায়, সুবলকে ডাকিয়া পাঠায়, তাহার মুগ্ধ নয়নের আরতিতে সে নব-বধূর মত হইয়া উঠে।

পরক্ষণেই মনে জাগে দারুণ ঘৃণা নিজের দেহের উপর, অক্ষম নির্লজ্জ স্বামীর উপর, দুনিয়ার ক্ষুধার উপর, সমস্তগুলার বীভৎসতা তাহাকে অতি কঠোরভাবে পীড়া দেয়। দীর্ঘ দিনের উপবাসে ক্ষুধা

তাহার ছিল না, কাজেই ওই আহার্য্যগুলার প্রতি কোন আকর্ষণও তাহার কাছে ছিল না ; ছিল শুধু দুর্বল চিত্তে অর্থশূন্য চিন্তা।

সহসা পিছনের সেই ছোট জানালাটায় একটা শব্দ হয়, খস—স খস—স।

দামিনী চমকিয়া সেদিকে চায় ; দেখে, শিকের ফাঁক দিয়া একখানা কাপড় আগাইয়া আসে : চওড়া খয়ের-পাড় শাড়ি একখানা।

দামিনী খয়ের-পাড় শাড়ি পরিতে ভালবাসিত।

দামিনীর বুকে একটা লঘু চকিত ভাব জাগিয়া উঠে ; বক্ষ-স্পন্দন অকারণে দ্রুত হইয়া উঠে, সে এ-পাশ ও-পাশ তাকায়, মনে হয়, ওই অন্ধকার কোণে দাঁড়াইয়া কে বুঝি দেখিতেছে !

সে বুঝিতে পারে কাপড়খানার ওপারে কে, তাহার মনের রুচিটি এমন নিখুঁভাবে জানে কে। তাহার মনে পড়ে কোন্ গাছটির আম সে বেশি ভালবাসিত, কোন্ কুলে তাহার রুচি বেশি, সে জানে কে। দামিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, শব্দ করিতে শঙ্কা হয়, কে হয়তো আড়ি পাতিয়া আছে।

একবার সে কোমল মনোহর বসনখানার পানে তাকায়, আর একবার আপন অঙ্গের ওই শীর্ণ ছিন্ন মলিন বসনখানার পানে।

সহসা আপন মনেই দুইটা আঙুল দিয়া নিজের পরনের কাপড়-খানা ঘষে ; জীর্ণ, অতি কর্কশ কাপড়খানা ; আঙুল দুইটার ডগা জ্বলিয়া উঠে, কাপড়খানা ছিঁড়িয়া যায়।

তাহার চক্ষে একটা বিচিত্র জ্বলজ্বলে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে, সারা অঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠে।

একটা লঘু কোমল শব্দ হয়, কাপড়খানা ঘরের মেঝের উপর আসিয়া পড়িল। ওই লঘু শব্দেই দামিনী চমকিয়া উঠিল।

কাপড়খানার অন্তরাল হইতেই জানালাটার ওপাশে একখানা মুখ চকিতে দেখা যায় ; পরমুহূর্তেই সে সরিয়া গিয়াছে।

দামিনীর অনুমান মিথ্যা নয়, সে সুবলই।

দামিনী বসিয়া বসিয়া ভাবে আর আঙুল দিয়া কাপড়খানা ঘষে।

কোমল, মসৃণ। ধীরে ধীরে সে কাপড়খানা আপন হাতের বাইয়ের উপর ঘষে, কাপড়খানার কোমলতায় একটা মধুর অনুভূতি আসে; আর ওই দামিনীর শখের পাড়খানি, সুন্দর, চোখ জুড়াইয়া যায়।

দোষ কি?

কতজনের কথা মনে পড়ে; শত শত দৃষ্টান্ত তাহার মনে আসিয়া জাগে।

ওই ছোটলোকপাড়ার উহারা!

উহাদের নয় এই স্বভাব; কিন্তু এই সৎ-জাতি, ইহাদের মাঝেও তো অভাব নাই। ওই খেঁদীর অঙ্গে পয়েন্টসম্যানের দেওয়া উপহারের অন্ত নাই; সে কথা জানেও তো সকলে, খেঁদীও তো গোপন করে না, তাহার তো ইহাতে লজ্জা নাই, সে তো প্রকাশ্যেই বলে, সগ্‌গে আমার কাজ নাই ভাই, সেথায় না হয় তোরাই যাবি; হেথায় তো খেয়ে প'রে বাঁচি।

খেঁদীর নয় রক্ষক নাই, কিন্তু ওই দাসী? তাহার তো স্বামী আছে—ওই হাঁপানি-রুগী বাবুলাল; তবুও তো হাজারিবাবুর পয়সা নেয় সে। সে বলে, সতীগিরি ফলাতে গেলে তো স্বামীকে শুকিয়ে মারতে হবে; তা এতে যদি ও-ও বাঁচে, আমিও বাঁচি, সেই আমার ভাল।

চিন্তায় চিন্তায় মন আজ মুখর হইয়া উঠে, সে বলে, আর ওই যে মানুষটি, যে আমার জন্য সব ত্যাগ করিয়া হেথায় পড়িয়া আছে, না বলিতে, না জানাইতে অপরাধীর মত গোপনে সব জানিয়া, গোপনে গোপনে যত পূজা যোগাইয়া যায়, তাহার পানে চাহিবার কি কোন অধিকার নাই?

দামিনী কাপড়খানা তুলিয়া লয়।

কিন্তু কেমন একটা অস্থিরতা বুকের মাঝে জাগিয়া উঠে, হৃৎ-পিণ্ডটা বুকের মাঝে ধকধক করে, বাহির হইতেও যেন সে শব্দ শোনা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা মুখও তাহার বুকের মাঝে জাগিয়া উঠে; দুঃখী স্বামীর ম্লান মুখখানি, তাহারই দিকে অতি নির্ভরশীল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে তাহাকে সামগ্রীসম্ভারের উপহারে সুখ দিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার বুকের একবিন্দুও তো দিতে বাকি রাখে নাই।

বাহির দরজা খোলার শব্দ হয়; দামিনী চমকিয়া কাপড়খানা তাড়াতাড়ি একটা শূন্য হাঁড়ির গর্ভে লুকায়।

ও বউ, কাপড় এনেছি, কাপড়।

দামিনী চমকিয়া দরজায় খিল বন্ধ করিতে যায়, কিন্তু তাহার পূর্বেই ভেজানো দুয়ার খুলিয়া, ছোট মিস্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসে, হাতে তাহার একজোড়া শাড়ি। দামিনী পাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়ায়, যেন ওই দেওয়ালের মাঝে গিয়া লুকাইতে চায়, সর্ব শরীর থরথর করিয়া কাঁপে।

কাপড়খানা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া ছোট মিস্ত্রী বেশ নরমভাবেই কহে, দেখ, পাড়ের কি বাহার! জানিতে পারিবে করিলে ব্যবহার।—বলিয়া সে ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসে।

কুৎসিত বীভৎস হাসি, কুৎসিত ইঙ্গিত করে, ইঙ্গিতে যেন দেনা-পাওনার পূর্ণ স্বরূপ প্রকট হইয়া উঠে, সে অতি বীভৎস, অতি ভীষণ।

মানসনেত্রে সুবলের সলাজ মুখখানাও অমনই বীভৎস ভীষণ হইয়া উঠে।

সারা অঙ্গ তাহার যেন মোচড় দিয়া উঠে, কণ্ঠে তাহার স্বর যুটে না, কিন্তু আর সে সহিতেও পারে না; সে সর্ব শক্তি একত্রিত করিয়া দুয়ারটা দড়াম করিয়া মিস্ত্রীর মুখের উপরই বন্ধ করিয়া দিয়া হাঁফায়। ওপাশে মিস্ত্রীর গলা শোনা যায়।

ভয় কি মাইরি, তুমি হুকুম কর, সোনার অঙ্গ মুড়ে দোব, আর ও শালাকে বল তো আজই ওকে তাড়াই।

উত্তর কেহ দেয় না; ছোট মিস্ত্রী আপন মনে গান করিতে করিতে আপন ঘরে চলিয়া যায়, দরজা খোলার শব্দ পাওয়া যায়।

দামিনীর আর লজ্জার আত্মগ্লানির পরিসীমা থাকে না, অশিক্ষিতা সে, সুস্পষ্ট কথার যুক্তি তাহার মনে জাগে না, কিন্তু নারী, নারীত্বের অপমানবোধ তাহার জন্মগত সংস্কার, সে বোধ তাহার আছে; প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া সুবলের কাপড়খানা বুকে করিয়া আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তর যেন পুড়িয়া যায়, আর ওই পশুটা তাহাকে যে নগ্ন বীভৎস অপমান করিয়া গেল, তাহার জন্য ক্ষোভ আর লজ্জার তাহার অন্ত ছিল না। দামিনী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে।

বাক্যহারা মন তাহার তখন বলিতেছিল, মা ধরণী, দ্বিধা হও মা। মাটির দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি বুঝি দ্বিধাবিভক্ত মৃত্তিকার অন্তরালে ধরণী-মায়ের বিস্তৃত কোলের প্রতীক্ষায় ছিল; কিন্তু নিশ্চলা অকরুণ ধরণী দ্বিধা হয় না; বোধ করি শক্তিমত্ত সন্তানগুলার দম্ভের পদাঘাতে সে আজ বেদনায় মূর্চ্ছিতা, চৈতন্যহীনা।

মৃদু বায়ু-প্রবাহে সহসা তাহার নাকে আসে ওই নতুন কাপড়ের গন্ধটা, সে মুখ তুলিয়া তাকায়।

অশ্রুরুদ্ধ ঝাপসা দৃষ্টির সম্মুখে ওই রক্ত-রাঙা পাড়খানা মনে হয় যেন নাগপাশ, যেন অন্তহীন বেষ্টনে দামিনীকে বাঁধিতে আসে; আর হাঁড়িটার ভিতরে খয়ের রঙের কাপড়খানা যেন বিবরের নাগের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে।

দামিনীর দম বন্ধ হইয়া আসে যেন, সত্যই সে আপন দেহের সর্বাঙ্গে একটা কঠিন বন্ধনাবেষ্টনী অনুভব করে; তাহার চোখ দুইটা কেমন বড় হইয়া উঠে।

সে উন্মাদের মত এ বন্ধন-মুক্তির উপায় খোঁজে, চোখে পড়ে তাহার কুলুঙ্গির 'পরে দেশলাইটা।

দামিনী ব্যাগ্র বাহুপ্রসারণে দেশলাইটা চাপিয়া ধরে; যেন উল্কা-মুখ গরুড় সে।

ও-পাশ হইতে কেরোসিনের ডিবাটা টানিয়া আনে।

একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ!

সে গন্ধে ছোট মিস্ত্রী বাহিরে ছুটিয়া আসে; চোখে পড়ে দামিনীর রুদ্ধ দ্বারের সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়া অনর্গল ধূমশিখা বাহির হইতেছে।

সে নিশ্চলভাবে আপন বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখে, চোখ দুইটা বিস্ফারিত, চীৎকার করিতে কণ্ঠ ফুটে না।

মনে হয়, ওই রাঙা-পাড় কাপড়খানা সুতায় বোনা ছিল না, আগুনের শিখায় বোনা ছিল; সেই আগুন ওই ঘরের মাঝে সমস্ত গ্রাস করিয়া লেলিহান শিখায় জ্বলিতেছে।

সে আগুন যেন সমস্ত গ্রাস করিবে, তাহার উত্তাপও যেন সে অনুভব করে, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠে; ভয়ার্ত্ত হইয়া মিস্ত্রী পলাইয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরেই গোষ্ঠ আসে টিফিনের ছুটিতে জল খাইতে হাতে একটা খাবারের ঠোঙা; গত রাত্রের ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিয়া দামিনীর জন্যই খাবারটা আনিতেছিল, ভোরবেলা সেই খাবারগুলা খাইয়া তাহার নিজের বেশ ক্ষুধা ছিল না। কি বলিয়া দামিনীর কাছে মাফ চাহিবে তাহার কত কথাও মনে জাগিতেছিল।

বাড়ীতে ঢুকিয়াই ওই বিশ্রী গন্ধে সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারি-পাশে চায়, দেখে তাহারই রুদ্ধ দুয়ারের ফাঁক দিয়া অনর্গল কালো ধোঁয়ার রাশি।

খাবারের ঠোঙা ফেলিয়া দিয়া সে ছুটিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকে, ওগো! ওগো!

কেহ সাড়া দেয় না, গোষ্ঠ উন্মত্তের মত দুয়ারে ধাক্কা মারে, উন্মত্ত ধাক্কায় দরজাখানা ভাঙিয়া পড়ে।

ধূমকুণ্ডলীর মাঝে দামিনী নিশ্চল দাঁড়াইয়া, দৃষ্টি তাহার স্থিরভাবে নিবদ্ধ, সম্মুখে চরণপ্রান্তে ধূমোদ্গারী এক অগ্নিস্তূপের উপর ছোট ছোট শিখাগুলি যেন তাহার আরতি করিতেছে, অগ্নিশিখার আভায় দীপ্ত মূর্ত্তিখানি যেন ওই অগ্নিশিখায় স্নান করিয়া উঠিয়াছে।

গোষ্ঠ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে একটা কাপড়ের স্তূপ জ্বলিতেছে, আরও জ্বলিতেছে আহার্য্য-সামগ্রী।

গোষ্ঠ ব্যস্ত হইয়া কহে, এ কি, কাপড় পুড়ছে যে!

সে একটা পাত্র লইয়া জল আনিতে ছুটে, কিন্তু দামিনী তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলে, না।

গোষ্ঠ বলে, সে কি?

হ্যাঁ, তুমি তো দাও নাই।

গোষ্ঠ দামিনীর পানে চায়, কথাগুলার সূত্র, যেন সে পাইয়াছে অনুভব করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় না।

দামিনী সহসা গোষ্ঠের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদে।

গোষ্ঠ তাহার হাত ধরিয়া তোলে, অশ্রুমুখী নারী তাহার দুইটি হাত ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কহে, ওগো, পরতে কাপড় আর খেতে ভাত তুমি আমায় দিও গো।

গোষ্ঠ দামিনীর অঙ্গপানে চায়।

ছিন্নবসা নারীর লজ্জা আজ অতি করুণভাবে সুপ্রকট হইয়া চোখের উপর ফুটিয়া উঠে।

দগ্ধ কাপড়ের গাদার পানে আঙুল দেখাইয়া গোষ্ঠ পরুষ কণ্ঠে কহে, কে, দিলে কে?

ওই অজ্ঞাত হস্তের বস্ত্রদানের অন্তরালে সে বস্ত্র-হরণের প্রয়াস দেখিতে পায়।

তা আমি জানি না গো, ওই জানালা দিয়ে—। গোষ্ঠর মূর্ত্তি

দেখিয়া, সে শিহরিয়া উঠিল; অজ্ঞাতে একটা গোপনতার প্রয়াস তাহার ভীত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

তাই পুড়িয়ে দিলে?

হ্যাঁ।

গোষ্ঠ যেন নিশ্চল পাষাণ হইয়া গেল, তাহার অন্তর-পুরুষ তাহাকে নিদারুণ ধিক্কারে মূক করিয়া দিল।

লজ্জার গ্লানির আর পরিসীমা থাকে না, তাহার সে লজ্জা, সে ধিক্কার দ্যূতসভায় যাজ্ঞসেনীর বসনাকর্ষণে নিশ্চল অক্ষম পাণ্ডবদের চেয়ে বোধ করি কম নয়।

সে বসিয়া ভাবে কত কি।

কে সে দুঃশাসন?

আক্রোশ গিয়া পড়ে সুবলের উপর, তাহার মন বলে, এ সেই। গোষ্ঠ ঝাড়া দিয়া উঠে, তাহার সে ভঙ্গিমার মাঝে প্রতিহিংসার ভয়াল রূপ সুপ্রকট হইয়া উঠে।

দামিনী তাহার হাত ধরিয়া কহে, কোথা যাচ্ছ?

খুন করব শালা মহান্তকে।

দামিনী শিহরিয়া কহে, সে নয়, না না, তুমি যেও না।—বলিয়া সে স্বামীকে দুই হাতে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিল।

গোষ্ঠ তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহে, কে তবে?

দামিনী কাতর কণ্ঠে কহে, ওগো আগে নিজের দোষ ভাব, তুমি আমায় দিলে, ভালবাসলে কার সাধ্যি যে—

ক্ষোভে, ক্রোধে, অভিমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়, চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রুর বন্যা বহিয়া যায়।

গোষ্ঠও আর ঠিক থাকিতে পারে না, নিদারুণ দুঃখে, লজ্জায় দামিনীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদে।

স্বামীর অশ্রুতে দামিনীর নারীহৃদয় গলিয়া যায়, সে বেশ আবদার

ভরা সহজ কণ্ঠে কহে, তুমি থাকতে আমার দুঃখ কি, আমার অভাব কিসের? নাও, ছাড়, জল খেতে দি।

গোষ্ঠ স্ত্রীকে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু সে এমন সহজ হইতে পারে না; অক্ষমতার আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তর-পুরুষ পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। দাওয়ায় আসিয়া বসিয়া ভাবে, কে সে দুঃশাসন?

দামিনী ঠিক বলিয়াছে, তাহার অক্ষমতা, ওই অভাব, ওই নির্ম্মম কদর্য্য অভাবই সেই দুঃশাসন।

অভাবের উপায় খুঁজে সে।

উপায় মিলে না, নিরুপায় ক্ষোভে সে বলিয়া উঠে, এর চেয়ে মরণ ভাল আমার।

বড় মিস্ত্রী আসিয়া বাড়ি ঢুকিল, গন্ধটার রেশ তখনও যায় নাই, বুড়া নাক সিঁটকাইয়া বলিয়া উঠে, উঃ, কি পুড়ছে?

কেহ কথার উত্তর দিল না, বুড়া ধীরে ধীরে আসিয়া গোষ্ঠের কাছে দাঁড়াইল, এক জোড়া শাড়ি গোষ্ঠর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিল, বউকে দিস।

সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠর সমস্ত আক্রোশ গিয়া পড়ে ওই বুড়ার উপর, বাঘের মত লাফ দিয়া ফিটারের উপর পড়িয়া হাতের নখ দিয়া যেন তাহার গলার নলীটা ছিঁড়িয়া দিতে চাহিল।

আজন্ম লোহা আর আগুনের সঙ্গে লড়াই-করা সবল দেহ, কঠিন হাত দুইখানা লোহার মত কঠিন, ভাইস-যন্ত্রটার মত ওই হাতের কঠিন নিষ্করুণ পেষণে গোষ্ঠর হাতদুইখানা যেন মড়মড় করিয়া উঠিল, আপনা হইতেই গোষ্ঠর হাত দুইখানা শিথিল হইয়া পড়িল।

বুড়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আপন ঘরের বারান্দায় গিয়া উঠে, ভাবলেশহীন সেই নিষ্প্রভ কঠিন মুখ, একটি রেখারও ব্যতিক্রম নাই।

দুর্বল গোষ্ঠ এ-পাশে নিরুপায়ে গালি পাড়ে, লজ্জা করে না,

বুড়ো ভেড়া, পরের পরিবারকে কাপড় দিতে, এই দেখ্, তোর কাপড়ের কি দশা হয়, পড়ুক আগুনে।

কাপড়খানা আগুনে দিবার জন্য সে হাতে করিয়া তুলে। ফিটার-বুড়া এতক্ষণে ঘুরিয়া আসিয়া বাধা দিয়া কহে, আরে বেটা, বাপ বেটিকে কাপড় দেয় না, তত্ত্বতল্লাস করে না?

হাতের কাপড় গোষ্ঠর হাতেই থাকিয়া যায়, সে হাঁ করিয়া ফিটার-বুড়ার মুখের পানে চাহিয়া থাকে, যেন কথাটা বুঝিতে পারে না। দামিনী নিঃসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসে, মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন, মুখখানি বেশ দেখা যাইতেছিল, সে গোষ্ঠর হাত হইতে কাপড়খানা তুলিয়া লইয়া যায়, যাইবার সময় বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া বলিয়া যায়, বাবা, এইখানে আজ খাবে তুমি।

গোষ্ঠ কাঁদে, আর থাকিতে পারে না।

ফিটারের ভাবলেশহীন মুখখানারও কেমন পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, উদাস দৃষ্টিতে শূন্যের পানে চাহিয়া থাকে, মনশ্চক্ষে কি যেন সে দেখে। তারপর ধীরে ধীরে আপন মনেই বলে, আমারও একটি মেয়ে ছিল রে গোষ্ঠ মা-মরা মেয়ে; এত রোজগার তখন আমার ছিল না, অভাবে খেতে না পেয়ে, অন্ধকূপের মাঝে থেকে সেও এমনই রোগা, ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, তারও এমনই ছেঁড়া কাপড় প'রে দিন গিয়েছে, শেষে সে—

কথাটা আর সে শেষ করিতে পারে না, স্বর কেমন ভারি হইয়া উঠে, ঠোঁট দুইটা কাঁপে, বুড়া আর কথা কয় না, ঠোঁট দুইটা টানিয়া কম্পন সে রোধ করিতে চায়, কিন্তু চোখের জল বাধা মানে না।

ছোট মিস্ত্রী আসিয়া সরাসরি আপন ঘরে প্রবেশ করে; ঘটনাটা সে বুঝিতে চায়।

ক্ষণপরে দিব্য হাসিমুখে আসিয়া গোষ্ঠকে কহে, এস টাইম হয়ে গেল যে।

গোষ্ঠ কহে, না।

সে কি হে, না কেন? আজ বিকেলে আবার—

না ভাই, ওতে হবেও না কিছু, আমি কাজই আর করব না। যে কাজ ক'রে রক্ত জল ক'রে খেটে'ছুটো মানুষের পেটের ভাত জোটে না, পরনের কাপড় জোটে না, সে কাজের মুখে ঝাঁটা; যাব না আমি।

ওর কণ্ঠস্বরে আক্ষেপের এমন করুণ প্রার্থনা ছিল যে, ছোট মিস্ত্রী পর্যন্ত বিচলিত না হইয়া পারিল না।

সবাই নির্বাক হইয়া বসিয়া ভাবে। ক্ষণপরে বড় মিস্ত্রী কহে, আচ্ছা মিস্ত্রী, আজ থেকে তো আর আমরা ওভারটাইম খাটব না, এ নিয়ে ধর একটা ছোটখাটো ঝগড়া হবেই, এই সঙ্গে যদি মাইনে বাড়ানোর আরজিটা রাখা যায়—

ছোট মিস্ত্রী সোৎসাহে লাফ দিয়া উঠিয়া কহে, বহুত আচ্ছা, চল, চল সব, বলা যাক, মাইনে বাড়াতে হবে।

গোষ্ঠ কহে, হ্যাঁ, মাইনে বাড়াবে; বলে কমাতে পেলে বাঁচে। মনের আগুন উহাদের কথায় লাগে, কণ্ঠ উত্তেজিত হইয়া উঠে, কোন অজানা অহেতুকী আক্রোশ বুকের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।

ছোট মিস্ত্রী ওই কণ্ঠে বলে, আলবৎ বাড়াতে হবে, না বাড়ায় রইল কাজ। বাড়াবে না চালাকি নাকি? এস তুমি। বিকেলে কি কাজ, এখুনি আমাদের সভা হোক; ওই বটতলায় এখুনি জমাট বস্তি করব, সব দিব্যি করিয়ে নোব, কি বল?

শেষ কথাটা বুড়া মিস্ত্রীকে বলিয়া তাহার মুখপানে তাকায়।

বুড়া সেই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, সেই হিম মৃদু কণ্ঠে কহে, ডাক সকলকে, বাউরীদের সুদ্ধু।

গোষ্ঠ, ছোট মিস্ত্রী বিপুল উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়ায়।

বটতলায় দাঁড়ায় বড় মিস্ত্রী; একে একে শ্রমিকের দল আসিয়া জমিয়া যায়, মেয়ের দল, গাড়ি-বোঝাই-করা মুটের দল, গাড়োয়ানের দল; ষ্টেশনের জমাদার, বুড়া ড্রাইভার, পয়েণ্টসম্যান—তাহারাও আসে। মেয়েরা প্রশ্ন করে, কি, হবে কি?

ব'স ব'স, জমাটবস্তি হবে।

মেয়েরা বলে, ঢং নাকি, দুপুর রোদে জমাটবস্তি! চল চল, কত কাজ প'ড়ে আছে, শেষে হাজরি পাব না।

গোঠ হাঁকে, যে যাবে সে বুঝে যাক, আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই, রোগ হ'লে দেখব না, ম'লে ফেলব না।

মর্, তুই মর্ কেন রে মুখপোড়া, রোগ হ'লে দেখব না, দেখে তো সব উল্টে দিলে!

শোন সব।

বড় মিস্ত্রীর মোটা গলার আওয়াজ গমগম করে, কাহারও আর পা উঠে না, সব ফিরিয়া দাঁড়ায়।

বড় মিস্ত্রী বলে, যে সব আক্রা-বাজার চলেছে, তাতে আমাদের আর কুলোচ্ছে না।

চারিদিকে আলোচনা শুরু হইয়া যায়।

গাড়োয়ান-সর্দ্দার বলে, যা বলেছ মিস্ত্রী, ঝিঙের দর দু' পয়সা ছিল দু' আনা হ'ল।

আর একজন বলে, ন আনার কাপড়খানা, ন সিকে।

মেয়েরা বলে, পোড়ারমুখোরা বলে আবার, যুদ্দু লেগেছে গো, যুদ্দু লেগেছে।

বুড়ি সাবী বলে, আমরাই দেখলাম মা, পয়সায় দু' সের ঝিঙে, আট আনা দশ আনা চন্দ্রকোনা কাপড়। দু' পয়সা সের চাল, বাবা বলত—

ছোট মিস্ত্রী হাঁকে, চুপ চুপ।

তারপর উত্তেজিত আলোচনা।

কথা কিন্তু এক—বেশি মাইনে চাই আমাদের, বেশি মাইনে চাই। খেতে পাই না, পড়তে পাই না।

আবার ঘুরিয়া আসে, বেশি মাইনে চাই।

একজন বলে, সে যদি ওরা না দেয়?

না দেয় ধর্ম্মঘট হবে।

তা হ'লে ধর্ম্মঘট ?

মাইনে না বাড়ালে জরুর ধর্ম্মঘট।

যে না করবে সে একঘরে।

ছোট মিস্ত্রী, গোষ্ঠ সকলের চোখ দিয়া আগুন ছুটিয়া যায়, একটা উত্তেজনার প্রবাহ বুকে বুকে বহিয়া যায়।

অন্তরতম প্রদেশের অতৃপ্ত মানবাত্মা, এমন ভাবেই বিরূপাক্ষের মত জটাজুট লইয়া জাগে চিরদিন।

কলের বয়লারের সিটিটা উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠে, ভোঁ—ভোঁ।

গোষ্ঠ বলে, কে সিটি মারে রে ?

একজন বলে, বোধ হয় বাবুরা কেউ।

গোষ্ঠ বলে, হাঁক হাঁক, হুকুম আজ শুনছি না।

বুড়া ফিটার, ছোট মিস্ত্রী, গোষ্ঠ এমনই কয়জন মাতব্বর শ্রমিক গিয়া অফিসের দুয়ারে দাঁড়ায়।

পিছনে কলের দুয়ারে বুভুক্ষু মজুরের দল।

বুড়া খাজাঞ্চী বলে, কোন্ লবাবের বেটার বিয়ে ? কাজ কামাই ক'রে বটতলাতে হচ্ছিল কি ?

কে একজন বলে, তোর বাবার বিয়ে, তুই নিতবর যাবি ?

বুড়া ফিটার বলে, মালিকবাবুর সঙ্গে দেখা করব একবার।

যাও যাও, কাজে যাও, এর পর দেখা ক'রো মালিকের সঙ্গে ; অনেক কাজ কামাই হয়ে গেছে আজ। সব মাইনে কাটব জেনে রেখো।

একজন বলে, মাইনে কাটলে আজ তোমার—

সমবেত জনতা চেঁচাইয়া উঠে, ধর ধর, বুড়ো ভালুককে ধর।

খাজাঞ্চী ঘরে গিয়া দরজায় খিল আঁটে, খোলা জানালা দিয়া দাঁত খিঁচাইয়া হাঁকে, পল্টু সিং ! পল্টু সিং !

ম্যানেজার উপরের বারান্দায় আসিয়া হাঁকে, কেয়া হ্যায় ?

সমবেত জনতা চীৎকার করে, বেশি মাইনে চাই আমরা, খেতে পাই না, পরতে পাই না, আমরা বেশি মাইনে—

ম্যানেজার বড় মিস্ত্রী আর ছোট মিস্ত্রীকে ডাকিয়া লয়, তোম ছুনো হিঁয়া আও।

সমবেত জনতা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকে।

পল্টু সিং আসিয়া ক্যাশঘরের দরজায় বসিয়া বন্দুকটা খুলিয়া পরীক্ষা করে, শেষে সেটা বাগাইয়া ধরিয়া চাপিয়া বসে।

বহুক্ষণ পর বড় মিস্ত্রী, ছোট মিস্ত্রী ফিরিয়া আসে।

বহু কণ্ঠ একসঙ্গে প্রশ্ন করে, কি হ'ল ?

বড় মিস্ত্রী কিছু বলিবার আগেই ছোট মিস্ত্রী চেঁচায়, ধরমঘট, ধরমঘট।

জনতাও চীৎকার করে, ধরমঘট, ধরমঘট।

পল্টু সিং বন্দুক ধরিয়া কহে, চলা যাও, কলসে নিকাল যাও।

কেউ তাকে দাঁত খিঁচায়, কেউ গালি পাড়ে।

বড় মিস্ত্রী বলে, সুরেনবাবু আর শিবকালীবাবুরও জবাব হয়ে গেল।

উত্তেজনার প্রবাহে অসন্তোষের বহ্নিদাহ কলের পর কলে ছড়াইয়া পড়ে; সব বুকের মাঝে যেন বিস্ফোরক পুঞ্জীভূত হইয়া ছিল, আজ অগ্নি সংযোগে ফাটিয়া পড়িল; দলে দলে মজুর সব ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল।

কলগুলার চিমনিতে চিমনিতে আর ধোঁয়া উঠে না, তুরন্ত যন্ত্রগুলা অসাড় নিস্পন্দ; তুয়ারে তুয়ারে গুর্খা পাহারা, নিষ্ঠুরতা মুখে মাখা, সমস্ত দেহখানা কর্কশ, কঠোর, কোমরে বাঁকা কুকরি, দিনের আলোয় শাণিত অস্ত্রটা চকচক করে, সারা অঙ্গ ব্যাপিয়া হিংস্র তীক্ষ্ণতা শোণিততৃষ্ণায় লকলক করে।

মজুরের দল, প্রথম উত্তেজনায়, নিস্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষে, জয়ের জন্য জীবন পর্যন্ত পণ করে।

কিন্তু অন্ন, অন্ন!

অনাহার যে দুর্বল করিয়া দেয়; দীনের সম্বল—নাই, নাই আর নাই। দোকানে ধার দেয় না; বলে, জলে যা পড়েছে, তা পড়েছে, আর না বাবা, ফেল কড়ি মাখ তেল, আমি কি তোমার পর!

শিক-দেওয়া ঘেরা দোকানের দুয়ার বন্ধ করিয়া ভিতর হইতে কথা কয়। জ্ঞান যতক্ষণ থাকে মানের দায়ে পেটের দাহ সয়।

অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত উদরে সমস্ত অন্ত্রপাতি লাভা-স্রোতের মত টগবগ করিয়া ফুটে যেন।

কিন্তু অজ্ঞান শিশুর দল ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করে, মায়ের বুকের দুধ রসহীন গাঢ় জমাট হইয়া উঠে, উহা বুঝি ক্ষীর নয়, মায়ের বুকের লহু, শিশুর মুখে বিস্বাদ ঠেকে, কচি গলায় পার হয় না।

শিবকালী সুরেন নানা স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া আনে।

আপন সঞ্চয়ের ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় বড় মিস্ত্রী, সুবল দেয় আপন দোকান, ছোট মিস্ত্রী আপনার সেই সাধের ঘড়িটা দেয়।

বুড়া ড্রাইভার চাঁদা দেয়, জমাদার দেয়, সবাই কিছু কিছু দেয়; দিতে পারে না গোষ্ঠ, একটু তাহার বুকে বাজে, দামিনী কোন গুপ্ত স্থান হইতে বাহির করে সেই জীর্ণ বালা দুইগাছা, বলে, দিয়ে এস।

গোষ্ঠ মুখের পানে চায়!

দামিনী কহে, ওই ছেলেদের শুকনো গলায় আট আনার দুধ তো পড়বে; তাই আমার সে পাবে।

জলন্ত শুষ্ক বুকের মাঝেও আজ যেন সেই সচ্ছল দিনের তরুণ গোষ্ঠটি ফিরিয়া আসে, অতি আদরে আজ দামিনীকে বুকে লয়; শুষ্ক পাংশু অধরে একটি চুম্বন আঁকিয়া দেয়, রুক্ষ চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে।

দামিনী একটু মিষ্ট হাসে।

এক সপ্তাহ। দুই সপ্তাহ। আরও পাঁচ দিন।

দুর্ভিক্ষ করাল গ্রাসে হা হা করিয়া জাগে; হা-হা, অন্ন অন্ন, একমুঠা অন্ন; এত কটি ক্ষুদ, হা-হা।

মুখের লালা আঠা বাঁধিয়া যায়, জিভ চটচট করে, আর রব বাহির হয় না, মা চেঁচায়, বাপ চেঁচায় ছেলেগুলা চেঁচায় না, অতি কষ্টে ধুকধুক করিয়া বাঁচিয়া থাকে, ধরণীর মমতায় জীবন কঙ্কালের আশ্রয়টুকু ছাড়িতে পারে না।

প্রাণের চেয়ে মান বড়, এ দর্শনবাদ মানুষের আবিষ্কৃত, এ তাহার স্রষ্টার উপরে সৃষ্ট, মানুষের জন্মগত সংস্কার হইতেছে মরণ হইতে জীবনকে বাঁচানো—দুনিয়ার সর্ব ধর্ম্ম সর্ব দ্রব্যের বিনিময়েও আপন অস্তিত্ব জীব বজায় রাখিতে চায়; সৃষ্টি হইতে এই নগ্ন সত্যটাকে মানুষের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া আসিয়াছে।

মানুষের আবিষ্কৃত এই দর্শনবাদ; এই সংস্কারের আধার মানব-সভ্যতা।

সভ্যতায় বঞ্চিত শ্রমিকদের উদরের জ্বালা অসহ্য হইয়া উঠে।

দরিদ্র-দলের জন কয় উদরের জ্বালায় আবার গিয়া ধনীর দুয়ারে লুটাইয়া পড়ে, কাজ দাও, কাজ দাও, খেতে দাও, এক মুঠো চাল, এক মুঠো ক্ষুদ।

উপর হইতে ম্যানেজার হাঁকে, ভাগো, ভাগো, নেহি মাংতা হ্যায়, চাই না, চাই না তোদের।

এরা তবুও চেঁচায়, কাজ দাও, দয়া কর মালিক, খেতে দাও।

গুর্খার দল কুকরি উঠাইয়া তাড়া দেয়।

গোষ্ঠ, ছোট মিস্ত্রী, কলের মিস্ত্রী, ফায়ারম্যান—এমনই জনকতক বিবরে রুদ্ধ সাপের মত গর্জায়, পেটের আগুনের শিখা অনশন-রুক্ষ চোখের শিখায় নাচে।

উন্মাদের মত বেইমানদের শাস্তি দিতে তাহারা বাহির হয়, হাতে কাহারও হ্যামার, কাহারও হাতে লোহার ডাণ্ডা, যেন শূলহস্তে রুদ্রের অনুচরের দল।

ধনীর প্রসাদভিক্ষু মজুর-দলের পথ আগলাইয়া ছোট মিস্ত্রী হাতুড়ি উঁচাইয়া কয়, কেন গিয়েছিলি তোরা ধরমঘট ক'রে?

হাঁপানি-রুগী বাবুলাল টানিয়া টানিয়া কহে, কেন গিয়েছিলি, কে—ন গিয়েছি—লি! খেতে দিবি, দিবি? তোরাই তো এই করলি, দে, খেতে দে, দে দে।

উদরের জ্বালায় হিংস্র পশুর মত সে ছোট মিস্ত্রীর দিকে ছুটিয়া আসে। ছোট মিস্ত্রীরও সকল সঞ্চিত ব্যর্থ ক্রোধ গিয়া পড়ে ওই নিরীহের উপর, হাতের হ্যামারটা উন্মত্তের মত হানিয়া ছোট মিস্ত্রী হাঁকে, খবরদার!

বাস. ওই এক ঘায়েই শেষ, মাথার খুলিটা ডিমের খোলার মত ফাটিয়া রক্তে মজ্জায় সে এক বীভৎস দৃশ্য।

তবুও উহার ওই জীর্ণ পাঁজরা কয়খানা দোঁপে, জীবনটা যেন ওই কয়খানা পঞ্জরের মমতা ছাড়িতে চায় না।

দুর্বলের দল চীৎকার করিয়া উঠে, দেখিতে দেখিতে দুই দলেই লোক জুটিয়া যায়, তারপর একটা বিভীষণ, ঘৃণিত অধ্যায়।

পশুর মত এ উহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরে, ও ইহার মাথা ফাটাইয়া দেয়; ইঁট, পাটকেল, লাঠি। প্রেতের মত তাণ্ডব নাচে সব। আর্ত্তের চীৎকার, প্রেতের মত উল্লাস।

দেখিতে দেখিতে পুলিশ আসিয়া পড়ে, তখন সব পলায়; ছোট মিস্ত্রী পর্যন্ত।

স্থানটা খালি হইলে দেখা যায়, রক্ত, মাংস, মজ্জায় স্থানটা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে, আর কয়টা দেহ, ভয়ার্ত্ত শরণার্থীর দলের কয়টা—বাবুলাল আর দুইজন, উন্মাদের দলের দুইটা—গোষ্ঠ আর একজন।

হাসপাতালে গোষ্ঠ মরিতে যায়, পাশে শিবকালী দাঁড়াইয়া। গোষ্ঠ অতি যাতনায় গোঙায়, তবু মাঝে মাঝে পেটের জ্বালায় আক্রোশে চীৎকার করে, জান দেগা, লেকেন নেহি যায়গা।—বলিয়া প্রলাপের ঘোরে উঠিতে গিয়া সহসা বিছানায় লুটাইয়া পড়ে।

ডাক্তার ও-ঘরে চলিয়া যায়।

কম্পাউণ্ডার হাতে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, করুণায় একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলে, কহে, কি যে ফল হ'ল, মরতে গরিবই ম'ল।

অদূরে তখন রেল লাইনের ধারে কয়টা কুলীর ছেলে ধর্ম্মঘটের খেলা খেলিতেছিল, মাটির কলের উপর লাঠি চালাইয়া একদল কহিতেছিল, তোড় দিয়া, তোড় দিয়া।

সেই দিক পানে চাহিয়া শিবকালী আপন মনেই বলে, চৈতালী ক্ষীণ ঘূর্ণি, অগ্রদূত কালবৈশাখীর।

যতিভঙ্গ

কতদিন ঠিক মনে নেই, তবে বছর দু'তিনের বেশী নয়, একজন সাংবাদিক একটি ফিচার লিখেছিলেন—দিল্লী সম্পর্কে ফিচার—তাতে লিখেছিলেন একটি বিচিত্র-চরিত্র মোহিনী নারী সম্পর্কে।

দিল্লী আজকাল আর অনেক দূর নয়, সাংবাদিকদের কাছে তো নয়ই; তাঁদের কাছে আজ মস্কো, পিকিং, লণ্ডন, নিউইয়র্ক সপ্তাহে সপ্তাহে যাওয়া চলে; দিল্লী আজ এবেলা গিয়ে কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যেতে খানিকটা কনট প্লেসে ঘুরে ওবেলা এই সব রহস্যময়ীদের দেখে কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ ফিরে আসা সম্ভবপর। এবং দিল্লীর কাছে—কলকাতার কথা থাক—বোম্বাই শহর রোমাঞ্চকর সংবাদ এবং রোমাঞ্চ সংবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে এই বিচিত্র-চরিত্র নারীর অস্তিত্ব গৌরবে হার মেনে যায় এ স্বীকার করতে হয়।

রূপে এবং সজ্জায় হয়তো বোম্বাই শহরের মনোহারিণীরা দিল্লীর কাছে হার মানবেন না কিন্তু চরিত্রবৈচিত্র্যে হার মানতেই হবে বোম্বাইকে। কারণ রাজধানী দিল্লীর পার্লামেন্ট হাউস থেকে চাণক্য-পুরী পর্যন্ত যে প্রসারিত ক্ষেত্র—সে ক্ষেত্রে যে বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য, তা শুধু আর্থিক সমৃদ্ধিতে উর্বর বোম্বাই-ক্ষেত্রে কখনও ফোটে না। ওর জন্যে প্রয়োজন হয় রাজনীতির রাসায়নিক সার প্রয়োগের।

যাক গল্পটা মনে করিয়ে দি। এই সাংবাদিক কুতুবের ওধানে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীকে দেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও অঞ্চলের রুজ লিপস্টিক মাখা মুখ, আঁকা ভুরু, চোখে কাজল, কেটে ফেলে ছোট করা খুকীবয়েসী কেশসজ্জা, পেটকাটা ব্লাউজ, ভারতীয় মনোহারিণী শাড়ি বাংলার ঢঙে পরা একটি মেয়ে; মুখে সিগারেট নিয়ে চঞ্চল

পায়ে গায়ে গায়ে যেন সেঁটে ছিলেন। বয়স তিরিশ বা পঁয়ত্রিশ। একেবারে আবদেরে খুকীর মত সাহেবের কাঁধে ঝুলেই ঘুরছিলেন একরকম।

ওখানকার রমণীরা স্বাস্থ্যবতী, শক্তিমতী, সাহসিনী—এই বেশভূষা তাঁদের অর্থাৎ নাগরিকাদের আটপৌরে। বাজারে দোকানে তাঁরাই বাজার করেন, দর করেন, বাড়িতে এই বেশ-বাসকেই শক্ত করে ঘুরিয়ে কোমর বেঁধে গৃহকর্ম করেন, আপিস যাঁদের আছে তাঁরা এইভাবেই সেজেগুজে আপিস করেন। অফিসারের পদ থেকে কেরানীর পদ পর্যন্ত, টেলিফোন অপারেটারের কাজ থেকে রেলওয়ে বুকিং ক্লার্ক তক্। পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে কোন্ দপ্তর নয়! মেয়েরা আজ জীবনের কর্মক্ষেত্রে সমান অংশীদার হতে চলেছেন। সেখানে পুরুষদের কোট প্যাণ্ট টাই-পরা সাহেবীআনা বা অফিসারিআনার সঙ্গেই বা বেশভূষাতেও তাল না রাখলে চলবে কেন?

তবে বাংলাদেশে আমাদের মেয়েরা বেশভূষায় চলনে বলনে এখনও বাঙালী ঘরের বিনম্র মাধুর্য যেটা বজায় রেখেছে তা ওরা ফেলে দিয়েছে। তার সঙ্গে দিল্লী বোম্বাইয়ের তফাত অনেক—ওখানে রঙ চড়া এবং জীবনের ঢঙ কড়া। দিল্লী বোম্বাইএর মধ্যে ফারাক—বোম্বাই রঙে চড়া, দিল্লী ঢঙে কড়া। বোম্বাইয়ে মেয়েরা ব্যস্ত এবং উল্লাসময়ী, দিল্লীতে মেয়েরা ব্যস্ততার মধ্যে শক্ত এবং উল্লাস প্রটোকলের ইস্তিরিতে পরিপাটী।

বোম্বাইএর জীবনে টাকার দেমাক বেশী, দিল্লীর জীবনে টাকার চেয়ে মেজাজের দেমাক বেশী। দিল্লীর এই রঙ ও ঢঙের মধ্যে এই মেয়েটি আবার সেই মেয়ে যাকে দেখবামাত্র মনে হয় এ মেয়ে বিশেষ নাগরিকা—যে নাকি দিল্লীর এই রঙ-ঢঙকে দুনিয়ার যে কোন দেশের রঙ ও ঢঙের মধ্যে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যার আঁচলে এই শ্বেতাঙ্গনন্দনটি অনায়াসে বাঁধা পড়েছেন, উনি কে, এবং শ্বেতাঙ্গটিই বা কে সাংবাদিকের জানা ছিল না। তবে উনি

কোন বিদেশের ধুরন্ধর গোপন তথ্যসন্ধানী এবং ইনি এদেশের গোপন পরিচয় সন্ধ্যানকারিণী বা সংবাদ সরবরাহকারিণী হলে বিস্ময়ের কিছু নেই এটুকু তাঁর জানা ছিল। সুতরাং ক'দিন ঘুরে ঘুরে সংবাদ নিয়ে জানলেন, মেয়েটি নিছক বিলাসিনী। ওই শ্বেতাঙ্গনন্দনকে পাকড়াও করে জীবনে ধন্য হয়েছেন।

তিনি নিজেই বলেছিলেন, মদের গ্লাস হাতে বলেছিলেন, ওর সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। মিছে আমার পিছনে ঘুরো না; চলে যাচ্ছি আমি এদেশ থেকে। এখন আমি আলেয়া, অনর্থক ঘুরে হয়রান হবে। বলে তিনি খিলখিল করে হেসে উঠেছিলেন ব্যঙ্গভরে।

সুতরাং তোগলকাবাদে পুরনো কেল্লার যে অংশটায় বাজারের ধ্বংসাবশেষ, যেখানে রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট খুপরি দোকানঘর-গুলির চিহ্ন আছে সেখানে এমনই এক বিচিত্র কন্যাকে দেখে বিস্ময়ের কিছু আমিও দেখতে পাই নি। একলা একটি তরুণী বড় কুলুঙ্গির মত একটা দোকানঘরের মধ্যে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দোকানের সেই ভাঙা ছাদের দিকে তাকিয়ে বসে আছে; দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে—পাঞ্জাবের রঙ টকটকে রক্তাভ গৌরী। মেয়েটি সুন্দরীও বটে। এবং লাস্যময়ী যা প্রথম দৃষ্টিতেই চোখ পড়ে। পরনের কাপড়ের জামার রঙ ফিকে নীল বা সবুজ ছুটোর একটা, পাদুখানিকে খানিকটা ভেঁজে দুই হাতে মুঠো বেঁধে ধরে রেখেছে; লম্বা আঙুলগুলির নখের উপর টকটকে নেলপালিশ। হ্যাঁ, সেই মুঠোর মধ্যে একটা গগল্‌স ধরা ছিল। ওটা তো এযুগে আধুনিকতার বোধ করি একনম্বর সিগন্যাল। মুখে রঙ না থাকতে পারে, চুলও খাটো করে না কাটতে পারে কিন্তু গগল্‌স থাকবেই। চোখ তুলে অসংকোচে যার মুখের দিকে খুশি তাকাতে সংকোচের বালাই ঘুচে যায়, চোখে চোখে মেলে না; এবং যার চোখে গগল্‌স থাকে তার পরিচয়টাও একটু ঢাকা থাকে। পাশে পড়ে একটা ভ্যানিটী ব্যাগ আর একটা ঝোলা। কিন্তু এ তো বড় বিচিত্র ভঙ্গি!

এমন করে সাতশো বছরের পুরনো ভাঙা কেল্লার দোকানের কুলুঙ্গিতে সাজানো পুতুল হয়ে বসতে ইচ্ছে হল কেন ওর ?

বিরহিণী ?

অথবা অভিমানিনী কলহান্তরিতা ?

কেল্লা দেখতে এসে প্রিয়জনের সঙ্গে কলহ করে এই ধ্বংসস্তূপের অলিগলির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে এমন করে বসে আছে ! ধ্বংসস্তূপ বলে খেয়ালই নেই, এখানে সাপ কম বটে কিন্তু বিচ্ছু কম নয় ; কীটপতঙ্গ তো আছেই। এবং ধ্বংসস্তূপের ফাটল, গর্ত তাদের অত্যন্ত প্রিয় স্থান। হাজার হলেও বাদশাহী ধ্বংসস্তূপ—সমতলের বা অনাবৃত মাটির গর্তের থেকে অনেক আরাম পায়। কীট-পতঙ্গের কামড় বা দংশন মারাত্মক হয়তো নয় কিন্তু মর্মান্তিক ; একটা লাল পিঁপড়ে কামড়ালেই সারা শরীরটা চমকে ওঠে, অর্ধেক দিন জ্বালা করে।

মনে মনে একটি সরস কৌতুক এবং কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়েছিল। এবং ক্যামেরা নেই বলে আপসোস হয়েছিল। একখানা ছবির মত ছবি হত !

ওই দিকে তাকিয়েই এগিয়ে চলছিলাম। তার চোখের গগল্‌স খোলা ছিল। অনাবৃত মুখখানাই দেখতে পাচ্ছিলাম। সে যেমন ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনিই রইল, আমাকে আমলেই আনলে না।

অল্প বয়স হলে এক্ষেত্রে প্রেমে পড়বারই কথা কিন্তু ষাট বছর বয়সের পর যখন 'বিদায় দে মা ফিরে আসি' গান মনে গুঞ্জন তোলে তখন দুনিয়ারই চেহারা পালটে যায়, ও-ভাবনা উঁকি মারলেও মানুষ তাকে ঘাড়ধাক্কা দেয়। অন্ততঃ সজ্জনে দেয় এবং অসজ্জন আমি নই। যেতে যেতে থমকে না-দাঁড়িয়ে পারলাম না ; কারণ মনে হল—যা মনে হল সে কথাটা সে আমার দিকে তাকাতেই বলে ফেললাম, একস্‌কিউজ মি মাদার, ডু ইউ ফীল আনওয়েল ?

কারণ একটি বেদনার ছায়া যেন মেয়েটির রঙকরা মুখের রঙ ছাপিয়ে ফুটে উঠেছিল বলে মনে হয়েছিল আমার।

তার ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হল, অন্যথায় একটু চাঞ্চল্যও সারা শরীরে দেখা গেল না। সে বললে, হোয়াট? হোয়াট ডু ইউ মীন?

আমি বললাম, আমার মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ অথবা ক্লান্ত বোধ করছ। সেইজন্যে কথাটা জিজ্ঞাসা করছি।

—ধন্যবাদ তোমাকে। না, দুটোর কোনটাই নয়। কিন্তু তুমি আমাকে মা বললে কেন? সঙ্গে সঙ্গে বক্র হেসে বললে, আমি তোমার মা? তা হলে তো আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল। কারণ তোমারই তো মরবার বয়স হয়েছে।

তারপর আরও একটু হেসে বোধ করি তার শক্ত কথাগুলিতে একটু রসিকতার সিঞ্চন দিয়ে মোলায়েম করবার জন্যে বললে, তুমি খুব রসিক লোক। আমি কি খুব বুড়ো?

আমিও হেসে বললাম, তোমার এ কম্‌প্লিমেণ্টের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি দুঃখিত, আমাকে মার্জনা করো, তোমাকে আমার ছোট্ট মা—লিট্‌ল্ মাদার বা ইয়ং মাদার বলা উচিত ছিল।

সেইভাবে আধ শুয়েই সে কথা বলছিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ে নি। যেন লীলাচ্ছলে কথাগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল। সে হেসেই বললে, কিন্তু তাই বা বলবার দরকার কি ছিল?

বুঝলাম, এ মেয়ে চিরযৌবনের স্বপ্নে বিভোর, আধুনিকতার কড়া নেশায় আচ্ছন্ন; একটু রাগও হল, সংবরণ করেই বললাম, দেখ, আমাদের ভারতবর্ষে সাধারণ মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক দুটি—

বাধা দিয়ে সে বললে, থাক, আমাকে বিশ্রাম করতে দাও। অনুগ্রহ করে তুমি কোথায় যাচ্ছ যাও।

আমি কথা না বাড়িয়ে পা বাড়ালাম। মনের মধ্যে মেয়েটির কথাগুলো কাঁটার মত খচখচ করছিল, জবাব না দিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না, তবুও এগিয়ে চললাম। মনে মনে বার বার বাংলা-দেশের মেয়েদের কথা স্মরণ হল। তারা এমন কথা কখনও বলত না। সেখানেও মহেন্দ্রাণীর মত রূপসী আছে। তারুণ্য এবং রূপ

সম্পর্কে প্রতিপদক্ষেপে সচেতন মেয়েকেও মা বলে সম্বোধন করলে তারা শ্রদ্ধায় বিনম্র হয়। এরা, বিশেষ করে ইয়োরোপের শিক্ষায় মোহমুগ্ধা দিল্লীর মেয়ে যারা, তারা জাত হারিয়েছে।

হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনলাম, হ্যালো! হ্যালো ওল্ড জেণ্টেলম্যান!

ফিরে তাকালাম। দেখলাম সে কুলুঙ্গি থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি ফিরতেই সে ডাকলে, মেহেরবানী করে একবার শুনবে?

ফিরে এলাম। হয়তো সে অনুতপ্ত হয়ে থাকবে। নিজের পাওনাটুকু পাবার প্রত্যাশাতেই বোধ হয় ফিরে এলাম, বললাম, বল।

সে-ধার দিয়েও সে গেল না; ওর জাতই আলাদা। বললে, তোমার কাছে ফ্লাস্ক রয়েছে, কি আছে ওতে? জল না চা-কফি না—। থেমে গেল কিন্তু এরপর বলাই বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন ছিল।

আমি বললাম, না, সে পানীয় আমি রাখি নে। ওতে বিশুদ্ধ জলই আছে।

—আমায় একটু জল দেবে? তিয়াস পেয়েছে অনেকক্ষণ থেকে।

ফ্লাস্ক খুলে ঢাকনি-গ্লাসটা জলে ভরতি করে দিয়ে বললাম, নাও।

সেটা নিঃশেষ করে বললে, যদি পার আরও একটু দাও।

তাও দিলাম। এরপর সে বললে, ধন্যবাদ। কিছু মনে করো না, তোমাকে কড়া কথা বলেছি হয়তো।

বললাম, না, না। কি মনে করব? মরবার বয়স তো হয়েছে আমার। এবং সে সম্বন্ধে আমি একটু বেশী সচেতন। আমার বন্ধুরাও বলেন, এত বেশী ভাব কেন মৃত্যু-মৃত্যু করে?

—তুমি দার্শনিক?

না।

এক কথায় ছেদ টেনে দিতে চাইলাম। এবং যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু সে বললে, অনুগ্রহ করে আর একটু দাঁড়াও।

দাঁড়ালাম।

—তোমার সব দেখা শেষ হয়েছে?

—আমি আগেও এখানে এসেছি। আজও এসেছি অনেকক্ষণ। এবার ফিরব। কিন্তু কেন বল তো?

—আমাকে নীচে রাস্তা পর্যন্ত নেমে যেতে একটু সাহায্য করবে? এরপর একটু ইতস্ততঃ করে বললে, দেখিয়ে, ময় নে আপকো ঠিক বাত নেহি বোলি থি।

এবার ইংরিজী ছেড়ে দিল্লীর উর্দুঘেঁষা হিন্দী ধরলে সে। বললে, পা-টা আমার জখম হয়েছে। একটা ঠোক্কর খেয়েছি। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটার নখটা ছেড়ে গেছে। কাউকে না ধরে নামতে পারব না মনে হচ্ছে। বাসেও চড়িয়ে দিতে হবে।

কথা কেড়ে নিয়েই বললাম, নিশ্চয়। আমার সঙ্গে ট্যাক্সি আছে, সঙ্গেও কেউ নেই। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আনন্দের সঙ্গে নিয়েও যাব। কিন্তু তুমি কি একা? সঙ্গে কেউ নেই?

সঙ্গের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছে ধারণাটা তখনও মাথার মধ্যে ঘুরছিল।

সে বললে, না। আমি একাই।

আমি সুযোগ পেলাম, ছাড়লাম না। বললাম, তাতে কোন সংকোচ করবার নেই। আমি বৃদ্ধ মানুষ, আমাকে বৃদ্ধ ছেলে ভেবে অসংকোচে তুমি চল।

সে হেসে ফেললে এবার। বললে, এবার আর প্রতিবাদ করব না। তবে দোস্তিতে দোষ কি? দোস্তি আমি বেশী ভালবাসি।

সে পা বাড়াল কিন্তু বাড়িয়েই যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেল। এবং ঝুঁকে জখম আঙুলটার উপর হাত বুলিয়ে বললে, যা ভেবেছিলাম তার থেকে বেশী জখম হয়েছে দেখছি।

আমিও দেখলাম, নখটা ফেটে প্রায় উঠে গেছে, শুধু একদিকটায় খানিকটা লেগে আছে। পা ফেলতে গেলেই উঠেপড়া দিকের প্রান্তভাগ চেপে বসে যাচ্ছে নরম ক্ষতটার উপর। ওর শাড়ির

প্রান্তভাগ টেনে এতক্ষণ আহত আঙুলটা ঢাকা ছিল ; হয় মাছির জন্য অথবা কেউ যাতে না-দেখতে পায় তার জন্য। অথবা দুয়ের জন্যই।

আমি বললাম, আমার কাঁধে না হয় ভর দাও। আবার বলছি, ভেবে নাও আমি তোমার ছেলে।

সে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বললে, উঁহু, যা সত্যি তাই ভেবে নিচ্ছি। দোস্তি হয়ে গেছে, দোস্তের কাঁধের উপর ভর দিয়ে চলছি।

আমিও নাছোড়বান্দা। বোধ হয় খুন চাপার মত জেদ চেপেছিল, বললাম, কেন ? এমন পবিত্র সম্পর্কে তোমার আপত্তি কি ?

—ওটা মন-গড়া। সত্যি নয়। সেই জন্যে।

—আমি মরে যদি তোমার কোলে ফিরে আসি ?

ঘাড় নেড়ে সে বললে, পূর্বজন্ম আমি মানি না এবং বিয়ে আমি করব না। সুতরাং—। সে হেসে ফেললে, বললে, কিন্তু আশ্চর্য লোক তো তুমি।

ওখান থেকে বেরিয়ে নীচে নামবার মুখে সে হঠাৎ দাঁড়াল। বললে, দাঁড়াও। আঙুলটায় বেশ লেগেছে, ভুগতে হবে হয়তো। বলে সে সমস্ত ধ্বংসস্তূপটার সর্বত্রটা যেন দেখে নিলে। কারণটা ঠিক বুঝলাম না।

তারপর বললে, চল।

বললাম, তুমি ডাক্তারের কাছে বরং অ্যান্টিটিটেনাস ইনজেকশন নিয়ে নিয়ো।

—নেব। অন্যমনস্কভাবেই বললে। মনটা যেন তার দৃষ্টির সঙ্গে ওই তোঘলকাবাদের ধ্বংসস্তূপের বিশাল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'চল' বলেও সে দাঁড়িয়ে রইল, বললে, পা জখম হল, ওখানটায় বসলাম। যন্ত্রণার মধ্যে ভাবছিলাম কি জান ? ভাবছিলাম, সে আমলে হয়তো ওই দোকানটার কোন দোকানদারনী ছিলাম।

—তবে যে তুমি বললে তুমি পুনর্জন্ম মান না ?

হেসে উঠল সে। বললে, তুমি উকীল?

—না।

—খুব ধরেছ তো! পুনর্জন্ম আমি সত্যিই মানি না। তবে ভাবতে ভাল লাগে।

নীচে নেমে রাস্তার মুখটায় এসে বলল, কতকগুলো জোয়ান এসেছিল, এমন হৈ চৈ করছিল! যাক, তারা চলে গেছে। যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে মেয়েটি।

প্রশ্ন করলাম, জোয়ান—। সাম্ ইয়ং স্টুডেন্টস অর ইয়ং মেন ইউ মীন?

—নো—নো—নো। আমাদের আর্মি মেন, আমরা জোয়ান বলি।

—কিন্তু তারা তো খুব ভদ্র। বদনাম তো শোনা যায় না।

—আমার কিন্তু—মানে আমি নার্ভাস হয়ে যাই। বিলকুল ভাল লাগে না ওদের।

ট্যাক্সির দরজাটা খুলে দিলাম। সে উঠে বসে কোণে ঠেস দিয়ে যেন নিজেকে এলিয়ে দিলে। আমি পাশে বসতেই বললে, আমাকে বিনয়নগরের পথে নামিয়ে দিয়ো। ওখানে একটা ফট্‌ফটিয়া নিয়ে নেব।

—কেন, বল না কোথায় নামবে তুমি—

—না—না—না। সে আমাকে কয়েক জায়গায় ঘুরতে হবে।

তাই গেল সে। সফদরজঙ এরোড্রোমের কাছে রেলওয়ে ক্রসিংটার কাছে এসে একটা ফট্‌ফটিয়া ডেকে বিনা বাক্যব্যয়ে সে নেমে চলে গেল। ফট্‌ফটিয়ায় উঠে বিলিতী বা অত্যাধুনিক ঢঙে হাত নেড়ে কি বললে, বাই বাই না গুড-বাই—ফট্‌ফটিয়ার বিশ্রী আওয়াজের মধ্যে ঠিক ধরতে পারলাম না। তবে ছুটোর একটা বটে।

গাড়ীর ভিতরটায় এবং আমার নিশ্বাসে তখনও একটি মিষ্টি গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটি কথাও ঘুরছিল—বিচিত্র মেয়ে।

দুই

দিন দশেক পর। সাপ্রু হাউসে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। দাদাসাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল। দক্ষিণ-ভারতের নাট্যকার দাদা মঞ্জরেকর ভারতবিখ্যাত; এমন ভাল মানুষ আর এমন নাটক-পাগল মানুষ বিরল। ওঁকে আমিও বলি দাদাসাহেব। দাদাসাহেব হাসেন আর বলেন, আরে ভাই তুমি তো বড় ভাল খেতাব দিলে এবং তুমিও খেতাব নিলে। আমাদের দেশে আমার ভাইদের বলে দেব, তোমাকে বলবে—ছোটেদাদা শঙ্করজী।

সুরসিক মানুষ এবং সেই হেতু সুমধুর। এখন ডেরা দিল্লীতেই; নাতনী পরিবৃত হয়ে বাস করেন। সংসারে সম্বল কন্যা এবং কন্যার কুমারী। সন্ধ্যাতে নাটকের, সংগীতের কোন-না-কোন আসরে থাকবেনই। আমাকে অনেকদিন থেকে ধরেছিলেন, তুমি কিছু নাটক দেখ: বিভিন্ন প্রদেশের নাটক। সন্ধ্যেবেলা কর কি এখানে?

—করি না কিছুই। ঘুরে বেড়াই।

কনট সার্কাসে গিয়ে ঘুরি, দিল্লীর জীবনযাত্রা দেখি। নিঃসন্দেহে একটা বলশালী জীবনযাত্রা। বলের সঙ্গে সমুদ্রের জোয়ারের মত প্রকাশভঙ্গির একটা নিকট সম্পর্ক আছে। কেউ উদ্দাম বললে বলব না—না, তা নয়। কেউ দৃপ্ত বললে তাতেও প্রতিবাদ করব না। অত্যাধুনিকতার ফেনার সঙ্গে আবর্জনা আবিলতার অনুযোগ করলে বলব, তা তো গোড়াতেই বলেছি। পয়সার প্রাচুর্য কত তা অর্থ-নীতিবিদেরা বলতে পারবেন, তবে পয়সা খরচ ওরা বেশী করে তাতে সন্দেহ নেই। যত স্যুট যত টাই, বার উঠে যাক, মদের দোকানে বিক্রী তত বেশী; আর মেয়েদের পোশাক এবং প্রসাধনদ্রব্যের

প্রাচুর্যও দোকানে তত বেশী। এবং প্রতি পাঁচটি মেয়ের চারটির ঠোঁটে লিপস্টিক।

আরও বৈচিত্র্য আছে: ফুটপাথে পকৌড়ি ভাজছিলেন একজন প্রৌঢ় শিখ। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলাম তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন পূর্বে, এখন বেকার তাই এই বেকার দশায় জীবিকার জন্যে পকৌড়ি ভেজে বিক্রী করছেন। জন দুই তিন গ্রাজুয়েট ড্রাইভারের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। একজন ফট্‌ফটিয়া চালায়।

শুধু পাঞ্জাবী শিখেরাই নয় বাঙালীর ছেলেকেও দেখেছি। বি-এ পাস করে ডি-এ সুদ্ধ একশো চল্লিশ টাকা মাইনেতে লেবর অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে ঢুকেছে, তারই মধ্যে সন্ধ্যেতে ক্লাস করে এম-এ পাস করেছে। নতুন চাকরি খুঁজছে। আদালার কাজ করে পড়ে আই-এ পাস করেছে। সে হয়তো আরও অনেক শহরেই করে কিন্তু এখানে বলিষ্ঠতা আছে তার জন্যই মুখখানা হাসি-হাসি।

মেয়েরাও এমনই। দোকানে বাজারে ক্রেতা হিসেবে তারাই প্রধান। দশটা থেকে অসংখ্য বাইসিক্‌ল চলে। কাজে আসে মানুষ, তাদের মধ্যে মেয়ে সংখ্যায় কম নয়, বেশী। আর মেয়েদের অধিকাংশকে দেখেই ভ্রম হয়, ওই সব বিলাসিনী মেয়েদের আর একজন বলে। তবে তা হয় তো সত্য নয়।

এ ক'দিনে বেশ কয়েকজনকে আমার সেই মেয়েটি বলে ভুল হয়েছে; দু'চারজনের পায়ের দিকে তাকাতে হয়েছে বুড়ো আঙুল-টায় ব্যাণ্ডেজ আছে কিনা দেখবার জন্যে। সেই দেখে তবে নিশ্চিত হয়েছি যে—না, এ সে নয়।

তবে এই ঘোরার মধ্যে আমার একটা অন্য নেশা আছে। সেটা হল, ফুটপাথে তিব্বতীদের পুরানো মূর্তির দোকান। ইতিমধ্যেই অনেক-গুলো মূর্তি কিনেছি আমি। আর দেখি কাঠের এবং ধাতুর উপর রিলিফে ফোটানো ছবি। কাশ্মীর কাঠের কাজ, লতাপাতা, হরেক-রকম নকশা-আঁকা কাঠের বাক্স, কলমদান, বইরাখা, ছোট ত্রিপদী—

তারপর বাঁশের, বেতের, ঘাসের তৈরি হরেকরকম শিল্পদ্রব্য। আশ্চর্য মনোহারি এগুলি। জনকতক নেপালী নিয়ে আসে মালা, কাঠের উপর গালা দিয়ে পিতল বসানো গোল ঢালের মত জিনিষ, অ্যাশট্রে —এগুলি ওরা তৈরি করে এখানেই, কিন্তু চালায় খাঁটি তিব্বতী মাল বলে। প্লাস্টার অব প্যারিস এবং কাগজের মণ্ডে সিমেণ্ট মিশিয়ে ছাঁচ থেকে ছবি তুলে চমৎকার ঘর সাজাবার শিল্পবস্তু তৈরি করেছে। কোনটায় রামসীতা, কোনটায় আদিবাসী দম্পতি, ভারতবর্ষ থেকে পারস্যের ওমর খৈয়ামের সাকী ও ওমর পর্যন্ত কত বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি। ঘোড়া, হাতি, হরিণ, পাখি নানান ধরনের সুন্দর পুতুলও বিক্রী করে। কাগজের ফুল নিয়ে ঘোরে ফিরিওলা।

আমি এগুলি দেখে বেড়াই, কিনিও কিছু কিছু। এতেই সাড়ে আটটা বাজে; বাড়ি ফিরি। নটা বাজতে বাজতে গোটা নয়াদিল্লী জনশূন্য হয়ে যায়। নিওনের বিজ্ঞাপনগুলো সারারাত্রি জ্বলে কিনা বলতে পারি না। রিসেপশন, চা-পার্টি, সভাসমিতিরও অন্ত নেই; তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলে নাট্য আন্দোলন। হিন্দী গুজরাটী মারাঠী—তামিল মালয়ালম—বাংলা ওড়িয়া অসমীয়া সকল ভাষার নাটক অভিনয় হয়। এর সঙ্গে লোকনৃত্য লোকসংগীত আছে। কিন্তু সর্বত্রই মেয়েরা যায় মুখে রং মেখে, পুরুষকে যেতে হয় মুখোশ পরে খোলস পরে—মুখোশটা রাজধানীর ভদ্রতার কানুনের—প্রটোকল বা যা খুশি বলুন—আর খোলস হচ্ছে পোশাকের।

এখানে মেয়েদের আর দোষ দেওয়া যায়না। তারা শাড়ি স্যাণ্ডেল বজায় রেখেছে। পুরুষদের সবই কোট প্যাণ্ট, অবশ্য গলাবন্ধ কোট। আর শেরওয়ানী চুস্ত পায়জামা। দুটোতেই আমার নিজের চোখে নিজেকে খুব বেমানান লাগে, কাজেই ওইসব পরবার ভয়ে ওদিকে হাঁটি নে। এমন কি বাংলা নাটকেও না।

এবার কিন্তু দাদাসাহেবের হাত এড়াতে পারলাম না। তিনি নাটক নিজে সংশোধন করেছেন, এবং অভিনয়ের ব্যবস্থার মধ্যেও তাঁর

উপদেশ নির্দেশ এ নাটকে এক বিশেষ অঙ্গ এবং তা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। দাদা নিজে যাবার সময় আমাকে তুলে নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ ধরে নিয়ে গেলেন। আসন পেলাম প্রথম সারিতেই। নাট্যানুরাগী এবং নাট্যানুরাগী না-হয়েও কর্তব্যের দায়ে নাট্যান্দোলনে উৎসাহদাতা হিসেবে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসে আছেন। দাদাসাহেব প্রসন্ন উদার মানুষ, সকলকে সহাস্য অভিনন্দন জানিয়ে বসলেন।

আলো এবং সাজসজ্জার চমৎকারিত্বের প্রশংসা না করে পারলাম না।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নয়া জমানার জীবন নাটক "এক-হিসাব"।

দাদাসাহেব বললেন, আমরা এ লিখতে পারি নে শঙ্করজী। বলতে বলতেই লাউডস্পীকারে ঘোষণা হল—"১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল"।

ভিতর থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠল শঙ্খধ্বনি, তার সঙ্গে কাঁসর-ঘণ্টা। তার ধ্বনি মৃদু হল—থামল না, তারই মধ্যে "আওয়াজ" উঠল—'স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ'—'আজাদ হিন্দোস্তান'—'জনতাকে রাজ—!' "জিন্দাবাদ"! তারপর একে একে—'জয়—জয়—জয়!' 'স্বাধীন ভারত কি'—'মহাত্মা গান্ধী কি'—'পণ্ডিত নেহেরু কি—!' 'জয়—জয়—জয়!'

যবনিকা উঠল। গভীর অরণ্য, গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তারই মধ্যে কয়েকটি গাছের আভাস। অরণ্যভূমির ভিতর দিয়ে সড়ক চলে গেছে। একটি কাঠের ফলক পোঁতা রয়েছে পথের ধারে, তাতে আরবী দেবনাগরী এবং ইংরেজি হরফে লেখা রয়েছে কিছু; ফোকাসের আলো পড়ল; ইংরিজীতে পড়লাম 'দিল্লী টু দেবগিরি।'

পিছনে সানাইএর সঙ্গে রোশনচৌকি বাজতে লাগল। তার সঙ্গে গান আরম্ভ হল; এক বিখ্যাত হিন্দী কবির স্বদেশী সংগীত।

এরই মধ্যে ওই একটা গাছের পিছন থেকে একটি মূর্তি খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল, লোকটার একটা পা নেই। একটা খাঁজওয়ালা

গাছের ডালকে ক্রাচের মত ব্যবহার করে তার উপর ভর দিয়ে চলছে। দাঁড়াল স্থির হয়ে, শুনতে লাগল গান। গান থামলে আবার ধ্বনি উঠল—'আজাদ হিন্দোস্তান'—

—জিন্দাবাদ!

—স্বাধীন ভারত—

—জিন্দাবাদ!

—জনতাকে রাজ—

—জিন্দাবাদ!

লোকটির মুখের উপর আলো পড়ল। শিউরে উঠলাম।

লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা কঙ্কাল-আঁকা পোশাক. কবর থেকে উঠে এল যেন। জিন্দাবাদ শেষ হতেই সে প্রশ্ন করলে. জনতাকে রাজ হয়ে গেছে? হো—ভেইয়ো!

—হাঁ—হয়ে গেল। আজই। শুনছ না, আওয়াজ উঠছে—তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে।

কঙ্কালের পোশাকটা এবার খুলে পড়ে গেল। বের হল মানুষ। একজন অন্ধ। প্রাচীন ইসলামী আমলের পোশাক। অন্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ডাল-ক্রাচের উপর ভর দিয়ে সে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বললে, আমার পা—! তা হলে আমার পা ফিরিয়ে দাও!—আমার পা!

—কি হল তোমার পা?

—ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

—কে?

—কে আবার? রাজা। সোলতান!

—কোন্ রাজা? কোন্ সোলতান? কবে?

—তা হলে শোন আমার ফরিয়াদ!

পর্দা নেমে এল।

আবার নেপথ্য অভিনয়। ঘোষণা হল. করিব্ সাত শও বরিষ।

দেহলিতে তখন তুঘলকাবাদে সোনালী মিনা করা ইটে গড়া সোলতানি মহল, সকালবেলা সুরুযদেবের আলোর ছটায় ঝকমক করে ওঠে। মানুষের চোখে সে ছটা লেগে দৃষ্টি অন্ধা করে দিত! হাঁ—সেই 'তুঘলকাবাদ'!

কণ্ঠস্বর এই লোকটির!

বলতে বলতেই পর্দা উঠল।

এবার একেবারে পশ্চাৎপটে সোনালী রঙে আঁকা সোলতান মহলের মাথাটা জেগে রয়েছে। আর সম্মুখে তুঘলকাবাদের সেই বাজার। সেই আট-দশ-ফুট চওড়া রাস্তার দু'পাশে কুলুঙ্গির মত দোকান।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল সেই বিচিত্র মেয়েটিকে। মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠল, "সে আমলে হয়তো এই দোকানে দোকানদারনী ছিলাম।" তা থাক বা না থাক, জন্মজন্মান্তরেব অনেক নদী নালা সমুদ্র বা খাড়ি পার হয়ে সে আবিষ্কার করা অসম্ভব কিন্তু তার সঙ্গে এই নাটকটার মনে হল যেন সম্বন্ধ আছে · অন্ততঃ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সম্ভব। কারণ সে যে মেয়ে তাতে এখনই যদি দেখতে পাই পায়ে ঘুঙুর বেঁধে সে আমলের নাচুনীর সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে সে আসছে তবে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না। সম্ভাবনাটা দূরে ফোটা ফুলের গন্ধের মত মনের মধ্যে একটি বিচিত্র ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু না, দোকানের দোকানদার দোকানদারনী যারা তাদের মধ্যে দেখতে পেলাম না তাকে। দোকানদারনা একজনই ছিল, দোকানদারনীও তাকে বলা চলে না, ফিরিওয়ালী—পথের ধারে—একেবারে সম্মুখেই সবজীর পসরা নিয়ে বসে ছিল। নেপথ্য থেকে দিল্লী অঞ্চলের ছোট ঢেঁড়া বেজে উঠল, তার সঙ্গে দেশী শিঙা। ঘোষণা শুরু হল, "লা ইলাহি ইলাল্লা। প্রিয় নবী পয়গম্বর হজরৎ মহম্মদের রসুলাল্লার অনুগামী, হিন্দোস্তানের সোলতান—হাতিমের

চেয়ে বড় দানী—অদ্বিতীয় জ্ঞানী—রুস্তমের থেকেও বীর, মালিক সুলতান মহম্মদ তুঘলকের এই হুকুমৎ আজ থেকে জারি হল হিন্দোস্তানে।"

হুকুমৎ—আজ থেকে হিন্দোস্তানে "চাঁদি আওর সোনেকা সিক্কা রূপেয়া আর চলবে না। নতুন সিক্কা রূপেয়া চল হল—সে সিক্কা তৈরি হবে পিতল আর তামার। আরও চল হল চামড়ার নতুন মোহরের। যারা কারবার করবে 'পুরানি' সিক্কা মোহরে তাদের উপরেই সোলতানের এই হুকুমতকি জোরসে সাজাই হো যায়েগা।"

আবার নাকারা শিঙা বাজল, বাজাতে বাজাতে তারা চলে গেল। এতক্ষণ দোকান থেকে দোকানীরা মুখ বাড়িয়ে শুনছিল, মেয়েটি দাঁড়িপাল্লা ধরে ওজন করছিল—সেই পাল্লার দড়ি ধরেই শুনছিল—অবশ্য চতুরতার সঙ্গে গড়িয়ে ফেলে দিয়েছিল কিছু সবজি: এবার তারা একসঙ্গে হায় হায় করে চঞ্চল হয়ে উঠল। হায়—হায়—হায়! মেয়েটা কপালে চাপড় মেরে বললে, হা রে নসীব—হা!

দোকানীরা রাস্তায় নামল।

—পিতলের সিক্কা? হা রে হা!

—চামড়ার মোহর! হে ভগোয়ান!

—হায় পরমাত্মা।

—হে আল্লা! হায় রসুলাল্লা! তোমরা ছাড়া কে এই সোলতানকে সমঝে দেবে?

—কিন্তু এত বড় জ্ঞানী লোক! এত ভারি পণ্ডিত দুনিয়াতে নাই। অ্যাঁ!

—আরে যদি মদ খেতো তো বুঝতাম মাতালের খেয়াল!

—চু—চু-চু! কি আপসোস! যে লোক মদ খায় না—কসবী তো কসবী কোন ঔরৎ—যতই কেন তার সুরত্ থাকুক তার দিকে তাকায় না: তার এ কি উদ্ভট খেয়াল! তামা পিতল—চাঁদি সোনার ফারাক বুঝতে পারে না।

—বাপকে মারে দরবারের মেরাপ চাপা দিয়ে—

—আরে—চুপ্—চুপ্!

—চুপ করব কি করে? আমার ঘরের চাঁদি সোনার সিক্কা মোহর নিয়ে আমি করব কি?

একজন বললে, মিট্টির তলায় গেড়ে রাখ শেঠজী। নেহি তো—

কথা কেড়ে নিয়ে এবার মেয়েটি বলে উঠল, নেহি! শেঠ মেহেরবান কদরবান আমাকে দিয়ে দাও, আমাকে গয়না গড়িয়ে দাও! আমার পিতলের কাঁকনি খাড়ু সব—সব তোমাকে দিয়ে দেব। চাও তো আমার জোয়ানি ভি দিয়ে দেব তোমাকে! আঃ হা—কি খুবসুরত্ তুমি শেঠ! কি খুবসুরত্!

এই সময় শোনা গেল গান—।

গানটা ঠিক বুঝতে পারি নি। তবে হিন্দী উর্দূ গানের মধ্যে যে ভারতীয় সংগীতের আমেজ আছে, বোম্বাই ছবির অত্যুগ্র ইউরোপী-আনা অনুকরণের মধ্যেও যে আমেজটি মরে নি, নাটকের গানখানির মধ্যে সেই আমেজ আরও স্পষ্ট এবং গাঢ়।

দাদাসাহেব বাঃ বাঃ বলে উঠলেন এমন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে যেন মনে হল তাঁর রসোপলব্ধির উল্লাস বা আনন্দ অজ্ঞাতসারে, অন্ধকার রাত্রি নামার মুহূর্তে প্রতীক্ষার জন্য সুইচ অন করে আলো জ্বেলে সামনে দাঁড়ানোর আনন্দের মত অকৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

সুর আমারও ভাল লেগেছিল কিন্তু কথা বুঝি নি, তাই আলো জ্বালায় যে আনন্দ সে আনন্দের বেশী আমার কিছু হয় নি। যে আলো জ্বেলেছে তাকে চিনতে পারি নি। দাদা বললেন, চমৎকার গানটি। সুন্দর।

—আমাকে বুঝিয়ে দেবে? উর্দূ ঠিক বুঝি না।

হেসে দাদা বললেন, অনুবাদে তো রস নেহি মিলেগা ভাই। দেখ, আমের তার কি আমসিতে কি আমসত্ত্বতে মেলে?

হেসে আমিও জবাব দিলাম, যে আম খায় নি তার পক্ষে আমসত্ত্ব ছাড়া আমের স্বাদ বুঝবার উপায় কি বল? না-হলে সাগর ডিঙিয়ে লঙ্কা যেতে হয়।

—চুপ কর। ওরা ঢুকছে।

—কারা?

—হিরো হিরোইন।

আবার চকিতের জন্য মনে হল, সে ঢুকছে। মনে হল নয়, একেবারে প্রায় নব্বুই নয়া পয়সা বিশ্বাস হয়ে গেল।

একজন অন্ধ ভিক্ষুক আর তার হাত ধরে ভিক্ষুণী। দুজনের হাতে দুটি বাদ্যযন্ত্র। ভিক্ষে করছে গান গেয়ে। আলোর ফোকাস পড়ল তাদের মুখে—আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। হাঁা, এ তো সেই। সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, সেই—। না, মুখের ঢঙটা তো ঠিক। এমন রঙ তার মুখে সেদিনও ছিল কিন্তু আজকের রঙ অনেক চড়া। তা ছাড়া দু'পাশে লম্বা বেণী, কেশ প্রসাধনে সে আমলের ছাঁদ, পরনে ঘাগরা কাঁচুলি ওড়না, হাতে মোটা রূপদস্তার বালা কাঁকনি। মাকে নাকছাবি। পালটে যাবারই কথা, কিন্তু এতখানি পালটাবে?

দাদাসাহেব ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, গানের অর্থ হল—"ইমাম সাহেব তোমার বসবার জন্যে মসজিদ তৈরি করেছে—হীরা মতি দিয়ে কতই না নকশা কেটেছে আসনে। শাহানশাহ বিশাল কেল্লা বানিয়ে তার উপর গম্বুজ তুলে, সেই উচ্চলোকে বসবার জন্যে তোমাকে ডেকেছে। ইমাম কত বয়েৎ তৈরি করে তোমার স্তব করেছে; শাহানশাহ ঘোষণা করে বলেছে সে তোমারই প্রতিনিধি। কিন্তু কি বিচিত্র তুমি! আমি অন্ধ, সামান্য আমার কুটীরে এসে দাঁড়ালে তুমি। আমি বললাম, কোথায় বসাব তোমাকে রাজ-রাজেশ্বর? তুমি বললে, তোমার এবং তোমার প্রিয়ার যে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত বিনম্র কোমল হৃদয় সেখানেই বসব আমি। বললাম. কি বলে স্তব করব তোমার? তুমি বললে প্রেমের গুণগান কর,

তাতেই আমার স্তব হবে। জ্ঞানের আসনে আমি উত্তাপ অনুভব করি, সম্পদের আসনে সোনার তৈরি কণ্টক আছে—আমাকে বিদ্ধ করে। প্রেমের আসন দূর্বাঘাসের আস্তরণের কোমল মখমল। ওই ঘাসের ফুলের মালা গেঁথে আমাকে বন্দনা কর। ওই ঘাসের বীজ থেকে অন্ন তৈরি করে আমার ভোগ দাও।"

মিথ্যা বলব না, মনে হল এ যদি আধুনিক রচনা হয় তবে তো—একটু কাঁটা ফোটার মত খচ্ করে কিছু বিঁধল। প্রশ্নই করলাম, এ কোন আধুনিক কবির রচনা?

—হাঁ। অবশ্যি মির্জা গালিবের কাছে ধার করেছে। তবে হিন্দু কবি তো—ফুলের মালা, ভোগ এগুলি ভুলতে পারে নি।

একটু চুপ করে থেকে দাদাসাহেব বললেন, তোমাদের রবিবাবু আর উর্দুওয়ালাদের গালিব মস্ত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স।

কথা শেষ হতে হতেই নেপথ্যে কলরব উঠল, সোলতান—সোলতান! শাহানশা আসছেন! শাহানশা!

একজন সিপাহ এল: হঠ যাও—হঠ যাও! হঠ যাও! সরে যাও সব—সরে যাও!

একজন নকীব সুলতানের নাম ঘোষণা করলে।

লোকজন সব মাথা ঈষৎ নত করে দাঁড়াল।

তারই মধ্যে একজন আতঙ্কিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলে উঠল, এয় আল্লা! আরে ব্বাপ্!—কার শির গেল?

সকলে আড়চোখে তাকালে। একজন জল্লাদ ঢুকল। তার কোমরে কুঠার, হাতে একটা বর্শা, তার মাথায় একটা মুণ্ডু।

তার পিছনেই ঢুকল সুলতানের তাঞ্জাম।

জল্লাদ বললে, দেখ, এই আদমীর মাথা গেল। এই আদমী কে জান? এ হল সুলতানের মীরবক্সী, আমীর উল উমরা ফিরোজজং সিপাহ্সরদার জাফর খাঁ। আমীরের দেমাক ছিল কি, সে বহুৎ পণ্ডিত লোক। পাদশাহী-মমালক্ সোলতানকে সে বেওকুফ মনে

করেছিল। বোঝাতে চেয়েছিল, সুলতান যে হুকুম জারি করছেন, তামা পিতলের সিক্কা চাঁদি সোনার সিক্কার বদলে চলবে—তা ভুল। তামা পিতল আর চাঁদি সোনা এক নয়। চাঁদি সোনার কদর বেশী। তকরার করেছিল। বলেছিল, পাদশাহ বিচার করুন—আমীর ওমরাহ রইস-আদমী, আর গরীব যারা ছোট কাম করে, ভিখারী যারা ভিক্ষা করে খায় তারা যেমন এক নয়—তেমনি তামা পিতল আর সোনা চাঁদিও এক নয়। সুলতান বলেছিল, বল, কি কারণে নয়? এরাও মানুষ, ওরাও মানুষ। ওমরাহ বলেছিলেন, পাদশাহ মালিক, কিন্তু বুঝে দেখুন, যিনি দিন-দুনিয়ার মালিক তিনি পাদশাহকে তাঁর হাত প্রসারিত করে রক্ষা করেন। তাঁর চেয়ে কম হলেও আমীর ওমরাহদের রক্ষা করেন, কিন্তু এই গরিবান, এদের উপর কি সেই হাত তেমনি করে রক্ষা করে? করলে এরা হামেশা হামেশা এমন করে দলে দলে মরে কেন? রোগে অনাহারে হরদম মরে। তেমনি সেই নিয়মে পিতল কাঁসাও মরে—তুরন্ত জলদি ক্ষয়ে নষ্ট হয়। পাদশাহ বলেছিলেন, তবে আল্লাহ্ তায়লার মর্জিতে পাদশাহ খুন হয়, হেরে যায়, পালিয়ে ভিখারী হয়। ভিখারী পাদশা হয় কেন? তুমি জান, পাদশা কুতুবুদ্দিন ছিল মহম্মদ ঘোরীর খরিদ-করা বান্দা। এই তুঘলক পূর্বপুরুষ—আমার পিতামহ একজন করৌনা তুর্ক—সেও ছিল বলবনলোকের খরিদ করা বান্দা! আজ কি করে আমি সোলতান? ওমরাহ বলেছিল, খোদ্দার মর্জি! পাদশা বলেন, হাঁ ঠিক। বেশক্। কিন্তু খোদার মর্জিতে যেমন বান্দা হয় পাদশা তেমনি পাদশার মর্জিতে তার শিলমোহরের ছাপে সিক্কা মোহর পায় মোহরের ইজ্জত আর কিম্মৎ। সে সোনা হোক আর চাঁদি হোক। কি দাম সোনার চাঁদির যতক্ষণ তাতে পাদশাহী ছাপ না পড়ে? খোদাতায়লার মর্জিকে মানুষ বলে, খেলা! তাঁর মর্জি হলে পাদশা আমীর বসে থাকতে থাকতে মরে। হয়তো তিনি বসান সেখানে কোন গরীবকে। ঠিক কি না? মীরবক্সীকে মানতে হয়, হাঁ হুজুর। এ ঠিক বাত

পাদশা তখন হুকুম দেন: পিতল তামা পাবে এতদিনের সোনা চাঁদির সিক্কার ওমরাহী পাদশাহী মর্জিতে, তার শিলমোহরের ছাপে। আর সেই সঙ্গে খোদার মর্জিতে মীরবক্সী হবে দেওয়ানখানার কোন গোলাম। সোনা-চাঁদির আমলের মীরবক্সী জাফর খাঁয়ের শির যাবে জল্লাদের কুড়ালির ঘায়ে। তা না-হলে তো কায়েম হবে না পিতল-তামার সিক্কার ওমরাহী। এই সেই বেওকুফ্ মীরবক্সীর মুণ্ডু। তোমরা হুঁশিয়ার হবে এই বেওকুফি থেকে।

দীর্ঘ বক্তৃতাদি সে করছিল উইংসের মুখে দাঁড়িয়ে। পিছনে ভিতরে তাঞ্জামের মুখটা দেখা যাচ্ছিল। বাজারের লোকেরা স্থির। আমি দেখছিলাম, অন্ধ ভিক্ষুক, তার চেয়ে বেশী করে তার সঙ্গিনীকে। মনের মধ্যে সেই প্রশ্ন—এ কি সেই? কিছুতেই যেন জ্যামিতির দুটি কোণ সমান ও দুটি বাহু সমান দুটি ত্রিভুজের মত এক হয়ে মিলে যাচ্ছিল না। মেয়েটি এবং অন্ধ লোকের ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করছিল। সে চেষ্টা যেন বিশেষ চেষ্টা।

ঘোষণার পর মুণ্ডশীর্ষ বর্শাধারী জল্লাদ এগিয়ে গেল, পিছনের তাঞ্জাম এসে ঢুকল রঙ্গমঞ্চে; কুর্নিশ পড়তে লাগল অজস্র এবং বারবার।

সুলতান স্মিতহাস্যে ঘাড় নাড়লেন; তারপর বললেন, কে আছে এখানে গরীব? সামনে আ-যাও!

এল সেই সবজিওয়ালী, দুনিয়ার মালিক, মেহেরবান শাহানশা, আমি বড় গরীব!

—আচ্ছা। লে, ইয়ে লে।

মুঠো ভরে মুদ্রা বাড়ালেন পাদশা, সে আঁচল পাতলে। পড়ল ঝরে পাদশাহের মুঠো থেকে।

—আর কে আছে?

ব্যস্ত হয়ে একজন দোকানী অন্ধকে বললে, জলদি যাও! জলদি করো!

সঙ্গিনী অন্ধের হাত ধরে নিয়ে এল সামনে। দাঁড়াল। পাদশাহের হাত উঠল মুদ্রামুষ্টি নিয়ে। উঠে অকস্মাৎ থেমে গেল। একটু ঝুঁকলেন, বললেন, আরে, এ কে? তুমি তো—কবি—সৈফুদ্দিন—! সায়রে শের!—অ্যাঁ?

কুর্নিশ করে অন্ধ বললে, হাঁ শাহানশা, আমি সেই সৈফুদ্দিনই বটে!

—আচ্ছা তুমি দিল্লীতে আছ এবং বেঁচে আছ?

ফের কুর্নিশ করে অন্ধ বললে, হাঁ দুনিয়ার মালিক মেহেরবান সোলতান!

—হাঁ—হাঁ। জরুর আমি মেহেরবান। জরুর। হাজারোবার।

—হাঁ—পাদশাহ! সে কথা কেউ না বললেও লাখোবার সত্য। সূর্যের উত্তাপ প্রখর, তার মেহেরবানীই ওই উত্তাপের মধ্যে, সে কথা না বললেও সত্য।

—এই তো, এই জন্যেই তোমাকে বলতাম, সায়রের মধ্যে তুমি শের। কবির মধ্যে সিংহ। ওঃ, কতকাল তোমার এমন মূল্যবান কথা শুনি নি! তাই মধ্যে মধ্যে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। তবে তুমি বড় দুর্বলচিত্ত। কবি, কাদায় নরম মাটিতে ফসল হয় মানি, কিন্তু হীরে দুনিয়ার সব থেকে কঠিন—শক্ত। মাটিতে গাছে ফুল হয় মানি, কিন্তু আজ ফুটে কাল ঝরে যায়। কিন্তু হীরে? সে আকাশের এক সূর্যকে পলে পলে খাঁজে খাঁজে ধরে হাজারো করে তোলে আর রোশনির ফুলঝুরি ফুটিয়ে দেয়। আর ফোটায় হাজারো কেন লাখো বরষ ধরে। তাই বা কেন, দুনিয়ার জিন্দিগী যতদিন ততদিন। কি, আমি ঠিক বলি নি?

—এর চেয়ে আর সত্য হয় না সুলতান; আপনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। আমি দুর্বল, সত্যই দুর্বল।

—হাঁ। তুমি ঔরৎ লেড়কার চেয়েও দুর্বল। দোয়াবে বিদ্রোহীদের দমন করে তাদের ঘেরাও করে জানোয়ার শিকারের মত শিকার

করেছিলাম। তুমি বুঝতেই পারলে না আমি কেন করেছিলাম! কেন জান? মানুষ বড় না জানোয়ার বড় তাই দেখতে চেয়েছিলাম। শিকার দেখেছ? বাঘ পালায় ভাল্লুক পালায়। গোড়াতে পালায়, কিন্তু শেষে যখন মুখোমুখী হয় সে তখন লড়াই দেয়। জবর লড়াই। মানুষ শুধু কাঁদে। কাঁদে আর মরে। জানোয়ারের চেয়ে অনেক ছোট। তুমি তাদের কাঁদতে কাঁদতে মরা দেখে কাঁদলে, তাই মেহেরবানী করে চোখ দুটো অন্ধ করে দিয়েছিলাম। ভালই করেছিলাম, না হলে তুমি অনেকবার কাঁদতে আর আমাকে বিরক্ত করতে। আজও এই মুণ্ডটা দেখে কাঁদতে। কাঁদতে না?

—হাঁ মেহেরবান সুলতান। মনে মনে আপনাকে হাজার সেলাম জানিয়েছি।

হা হা করে হেসে উঠলেন সুলতান। বললেন, সত্যি বলছ সৈফুদ্দিন? সচ্ বাত? খোদা কসম?

—খোদা কসম, সচ্ বাত শাহানশা!

—ঝুটা নেহি?

—কভি না, শাহানশা। ঝুটা নেহি!

—আচ্ছা! কিন্তু—

স্থিরদৃষ্টিতে এতক্ষণে তাকালেন বাদশা তার সঙ্গিনীর দিকে। সে মুখ নত করে অন্ধের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। বললেন, এ কে সৈফুদ্দিন?

—ও এক ভিক্ষুকের মেয়ে, নিজেও ভিক্ষে করত। আমি অন্ধ হয়ে শহরের বাইরে গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম—তখন যন্ত্রণায় অজ্ঞান—সেই সময় আমার শিয়রে এসে বসেছিল। আজও আমাকে ছাড়ে নি।

—সচ্ বাত?

—খোদা কসম সুলতান!

—কিন্তু তোমাদের সম্পর্ক কি?

—ওকে আমি সাদী করেছি হজরৎ।

—সচ্ বাত ?

—খোদা কসম !

—আচ্ছা ! কিন্তু তুমি—

মেয়েটি কাঁপছে।

—তোল্—মুখ তোল্। দেখি তোকে ! তুই কবিসিংহের প্রিয়তমা। সাকী।—আরে, তুনিয়ার মানুষ জানে মহম্মদ তোঘলকের কখনও ঔরতের ভুখা নেই ! কখনও পরের মেয়ে ছোঁয় না। মুখ তোল্।

সে তুললো মুখ। পাকা অভিনেত্রী। আতঙ্কে যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সুলতান আর একবার অট্টহাস্য করে উঠলেন। সব স্তব্ধ। হাসি থামিয়ে সুলতান বললেন, সৈফুদ্দিন, বল তো, কানা করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি তোমাকে কালাও করে দিয়েছিলাম ?

—না শাহানশা !

—হাঁ। কিন্তু করে দেওয়াই আমার উচিত ছিল। ইচ্ছে হচ্ছে আজ সেটা করে দি।

—মেহেরবান সুলতান—

—আরে, তুমি সৈফুদ্দিন, সত্যি কথা বলছ ! তুমি শিরিনকে গলার আওয়াজ শুনে চিনতে পার নি ? গান শুনেও চেন নি ?

চমকে উঠল অন্ধ। বলে উঠল, শিরিন !

—আরে, যাকে তয়ফাওয়ালী কসবী বলে তুমি ঘেন্না করতে। কথাও বলতে চাইতে না ! যার জন্যে তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম ! তা—ওই তো শিরিন !

—তুনিয়ার মালিক শাহানশা, আমি ভিক্ষুক অন্ধ। আমি আপনার রহস্যের অযোগ্য। ও তো বোবা !

—বোবা ?

—হাঁ শাহানশা। ঠিক বোবা নয়; ওর গলার নালী সর্দিতে বন্ধ হয়ে গেছে। আওয়াজ বের হয় না। ফিসফিস করে কথা বলে। গান গাইবে কি!

—তা হলে শোন!—এই—এই ঔরৎ!

মেয়েটি মাঝখানে মাথা হেঁট করেছিল, আবার সে তুললে মুখ।

—তুই বোবা? বল্, নইলে সাঁড়াশি দিয়ে চামড়া টেনে দেখব তোর গলার আওয়াজ বের হয় কি না। বল্—। উত্তর দে। তুই বোবা?

—না, শাহানশা দুনিয়ার মালিক।

—গান গাইতে পারিস?

—পারি।

—সেই গানটা শোনা আমাকে—সেই—"হায় সাধু তুমি তাকে পাবার জন্যে সূর্যের দিকে তাকিয়ে অন্ধা হলে—কিন্তু চাঁদের দিকে তাকালে না কোনদিন। আজ অমাবস্যা, চাঁদ নেই, তা হোক—আমার চাঁদের মত মুখের দিকে তাকাও, তাকে দেখতে না পাও আমার চোখে তোমার ছবি দেখতে পাবে।" গা—।

গান ধরলে মেয়েটি কম্পিতগলায়।

সুলতান হুকুম দিলেন, চলো। সুলতানের তাঞ্জাম চলে গেল।

যে মুহূর্তে তাঞ্জাম চলে গেল সেই মুহূর্তে মেয়েটি থেমে গিয়ে দুই হাতে মুখ ঢাকলে। আর সৈফুদ্দিন চিৎকার করে উঠল, তমিনা!

সে মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চিৎকার করে উঠল, না না—আমি শিরিন। আমি শিরিন!

বলেই সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

—শিরিন।

—আমার কসুর মাফ করো। আমি শিরিন। মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বর দূরে। অন্ধ চিৎকার করে এগুতে লাগল, শিরিন! শিরিন! শিরিন! শি—রি—ন!

নামল পর্দা।

দাদাসাহেব বললেন, বহুৎ আচ্ছা! বাতাইয়ে, আপ ক্যা কহেতে হ্যায়! আপনার মত বলুন।

বললাম, ভাল!

—শুধু ভাল? সিরিফ ভালা, ওর থেকে বেশি নয়?

—অভিনয়, প্রডাকশন খুব ভাল।

—আই অ্যাম গ্ল্যাড!

বাধা পড়ল। প্রথম সারির বিশিষ্ট জনেরা এসে দাদাসাহেবকে টেনে নিয়ে গেলেন। আমার মনে আমি তখনও মিলিয়ে দেখছিলাম, এই মেয়ে আর সেই মেয়ে এক কি না? তোঘলকাবাদের এই পটভূমি, আর তোঘলকাবাদের সেই বিচিত্র মেয়েটির সেই কথা। ভাবছিলাম, "সেকালে হয়তো আমি এইখানে এই দোকানে দোকানদারনী ছিলাম।" এই দুটো মিলিয়ে এমনই হয়েছে যে হাজার গরমিল হলেও মনে হচ্ছে এরা দুজনে এক। দুটো সমান ত্রিভুজের একটার দুটো কোণ ধরে টেনে ইতরবিশেষ করে দিলে একটার সঙ্গে অন্যটাকে, মেলালে আর মিলবে না। অঙ্কে মিলবে কিন্তু চেহারায় মিলবে না। বেশ মনে হচ্ছে, ছুটে বেরিয়ে যাবার সময় যেন মেয়েটি খুঁড়িয়েছিল।

দাদা ফিরে এলেন; আবার পর্দা উঠবে।

আমি প্রশ্ন করলাম, হিরোইনটি কে? ভাল অভিনয় করছে।

—ও, সী ইজ ওয়াণ্ডারফুল। পাক্কা অ্যাকট্রেস। পাঞ্জাবী গার্ল। ভেরী মডার্ন। আওয়ার অ্যাকাডেমি প্রডাক্ট। ইউনিভারসিটিকে গ্রাজুয়েট ভি হ্যায়।

—ও একটু খুঁড়িয়ে চলছে না?

—চলছে নাকি? হবে, পা জখম হয়ে থাকবে।

—আমি ওকে দেখেছি।

—দেখবে বই কি। আমার কাছে তো প্রায়ই আসে। সাউথ

অ্যাভেন্যুতে দেখে থাকবে। যে কোন জায়গায় দেখে থাকতে পার। সারা দেহলী চষে বেড়ায়।

পর্দা উঠল।

অন্ধ খুঁজছে শিরিনকে।—শিরিন!

আমার কিন্তু সন্দেহ রইল না যে এই শিরিনই সেই মেয়ে!

শিরিন কিন্তু আর বের হল না। ওইখানেই শিরিনের ভূমিকা শেষ। শিরিন হারিয়ে গেল। সে আর ফিরল না সৈফুদ্দিনের কাছে। লজ্জায় সংকোচে বা যে কোন কারণে হোক ফিরল না। সৈফুদ্দিনই বললে, সে তখন কবরের পাশে বসে আছে। তার কুটীরের সামনে একটি কবর—ওই শিরিনের কবর। কবরের পাশে বসে গান গাইছে —"খোদা তোমাকে চেয়েছিলাম, দাও আমাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মধু। তোমার সাড়া পাই নি! পদ্মফুল আমাকে ডেকেছিল, এস তুমি। আমার মধ্যে খোদা তোমাকে পাঠিয়েছেন তোমার প্রার্থিত বস্তু। আমি মুখ ফিরিয়েছিলাম। বলেছিলাম, পাঁকে তুমি ফুটেছ, তোমার মধুতে পঙ্কের অশুচি। চাই নে। আমি অন্ধ হলাম। পদ্ম নিজে এল, আমার চোখে ঢেলে দিলে তার মধু। অন্ধত্ব সারল, চোখ মেলে পদ্মকে বুকে ধরতে গেলাম; পদ্মটির পাপড়ি ঝর ঝর করে পড়ে গেল।"

নাটকে কথার মধ্যে বুঝলাম, শিরিনকে আর সৈফুদ্দিন পায় নি, সে আত্মহত্যা করেছিল, পেয়েছিল তার মৃতদেহ। সেই দেহ নিয়ে কবর দিয়ে সেইখানে বসে সে গান গায় ভিক্ষে করে।

এরই মধ্যে ঘোষণা হল, রাজধানী যাবে দেবগিরি।

হুকুমৎ জারি হল—"হুকুম শাহানশা, তামাম হিন্দোস্তানের পাদশাহ সোলতান মহম্মদ তুঘলকের; দিল্লী তুঘলকাবাদের সুলতানশাহী যাবে দেবগিরি। এক মাট্টি আর পাথর এ ছাড়া যা কিছু সবকে যেতে হবে। সব আদমী যাবে, গৃহস্থী যাবে, আমীর ওমরাহ, এমন কি গরু ভেড়া ছাগল কুত্তা সমেত।"

কান্না উঠল, হায় হায় উঠল। এয় আল্লা, হে ভগবান, সুলতানের মতি ফেরাও। সুবুদ্ধি দাও! হে ভগবান! ইয়া আল্লা মেহেরবান! নয় তো দয়া করো—এই উন্মা—

যে বলছিল তার মুখ চেপে ধরলে একজন, চুপ! চুপ! চুপ!

এরপর নাটকে এসেছে অনেক কিছু। জনতা এসেছে, বিদ্রোহের ধোঁয়াও উঠেছে, সে ধোঁয়ার উপর জল ঢালা হয়েছে। এতটুকু প্রতীক করে ভাল দেখিয়েছে। একদল লোক জমায়েত হয়ে পরামর্শ করেছে, ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে পালিয়ে যাবে। তারা কাঠ এনে ঘরে বোঝাই করছে। পাকা ঘর। পাথরের দেওয়াল! আগুন দিলে। ধোঁয়া উঠল। জানালা দিয়ে ধোঁয়া বের হতে লাগল। লোকজনের সঙ্গে এল পাদশাহী সিপাহী। তারা কুয়ো থেকে জল তুলে ঢেলে দিলে। নিবে গেল। একজন সিপাহী টেনে একখানা কাঠ বের করে বললে, ভিজে, একদম ভিজে! কাঁচা কাঠ। এই জ্বলে! চল। ক'বালতি জলেই নিবে গেল।

অন্যজন বললে, শুকনো হলে কি হত বল তো!

সে বললে, শুকুক, শুকুবে একদিন। সেদিন দেখা যাবে কি হয়!

জল্লাদ এল, একটা শিকে বেঁধানো রয়েছে অনেকগুলো জিভ। ক'জন সিপাহীর হাতের দড়িতে বাঁধা একদল লোক। 'বধ্যভূমে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে গোলমাল এসেছে বেশি। নাটকটা জোর হারিয়ে ফেলেছে। শেষ—অন্ধ সৈফুদ্দিন কবর আঁকড়ে পড়ে বলছে, আমি যাব না। আমি যাব না।

সিপাহীদের একজন বললে, হুকুম শাহানশাহ সুলতানের—ইট কাঠ পাথর বাদ দিয়ে জীবন্ত যে কেউ, জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত সব যাবে দেবগিরি।

—আমি ভিক্ষুক।

—খানাপিনা সব মিলবে। বিলকুল ভার শাহানশাহের।

—আমি অন্ধ—

—বয়েল গাড়িতে উঠিয়ে দেব। ওঠো।

—না না—আমি যাব না।

—তা হলে হুকুম, দড়ি দিয়ে বেঁধে জানোয়ারের মত টেনে নিয়ে যেতে। বাঁধ।

—না—না—না।

কিন্তু কে শোনে? শাহানশাহের হুকুম! হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে টানলে। সে শুয়ে পড়ল। চিৎকার করলে, শিরিন! শিরিন!

একজন বললে, এইসা নেহি। হাতে নয়, এমনি করে বাঁধো পায়ে।

বাঁধতে লাগল পায়ে।

পর্দা পড়ল। ডাক শোনা গেল অন্তরাল থেকে. শিরিন!

আবার পর্দা উঠল। দেবগিরিতে মহম্মদ তোঘলকের দরবার। বাইরে মসজিদ থেকে সুলতানের নামে খুদবা পড়া হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে।

বন্দনা-গান হল.

সুলতান হুকুম দিলেন, ফকীর ভিক্ষুকদের দান কর। এক এক আঁজলায় যত নতুন সিক্কা ওঠে—দাও। এক সপ্তাহ ধরে সারা শহরে রোশনাই হবে। দিল্লী থেকে যারা এসেছে সব লোকের এক সপ্তাহের খাদ্য যাবে পাদশাহী খাজাঞ্চাখানা আর গোলা থেকে।

তারপর প্রশ্ন করলেন, দিল্লীর সব লোক এসেছে?

—হাঁ সুলতান।

—অন্ধ সৈফুদ্দিন? কসবীর কবর থেকে যে নড়ে না, সে?—

সিপাহী

সিপাহী এসে ঢুকল, তার হাতে দড়ি। সে দড়ির প্রান্তে বাঁধা শুধু একটা পা।

—আর কই?

—তাকে ছেঁচড়ে আনতে হয়েছিল সুলতান। পথে জঙ্গলের মধ্যে সেই ছেঁচড়ানিতে কমবক্ত মরে গেল। তারপর ধড়ের সব অঙ্গ একে একে খসে পড়ে গেল। পাখানা বাঁধা ছিল দড়িতে, সেইটে এসেছে।

সভাসদেরা নাকে কাপড় দিয়েছে। অর্থাৎ পঁচে গন্ধ উঠছে। সুলতান কিন্তু দিলেন না। প্রশ্ন করলেন, কি বলছিল কমবক্ত মরবার সময়? শিরিন বলে চেঁচাচ্ছিল?

—না, শাহানশা!

—তবে?

—বলতে ভয় হচ্ছে মেহেরবান।

—কোন ডর নেই। বল্···

—কমবক্ত চিল্লাচ্ছিল, খোদা—এয় খোদা, কবে, কবে দুনিয়া থেকে পাপ শাহানশাহী বরবাদ হবে? কবে? কবে? নয়া জমানা কবে আসবে? জনতাকে রাজ? আদমীর আজাদী?

অট্টহাস্য করলেন পাদশাহ।

পর্দা নামল।

আবার উঠল। এবার তোঘলকাবাদের ধ্বংসস্তূপ। সেই বাজারের মুখ; পরিত্যক্ত কুলুঙ্গির মত দোকানগুলি পড়ে আছে। কেউ নেই। পিছনে দূরে লালকেল্লার মাথায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। আলোর রোশনাইতে ঝলমল করছে। ঢুকল সেই মানুষ!

—কই, আমার পা? আমার পা?

—কবি!

—কে? কে? কে?

—আমি শিরিন।

—শিরিন!

—হাঁ, আমি কবর থেকে উঠেছি। তোমার জন্যে বসে আছি। চল আমরা যাই।

—কোথায়?

—ওই কেল্লার নয়া দরবারে। চল, তুমি চাইবে পা, আমি চাইব জাত, যা না থাকার লজ্জায় আমি দুনিয়ায় অচ্ছুৎ। চল।

পর্দা নেমে এল। শেষ হল নাটক। করতালিতে ভেঙে পড়ছে আচ্ছাদন। চারিদিকে সাধুবাদ! অজস্র সাধুবাদ!

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা আবার উঠল।

নাটকের পাত্রপাত্রী সম্মুখে দাঁড়ালেন। দাদাসাহেব কখন উঠে গিয়েছিলেন লক্ষ্য করি নি। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, দু' এক বাত। তার আগে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি নায়ক সৈফুদ্দিন সেজেছিলেন—

আমি সোজা হয়ে বসলাম। এবার নায়িকা আসবে। নায়িকা এল। তার সজ্জা এখন সহজ সজ্জা। অনেকক্ষণ ভূমিকা শেষ হয়েছে। অতি আধুনিকা একটি তরুণী।

কিন্তু সে নয়। না, সে নয়। তার থেকে এ মেয়েটি সৌন্দর্যে ম্লান। এবং যতই আধুনিকা হোক আধুনিকতার সে উগ্রতা এর নেই। এখন চোখে পড়ল, আকারে অবয়বে মুখ চোখের গড়নেও অনেক তফাত তার সঙ্গে। অভিনেতা অভিনেত্রীদের পরিচয় শেষ হল; নাট্যকার, প্রডিউসার, ডিরেকটার এলেন। শেষ হল; সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। গাড়ী পাব না। দিল্লীতে ওই এক সমস্যা।

পথে মেজাজ যেন ভাল ছিল না। নাটকে খুব খুশী হতে পারি নি। শেষ দিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। একদম ঝুলে পড়েছে। হয়তো নায়িকাকে বাঁচিয়ে রাখলে ভাল হত। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই মেয়েকে। তোঘলকাবাদের পটভূমি আর আমার তোঘলকাবাদের

সেদিনকার স্মৃতি ছুইয়ে এমন জট পাকিয়েছে এবং তার মধ্যে সেই মেয়েটি এমন সামনে রয়েছে যে তাকে বাদ দিয়ে নাটকটা দেখে আমার মন ভরে নি। হয়তো বা সে থাকলে ভালই লাগত! তাতে হয়তো নাটকের এই ভূতুড়ে কল্পনার সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতার সম্পর্কে উচ্ছ্বাস—সাম্রাজ্যবাদ বরবাদ—ডাউন উইথ ইম্‌পিরিয়ালিজম শ্লোগানের উৎকটত্ব ঢাকা পড়ত না—তবে বোধ হয় আমার মনে ভাল লাগত।

তিন

পরের দিন সকালেই দাদাসাহেবের বাসায় গিয়েছিলাম। বাসায় ফেরার পর মনে মনে একটু সংকোচ অনুভব করেছিলাম, দাদা-সাহেবকে ফেলে চলে আসা আমার উচিত হয় নি। দাদাসাহেব নিশ্চয় আমাকে খুঁজে থাকবেন। তিনি যে লোক, নিশ্চয় খুঁজবেন।

সকালবেলা আটটার মধ্যেই গেলাম। রবিবার, ছুটির দিন; তার উপর কাল থিয়েটার গেছে, আজ অনেক জন আসবে। থিয়েটারেরই লোক। দাদার মতামত শুনতে আসবে। দাদাসাহেবের এ গুণের কথা বলেছি—হয়তো পুনরুক্তি হচ্ছে—দিল্লীর উপর থেকে নীচে পর্যন্ত—মন্ত্রী থেকে সাধারণ মানুষকে সমান সমাদরে গ্রহণ করেন, এবং তাদের কাছে তিনি সমান প্রিয়। তা ছাড়া দাদা-সাহেবের কাছে নিন্দে শুনেও সুখ না থাক, দুঃখ নেই। ওঁর নিন্দের মধ্যে বিষ থাকে না।

এরা সকলেই আসবে আটটার পর। ছুটি ব'লে তো বটেই তা ছাড়া প্রাতঃভোজনের পরে আসাই বিধি। অন্ততঃ শোভন। সকালবেলা দাদাসাহেব জমিয়ে চা খান, প্রাতঃরাশ করেন। চানাচুর পকৌড়ি থেকে ডিম মাখন রুটি জ্যাম জেলি অনেক রকম নিয়ে

বসেন, পাশে বসে তরুণীর দল। তাঁর দৌহিত্রীরা এবং তাদের সঙ্গে একজন দুজন তাদের বান্ধবী তরুণী, তাদের আকর্ষণ কিন্তু দাদা-সাহেব। আমি সকাল বেলা খাই নে এসব, দাদাসাহেবের ঘরে এ-কথা জানা কথা হয়ে গেছে; সুতরাং আমার খাবার টেবিলের সংকোচ ছিল না।

দাদার বাসায় বারান্দায় উঠলাম আর ঠিক মনে হল এই মাত্র দরজাটা বন্ধ হল। রাস্তার মোড়ে একখানা ফটফটিয়াও আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। তা হলে কেউ এর মধ্যেই এসে গেছে। তার আর উপায় কি! বোতামটা টিপলাম! ভিতরে বাজার্ বেজে উঠল।

নারীকণ্ঠে উচ্চারিত হল, আ—!

দরজা সঙ্গে সঙ্গেই খুলল, দাদাসাহেবের সেক্রেটারী, তাঁর দৌহিত্রীর বান্ধবী শীলা এক তরুণী দরজা খুলে আমাকে দেখে বললে, আপ্! আইয়ে, নমস্তে।

ভিতরে ঠিক দরজা থেকে কেউ নারীকণ্ঠে বললে, ওঁকে বসতে বল, যিনিই হোন! দেখতে পেলাম, একখানা রঙীন শাড়ির অঞ্চলপ্রান্ত ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে অদৃশ্য হল দরজার ওদিকে। সঙ্গে সঙ্গে দাদাসাহেবের প্রসন্ন কণ্ঠ শুনলাম, আ! অ্যাট লাস্ট মাই রৌশন আগেয়ী—

শুষ্ককণ্ঠে উত্তর হল, হ্যাঁ এলাম। অন্যের কাছে যাই নি, যাবও না। তোমার কাছেই এসেছি।

—আমি জানি! তা তুমি রাগ করে পালিয়ে এলে কেন? পহলে বস—বস।

—না, বসব না!

—আরে ভাই এতনা গোস্যা বুঢ্ঢেকে পর, হায় পরমাত্মা! এ কি সাজে! বস, বস! মেজাজ ঠাণ্ডা কর। চা খাও, কিছু খাও, তারপর হবে। কালরাত্রে যা মেজাজ দেখেছি তাতে জরুর তুমি কিছু খাও নি।

—এত বেওকুফ আমি নই।

—বহুৎ আচ্ছা ভাই, তা হলে এখন এই সকালেই বেওকুফি তুমি জরুর করবে না। বস।

চেয়ার টানার শব্দ হল।

আমি বসবার ঘরে বসে ছিলাম। সেক্রেটারীটি দাঁড়িয়ে ভাবছিল কি করবে। মেয়েটি তাকে বারণ করে গেছে। আমি বললাম, দেখ, আমি বরং পরে আসব, কি বল?

—এক মিনিট। আমি আসছি।

সে চলে গেল। পরমুহূর্তেই দাদাসাহেব ডাকলেন, আরে ভাই শঙ্করজী, আ যাও, ভিতর আ যাও।

—না। আমার কথা—

—হবে, পরে হবে, তুমি বস। বাংলাদেশের লেখক, বড় লেখক—তার উপর আর্টে ঝোঁক—আলাপ করিয়ে দিই। তুমি তো 'আরতি' নিয়ে গিয়েছিলে আমার কাছ থেকে। পড়েছ, হারিয়ে ফেলেছ পথে—

সেই মুহূর্তেই আমি গিয়ে ঢুকলাম, নমস্তে।

—নমস্তে ভাই, নমস্তে!

মেয়েটিও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। আমি বিস্মিত হলাম, খুশীও হলাম। এ সেই মেয়ে। সেও হেসে সবিস্ময়ে বললে, হোয়াট এ সারপ্রাইজ—! ইট ইজ ইউ, মাই ওল্ড ফ্রেণ্ড!—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, হোয়াই নট ওল্ড চাইল্ড, মাই ইয়ং মাদার? ইজ ইট নট সুইটার?

—নো—নেভার। তারপর হেসে বললে, তুমি তো আচ্ছা অবস্টিনেট লোক!

দাদাসাহেব হেসে উঠলেন, মাই গুডনেস! তোমরা জান দুজনে দুজনকে?

আমি আবার দুষ্টুমি করেই বললাম, ইয়েস ইয়েস দাদাজী, শী ইজ মাইন—

—নো—নো—নো। বেতরিবৎ লোক কোথাকার!

দাদা বললেন, কি ব্যাপার? হোয়াট'স দি ফান্?

—দেখ না, সেই প্রথম দিন থেকে ধরেছে—আমি ওর মা!

কপালে হাত দিয়ে দাদাসাহেব বললেন, মাই গড! রৌশন মা! হায় পরমাত্মা।

—তাই বল তো ওকে!

—নো—নো—না। বি ফ্রেণ্ডস, শঙ্করজী!

—গ্যাটস রাইট! ও মাই গ্রাণ্ড ওল্ড দাদাসাহেব, আই লাভ ইউ। এত পেয়ার করি এই জন্যে। ইউ ডোণ্ট নো, হাউ মাচ আই লাভ ইউ।

—হাউ মাচ? এতনা? দাদাসাহেব দু হাত দিয়ে একটা পরিমাণ দেখালেন।

—উঁহু। এ—ত—না। বলে সে দুখানা হাতকে যতদূর পারা যায় প্রসারিত করে জানালে, যে তার থেকে বেশী আর হতে পারে না।

—একদম ঝুটা বাত।

—কেন?

—এই সেদিন কলকাতা থেকে ফিরে আমাকে বললে সেখানকার 'জু'তে যে শিম্পাঞ্জীটা আছে তুমি তার প্রেমে পড়েছ, আর সেদিনও ঠিক এতখানি প্রেমে পড়েছ বলে হাত দুখানা এমনি করেই বাড়িয়ে দেখিয়েছ।

মেয়েটি হেসে গড়িয়ে পড়ল, ওয়াণ্ডারফুল! দাদাসাহেব, তুমি ওয়াণ্ডারফুল! ইউ আর এ ডার্লিং!

—তা, শঙ্করজীকেও তো ভালবেসেছ?

—নিশ্চয়।

—প্রথম দিন থেকেই?

—প্রথম দিন থেকে। উনি আমাকে তোঘলকাবাদ রুইন্‌সে জল খাইয়েছেন। পা জখম হয়েছিল, ওঁর কাঁধে ভর দিয়ে সেই

উঁচু থেকে নেমেছি। ওঁর ট্যাক্সিতে উনি লিফ্‌ট দিয়েছেন বিনয়নগরের মোড় পর্যন্ত। তখন অবশ্যই জানতাম না যে উনিই শঙ্করজী, 'আরতি' ওঁরই লেখা! ওঃ দাদাসাহেব, কি বলব তোমাকে, ওই আরতির সেকেণ্ড হিরোইন আমাকে হণ্ট করেছে। ওঃ, কতবার ভাবতে চেয়েছি, ওই আশ্চর্য বউটি যদি আমি হতাম!

দাদা প্রগল্‌ভ ব্যক্তি। বললেন—এবং লেখককে নায়ক ভাব নি?

—হুঁ। ভেবেছি।

—তা হলে ভাগ্যে শঙ্করজী সে পরিচয় দেয় নি। বচ গিয়া আপ্‌নে, বহুত বচ গিয়া ভাইজী।

—কেন?

—কেন? আব তা হলে, তুমি শ্রীমতী রৌশন, তোমাকে তো আমি জানি, তুমি হয় বেচাবাকে চুলের মুঠো ধরে বলতে, চুল পেকেছে কেন তোমাব? দাঁত ভেঙেছে কেন? নয়তো একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে বলতে, আই লাভ উই, মাই গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান। হু নোজ? জোয়ানি কি মর্জি, ইউ মাইট হ্যাভ বিগান কিসিং হিম। অ্যাণ্ড শঙ্করজী খুন হয়ে যেত। তুমি জান না, উনি পিউরিট্যান লোক, ধর্মবাতিক।

মেয়েটি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে ঝরে-পড়া ঝরণার মত খিলখিল করে হেসেই 'চলেছে। দাদাসাহেবের কৌতুক রসিকতার লোষ্ট্রনিক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত জলের মত তার সে হাসি যেন ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়েছিল। আমি সবিস্ময় কৌতুকে এই পরিহাস-রসিকতার মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ আবার বাজার্ বেজে উঠল। বাইরে কেউ এসেছে। এক মুহূর্তে রৌশনের হাসি থেমে গেল। বললে, আমার কথাটা আমি শেষ করতে চাই লোক আসবার আগেই।

আমি বললাম, আমি তাহলে উঠি—

হাতখানা চেপে ধরে রৌশন বললে, না বস তুমি। তুমি

আমার সাক্ষী। বল তুমি শঙ্করজী, সেদিন তোঘলকাবাদে আমার অবস্থা তুমি স্বচক্ষে দেখেছ। তোমাকে আমি বলেছিলাম, ওই কুলুঙ্গি-দোকানে বসে ভাবছিলাম, হয়তো তোঘলকাবাদের আমলে আমি এই দোকানের দোকানদারনী ছিলাম।

আমি বিস্মিত হলাম। বুঝলাম না কথাটার অর্থ।

রৌশন বলেই গেল, উনি আমাকে একদিন দেখেছেন। আমি দিনের পর দিন ওই কবরস্থানে গিয়ে স্কেচের পর স্কেচ করেছি।

—কে তা অস্বীকার করবে, ডিয়ার রৌশন? ই তো সব কোইকো মালুম হ্যায়।

—তবে? কেন, কেন আমার বদলে অন্যের নাম দিলে প্রডিউসার হিসেবে?

—আরে ভাই, তার আমি কি করব বল? সে হল মাইনেকরা আকাদেমির প্রডিউসার—আর তুমি তো ভাই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসেবে কাজ করতেই রাজী হয়েছিলে।

—কিন্তু আমি কুলি মজুর নই, শিফ্‌টার নই। আমি স্কেচ করেছি, আমি সেট ডিজাইন করেছি, রঙ তুলি নিয়েও কাজ করেছি, আর তার জন্যে পাওনা খাতির পাবে অন্য লোকে? এ নাটক ওই ভালা-ভোলি-নাড়ুগোপালের মত দেখতে ওই শরণ সিংয়ের লেখা ভেবেছ? হ্যাঁ লিখেছিল একটা, কিন্তু সে কংগ্রেস রাজের স্রিফ বেশরমী প্রপাগাণ্ডা। আমি ওকে বলে বলে কাটিয়ে লিখিয়ে চেহারা দিয়েছিলাম। তাও তুমি তাকে এমন করে কাটলে যে শিরিনকে এক সিন রেখে একদম মুছে দিলে!

দাদা বললেন, সো ইউ রিফিউজড টু অ্যাকসেপ্ট শিরিন'স রোল। হেসেই বললেন, কিন্তু সে হাসি নামেই হাসি, স্বাদে তার ঝাঁঝ ছিল।

—হ্যাঁ। তা আমি করেছি।

—কিন্তু করা উচিত ছিল না তোমার।

—ও পার্টে আছে কি তাই করব!

—যা আছে তাই করতে।

—না। তা আমি করি না।

—শুনো ভাই রৌশন। কথাটা শোন। দেখ তুমি ইউনিটের লোক নও, তবু তোমাকে ভালবাসি। তুমি নাটক নিয়ে এলে, আমি নাটক নিলাম। যা করে এনেছিলে তাতে তোমার মগজ আছে সে বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু সে আমার ভাল লাগে নি। বলেই নিলাম যে বদল করব।

—আমি তা মেনে নিয়েছি।

—তাও অনেক ঝঞ্ঝাট করেছ। শেষ পর্যন্ত শিরিনকে রাখা উচিত ছিল সে আমি মানি। কিন্তু যে ভাবে তুমি রেখেছিলে তা হয় না। আমি ভাবতেই পারি না। তাই আমি ওই ভাবে কেটে করে দিলাম কি তুমি পার্টটা করবে। পার্টের জন্যেই তোমাকে নেওয়া হয়েছিল। প্রডাকশনের জন্যে নয়। তুমি যেচে ভার নিয়ে স্কেচ করলে, ডিজাইন করলে। তার জন্যে তুমি—। মাফ করনা ভাই। এ নিয়ে অনেক কথা কানে এসেছে। তুমি না কি—।

—হ্যাঁ জানি। যত সব নর্দমার মক্ষির মত মনের লোক বলেছে, আমি প্রডিউসারকে খুশী করেছি,—কটাক্ষে ঘায়েল করেছি—

—ছাড় ছাড়, ওসব কথা ছাড়। তোমার মুখে আটকায় না কিন্তু আমাদের শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট শিরিনের পার্টের জন্যে। তুমি সাত দিন আগে বললে, আমি করব না। বেশ ভাল। ওরা চটে গেল। যাবারই কথা। সুরঞ্জনা পাকা অ্যাক্ট্রেস, সে চালিয়ে দিলে। তার উপর তুমি হঠাৎ প্রডিউসারকে বললে, ইডিয়ট।

—সে আমাকে কি বলেছে জান? হারলট। লোকের সামনে। হ্যাঁ। বলেছে আমি মদ খাই! আমি নাকি ফরেনারদের নিয়ে গাইডের কাজ করার নামে ফুর্তি করে বেড়াই! আর্ট ট্রেজার কিনে দেওয়ার ছলে বাজে জিনিষ বিক্রি করে ঠকাই। আমি নাকি একটা চিট!

আমি আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়েটির কোন সংকোচ ছিল না।

দাদা বাঁধা দিয়ে বললেন, দেখ রৌশন, এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ কি বল? আমি বলব, তুমি প্রডিউসারকে যখন সাহায্য করেছ, খেটেছ, তখন তোমার রেমুনারেশন পাওয়া উচিত। চেষ্টাও করব যাতে পাও।

—কিন্তু টাকাটাই সব নয়।

হাসলেন দাদা। এ হাসিটাও সহজ নয়, তিক্ততা তার মধ্যে স্পষ্ট। বললেন, নিমক মিলা হ্যায়, বাস্; চিনিকে বাত ছোড়ো। ওতেই মেনে যাও। নুন একটু বেশী হওয়া চাই, এই তো!

রৌশন স্থিরদৃষ্টিতে দাদাসাহেবের দিকে তাকাল। তাতে তিরস্কার ছিল। তারপর বললে, যাক দাদাসাহেব, আর কথা বাড়াব না। কিন্তু—। না থাক। শঙ্করজী, তুমি হয়তো খুব শক্‌ড্ হলে। মাফ চাইব না। বলব, সহজভাবে নিয়ো। আচ্ছা, নমস্তে।

চলে গেল সে।

বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ উঠবার পর দাদাসাহেব বেদনার সঙ্গে আক্ষেপ-মেশানো সুরে বললেন, একদম স্পয়েল্‌ড হো গয়া। অথচ ট্যালেণ্ট ছিল লেড়কীর! ছবি আঁকতে পারে, এদেশের ক্র্যাফটসও জানে, এ্যাক্টিং করতে পারে; ফরোয়ার্ড—কিন্তু—।

ওই অসমাপ্তির মধ্যেই ইঙ্গিতে কথাটা সুস্পষ্ট। বললে এত স্পষ্ট হতে পারত না।

আমি বললাম, কোথাকার মেয়ে? পাঞ্জাব?

—সে সব কেউ কিছু জানে না। ও বলে হরেক রকম, কাউকে বলে, কোন জায়গীরদারের মেয়ে। কাউকে বলে, রাজার মেয়ে। কখনও বলে, বাপ ছিল পণ্ডিত লোক। কোন উপাধি বলে না। শুধু রৌশন। লেখাপড়া ভাল জানে না। তবে ইংরিজি বলে যাবে। ফরেনারদের গাইড হয়, আর্ট ট্রেজার কিনে দেয়, বললে, শুনলে না।

লোকে নানারকম বলে। আমি স্নেহ করি। একটা অ্যামেচার ক্লাবে ওর অ্যাক্টিং দেখে ভাল লেগেছিল। আলাপ করেছিলাম। ঠিক এমনটা বুঝি নি। এই নাটক নিয়ে ওর সঙ্গে আলাপটা বেশী হয়েছিল। তা—।

হাসলেন দাদাজী।

—তা আমার গোড়াতেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

বাজার্ বেজে উঠল আবার। কেউ এসেছে।

মাঝখানে একবার বাজার্ বেজেছিল। সেবার এসেছিল ডিমওলা। দাদা থামলেনঃ কোই আ গেয়া হোগা। নাউ লেট আস্ স্টপ্। বাট, রৌশন হ্যাজ স্ট্যন্ড্ ইউ, ইজ নট ইট্? একদম চমক লাগা দিহিস! অ্যাঁ?

—নট মাচ্।

—নট মাচ্?

—হাঁ। ও সেদিন যখন মা বলতে রাগ করলে তখনই বিস্ময় কেটে গেছে।

হেসে ফেললেন দাদাজী। বললেন, সে দিল্লীর অনেক মেয়েই করবে। কিন্তু রৌশন একজাতের বোধ হয় একটি। অন্ততঃ আমি তো দেখি নি। আরে নাটকে ওর হাত ছিল বলছিল না? ছিল। ফ্যাক্ট। স্বীকার করেছে ড্রামাটিস্ট। ইয়ং ম্যান, রৌশনের পাল্লা। করেছিল কি জান? ওই হিরোইন শিরিন ছুটে পালাল। তারপর পাদশার লোক তাকে ধরলে, নিয়ে এল পাদশার কাছে। পাদশা জিজ্ঞাসা করলে, তোর মহব্বতি সত্যি? সে চুপ করে রইল। তারপর বললে, সত্যি কিনা জানি না জাঁহাপনা, তবে—। পাদশা বললে, আচ্ছা তার পরীক্ষা দিতে হবে। তুই ওর কাছে যেতে চাইলে তোর মুখটা ঝলসে পুড়িয়ে দেব। তাতে তোর ক্ষতি হবে না। ও চোখে দেখতে পায় না। আর লোকেও তোর সুরত দেখে তোর পিছু নেবে না। আর যদি না-চাস, তবে তোকে দরবারের

নাচনেওয়ালী হয়ে থাকতে হবে। পরদেশ থেকে রাজাদের দূত আসে, আমার অধীন এ-দেশের রাজারা আসে, তাদের গান শোনাবি, নাচবি, আর তারা চাইলে কসবীগিরিও করবি। খাজাঞ্চীখানা থেকে মাসে একশো মোহর তলব মিলবে। খানাপিনা মিলবে। বাড়ি মিলবে। হীরা জহরৎ ভি মিলবে। বল্, কি করবি বল্। মেয়েটা কাঁদতে লাগল। পাদশা হুকুম দিলেন, দে তবে ওর মুখখানা ঝলসে দে। দেখিস যেন মরে না-যায়। মেয়েটা কেঁদে উঠল, না মালিক, না—না। পাদশা বললেন, কী না? ও বললে, যাব না আমি, অন্ধা সৈফুদ্দিনের কাছে যাব না। পাদশা একরাশ মোহর ঢেলে দিলেন, বললেন, এই নে। যাও, একে আচ্ছা মোকাম দাও। আচ্ছা পোশাক দাও। এরপর মেয়েটার একটা সিন ছিল। বাড়িতে কাঁদছে। তারপর দরবারে মদ খাচ্ছে নাচছে, এক বিদেশী অতিথির কাছে কসবীপনা করছে। তারপর শঙ্করজী, মোস্ট হরিব্‌ল থিং—লাস্ট সিনে—দেবগিরির দরবারে যখন পা-খানা নিয়ে সিপাহী ঢুকল, সেই মুহূর্তে ওই মেয়েটা দরবারে ঢুকে কুর্নিশ করে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। তারপর বজ্জলে, জাঁহাপনা, মেহেরবানী হয় তো পঁচা পা-খানা বাইরে ফেলে দিতে হুকুম হোক। আমি গান গাই নাচি আর গুলাব জল ছড়াই। বলে, দিস ইজ রিয়াল। শেষ—

এসে ঢুকলেন যিনি তিনি আমার পরিচিত নন তবে গতকাল রাত্রে তাঁর মুখ চিনেছি। তিনি কালকের নাটকের প্রডিউসার। দাদা হেসে বললেন, আইয়ে। উ আয়ি থি।

—হ্যাঁ দেখলাম, তিনমূর্তির সামনে বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে।

বুঝলাম, এই আলোচনাই চলবে। বলতে কি, খুব ভাল লাগছিল না। গোড়াটা বেশ লেগেছিল, হাসি-ঠাট্টা। মেয়েটির এই নতুনকালের আলট্রা-মডার্নিজম খারাপ লাগে নি। এ জিনিষ আমি বরদাস্ত করতে পারি নে তবু এ সময়টুকুর মধ্যে বেলোয়ারী কাচের আলোক প্রতিফলনের ঝকমকানি উপভোগ করছিলাম।

এর মধ্যে মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলেছিল। ভেবেছিলাম, কিছু লোককে মেয়েটির পিছনে লাগিয়ে দিলে কি হয়। তারা কেবলই বলবে, মাদার! মাঈজী! মা গো! কিন্তু হঠাৎ নাটকের কথা এবং অভিনয়ের ব্যাপারে ন্যায়-অন্যায় টাকার প্রসঙ্গ উঠতেই সবটাই কেমন বিস্বাদ হয়ে গেছে। প্রডিউসারটির সম্পর্কেও ধারণাটি যেন প্রসন্ন নয়। দাদা যা বলেছেন তাতে লোকটিও খুব নির্দোষ নন। মেয়েটি যদি তার স্বার্থ-সাধনের জন্য খেলা খেলবার জন্য ফাঁদ পেতে থাকে, তবে উনি তাতে জেনেশুনে পা বাড়িয়েছিলেন।

আমি নমস্কার করে উঠে চলে এলাম। ন'টা বেজে গেছে। বেরিয়ে সাউথ অ্যাভেন্যুর মোড়ে এসে দেখলাম, সাইকেলের ভীড় চলেছে। দিল্লী শহর, বলতে গেলে সাইকেলের শহর। সাইকেল আর মোটরকার, যাদের ও দুটোর একটাও নেই এবং ট্যাক্সি চড়া যাদের ক্ষমতার বাইরে, এই মাঝখানের লোকের পথকষ্ট ভাগ্যলিপি। বাসের জন্য কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কতক্ষণে যে বাসে জায়গা মিলবে সে কথা বোধ করি ত্রিকালজ্ঞও বলতে পারে না। ত্রিমূর্তির চারিদিকের গোলাইটার দিকে তাকালাম। লম্বা কিউ। আপিসের সময়। প্রডিউসার বলেছিলেন, সে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলাম তাকিয়ে, কই সে? ওই না? গগল্‌স চোখে? গগল্‌স অনেক। আজকাল গগল্‌স দিল্লীতে ফ্যাশন। ফ্যাশন প্রয়োজন দুইই বটে। মেয়ে পুরুষ সবাই পরে। না, গগল্‌স ক'জনের চোখে থাকলেও সে নেই। সে রঙের শাড়িই নেই। মেয়েটি আজও সেই হাল্কা নীল বা সবুজ রঙের শাড়ি পরে এসেছিল। ওই রঙটা ওকে মানায় ভাল। এবং মেয়েটি তা জানে।

চার

দিন পঁচিশেক পর। এপ্রিল এসে শেষের দিকে পৌঁছেছে। শুকনো গরমে শরীর ফাটতে শুরু করেছে। দুপুরে রোদের মধ্যে বের হওয়া দূরের কথা, রোদের দিকে চাওয়া যায় না। সন্ধ্যের পর ভিন্ন বের হওয়া যায় না। সন্ধ্যে হতে সাতটা বেজে যায়। কলকাতা থেকে দিল্লীতে সূর্য ওঠেন দেরীতে, অস্ত যানও দেরীতে। কনট সার্কাসে গিয়ে দু পাক দিতে-না দিতে দোকান বন্ধের পালা পড়ে যায়। তাই সেদিন সকাল-সকাল বেরিয়েছিলাম। দিনের আলোরও দরকার ছিল। জনপথের ফুটপাথে চট পেতে যে-সব প্রাচীন তিব্বতী দক্ষিণী পিতলের মূর্তি, টেরাকোটা মূর্তি, কাঠের মূর্তি বিক্রী হয়, যা আমি নিত্যই দেখি, সেগুলির মধ্যে আগের দিন একটি বিচিত্র মূর্তি দেখেছিলাম। এ মূর্তি আমি আগে আর চোখে দেখি নি। মূর্তিটি শিব ও শিবানীর বিহার অবস্থার মূর্তি। রাত্রে দেখে ঠিক সুষমার পূর্ণ আস্বাদন পাই নি। দাম বেশী বলেছিল বলেই না-দেখে কিনি নি। আমার ট্যাক্সিওয়ালা বন্ধু উধম সিং আমাকে আর একদিন রাত্রে একটি মূল্যবান কথা বলেছিল। উধম সিং ট্যাক্সিওয়ালা বটে কিন্তু ওর সঙ্গে আমার পরিচয়ের মধ্যে একটি প্রীতি-মমতার স্রোত ফল্গু-ধারার মত বিদ্যমান। আগে যখন কনস্টিট্যুশন হাউসে থাকতাম তখন থেকে ওর সঙ্গে পরিচয়। একটু বিচিত্রভাবে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন কারুর ইচ্ছেতে (যে জনকে দেখতে পাইনে) এর সূত্রপাত। অবশ্য সেটা আমারই মনগড়া। সে বিবরণ থাক। উধম সিং এমনি ভাবে একদিন রাত্রে মূর্তি কেনার সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমার কাছে সেদিন টাকা বেশী ছিল না, তাই না-কিনে ফিরে তার ট্যাক্সিতে বসতেই বলেছিল, বাবুজী, তুমি না কিনেছ ভালই করেছ।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কেন বল তো ?

—বাবুজী দেখিয়ে, আপনি যে এ চিজ কিনছেন, কেন কিনছেন ? ও চিজটির সুরতের জন্যে কিনছেন তো ? তা রাত্রিকালে বাবুজী বুড্‌ঢিতে রঙ মেখে এইসা সুরত বানায়—ঝুটা সুরত—যা ধরবার উপায় থাকে না। গাছকে মানুষ মনে হয়, চোর 'ছিপাকে' দাঁড়িয়ে থাকলে আঁখসে মালুম হয় না। সূরযনারায়ণ থাকতে এ ফাঁকি চলে না। কাল দিনে দেখে কিনো। হার জিতের আপসোস থাকবে না।

সে কথাটি ভাল লেগেছিল, কথাটা মেনে চলি। তাই কাল রাত্রে মূর্তিটি দুর্লভ বা অসচরাচর হলেও কিনি নি।

বেলা পাঁচটা। এপ্রিলের বেলা পাঁচটায় দিল্লীতে রোদ উত্তাপ কলকাতার সাড়ে তিনটে চারটের মত। ওখানে নেমে মূর্তিটি দেখছি, কিনছি। হঠাৎ পিছন থেকে মৃদুস্বরে কেউ বললে, হ্যালো, ইজ ইট রিয়ালি ইউ ওল্ড ম্যান, মাই ফ্রেণ্ড ?

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, আর কেউ নয়—রৌশন। মনে হল রৌদ্রে খুব ঘুরেছে। দেখেও খুশী হই নি। সেদিন দাদাসাহেবের ওখানে ওই সব শুনে খুশী হবার কথা নয়। তবুও একটু হেসে বললাম, ইয়েস। কিন্তু তুমি কোত্থেকে ?

—আসমানসে নেহি। পথে পয়দলে হাঁটতে হাঁটতে। তোমার মত ট্যাক্সিতেও নয়।

—ভাল। চলেছ কোথায় ? ভাল আছ ?

—যাব আর কোথায় ? এই কাজ শেষ হল। এবার একটু ঘুরে আস্তানায় ফিরব।

—কি কাজ করছ এখন ? নতুন প্লে ?

—না, না, না। ও আমার কাজ ঠিক নয়। ওটাতে একটা চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম। ভাগ্য মন্দ। আর—থাক সে সব। আমি আসলে এই সব নিয়েই কাজ করি। এই সব কিউরিয়ো, আর্ট ট্রেজার। নিজে একটু আধটু ছবি-টবি আঁকি। আর বিদেশী

টুরিস্ট এলে তাদের গাইডের কাজও করি, সঙ্গে সঙ্গে এই সব জিনিষও বিক্রী করি। একদল ইংরেজ এসেছে, তাদের কুতুব তোঘলকাবাদ ওই দিকটা দেখিয়ে নিয়ে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে এই ফিরছি। কিন্তু তুমি এই সব জিনিষ কেন বুঝি? হাঁ—হাঁ—হাঁ, দাদাসাহেব সেদিন বলছিলেন বটে। তা কিনছ? এদের সঙ্গে দর করতে পার?

—তা জানি নে। এ সব জিনিষে ঠকা জেতার হিসেব করি নে। কবলে কেনাও যায় না। তা ছাড়া দিল্লীতে তো জিনিষের দর কুতুব-মিনারের মাথায় চড়ে বসে থাকে।

—সিঁড়ি আছে কুতুবমিনারে, টেনে নামিয়ে আনতে হয়। সর, আমি দেখি। ওরা আমাকে খুব চেনে। তোমাকে কত দাম বলেছে? চল্লিশ?

—পঁয়তাল্লিশ।

—হায় পরমাত্মা! তুমি নিশ্চয় এর আগে এদের কাছে বেশী দামে জিনিষ কিনেছ, না হয় তো দু'তিন দিন এটার জন্যে এসে দর করে যাচ্ছ?

—সেটা সত্যি। কাল রাত্রে বলেছিল চল্লিশ। আজ বলে পঁয়তাল্লিশ!

—আচ্ছা।

বলে সে মূর্তিটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। বললে, নাও, দাম বল।

মুখের দিকে তাকিয়ে সে হেসে বললে, বলেছি তো?

—না, না। উনি আমার দোস্ত। ঠিক দাম বাতাও।

—চালিশ!

রৌশন মুখে কিছু বললে না শুধু তিনটে আঙুল দেখালে।

—নেহি, নেহি হোগা।

—হোগা। হো গেয়া। এক দো তিন। বাস্ করো।

তিরিশ টাকাতেই কিনে দিলে রৌশন। এবং জিজ্ঞেস করলে, এনিথিং এল্‌স্‌?

—নো, থ্যাঙ্কস।

—আচ্ছা। তা হলে, চল কফি হাউসে কফি খাইয়ে দাও।

—তারপর?

—তারপর—? না বাসায় আর যাব না। সাতটায় ফিরতে হবে হোটেলে। ডিনারের পর ওরা যদি কোথাও যেতে চায় তবে ব্যবস্থা করতে হবে। এইখানেই খানিকক্ষণ ঘুরব। বন্ধু মিলতে পারে। পার্কে বসব। কি ফের কফি হাউসে ঢুকব।

কফি খেতে বসে হঠাৎ সে বললে, তোমায় আমি একটা জিনিষ দেখাব। দেখ তো।

তার বড় ধরনের ভ্যানিটি ব্যাগ বা ছোট হাতব্যাগটি খুলে বের করলে ছোট একটুকরো কাঠ এবং একটি পেন্সিল চক।—দেখ তো।

অবাক বা বিস্মিত হয়ে গেলাম বলব না, সাধারণ জিনিষ—এ দেখেছি। কিন্তু সাধারণ যা বাজারে মেলে, দেখা যায়, তার থেকে ভাল। কাঠের টুকরোটি পালিশকরা, তার উপরে খুদে লালকেল্লার ছবি আঁকা। খোদাই দাগের উপরে হাতীর দাঁতের মত কোন সাদা জিনিষ দিয়েছে যাতে ঠিক হাতীর দাঁত বলেই মনে হয়। কোন সস্তা হাড়ও হতে পারে। আর পেন্সিল চকটি নীল রঙ মাখিয়ে তার উপর সুন্দর একটি মেয়ের ছবি। রঙীন।

সে বললে, ইয়ে দিল্লী আর ইয়ে ময় হুঁ। বল, আমার মত হয় নি?

প্রশ্ন করলাম, তুমি করেছ?

—তোমার ভাল লাগলে, আমি করেছি; না-লাগলে, আমি করি নি। হাসতে লাগল।

—না ভাল লেগেছে। সত্যিই ভাল লেগেছে। রাখ।

—তুমি রাখ। খুশী হয়ে দিচ্ছি। এসব আমি ওই টুরিস্টদের

জন্যে করে রাখি। ওদের সকলকে যাবার সময় দিই। বিজ্ঞাপন বলতে পার।

—কিন্তু আমার কাছে তোমার বিজ্ঞাপনের দরকার নেই।

—তা হলেও ধর, এ দুটো দিয়ে মনে মনে বলছি, ফরগেট মি নট।

তার পরমুহূর্তেই বললে, নেইই বা কেন? এতে তোমার মনে হবে আমি শুধু রঙীন ফানুস নই। তা ছাড়া তুমি ওই সব জিনিষ কেনো, মনে কর ক্লায়েণ্ট তৈরি করছি।

আজ ভারী ভাল লাগল রৌশনকে। মনে হল, মানুষ কখনও রঙীন ফানুস হয় না। কিছু বস্তু থাকেই। বাসায় ফিরে এলাম। পকেট থেকে ওদুটোকে বের করে দেখলাম পেন্সিল চকটা দুখানা হয়ে ভেঙে গেছে। কিন্তু ছবিটা গোটা আছে। চকটা ঠিক মাথার উপর থেকে ভেঙেছে।

চারদিন পর; মনে হল ছবিটা দুখানা হয়ে ভাঙলেই ভাল হত। সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে গেল।

সেদিন জনপথের উপর বড় হোটেলগুলোর মধ্যে একটায় গিয়েছিলাম বম্বের এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি গত রাত্রে ফোন করেছিলেন। শরীর ভাল নেই, থাকলে তিনিই আসতেন আমার বাসায়। ইস্ট জার্মানী, পোল্যাণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া চষে ফিরেছেন, ধকল অনেক গেছে; শরীর খারাপের দোষ কি?

লিফ্‌টে তিনতলায় উঠে করিডর ধরে চলেছিলাম। বেলা তিনটে হবে, লোকজন নেই। হঠাৎ একটা দরজা খুলে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। সামনে খানিকটা দূরে, তবু চিনতে পারলাম সে রৌশন। বেরিয়েই সে হন্‌হন্ করে চলে আসছিল। ওদিকে পিছনে দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটি সাদা চামড়া ছোকরা। সে যেন তাকে

ধরবার জন্যে অগ্রসর হল। লম্বা পা ফেলে ডাকলে, ইউ! ইউ! ডু ইউ হিয়ার?—ইউ!

রৌশন দাঁড়ায় নি। আমাকে সামনে দেখেও না। সে পালাচ্ছিল। বিদেশী ছোকরা লম্বা পা ফেলে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে রুখে বললে, মাই মানি। রূপেয়া দেও হামারা!

আমি তখন প্রায় কাছে এসে পড়েছি। বেশী হলে হয়তো পনের বিশ ফুট তফাতে। রৌশনের মুখ আমার দিকে। চোখ ফিরিয়ে সে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা তার মত প্রগল্‌ভার মুখেও জোগাল না। ছোকরাটি তার হাত ধরে বললে, তোমাকে আমি ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যাব। সমস্ত কথা বলব। ইউ ড্যাম চীট! লোক ঠকানো তোমার পেশা। তুমি জান, ম্যানেজারকে বললে এ হোটেলে ঢোকা তোমার বন্ধ হয়ে যাবে।

রৌশন যেন কাঠের পুতুল হয়ে গেছে। এমন সে হতে পারে তা আমি ভাবতে পারি নি। পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিলাম। টাকার কথা এবং যেভাবে সে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে, যেভাবে ওই বিদেশী উদ্ধত যুবক উত্তেজনায় তার পথ রোধ করেছে তাতে আভ্যন্তরীন কুৎসিতপনা নির্লজ্জভাবে দাঁত বের করে হাসছিল। কাছে পৌঁছতেই গন্ধতেও প্রকাশ পেল। মদ্যগন্ধে কয়েক ফুটের মধ্যে বাতাস সংক্রামিত হয়ে উঠেছে।

রৌশন মাথা হেঁট করে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে।

আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। রৌশনকেই ডাকলাম, হ্যালো! রৌশন?

বিদেশী ছোকরা চোখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল। মুখে চোখে অসহিষ্ণু ঔদ্ধত্য রেখায় রেখায় ফুটে উঠল। দিল্লীর গরমে চড়া রোদে মদ্যের ক্রিয়াও বোধ করি মাত্রা ছাড়িয়েছিল। সে বললে, ওয়েল জেন্টেলম্যান—

আমি প্রস্তুত ছিলাম, প্রত্যাশা করছিলাম কিছুটা। বললাম, ইয়েস জেন্টেলম্যান!

—অনুগ্রহ করে যদি তুমি নিজের কাজে যাও তো আমি খুশী হব। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে, কাজ আছে।

চট করে জবাবটা এসে গেল অর্থাৎ ভেবেচিন্তে নয়। ওই জবাবটাই এল তাই বললাম, আমার ওর সঙ্গে তোমার কাজের চেয়েও জরুরী কাজ আছে। আমি ওকে খুঁজতেই এসেছি।

—তোমার কাছে ও টাকা নিয়ে এনগেজমেণ্ট রাখে নি—না কি?

আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। একজন পানোন্মত্ত বিদেশী এই দেশের একটি মেয়ের, সে যেই হোক, যাই হোক তার পরিচয়, চরিত্র, অপমান করবে, তার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে অপমান করবে সে সহ্য হল না। বলে উঠলাম, তুমি জান, তুমি কি বলছ?

—নিশ্চয় জানি।

—না। জান না। জান, রৌশন আমার ধর্মকন্যা। সী ইজ মাই অ্যাডপটেড ডটার। আই কল হার মাই লিট্‌ল্ মাদার।

—ওঃ, গৌরবের ধর্মকন্যা তোমার—

—শাট আপ! আই সে! আমি এই হোটেলের সমস্ত ইণ্ডিয়ানকে ডাকব এবং বলব, তুমি এমনি জঘন্যভাবে এদেশের মেয়ের অপমান করছ।

এবার ছোকরা চমকাল। এটা সে ভাবে নি। চমকে আমার দিকে তাকালে। আমি বললাম, কি করেছে রৌশন যে তুমি এমন কথা বলছ? আমি শুনেছি, তুমি টাকার কথা বলছিলে। ফিরে চাচ্ছিলে টাকা।

—হাঁ, ও আমার কাছে একশো টাকা নিয়েছে।

রৌশন এবার বললে, কিছু মূর্তি সংগ্রহ করে দেবার জন্য একশো টাকা দিয়েছিল কিন্তু সে মূর্তি এখনও পৌঁছয় নি। ও—।

আমার ব্যাগে টাকা ছিল। আমি বের করে একশো টাকার একখানা নোট তার হাতে দিয়ে বললাম, যাও, চলে যাও। একটা

কথা শুধু স্মরণ রেখো, উপকার হবে। ভিন্ন দেশে যখন যাবে তখন সে দেশের মেয়েদের সব থেকে বেশী শ্রদ্ধা সম্মান দিয়ো। যাও।

রৌশনকে বললাম, যাও, বাড়ি যাও। তোমাকে খুঁজে আমি হায়রান। যাও দেরী করো না।

রৌশন নীরবে মাথা হেঁট করে চলে গেল। ওর শরীর থেকেও মদের গন্ধ বের হচ্ছিল। হতভাগা মেয়ে ভাগ্যের নামে হতভাগ্যের পিছনে উন্মত্তের মত ছুটেছে।

যতক্ষণ সে লিফ্‌টে না চড়ল ততক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

একশো টাকা যাওয়ার জন্য মনে আক্ষেপ ছিল না। সে চলে গেলে আমি ওপ্রান্তের দিকে অগ্রসর হলাম। প্রায় শেষ প্রান্তে বন্ধুর ঘর।

পাঁচ

ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল।

বাসার দরজায় নেমেছি। রাস্তার ধারে বড় গাছগুলির তলার অন্ধকার থেকে কে উঠে এল। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছিল; ট্যাক্সি থেকেই নজরে পড়েছিল কিন্তু সে নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। গরমের দিন—গরমের দিন কেন—শীত বা গ্রীষ্ম যে কালই হোক, সাউথ অ্যাভেন্যুর দু'পাশের ছোট পথে এবং ঘাসওয়ালা মাঝখানের জায়গায় সভ্য মানব মানবীরা ঘুরে বেড়ান। এদের ছোট ছেলেদের ব্যাডমিন্টন থেকে ক্রিকেট চলে; মাঝে মাঝে ফুলের বেড; তার চারদিকে পশ্চিম অঞ্চলের তাজা-স্বাস্থ্য টকটকে-রঙ, রঙীন পোশাক পরা বাচ্চারা টলতে টলতে ঘুরে বেড়ায়। দাঈ—মডার্ন কথায় আয়ারা, প্যারাম্বুলেটর ঠেলে। মাঝে মাঝে সাহেবী পোশাক পরা (কোট অবশ্য গলাবন্ধ) বা পাজামা শেরওয়ানী পরা কেউ চামড়ার দড়ি হাতে হন্‌হন্ করে হাঁটেন, পিছনে চলে অ্যালশেশিয়ান।

মেয়েদের পোশাক আশীভাগ শাড়ি। কিছু সালোয়ার পাঞ্জাবি। মজুর মজুরনীরা ঘাগরা কাঁচুলি ওড়না পরে কিন্তু তারা সকালে কাজে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে। কোন মেয়ে এখানে গাছে ঠেস দিয়ে বসে থাকলে কোন প্রশ্নই জাগে না।

মেয়েটি উঠে এসে দাঁড়াল। সে রৌশন।

চিত্ত কিন্তু আমার প্রসন্ন হল না। সে বললে, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি।

উত্তর দিলাম না।

সে বললে, হোটেল থেকে বরাবর এখানে এসেছি।

এবার বললাম, ঠিকানা কোথায় পেলে?

—হোটেলের নীচেতলায় এসে ফোন গাইড থেকে দেখে নিয়েছিলাম

—আর কোন দরকার আছে?

—আছে।

কি বলব? কয়েক পা নীরবে হেঁটে বললাম, এস

'না' কথাটা বলতে পারলাম না কিন্তু মনে খুব, খুব কেন—আদৌ সায় ছিল না। বাসায় ঢোকা না-পর্যন্ত সেও কোন কথা বলে নি। ঘরে ঢুকে বসবার আসন দেখিয়ে বললাম, বস।

বসে সে বললে, এক গ্লাস জল খাব।

দিল্লীর সংসার আমার চাকর নিয়ে। চাকরকে ডেকে বললাম, জল দে এক গ্লাস।

তার কথা কি জানি। কোনমতে একটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। অথবা একশো টাকা দিয়ে তাকে অপমান থেকে বাঁচিয়েছি যখন তখন সে প্রত্যাশা করেছে আরও দশ বিশ টাকা কি আর বের না হবে?

জলের গ্লাসটা একনিশ্বাসে শেষ করে সে বললে, আঃ, বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

একটু অপেক্ষা করে বললাম, একেবারে সরাসরিই বলে ফেললাম, ধন্যবাদ দিতে এসেছ ?

—না।

—তবে ?

একটু চুপ করে থেকে বললে, সেই তোঘলকাবাদ থেকে তুমি আমার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাতে চেয়েছ। আমি পাতাই নি। আজ—

মুখ তুলে তাকিয়ে সে হাসলে। সংসার বিচিত্র। অথবা মূর্খের মেলা। একটি ভালো কথা বললেই মন্দ মানুষকে ভালো মনে হয়। পিছনের সব মন্দ কথা ঢাকা পড়ে যায়। আশ্চর্য, আমি প্রসন্ন হয়ে উঠেই বললাম, মা হলে আজ থেকে ?

—না। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ও নাড়ল।

আমার ভুরু দুটি কুঁচকে আবার কপালের শিরায় টান ধরাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সে ওই কয়েক সেকেণ্ড থেমে ঘাড় নাড়া বন্ধ করে বললে, তুমি আজ বলেছ আমি তোমার ধরমবেটী, অ্যাডপটেড ডটার। আজ থেকে তুমি আমার পিতাজী, আমি মেয়ে।

ব্যাস। ওইটুকু বলেই সে উঠল যেন তীরের মত। এবং চট করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আমি বেরিয়ে এলাম, ডাকলাম, রৌশন! রৌশন!

সে প্রায় ছুটে দুড়দুড় শব্দ করে নেমে চলে গেল। সিঁড়ি নেমে ধরবার সময়ও ছিল না, উচিতও হত না। লোকে মনে করত, অন্ততঃ কিছু মনে করতে পারত। আমি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ডাকতে গেলাম, কিন্তু তাও পারলাম না। দেখলাম সে হন্‌হন্‌ করে চলছে; চলছে নয় ছুটছে—বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। অনেকটা দূর পর্যন্ত তাকে দেখা গেল। দাঁড়িয়েই রইলাম। যাক, এ আবেগ আর কতক্ষণ ? হয়তো যতক্ষণ পানীয়ের প্রভাব আছে ততক্ষণ। সে প্রভাব এখনও আছে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। অথবা

আজকের রাত্রিটা, যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ। সকালে যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন সব, বিগত দিনের সব মুছে যাবে। আমি জানি এ দিক আর ও মাড়াবে না। আমাকে দেখলে অন্য পথে হাঁটবে।

মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণে আমার পারঙ্গমতায় বা সার্থকতায় আমি খুশী হলাম। রৌশনের মত মেয়ের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম। বাংলাদেশে এমন মেয়ে বিরল না হলেও অল্প। তবে দু'জন একজনকে দেখেছি, জানি; এই দিল্লী শহরেও একজনের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। তবে ঘনিষ্ঠতা কম। এমন ক্ষেত্রও কখনও হয় নি। সুতরাং এ অনুমান অভিজ্ঞতা থেকে নয়, এ অনুমানে আমার বুদ্ধির গৌরব করতে পারি। রৌশন সম্পর্কে আমার অনুমান পনের আনা মিলে গেল।

সাতদিনের মধ্যে রৌশন এল না। সাতদিন পরে একখানা চিঠি এল। এক আনা গরমিল হল ওই চিঠিখানা। পথে হঠাৎ দেখা হলে সে চলে না গিয়ে কথা বললে বলতাম, এক পয়সা গরমিল। ইংরিজীতে লিখেছে। হাতের লেখাটি ভাল। কিন্তু ভাষাটা গোলমেলে। কথাবার্তা রৌশন ইংরিজীতে চালায়, বেশ চালায়, অনর্গল বলে, থামে না কিন্তু ভুল থাকে অনেক। আমার থেকেও ভুল থাকে। চিঠিখানায় যেন বেশী অসুবিধায় পড়েছে। কথা বলা আর লেখা, সে চিঠি হলেও, এক নয়। লিখেছে—

ডিয়ার ফাদার, (মাই ডিয়ার নয়)

সেদিন তোমাকে ফাদার বলেছি, ওটা মেনে নিয়েছি। পরে অবশ্য মনে কেমন কেমন ঠেকেছে, খুঁতখুঁত করেছে কিন্তু তুমি আমার জন্যে যা করেছ তারপর যদি বলি ওটা ভুল হয়েছে, নিতান্ত-ভাবে সে কালে সেই মাতালের বাদশাকে হাতী বিক্রী করবে কিনা

জিজ্ঞাসা করার গল্পের মত কাণ্ড—তা হলে ঠিক হবে না। সেদিন পানীয়ের প্রভাব আমার উপর ছিল সে তুমি জানতে পেরেছিলে। তা ছিল, কিন্তু আমার সচেতনতাও ছিল, এটা নিশ্চয় ওই হোটেলের বারান্দায় তুমি লক্ষ্য করেছ। তা না-হলে তো এমন দৃশ্য বা ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটত না। খুব বেশী কথা বলব না। তবে তুমি সেদিন আমাকে তো জেনে বুঝেই তাকে বলেছিলে—রৌশন আমার ধরম-বেটী—আমাকে খারাপ জেনে, মন্দ জেনেই কথাটা অসংকোচে বললে। তারপর তোমাকে ফাদার বলতে সত্যিই ইচ্ছে হয়েছিল, পানীয়ের প্রভাবও তার সঙ্গে মিশেছিল। আবেগটা বেশী হয়েছিল। না-হলে ঘণ্টা তিনেক গাছে ঠেস দিয়ে তোমার বাসার সামনে বসে বসে ঢুলতে পারতাম না। পরে মন খুঁতখুঁত করলেও ওটাকে মেনে নিয়েছি। আমি মন্দ মেয়ে, এ ব্যাড গার্ল জেনেই তুমি কথাটা বলেছ। সুতরাং আমার দিক থেকে কি আপত্তি থাকবে? আমার বাবা তো ছিল। সে থাকলে বরং তার সঙ্গে ঝগড়া হত কিন্তু তোমার সঙ্গে তো ঝগড়া হবে না। তোমার কাছে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। বন্ধু হলে যেতাম। ফাদার বলেছি বলেই যাব না। তবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার সত্যিই উপকার করেছ। আমি কৃতজ্ঞ। তার থেকে বেশী—তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ। তোঘলকাবাদে প্রথম দেখা হওয়ার সময় যে জেদটা ধরেছিলে, যাতে আমি বার বার না বলে ঘাড় নেড়েছি, তা আমাকে স্বীকার করিয়ে ছেড়েছ। কথাটা দাদাজীকে বলো না। বললে যায় আসে-না কিছু, তবে বলো না। টাকাটা ফেরত দেবার ইচ্ছে আমার খুব। হাতে নেই। টাকায় কুলোয় না আমার। তবে হলে, দেব। ইতি—

রৌশন

আমি একটু হাসলাম। কি করব আর? মনটা খুশী ছিল। অনুমান সত্য হয়েছে বলে।

এরপর কয়েক দিনই ওই তিব্বতি বা নেপালীদের ফুটপাথের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকলাম বিকেলে কিন্তু রৌশনের দেখা পেলাম না।

এর কয়েক দিন পর, মে মাসের আট দশ তারিখ হবে, দাদা-সাহেবের সঙ্গে দেখা হল।

দাদাসাহেব বললেন, রৌশনকে মনে পড়ে তো? ছ্যাট স্পয়েল্‌ড গার্ল!

—হ্যাঁ। কি হল তার?

—তাজ্জব কি বাত, আজ এরোড্রোমে গিয়েছিলাম। দেখলাম সেখানে, বললে কাশ্মীর যাচ্ছে। আরে বাপ! মনে হল আমেরিকান গার্ল! স্ন্যাক, ব্লাউজ পরে, গগল্‌স চোখে, বাপ রে! তোমাকে নমস্তে জানিয়েছে।

ক'জনের কাছে টাকা নিয়েছিল রৌশন?

এর ক'দিন পরই চলে এলাম দিল্লী থেকে।

কলকাতায় এসে নিজের কাজে মগ্ন হয়েছিলাম। হঠাৎ এর মধ্যে রৌশন এসে দাঁড়াল। রৌশন সশরীরে নয়, ডাক মারফত তার বিচিত্র পরিচয় এল। পিওন হাঁকলে, ইনসিওর! ইনসিওর? দেখলাম, রৌশন ইনসিওর করে একশো টাকা পাঠিয়েছে। ইনসিওরটা দিল্লীর ঠিকানা ঘুরে এখানে এসেছে।

সঙ্গে ছোট্ট চিঠি। ফাদার, কিছু টাকা পেয়েছি। বিশ্বাস করো, বাই অনেস্ট মীন্‌স্। তোমার টাকাটা ফেরত পাঠালাম। কাশ্মীর এসেছি। তোমার জন্যে কি নিয়ে যাব বল তো? রৌশন।

সশরীরে রৌশন এল তিন মাস পর। সেপ্টেম্বর। তিন মাস পর দিল্লী গিয়েছিলাম। রৌশনের কথা মনে অবশ্যই হয়েছিল। সে নিজের কন্যা হলে তার ব্যবহারে, তার দুর্নামে যে দুঃখ পাবার কথা

তা তো আমার হবার কথা নয়; হয়ও নি। সেই কারণে কনট সার্কাসে যখন গিয়েছি তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে লক্ষ্য করেছি রৌশন আছে কিনা জনস্রোতের মধ্যে। জনপথে সব থেকে বেশী ভিড়। রেফ্যুজিদের দোকান, ফুটপাথে পেপার পাল্পের পুতুল, কাগজের ফুল, তামা পিতলের ওয়ালপ্লেটের নকল, পেপার পাল্পের ওয়ালপ্লেট, ফিরিওলা। ওরই মধ্যে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের ভারতীয় কুটিরশিল্পের কেন্দ্র, যেখানে কাপড়, কাগজের পুতুল থেকে কাশ্মিরী কার্পেট, পিতলের মিনা করা টেবিল, সোনা রূপোর কাজকরা শাল যার দাম আড়াই তিন হাজার পর্যন্ত, তার ওধারে তিব্বতী নেপালী দক্ষিণী মূর্তির ফুটপাথের বাজার, যেখানে রৌশনের ঘোরাফেরা প্রায় নিত্য বলে আমার ধারণা। সেখানেও কদিন সে আছে কিনা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু পাই নি। চার পাঁচ দিনের পর রৌশন সম্পর্কে একেবারেই আর চিন্তা ছিল না।

আট দিন পর হঠাৎ টেলিফোনে সাড়া পেলাম।

—হ্যালো—ইজ ইট··· ?

—ইয়েস।

—শঙ্করজী ?

—হাঁ।

—ফাদার! বাপুজী!

—রৌশন!

—হাঁ। তুমারা খারাপ লেড়কী। বদমাস লেড়কী। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসির আমেজ।

—ভাল আছ ?

—খারাপ যারা তারা তবিয়তে খারাপ থাকে না বাপুজী।

—ভাল। কি খবর বল।

—তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কাল যাব ?

—কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার তোমার সঙ্গে দেখা করা।

—এস। কাল এস। এবেলা বারোটা পর্যন্ত ওবেলা চারটে থেকে ছটা।

—আচ্ছা। নমস্তে।

—নমস্তে।

—নেহি। তুমি আমাকে নমস্তে বলবে কি? তুমি পিতাজী। ধরমবাপ। বল, জিতা রহো, আনন্দ রহো।

—তাই বলছি। জিতা রহো, আনন্দ রহো।

কিন্তু বিচিত্র, না, বিচিত্র কেন, বিচিত্র মেয়ে রৌশন, তার পক্ষে এইটেই স্বাভাবিক, সে এল না। কোথায় কোন নবতর আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে কে বলতে পারে? তার পরদিনও না।

দুদিন পর, বেলা তখন একটা, আমি স্নান সেরে আমার শোবার ঘরে পূজোয় বসেছি, বাইরে দরজায় কলিং বেলে সাড়া উঠল। শোবার ঘরে আমার পূজোর পাট। পূজোর সময় দরজা বন্ধ করে বসি এবং যে কেউ আসুক তাকে হয় বসতে হয়, নয় ফিরে যেতে হয়। আমার লোককে এ বলা আছে। এবং এই অসময়ে কেউ আসে না কারণ দিল্লীতে এটা লাঞ্চের সময়।

চাকর দরজা খুললে, বন্ধ করলে। হয়তো কাগজপত্র হবে।

মনকে ধমক দিলাম। যে হবে, যা হবে, তুমি ওদিকে ছুটছ কোথায়? যাকে ডাকছ তাকে ডাক, ভাব।

মন চতুর। তার উত্তরের অভাব হয় না। সে বলে, যদি সেই এসে থাকে।

—না। তাঁকে ডাকছি মনে। বাইরে এলে তাঁকেও বসতে হবে।

মন ফিরে এল পূজোয়। পূজো সেরে, পূজোর কাপড় ছেড়ে, একটা জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। বসবার ঘরে এসে

দেখলাম রৌশন দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার সিগারেট, সে ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ওয়ালপ্লেট দেখছে নিবিষ্টচিত্তে।

ডাকলাম, রৌশন!

সে একটু চমকে উঠল। ফিরে আমাকে দেখে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে টিপে নিবিয়ে বললে, এসবে তোমার এত শখ? এটা কোথায় কিনলে?

রৌশনের মুখের এমন চেহারা আমি কখনও দেখি তো নাই-ই, কল্পনাও করতে পারি না। মুখে একটা কি যেন ছায়া ফেলেছে বা ফুটে উঠেছে যেটা বিস্ময় বা জিজ্ঞাসা বা বিমুগ্ধতা যে-কোন একটা হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে মমতা আছে, তাতে ভুল নেই। আমি ওর একটি নতুন পরিচয় যেন পেলাম। বললাম, সে কথা পরে বলছি, তার আগে আর একটা কথা বলব। মুখে আমার নিশ্চয় প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

সেও একটু হাসলে, বোধ হয় প্রতিবিম্বের মত। কারণ সে হাসিও তার প্রসন্ন এবং চাতুর্যবর্জিত। বললে, ফরমাইয়ে।

—তুমি সত্যিকারের শিল্পী। সে আজ এই মুহূর্তে তোমার মধ্যে বেরিয়ে এসেছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে, শিল্প আমি ভালবাসি।

—সে তোমার ওই ওয়ালপ্লেটখানা ভাল লাগাতেই বুঝেছি। ওর একটি ইতিহাস আছে। কিন্তু তার আগে তুমি দেখ, ওই জিনিষ আরও আছে। চল ওই ঘরে।

এ জিনিষ আরও ক'খানি ছিল। ঠিক একই জিনিষ নয়। ওই একই রকমের। কাশ্মীরের পুরনো আমলের ডিজাইন—পুরনো শৈলী।

ওয়ালপ্লেট—পিতলজাতীয় ধাতুর তৈরী, ঢালের মত ঢঙ। আকার সচরাচর দু'রকমের, একটা গোল অন্যটা ডিম্বাকার। এর উপরে রিলিফে কাহিনীমূলক ছবি ফোটানো থাকে। হরপার্বতী,

রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-সরস্বতী ইত্যাদি এ ছাঁচের উপর ফেলে ছোট্ট হাতুড়ির নিপুণ মৃদু ঘায়ে ঘায়ে ফুটিয়ে তোলে। মূর্তির চারিধারে একটি পরিমণ্ডল রচনা করে সূক্ষ্ম বাটালি হাতুড়ির কাজ। এখন অর্থাৎ আধুনিক কালে এ শিল্পের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কাহিনীর দিক দিয়ে ওমর খৈয়ামের কবি ও সাকী, সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে, আবার সংযুক্তাহরণ পর্যন্ত এসেছে এবং ওই পরিমণ্ডলের কারুতে অনেক আধুনিক ঢঙ এসেছে। বলতেই হবে চোখে চটকদার হিসেবে এই আধুনিকগুলিই বেশী ঠেকে, চোখকে টানে। এগুলির বিক্রীও বেশী। পুরনো আমলের ঢঙের মধ্যে সেকেলে ভাব আছে, হয়তো বা গ্রাম্য মোটাও বলে অনেকে। প্রতিটি প্লেটের কাছে সে ঠিক ঐভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আমি একটু বিস্মিত হলাম এবার। বললাম, এগুলি কি খুব ভাল? খুব দুর্লভ মনে কর?

—আমার খুব ভাল লাগছে। আমি এ শিল্পকে খুব ভাল করে জানি। আমি নিজেই তৈরি করতে পারি। তা ছাড়া—

—তুমি পার?

—হ্যাঁ। তুমি দেখেছ আমার হাতের কাজ। তোমাকে লালকেল্লার ছবি আঁকা কাঠটা দিয়েছিলাম। এও আমি পারি। আমার সঙ্গে শ্রীনগরের খুব ভাল জিনিষ রয়েছে, ডাল লেকে শিকারাতে মাঝি আর মাঝিনী। তোমার জন্যে এনেছি আমি, দেখাচ্ছি এখুনি। কাজ খুব ভাল। কিন্তু সে নয়, এগুলি একবাড়ির তৈরি আর পুরনো বাড়ির হাত।

—তোমার দৃষ্টি তো খুব তীক্ষ্ণ!

—আমি চিনি যে! এ সবের সঙ্গে—। তারপরই সে সচেতন হয়ে উঠল আমার খাওয়া হয় নি বলে। সত্যই, আমার খাবার সময় চলে যাচ্ছিল। স্নান করে পূজো শেষ হলেই ক্ষিদে যেটুকু পাবার পেয়ে যায়। প্রাণায়াম শেষ হলেই যান্ত্রিক নিয়মে পিত্তরস ক্ষরিত হয় অভ্যাসফলে।

চাকর রামও দাঁড়িয়েছিল দরজায় কিন্তু বলতে সে কিছু পারছিল না। রৌশনের উপর সে বোধ হয় চটেছিল। দরজায় একটা কড়ায় লাগানো চাবিসুদ্ধ তালাটা নিয়ে মোচড়াচ্ছিল, এর মধ্যে চাবিটা খুলে মেঝের উপর পড়তেই তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল রৌশন। এবং বুঝতেও পেরেছিল যে লোকটি বিরক্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় কারণও অনুমান করেছিল যে, খাবার সময় যাচ্ছে। সে তার কথা অসমাপ্ত রেখে বললে, ওঃ তোমার লাঞ্চের আমি দেরী করে দিচ্ছি বাপুজী। থাক ওসব কথা, চল তুমি খেয়ে নাও।

—তুমিও এস রৌশন। বাপুজী বলছ, আমার ধরম-বেটী তুমি, আমার সঙ্গে বাংলাদেশের ডাল ভাত চচ্চড়ী খাবে। ডোণ্ট সে—নো।

হাসল সে। এবার তার হাসিতে তার স্বাভাবিক রঙ ধরেছে। বললে, ডাল ভাত নেহি বাপুজী, শুধু চচ্চড়ী।

—কেন? কম পড়বে ভাবছ?

—না, তা ভাবি নি। তবে সেটাও ভাববার কথা। আমি তোমার মন্দ বেটী, বদমাস বেটী, খারাব লেড়কী হলেও আমি খেয়ে তোমাদের কাউকে উপোস করাব এমন ঠিক নই। তবে কথা তা নয়। আমি তো দুপুরে লাঞ্চে ভাত রোটী ভরপেট খাই নে। দিল্লীতে রেওয়াজই তাই—সেকালওয়ালারা খায়, একালওয়ালারা খায় না। ওই থোড়াথুড়ি, কিছু তরকারি, কিছু গোস, একখানা রোটী—এই খাই। কাজ করব কি করে?

সে বসে গেল একখানা চেয়ার নিয়ে।

তরকারি খুব মন্দ হল না। ভাজা, মাছের ঝোল, আলু ছেঁচকি, স্যালাড—তার উপর রাম পাঁপর ভেজে দিলে।

রৌশন বললে, একটু কফির জন্যে বলে দাও।

বেকুব হলাম, কফি তো নেই: রাখি নে ওটা। সে বললে, তবে চা।

খেতে খেতে বললে, জান বাপুজী, কাশ্মীর ক্র্যাফট্‌সের আড়ৎ।

শাল, গালিচা, দোপাট্টা এ সব তো বিশ্ববিখ্যাত। ওখানকার লোকে পুরুষ পুরুষ ধরে করে আসছে। দাদুর সুইয়ে নাতি সেলাই করে নকশা তোলে, দাদির সুই কাঁইচি পায় নাতির বউ, নাতনী। এক এক ঘরে এক এক নকশা আছে। সোনার তারের কাজও হয়। ঠিক তেমনি আছে কাঠের কাজে হরেকরকম চিজ—বাক্স, তিনপাইয়া, ট্রে দেখেছ। তেমনি আছে পিতলের জিনিষের উপর নকশায় মিনায়। ঘরের দেমাক হচ্ছে ওই নকশা নিয়ে। যে ঘরে যে নকশার কাজের নাম ছোটে তার কারিগরির যেটুকু সব থেকে কিম্মতের কাজ তার কৌশল সেই বাড়িতেই লুকোনো থাকে। সহজে বের হয় না। হলেও, ওই বাড়ির কাজের যে-কদর সে-কদর অন্যের কাজে ঠিক তেমন, এমন কি ভাল হলেও হয় না। ধর আমি তোমার বেটী, এই কাজ শিখে শ্বশুরালের ঘরে গিয়ে সেখানে এই জিনিষ তৈরি করলাম। কিন্তু তবু ওর কদর হবে না। লোকে, মানে, যারা এই সব নিয়ে কারবার করে তারা তাদের ঘরের সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে দেয়। ট্রেডমার্ক বলতে পার। ওটা কেউ নকল করে না। তোমার দেওয়ালের সব প্লেটগুলি একবাড়ির। সব প্লেটে এক চিহ্ন। এ কথা সকলে জানে না। জানে যারা খুব ভাল করে এদের সঙ্গে মিশে কারবার করেছে বা এদের নিজেদের লোকেরা।

তারপর থেমে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, রাগ করো না বাপুজী, একটা সিগারেট খাব। তুমি খাচ্ছ, গন্ধে আমার মন খাবার জন্য ছটফট করছে! আমি বড্ড সিগারেট খাই। আই অ্যাম ইওর ব্যাড ডটার!

—সে কি! খাও। এই নাও। আমারই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, তুমি—

—হ্যাঁ, আমি মুখের সিগারেট তখন ফেলে দিয়েছিলাম। আপনা-আপনি ফেলে দিয়েছিলাম! ঠিক যখন প্রথম সিগারেট খেতে শিখি তখন যেমন আমার নিজের বাপকে দেখে ফেলে দিয়েছি তেমনি ভাবে।

সে সিগারেট ধরালে। ধোঁয়া ছেড়ে বললে, আমি সত্যিই মন্দ মেয়ে। সত্যিই মন্দ। আই স্মোক, আই ড্রিংক, অ্যাণ্ড—।

চুপ করে ছাদের দিকে চেয়ে রইল।

আমি কথাটা ঘোরাবার জন্য বললাম, ও সব বাত্ ছোড়ো রৌশন। এখন যে কথা হচ্ছিল তাই বল।

—ওই ক্র্যাফ্‌ট্‌সের কথা। ওগুলো তোমার পুরনো বাড়ির কাজ বটে, পুরনো ঢঙ আছে কিন্তু তৈরি হাল আমলের। আজ-কালকার।

আমি খুশী হয়ে উঠলাম। সত্যিই খুশী হলাম। এমন একটি আত্মসর্বস্ব বিলাসিনী, যাকে রঙ্গিণী বললে অত্যুক্তি হয় না তার মধ্যে এমন একটি গুণ আবিষ্কার করে খুশী হলাম। বললাম, সাবাস! ওয়াণ্ডারফুল! তুমি ফুলমার্ক পেয়ে গেছ।

সে হাসলে। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, ছেলেবেলা এসব আমি যে দেখেছি। আমার বাপ ছিল শিল্প-পাগল লোক, ছোটখাটো সরদার আমীর। মা ছিল না। আমি গ্রামে ইচ্ছেমত ঘুরতাম। এই সব কারিগর-লোকের বাড়ি গিয়ে বসে থাকতাম। কাজ দেখতাম। বলতাম, আমাকে শেখাও, আমি শিখব। লোকে আমীরের বেটী বলে ভালবাসত; শেখাত। তারা জানত, আমি তো আর এ-সব কাম করে খাব না।

থেমে-থেমে কথাগুলি বলছিল সে। মনে মনে যেন সেই সব ছবিগুলি ভেসে উঠছিল এবং তাড়াতাড়ি কথা বলে ছবিগুলিকে মুছে দিতে বা সিনেমার ছবির মত পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না।

হঠাৎ বললে, জান, ছেলেবেলা থেকেই আমি মন্দ। দুরন্ত। আমাদের দেশে তো ঘোড়া অনেক। জাঠদের ঘরে ঘোড়া আছে। মাঠে চরে বেড়ায়। সেই ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতাম। তারপর একটু থেমে বললে, একবার মেলায় গিয়েছিলাম বাপকে না বলে। এমনি

একটা ঘোড়ায় চড়ে। সেখানে হঠাৎ হুজ্জৎ বাধল। ওঃ, সে যে কি বিপদ! জান, এক ছোকরা শেষে আমাকে বাঁচায়। নিজে একটা ঘোড়ায় চড়ে আমার ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে ছোটাতে ছোটাতে নিয়ে আসে। আমার কি বিপদ! এই পড়ে যাব, এই পড়ে যাব মনে হচ্ছিল। কিন্তু কষে ঘোড়ার গলাটা ধরে আর রেকাবে পা টান করে রেখে এসে পৌছেছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইলাম দুজনেই। মেয়েটি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল সেদিন। যেদিন হোটেল থেকে মদ-খাওয়া অবস্থায় এসে আমাকে ধরমবাপ বলে ছুটে পালিয়েছিল সেদিনও এমন হয় নি।

কিছুক্ষণ পর আমি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলাম, তোমার বাবা বেঁচে আছেন?

—নাঃ।

—কি নাম ছিল তাঁর?

—নো, নো ফাদার! বলতে নেই। আই অ্যাম এ ব্যাড গার্ল।

তারপরই বললে, তবে—, তবে তোমাকে বলতে পারি। বলা উচিত। একটু হাসলে এবং বললে, আমার পিতাজীর নাম—শঙ্করজী।

বুঝলাম আবহাওয়াটাকে লঘু করে তুলতে চাচ্ছে। আমি হাসলাম।

সে হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, অয় বাপ! দু ঘণ্টা হয়ে গেছে! নাও তোমার জন্যে কাশ্মীর থেকে ওয়ালপ্লেট এনেছি। যা বলছিলাম।

তার কাঁধের ঝোলা থেকে একখানি চমৎকার প্লেট বের করে টেবিলের উপর রাখলে। চমৎকার, অতি সুন্দর জিনিষ। কাশ্মীর এম্পোরিয়ামে অবশ্যই থাকবে কিন্তু আমার চোখে পড়ে নি। ডাল

লেকে বা কোন জলস্রোতের উপর মাঝি ও মাঝিনী। তারা অবশ্য কাশ্মিরী। সুতরাং ডাল লেক বলা যায়। দাম দেখলাম ওতে আঁটা একটি কাগজের টুকরোয় লেখা, চল্লিশ টাকা কত নয়া পয়সা। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, এ যে অনেক দাম রৌশন!

—ভাল জিনিষের দাম বেশী হবেই বাপুজী!

বলে আরও কয়েকটা টুকরো টুকরো ছোট খেলনা রাখলে সে। তারপর উঠল। আমার সিগারেটের বাক্স থেকে আর একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বললে, তুমি আমার বাপুজী তো?

বললাম, জরুর। বুঝলাম সে উপহার দেবার দাবি খুঁজছে।

সে বললে, আমি তোমার গরীব বেটী।

—কেন? গরীব কেন? তুমি বড় বাপের মেয়ে, তুমি—

—বিলকুল বেচে খাপ ফকীর হয়ে মরে আমায় পথে বসিয়ে গেছে।

চুপ করে রইলাম। দুঃখ অনুভব করছিলাম রৌশনের জন্য। রৌশন নিজে থেকেই বললে, আমি সত্যিই গরীব। জীবনে অভাব মিটল না। অভাব যার মেটে না সে গরীব নয় তো কি!

একটু চুপ করে থেকে বললে, ওই ছোট জিনিষগুলি তোমার গরীব বেটির উপহার। আর ওই প্লেটটার দাম তুমি আমাকে দিয়ো। কেমন?

বললাম, বস। আমি দেবার কথাই ভাবছিলাম।

সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, বাপুজী, আমার বাপুজী, সত্যিকারের বাপ তুমি।

সে বসল।

আমি উঠে শোবার ঘরে গেলাম টাকা আনবার জন্য। হাসতে হাসতেই গেলাম। মনে মনে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ব্যঙ্গ করছিলাম। আমি কিনা ওর ওই সব গরীব বেটী ইত্যাদি কথাগুলির ভনিতায় বোকার মত ভাবছিলাম মেয়েটি সবিনয়ে বলছে, বাপুজী,

আমি গরীব, তা হলেও তুমি বাপুজী। তুমি যেন এ নিতে সঙ্কোচ করো না। হায় ভগবান! কিছুদিন আগে রৌশনের চরিত্র বিশ্লেষণ করে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম। যাক্! রৌশন একশোটা টাকা ফেরত দিয়েছে যখন তখন চল্লিশটে টাকা নিয়ে যেতে পারে।

টাকা নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম সে আবার সেই ওয়ালপ্লেটটা দেখছে। সেই তেমনি মুগ্ধ বিস্ময় বা মমতা বা এমনি একটা কিছুর সঙ্গে দেখছে। আমি বললাম, ওটা কি এত ভাল, রৌশন? নেবে তুমি ওটা?

—নাঃ। সে ঘাড় নাড়লে।

—নাও। তোমার টাকাটা নাও।

টাকাটা হাতে দিয়ে বললাম, ওটার দাম কত জান?

—কত? পনের ষোল টাকা। বেশী দিয়ে থাক তো কুড়ি। যারা বেচে তারা ওই রকমই বলে। কুড়ি। দেয় পনেরতে।

—আমি কুড়িই দিয়েছি।

—কিছু বেশী দিয়েছ।

—ওটা আমার সব সময়ে সব ক্ষেত্রেই বিশেষত্ব।

চকিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বললে, আমার প্লেটের দামের কাগজটা কিন্তু জাল নয় বাপুজী। হাসলে সে।

—ও আমি যাচাই করব না। ওটার দাম যা দিলাম তার থেকে অনেক বেশী। ওর সঙ্গে তোমার কাহিনিয়া রইল। ওই ওয়াল-প্লেটটারও তাই। ওর ভারী মজার ইতিহাস আছে।

সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে।

আমি বললাম, বস না। চায়ের সময় হল। চা খেয়ে যাও। রাম! চা তৈরি কর।

বললাম, যার কাছে কিনেছি—

ছয়

তার নাম উধম সিং। ট্যাক্সি ড্রাইভার। ট্যাক্সি নাম্বার—। উধম সিং ট্যাক্সি ড্রাইভার হলেও আমার দোস্ত। সংসারে এক একজনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে নিবিড় যোগাযোগ ঘটে যায়। তার কার্য-কারণ খুব খতালে অবশ্যই বুঝতে পারা যায় কিন্তু খতাতে ইচ্ছে করে না। সে খতানো পুতুল ভেঙে উপকরণ দেখার মত ব্যাপার।

আমি গাছের বাঁকাচোরা ডাল কেটে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে পুতুল তৈরি করি। এমনি একটা বাঁকা ডাল যেটা দুটো বাঁকে বাঁকা এবং যার হাত পায়ের মত চারটে ফ্যাংড়া আছে তা থেকে একটা ফকীর তৈরি করেছি। মাথায় মুখে তুলোর চুল দাড়ি পরিয়ে, কাগজ সেঁটে তাতে চোখ মুখ এঁকে, লুঙ্গি পরিয়ে, মালা পরিয়ে হাতের মত ফ্যাংড়া ডালের ডগায় একটা বাটীর মত এঁটে দিয়েছি, চমৎকার লাগে। যে আসে সেই দেখে খুশী হয়। সেদিন এক বন্ধু এসে ওটা নেবার মতলব করতেই টেনে সাজপোশাক খুলে দিলাম, ডালটা বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বন্ধু চলে গেলে ওটাকে আবার সাজালাম। এবার খরচ করলাম, খাটলাম বেশী। বেশী মনোহারি করে তুললাম। না-করে পারলাম না। উধম সিংয়ের সঙ্গে দোস্তি এমনি ব্যাপার। তুলনা যদি খুঁটিয়ে মানে ধরে করা যায় তবে হয়তো মিলবে না কিন্তু ধরণটা এমনি। আলাপ বা দোস্তটিকে মনে হয়েছিল অদৃষ্ট-নিয়ান্ত্রত বা বিধি-অভিপ্রেত।

রৌশন বললে, বড় ভাল কথা বল তুমি বাপুজী।

বললাম, ধন্যবাদ। খুশী হলাম শুনে। এখন শোন।

দিল্লীতে নতুন আসছি। কালকা মেলে এসে সন্ধ্যার সময় দিল্লীতে নেমেছিলাম। উনিশ শো পঞ্চান্ন সাল; স্টেশন থেকে—নম্বর ট্যাক্সিতে এসেছিলাম; নোট-বইয়ে নম্বরটা টোকা আছে। কারণ

ঘটেছিল। ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় আমার নীলরঙের পাওয়ার-ওয়ালা চশমাটা ফেলে গিয়েছিলাম। হোটেলে নেমেও খেয়াল ছিল না। কালকা মেল আসে সন্ধ্যের পর। নীলরঙের চশমার প্রয়োজন হয় নি। আধ ঘণ্টা বাদে ট্যাক্সিওলা এসে সেটা দিয়ে গেল।

—বাবুজী এটা তোমার ?

—হ্যাঁ।

—লিজিয়ে ; নমস্তে।

কিছু বকশিস দিতে গিয়েছিলাম, নেয় নি। ওর সঙ্গে ট্যাক্সি পর্যন্ত এসেও নিতে রাজী করাতে পারি নি। ট্যাক্সির নম্বরটা নোট করে নিয়েছিলাম আর জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপকা নাম সাব ?

—উধম সিং, বাবুজী।

বলে সে ফের নমস্কার করে চলে গিয়েছিল।

তারপর কয়েকবার দিল্লী এসেছি, তা দশ বারো বার হবে। ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। মনেও ছিল না ওর কথা। গত বছর দিল্লী এলাম, এবার এখানে কয়েক মাস অন্ততঃ পাকাপোক্তভাবে থাকতে হবে। কনস্টিট্যুশন হাউসে ঘর পেয়েছিলাম। এসেছিলাম রাত্রের প্লেনে। ওখানে যে ট্যাক্সি নিয়েছিলাম সেটা বড় ট্যাক্সি। তারপর কাজে গেলাম। কনস্টিট্যুশন হাউসের সামনে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম।

পরের দিন ছিল শনিবার, কাজ ছিল না, ছুটির দিন। সকালবেলা যাব সোনেরিবাগ, চা খাব সেখানে। গত রাত্রে টেলিফোনে নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম, শুধু চায়ের নয়, বন্ধুর বাড়িতে দুর্লভ ক্যাকটাসের ফুল ফুটতে শুরু করেছিল রাত্রে। বন্ধু বলেছিলেন, রাত্রেই ফুটে যাবে, সকালেই আসবেন যেন। নিশ্চয় আসবেন।

ট্যাক্সি নিলাম ; চেপে মনে হল, কালকের সেই লোক, সেই গাড়ি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

বন্ধুর ওখানে গিয়ে দেখলাম, ক্যাকটাস রাত্রে ফুটে ভোরবেলা ম্লান হয়ে গেছে। বন্ধুও ম্লান মুখে বললেন, বেয়াকুফ বইনা গেলাম মশয়। কাল রাত্তিরে আট দশজনকে টেলিফোন করছি। তাঁরা আইয়া পড়ব।

ঘণ্টাখানেক গল্প করে বন্ধুর ক্লার্ককে বললাম, একটা ট্যাক্সির জন্য ফোন করে দিন।

ক্লার্ক টেলিফোন করে এসে বললে, স্ট্যাণ্ডে এখন ট্যাক্সি নেই, এলেই পাঠিয়ে দেবে।

বসে রইলাম। মিনিট দশেক পর বন্ধুর নিমান্ত্রত কয়েকজন এসে হাজির হলেন ; ট্যাক্সির মিটার ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘণ্টা বাজার শব্দ হয়, সেই শব্দ উঠতেই আমি বেরিয়ে গিয়ে বললাম, রোখো।

দেখলাম, সেই ড্রাইভার !

এবার সে হেসে বললে, নমস্তে বাবুজী।

হেসে আমিও বললাম, নমস্তে।

সে বললে, কনস্টিট্যুশন হাউস ?

—হাঁ।

বিকেলে বেরিয়েছিলাম একজনের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে। গিয়েছিলাম বাজারে। জিনিষ কিনে দোকান থেকে বেরিয়েই দেখলাম খালি ট্যাক্সি এবং সেই ট্যাক্সি। হাত তুললাম, দাঁড়াও।

গাড়িতে উঠতেই সে বললে, এ তো তাজ্জব বাবুজী। একদিনে এই তিনবার। এ তো বড় হয় না।

সে 'কভি' শব্দ ব্যবহার করেছিল। আমি হেসে বলেছিলাম, ধরে নাও নসীবের খেলা !

সে খুশী হয়ে বলেছিল, ইয়ে তো ঠিক হ্যায়। সচ্ বাত।

এটা নেহাত কাকতালীয় বললে সে খুশী হত না। সে চলতে লাগল। খানিকটা দূর এসে আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছ ?

—কেন? কনস্টিট্যুশন হাউস।

—না। আমি যাব কালীমন্দিরে, বিড়লা মন্দিরের পাশে।

সে বললে, কেন বললে না আগে? কতটা ঘুর হল বল তো।

বললাম, তা হোক। একটু ঘোরা তো হবে, চল!

গাড়ী আটকে রেখে কালীমন্দির থেকে ফেরার সময়, তখন সাড়ে সাতটা বাজছে, আমার ইচ্ছে হল জনপথে ওই তিব্বতীদের ফুটপাথের দোকান ঘুরে যাব। টেবিলের উপর নটরাজের একটি মূর্তি রাখতে অনেকদিন থেকে ইচ্ছে। বললাম, আমাকে একবার জনপথ যেতে হবে, ওখানে চল।

নামলাম। ভাড়া দিতে গেলাম, সাড়ে চার টাকা উঠেছিল, সে বললে, না এক টাকা কম দাও তুমি।

—কেন?

—আমি ভুল করে কনস্টিট্যুশন হাউস গিয়ে ঘুরিয়েছি তোমাকে।

বললাম, সে আমার ভুল। তোমার নয়।

—নেহি; জরুর আমার ভুল। আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল কোথায় যাবে।

—সেও ঠিক, আবার আমিও বলি নি কোথায় যাব। এটা আমারও কসুর এটাও ঠিক। নাও তুমি।

নিলে সে। কিন্তু বললে, না বাবুজী, এ ঠিক নেহি।

আমি পূর্বদিকের ফুটপাথে নেমেছিলাম, ভাড়া মিটিয়ে পশ্চিম-দিকে এসে উঠলাম। দাঁড়ালাম তিব্বতীদের দোকানে। হেজাক বাতি জ্বেলে দোকান পেতেছে। কয়েকজন বিদেশিনী রয়েছে। এটা নাড়ছে ওটা নাড়ছে। আমি দাঁড়িয়ে দর দেখতে শুরু করলাম। বাগবাজারে খড়ঘাটে ইলিস কিনতে গিয়ে ওটা শিখেছি। পাঁচ জনে মাছের দর হাঁকলে একটা দর পাওয়া যায় যেটা দিলে ঠকেছি এমন আপসোস হবে না। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, দরও

করলাম কিন্তু কিনলাম না ; হাতে তুলে আলোর কাছে ধরেও মনে হল যেন ঠিক রূপটা বুঝতে পারছি না। রেখে উঠে বললাম, নাঃ। কাল দিনে আসব।

পিছন থেকে শুনলাম কেউ বললে, ঠিক বাবুজী। ওহি ঠিক হ্যায়। রাতের আলোর জলুসে মেকী জিনিষ খাঁটি বলে চলে যায়। রাত্রে মানুষকে ঘুমুতে হয়। ওটা হল জানোয়ারের খেলার কাল। ওদের চোখ রাত্রে জ্বলে। কাল দিনে কিনো।

ফিরে দেখলাম, সেই ড্রাইভারটিই পিছনে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বলছে। বিস্মিত হলাম, তুমি ?

সে বললে, হাঁ। গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, তুমি এখানে দাঁড়ালে। তাই দাঁড়ালাম। তুমি তো ফিরবে, তোমাকে নিয়েই যাব। তুমি লোক ভাল বাবুজী। নাও ওঠো গাড়িতে।

বললাম, আরও কিছু কিনব যে। দুটো অ্যাশট্রে। ফুটপাথে নেপালীরা কাঠের উপর পিতলের কাজ করা অ্যাশট্রে বিক্রী করে তাই কিনব।

—বেশ তো চল।

ঠিক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেই দর করে কিনে দিলে। একটি ছোট নটরাজের মূর্তিও তার কাছে ছিল। সেটাও কিনলাম। সে বললে, ওর দর তুমি কর, ওর কদর আমি জানি না।

লোকটিকে ভাল লাগল। গাড়িতে উঠে স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা না বলে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে এক আপিসে বড় ছোট চাকরি করবার জন্য যেন অন্যায় বা অশোভনভাবে আলাদা হয়ে যাচ্ছি, সকলের হয় কি না জানি না তবে আমার হয়। আমার ভাবপ্রবণ বলে অপবাদ আছে। অনেকে ইংরিজীতে নিজেদের দিকে দায় কমিয়ে নিয়ে বলেন 'টাচি'। যাই হোক, কথা খুঁজছিলাম। প্রথম যে কথাটা খুঁজে সবাই পায়

সেইটে আমিও পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি সাহেব?

—আমার নাম উধম সিং।

একমুহূর্তে নামটার ধ্বনি মনের তারে একটা পরিচিত ধ্বনির সুর তুললে। মেঝেতে কাঠ পড়লে কিছু হয় না কিন্তু ধাতুর কিছু পড়ে শব্দ উঠলে জানালার লোহার শিকে একটা সুর বয়ে যায়। কানেও ধরা পড়ে, হাত দিলে তো বেশ বুঝা যায়। ঠিক তেমনি ভাবে।

—উধম সিং?

—জী হাঁ।

চুপ করে রইলাম, ওই সুরটা মনে বাজছিল। হঠাৎ মনে পড়ল। প্রথম মনে পড়ল নীল চশমাটা। তারপর সব।

এবার বলে উঠলাম, তাজ্জব কি বাত সাহেব!

—কিঁউ?

—আজ বিকেলে ওষুধের দোকানের সামনে তোমার গাড়িতে যখন তিসরিবার চড়লাম তখন তুমি বললে, তাজ্জব কি বাত। তা তার চেয়েও তাজ্জবের কথা উধম সিংজী—আমি যেবার প্রথম দিল্লী আসি, দিল্লী স্টেশন থেকে হোটেল পর্যন্ত তোমার গাড়িতে এসেছিলাম। তোমার গাড়িতে আমি একটা চশমা ফেলেছিলাম। তুমি আধঘণ্টা বাদ ঘুরে এসে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলে। আমি তোমাকে কিছু দিতে চেয়েছিলাম, তুমি নাও নি। তোমার নামটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলেছিলে উধম সিং। ট্যাক্সির নম্বরটাও লিখে নিয়েছিলাম নোট বইয়ে। হ্যাঁ, এই নম্বরই তো! মনে পড়ছে তোমার? তোমার ট্যাক্সিতে চড়ে দিল্লী ঢুকেছি। আজ এইভাবে তিনবার দেখা হয়ে তোমার গাড়ি চড়লাম, আলাপ হল। যেন কেউ বন্দোবস্ত করে করিয়ে দিলে। তাজ্জব কি বাত নয়?

'—জরুর বাবুজী, জরুর; জরুর তাজ্জবের কথা।

বললাম, আমরা দোস্ত হয়ে গেলাম সিংজী।

—দোস্ত ?

—হাঁ দোস্ত।

—আপকা মেহেরবানী।

—নেহি, উপ্পরওয়ালে কি মর্জি।

—বাস্ বাস্ ! ভগবান কা মর্জি !

ভগবানের মর্জিতে উধম সিংএর সঙ্গে আলাপ। উধম সিং আমার দোস্ত। এই লোকটিই এইসব জিনিষ আমাকে এনে দিয়েছে। সে আমাকে দিল্লী দেখিয়েছে। কনসিটুশন হাউসে যতদিন ছিলাম ততদিন তার গাড়িতে রোজ বিকেলে ঘুরেছি। দিল্লীর ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে নিয়ম আছে যাত্রী এলে বা টেলিফোনে ডাক এলে যার পালা সেই যাবে, অন্য কেউ যেতে পায় না। উধম সিংকে বলা ছিল, সে বিকেল-বেলা রাস্তা থেকে মিটার ডাউন করে এসে একেবারে কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকত এবং আমার ঘরে এসে বলত, নমস্তে বাবুজী। আমি তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতাম।

রাম এসে চা এবং কিছু খাবার নামিয়ে দিয়ে গেল। গল্পে ছেদ পড়ল। রৌশন চুপচাপ শুনে চলেছিল। কখনও চোখ বন্ধ করে, কখনও জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের বড় গাছটার বা তার উত্তর পাশের খোলা ঠাঁইটুকু দিয়ে ওপারের বাড়িগুলির মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। ওদিকে বাঁদিকে অল্পদূরে, সফদরজঙ, ডাইনে কয়েক মাইল দূরে পালাম এরোড্রোম। এই সময়টুকুর মধ্যেই একখানা জেট, একখানা ভাইকাউণ্ট ঘুরপাক খেয়েছে। উঠেছে কি নেমেছে বলতে পারব না। সিগারেট সে তিনটে ধরিয়েছে কিন্তু একটাও পুরো সিগারেট খায় নি। ওর হাতে ধরা অবস্থাতেই প্রদীপের শিখার কালির মত আঁকাবাঁকা রেখাতে নীলচে ধোঁয়ার

শিখা তুলে পুড়েই গেছে। মধ্যে মধ্যে চোখে লেগে জল টেনে বের করলে ফেলে দিয়ে জুতোয় চেপে দিয়েছে, নয়তো একটা টান দিয়েছে। অ্যাশট্রেটা সামনে থাকতেও তাতে ফেলতে তার খেয়াল হয় নি। বোধ হয় মেঝেতে ফেলে পায়ে চেপে সিগারেট নেবানো ওর অভ্যাস। স্থান কাল সম্পর্কে যে সচেতনতা থাকলে সতর্ক হয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলতো সেটা গল্পের মধ্যে মগ্ন হয়ে হারিয়ে ফেলেছিল সে।

রৌশনকে বললাম, চা খাও। নাও, খাবার নাও।

রৌশন চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে হাত নেড়ে জানালে খাবার সে খাবে না।

—কেন?

—নাঃ। এমনি। ভুখা নেহি হুঁ।

—একটা কিছু নাও। মেয়ে খাবে না, বাপ খাবে কি করে?

হেসে দু'তিনটে বেগুনি তুলে নিয়ে খেয়ে বললে, ভাল হয়েছে। কিন্তু তারপর বল। কি হল তোমার উধম সিংয়ের?

—হবে আর কি? আছে, এখনও ট্যাক্সি চালায়। কিন্তু আমি চলে এলাম ওখান থেকে এখানে। সাউথ অ্যাভেন্যু। এখন ট্যাক্সি এখানকার স্ট্যাণ্ড থেকে আসে। ওর সঙ্গে বড় দেখা হয় না। তবে এদিকে যখন খালি ট্যাক্সি নিয়ে ঘোরে তখন জানালা খোলা, বারান্দার পর্দা তোলা দেখলে এসে দেখা করে যায়। চা খায়। গল্প করে।

—আসল কথাই তো বললে না। এইগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা।

—বলি নি বুঝি? ও। ও-ই এগুলি এনে দিয়েছে আমাকে।

—সে কোথা থেকে যোগাড় করলে?

—তুমি ঠিকানা চাও? তোমার ঠিকানা দাও, তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। এসব তার বাড়ির তৈরি। তার স্ত্রী দুটি ছোট ছেলে আছে বুড়ো মা আছে। তারা বাড়িতে তৈরি করে।

একটু হেসে বললাম, বললাম না, তুমি ফুলমার্ক পেয়েছ। এই কারণেই বললাম। কাশ্মীরে বাড়ি ছিল। জম্মু আর পাকিস্তানের বর্ডার ঘেঁসে। সেখানে পুরুষানুক্রমে এইসব করত। ও নিজে ড্রাইভারি করত একজন মুসলমান মার্চেন্টের। দেশভাগ, কাশ্মীরের গোলমালের সময় খেতে না পেয়ে চলে এসেছিল দিল্লী, নাইন্টিন ফিফ্‌টি কি ফিফ্‌টি ওয়ানের সময়, সাল তারিখ তো মনে নেই ওর। এখানে এসে ট্যাক্সি ড্রাইভারি করছে।

চায়ের কাপটা সে ধরেই ছিল, খায় নি বিশেষ। ওই দু' এক চুমুক দিয়েছিল। এবার সেটা নামিয়ে দিয়ে বললে, এদের দারুণ অভাব। তবে জান বাপুজী, সে বোধটা এদের নেই।

—সেইটেই একটা আশীর্বাদ!

—তুমি তাই বল?

—তা বলি। অভাবকে ভাল বলি নে কিন্তু অভাবের কষ্টকে সহ্য করে জিন্দিগীর লড়াইকে ভাল বলি।

—উই ডিফার। তা এর—

—কি?

—বড় ছেলে-টেলে নেই? মানে যে সাহায্য করতে পারে? কি বড় মেয়ে? তা হলে এইগুলো করতে পারে বেশী। থেমে গিয়ে আবার বললে, এদের দুঃখ আমি জানি বাপুজী।

—নাঃ। বড় ছেলে মারা গেছে।

চুপ করে চেয়ে রইল জানালা দিয়ে।

আমি বলেই গেলাম, বড় মেয়েও একটি ছিল। সেও মরে গেছে।

ঘাড় নাড়ল সে। সে ঘাড়নাড়ার অর্থ হয় না। তবু নাড়লে। আর কিই বা করতে পারত? আমি বললাম, ঠিকানা দেবে? ওকে বলে দেব, এমনি ওয়ালপ্লেট তোমার কাছে দিয়ে আসবে!

—প্লিজ সেভ মি ফাদার। নো। প্লিজ। ওসব দুঃখীর দুঃখ

মোচন টোচন আমার কাজ নয়। আমি নিজেও দুঃখী। হয়তো ওদের থেকেও দুঃখী। আমার অভাবের দুঃখবোধ আছে। আজ আসবে, কয়েকটা টাকা দাও। কাল আসবে, কিছু ব্রাশ প্লেট কিনে দাও। পরশু বলবে, লোকে বলছে যা দাম দিচ্ছ তা কম দিচ্ছ। ওসব আমার সইবে না। পাঠিয়ো না তুমি।

বলে অনেকটা যেন হঠাৎ উঠে পড়ল —চললাম বাপুজী। অনেক সময় চলে গেছে তবে দিল খুশী হয়ে গেছে একটা এনগেজমেণ্ট গেছে, আপসোস নেই সন্ধ্যার এনগেজমেণ্ট ফেল করলে চলবে না।

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে হেসে বললে, দুপুরটায় আজ ফেলে-বেলার স্বপ্ন দেখলাম। ভারী মিষ্টি, ভেরী সুইট!

আবার একটু হেসে বললে, নমস্তে।

গগল্‌সটা চোখে লাগিয়ে সে বেরিয়ে গেল

রৌশন স্টাইল ভুলবে না। বেলা পড়ে গেছে, সন্ধ্যার আমেজ লেগেছে দিনের আলোয়, এখনকার এই গোধূলিবেলার আলোয় চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু রৌশন গগল্‌স না-পরে পথে বের হবে না।

ঘণ্টা দুয়েক পর; রাত্রি তখন আটটা। টেলিফোন বেজে উঠল।

প্রশ্ন করলে কেউ—নম্বর এটা?

—হ্যাঁ।

—আমি কি শঙ্করজীর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

—কথা বলছি।

—গুড ইভনিং স্যার। আমি একজন পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর কথা বলছি।

মনটা অবশ্যই ছ্যাঁৎ করে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল এই মন্দ মেয়েটিকে। এর পরই বোধ হয় টেলিফোনে তার গলা

শুনতে পাব, ফাদার, আই অ্যাম রৌশন, ইওর ব্যাড ডটার। প্লিজ হেল্প মি ফাদার।

নীরস কণ্ঠেই বললাম, বলুন কি প্রয়োজন আমাকে?

—আপনি কি কোন মেয়ে আর্ট ডীলারের কাছে কিছু জিনিষ কিনেছেন?

সন্দেহ হল, চোরাই মাল! যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করেই বললাম, কিনেছি একখানা কাশ্মীরী মেটাল ওয়ালপ্লেট।

—বোটম্যান অ্যাণ্ড হিজ ওয়াইফ।

—ইয়েস!

—জিজ্ঞাসা করতে পারি কত দাম দিয়েছেন?

—চল্লিশ টাকা অ্যাণ্ড সাম নয়া পয়সা।

—থ্যাঙ্ক ইউ সার! বলেই আবার বললে, আর একটা কথা।

—বলুন।

—ক'খানা কত টাকার নোট মনে আছে?

—হাঁ। অল ইন ফাইভ-রূপী নোটস।

—অনেক ধন্যবাদ স্যার। এই রাত্রে বিরক্ত করার জন্য মার্জনা করবেন।

—আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—নিশ্চয়!

—ঘটনাটা কি? অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে।

—নাথিং সিরিয়াস স্যার। আপনি বোধ হয় জানেন না এই মেয়েটির খুব সুনাম নেই। কয়েকবার আমাদের কাছ পর্যন্ত এসেছে। তবে আজ তার দোষ নেই। সেই একজনকে চড় মেরেছিল, তারপর সে তাকে মেরেছে; একটু বেশীই মেরেছে! তারপর চার্জ করেছে তার কাছে টাকা নিয়েছে বলে।

কথা ওখানেই শেষ হল।

আমি রিসিভারটা নামিয়ে রেখে একটু হাসলাম এবং একটা

দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললাম। রৌশন কথা বলে নি ফোনে কিন্তু কানের পাশে যেন শুনলাম সে বলছে, বাপুজী, আমি তোমার খারাপ বেটী, বদমাস বেটী!

রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। ওই কথাই মনে ঘুরল শুধু। বারবার মনে হতে লাগল এই বুঝি টেলিফোন বাজল! রৌশন ডাকবে।

—বাপুজী, আমাকে তুমি মাপ কর। আমি তোমার খারাপ বেটী।

আবার ভাবনা হল, ওকে থানায় নিয়ে যায়নি তো? ইন্‌স্‌পেক্টর বললে, কয়েকবারই ওকে আমাদের কাছ পর্যন্ত আসতে হয়েছে।

আজ? আজও হয়তো হাজতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। ছাদের দিকে চেয়ে আছে।

সাত

পরের দিন সকালে সে এল। প্রত্যাশা করি নি। আদৌও করিনি। বুদ্ধির বিচারে এরপর রৌশনের গতিবিধির যে ছক তাতে তার আড়ালে চলার ছক। পরমুহূর্তেই আমার ভুল ভাঙল। বুদ্ধি আমার সাধারণ বুদ্ধি। আমাকে যারা চেনে তারা যে বলে বুদ্ধি মোটা, সে তারা ভুল বলে না। রৌশনকে চিনতে আমার ভুল হয়েছিল, বুদ্ধির অঙ্কে গোলমাল হয়েছে সেখানে।

রৌশন আমার অনুমানের চেয়ে অনেক খারাপ মেয়ে এবং সে পাকা অভিনেত্রী। আমার ভুলটা সে বুঝতে পেরে সেই মত অভিনয় করে গেছে। কাল অভিনয়ের মেকআপ যখন খসেই গেছে তখন সে সে-সব ভাল করে মুছেই এসে দাঁড়িয়েছে।

তার মাথার সযত্নবিন্যস্ত চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। মুখে

কালো ছায়া পড়েছে, শুধু তাই নয় কপালে কালসিটে। গালে চড়ের দাগের চিহ্ন যেন এখনও মিলিয়ে যাবার যথেষ্ট সময় পায় নি। শিউরে উঠলাম। বিতৃষ্ণা বিরক্তির মধ্যেও বেদনা অনুভব করলাম।

সকল কথা যখন আজকে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করছি তখন এটুকু বুঝতে পারছি যে তার প্রতি গভীর অন্তরে একটি মমতা ছিল। যে মমতা সম্ভবতঃ মূর্খতার নামান্তর। অথবা তার সঙ্গে যেটুকু থাকা উচিত ছিল তার অভাব ছিল। মমতাকে বা হৃদয়াবেগকে যে শিক্ষা ও বুদ্ধির শৈত্যে জমিয়ে কঠিন করা যায় তা ছিল না। নইলে ওই সকালের আগের সন্ধ্যায় টেলিফোনে পুলিশের কাছে তার কথা শোনার পর ভাবব কেন? সেদিন সকালে তাকে দেখে তার জন্যে বেদনা অনুভব করেও বোধ করি প্রথমেই কঠিন হবার চেষ্টা করলাম।

বললাম, কোথা থেকে? ফ্রম পুলিশ লক-আপ?

সে তাকালে আমার দিকে। চাউনিতে সে কি ক্লান্তি! লাল হয়ে আছে চোখ দুটি। পাঞ্জাবের মেয়েদের চোখ বড় নয়। রৌশনের চোখ টানা চোখ। দু'পাশের সাদা ক্ষেতে লালচে আভা জেগে রয়েছে। একবার সন্দেহ হল, সে কি এই সকালেই—? ইচ্ছে করেই এগিয়ে গিয়ে সামনে কাছে দাঁড়ালাম যেন অসন্তুষ্ট হয়ে কৈফিয়ৎ নিতে এগিয়ে এসেছি। কিন্তু না। কোন গন্ধ পেলাম না।

সে মাথা নাড়লে, যার অর্থ—না।

—এখানে কেন এসেছ? ধন্যবাদ দিতে?

এবার তার কণ্ঠস্বর নির্গত হল, বললে, না।

—তবে?

একটু চুপ করে থেকে সে কোন উত্তর দেবার আগেই বলে দিলাম, যদি তোমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন থাকে রৌশন তা হলে বলে রাখি, আমি দুঃখিত।

সে একটু হেসে বললে, না, তার জন্যেও আসি নি। কিন্তু তুমি

কি আমাকে বসতেও বলবে না? না, চলে যেতে বলছ?

এমন শান্ত করুণ কণ্ঠ কখনও রৌশনের শুনি নি। তার কণ্ঠস্বর এবং তার ও শেষের প্রশ্ন আমাকে একটু অপ্রতিভ করলে। বললাম, বস।

বসল সে। তারপর বললে, তুমি আমার উপর খুব গোস্সা হয়েছ। হবার কথাই বটে। কিন্তু আমি কি তোমাকে বার বার বলি নি, আমি ব্যাড গার্ল। আমাকে মেয়ে বলেছ, আমার ধরমবাপ তুমি। আমি তোমার মন্দ মেয়ে।

এর যা জবাব তা আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু মন্দেরও একটা সীমা আছে রৌশন। তুমি এত উচ্ছৃঙ্খল এত মন্দ তা আমি জানতাম না।

সে মুখ তুলে আমার দিকে অসংকোচ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, তুমি বিশ্বাস কর বাপুজী, কাল আমি কোন মন্দ কাজ করি নি। কোন দোষ আমার ছিল না।

আমার অজ্ঞাতসারে আমার কপাল কুঁচকে উঠল। যখন উঠে গেছে তখন বুঝতে পারলাম। বলতে যাচ্ছিলাম, এই বিশ্বাস করতে বল আমাকে? কিন্তু এই বুঝতে পেরে সংযত করলাম নিজেকে।

সে বলেই চলেছিল, আমার সত্যকারের বাপ মায়ের দোহাই নিয়ে বলছি, তুমি আমার ধরমবাপ, তোমার দোহাই দিয়ে বলছি, ঝুট বাত আমি বলছি না। যেদিন হোটেলে আমাকে তুমি দেখেছিলে সেদিন আমি ড্রিংক করেছিলাম সেই বিদেশীর সঙ্গে। তাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়েছিলাম, সেদিন আমার দোষ ছিল। কিন্তু সেদিন তুমি নিজে থেকে এগিয়ে এসে তাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলে, আমার ধরমবেটী এ মেয়ে। সেই কারণেই কাল যখন পুলিশ এসে নির্দোষ আমাকে ধরলে, আমার ব্যাগের টাকা নিয়ে প্রশ্ন করলে, তখন সত্যি কথা বলেছিলাম। তোমার নাম

করেছিলাম। না-হলে তাও করতাম না। তাতে আমার যা হত হত।

—কি হয়েছিল কাল ?

—হয়েছিল। তার আগে বল তোমার মন শান্ত হয়েছে। না-হলে আমার চলে যাওয়াই উচিত হবে। কালকের নির্যাতনের চিহ্ন আমার মুখে চুলে ফুটে রয়েছে। আসবার সময় দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটায় হঠাৎ নিজের চেহারা আমার চোখে পড়েছিল। কাল আমার কোন দোষ ছিল না, আমি ড্রিংক করি নি। পুলিশ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ বলেই ছেড়ে দিয়েছে আমাকে, না হলে কখনও ছাড়ত না। তাদের খাতায় আমার বদনামের কালো দাগ মারা আছে। তারপর নিজের আস্তানায় গিয়ে সারাটা রাত জেগে শুধু কেঁদেছি। ঘুম আসে নি। চোখে মুখে তাও ফুটে আছে। সকালেও মন শান্ত করতে পারি নি। তাই এসেছি। মনে হয়েছিল—

বাধা দিলাম। বললাম, দাঁড়াও। সে থামলে বললাম, চা খেয়েছ ?

—না।

—কাল রাত্রেও কিছু খাও নি বোধ হয় ?

—খেতে বসেই তো বিপদটা ঘটেছিল। হোটেলে খাই তো। বাড়িতে তো ওসব ঝামেলা রাখলে চলে না। সবে একখানা রোটি ছিঁড়ে মুখে তুলেছি—। একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটল তার মুখে। এ বিষণ্ণ হাসি সেই হাসি যা কেবল নির্দোষ দণ্ডিত বা নিরপরাধ নির্যাতিতের মুখেই ফোটে। অতি নিষ্ঠুর ছাড়া সব মানুষকে সে-হাসির সম্মুখে বিষণ্ণ হতে হয়।

শুধু ওই বিষণ্ণতাই নয় তার সঙ্গে মমতা যা আমার দুর্বলতা এবং এমন ক্ষেত্রে জ্বরের অনুসঙ্গী উপসর্গের মত লজ্জাও আমার উপর প্রভাব বিস্তার করছিল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রামকে বললাম, রাম কিছু খাবার দে। কি আছে ? আর দুধ থেকে যদি ছানা

না-করে থাকিস তবে দুধটা দে কাচের গ্লাসে করে। আগে ওটাই দে।

রাম দুধটা গরমই করছিল ছানা কাটাবার জন্য। সে দুধের প্যানটা নামাতেই বললাম, দে, আমাকে দে।

নিজেই হাতে করে নিয়ে এলাম। টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বললাম, আগে এটা খাও। তারপর কথা শুনব।

দুধের গ্লাস দেখে সে আবার হাসলে। বললে—দুধ! সত্যিই তোমার কাছে আমাকে ছোট্ট মেয়ে বানিয়ে দিলে।

সস্নেহে বললাম, পি লেও বেটী!

দুধের গ্লাসে একটি চুমুক দিয়ে নামিয়ে রেখে বললে, বেশী গরম আছে।

—জুড়ুক।

জানালার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে, জান বাপুজী, বাপ মা সবারই থাকে, আমারও ছিল। তা—। থেমে গেল রৌশন।

—তুমি তো বলেছ তোমার বাপের কথা। মায়ের কথা অবশ্য বল নি।

মাথা নাড়লে সে। অর্থাৎ—না।

বললাম, তোমার মনে নেই, বলেছ তুমি। আমীর আত্মভোলা বাপের আদরের মেয়ে, ছেলেবেলায় মাতৃহারা—

—নেহি বাপুজী। ঘাড় নাড়লে সে শান্ত দৃঢ় ভাবে। আমি সে ঝুটা বাত বলেছি তোমাকে। বাপ আমার আমীর ছিল না। ছিল ওই উধম সিংএর মত গরীব জাঠ। ওই একই গাঁওয়ে আমাদের বাড়ি ছিল। পাশাপাশি, হ্যাঁ একদম পাশাপাশি বাড়ি ছিল। ওর মেয়ে ছিল। সেও আমার সাথী ছিল। তুমি বললে সে মরে গেছে। কাল সব শুনে ছেলেবেলার সব কথা মনে পড়ে গেল। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল বাপুজী। খুব খারাপ। উধম সিং এখানে থাকে, ট্যাক্সি

চালায় আমি জানি। ওরাও যেমন দেশ ছেড়ে এসেছিল আমরাও এসেছিলাম তেমনি। ওর মেয়ের নাম ছিল হরিপীতম, ভালো মেয়ে ছিল। ভালো মেয়ে সে বাঁচলো না। আমি জানতাম, বাঁচবে না। সংসারে শাস্ত্রে একটা ধর্মযুদ্ধ বলে কথা আছে। বাপুজী বল তো, ধর্মযুদ্ধ করে কেউ জেতে? জেতে না! সে মরে গেল। হরিপীতম! হরিপীতম।

দুধের গ্লাসটিতে এবার চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে খেয়ে শেষ করলে। তারপর জল খেলে। আবার বললে, হরিপীতম। আবার স্তব্ধ হল। আমার ওকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল না। থাক।

একটু পরে আবার বললে, আমারও একটা নাম ছিল। থাক সে বলব না। বাপ মা'র নামও বলব না। তারা বোধ হয় বেঁচে নেই। নাম বললে, তুমি কোনদিন উধম সিংকে বললে সে আমাকে চিনতে পারবে। হয়তো খুঁজবে। উধম সিংয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, মানে দেখেছে সে আমাকে পথেঘাটে। নিশ্চয় দেখেছে। চোখাচোখিও হয়েছে। অবশ্য আমার গগল্‌সের ভিতর দিয়ে। চিনতে সে আমাকে পারে না।

হাসলে। হেসে বলতে লাগল, কি করে চিনতে পারবে? এক গরীব জাঠের বেটী, দেহাতী, সেই দশ বছর বয়সে লম্বা বেণী ঝুলিয়ে, ছেঁড়া সালোয়ার পাঞ্জাবি, ময়লা দোপাট্টার নামে ন্যাকড়ার ফালি পরে যাকে দেখেছে তার এই মেমসাহেবী ঢঙে ছাঁটা চুল, দোকানে ড্রেস করা, এই শাড়ি এই ব্লাউজ, চোখে গগল্‌স, ইংরিজী কথা, জোয়ানী চেহারার বদলি, চিনবে কি করে বল? দেখ, দামী সালোয়ার পাঞ্জাবি, হীরা জহরৎ, বেণী হলেও সন্দেহ হত, ভাবত কেউ আমীর-টামীরের নজরে পড়ে এই বদলটা হয়েছে। দেশ ছাড়ার সময় আমার উমর ছিল দশ এগারো। তার সাত আট বছর পর সরকারী আর্টস ক্র্যাফ্‌ট্‌স থেকে কাজ শিখে এই পথে পা দি যখন তখন এই ভাবের বদল আর জোয়ানীর বদল দেখে চিনতেই পারেনি। আমিও

চেনা দিইনি। খারাপ আমি অনেকদিন আগেই হয়েছি অনেক আগে। ওই দশ এগারো বছর বয়সে। অথচ বাপ মা এমন ধার্মিক ছিলেন বাপুজী! সেই কথা মনে হয়ে গেল কাল; তোমার দেওয়ালে ওয়ালপ্লেট দেখে থেকে—।

চুপ করে গেল সে। গলা ধরে এসেছিল। একটু সামলে নিয়ে বললে, ওখানাতে আছে গৌরী মাঈ আর মহাদেওজী। আজকাল তো এসব বিলকুল মিথ্যে হয়ে গেছে। ওসবের দাম আর নেই। সত্যিসত্যি মানেও নেই কি মানে আছে? গাঁজা মদ খায় ঘরদোর নেই এমন যে লোক, তার নিন্দে শুনে কোন মেয়ের ঘরে যাওয়ার কি মানে আছে? ও ঘরের ওয়ালপ্লেটে রয়েছে রামসীতা। বল তো, সীতার আগুনে পুড়তে যাওয়া কে মানবে, কেন মানবে আজ? রাম বনে গেল বাবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে? তার কি মানে? কেন যাবে? একালে ছেলে বিদ্রোহ করবে। সীতার আগুনে পুড়ে রক্ষা পেয়েই শেষ নয়, শেষে বনে নির্বাসন! এ সতীত্বের কোন অর্থই নেই আজ। আমার কাছে তো নেইই। সেটা আমি ব্যাডগার্ল বলেই নয়—আমি সত্যিই ওগুলিকে মূর্খতা বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু তবু আমি কেমন হয়ে গেলাম ফিরে গেলাম সেকালে। তারপর তুমি উধম সিংহের নাম করলে, আমি চিনলাম। আমিই জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঘুরিয়ে ওর মেয়ে হরিপীতমের কথা। বললে সে মরে গেছে। মনটা কেমন হয়ে গেল। মনে আছে বলেছিলাম, পাথরের মত শক্ত দিল, ফাটলে তার ভিতর থেকে জল বের হওয়া সহজে থামে না। বড় বড় দরিয়া ধরে গেলে শুনেছি পাওয়া যায় ওই একটি বা দুটি পাথরের ফাটল। গোমুখী থেকে গঙ্গাজী বেরিয়েছে। সেখানে শুনেছি দুটি গর্ত আছে। আমার দিলে কাল ফাটল ধরেছিল। জল ঝরছিল। চোখ দিয়ে বের হতে চাচ্ছিল। তোমার এখানে কাঁদতে পারি নি। চলে গিয়ে কনট সার্কাসের একটা পার্কে গাছতলায় বসে কেঁদেছিলাম। তারপর গেলাম খেতে

একটা হোটেলে। অন্যদিন বন্ধু পাকড়াবার চেষ্টা করি, খানিকটা হাসিতে কথায় তাকে খুশী করি, চাউনি দিয়ে ভোলাই; তার পয়সায় খাই। তারপর হয়তো খানিকটা গাড়িতে বেড়িয়ে কি একটু হেঁটে হঠাৎ স্লিপ করি। বা যেখানে অনেক লোকজন সেখানে গুডনাইট বলে হাত বাড়িয়ে পুট দি ফুলস্টপ। কাল একলা ছোট কেবিনে একটা টেবিলে একটা কোণে খেতে বসেছিলাম মধ্যে মধ্যে অবাধ্য জল চোখ থেকে বেরিয়ে আসছিল; আমি সেটা লুকোবার জন্যে টেবিলে কনুই রেখে দুই হাতে মাথা রেখে মুখ নীচের দিকে করে বসে ছিলাম টপ টপ করে জল পড়ছিল টেবিল ক্লথের উপর কিন্তু কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। মনে মনে নিজের উপর রাগ হচ্ছিল। কেন? কেন চোখের জল পড়বে? পিছন মুছে দিয়ে এসেছি। নিজের হাতে। এসব বিশ্বাস করি নে। তবে? কেন?

হঠাৎ থেমে গেল রৌশন। চুপ করে চেয়ে রইল মেঝের দিকে। কপালে ভ্রূর রেখায় একটি কুঞ্চনরেখা ফুটেছে। ভাবছে কিছু।

রাম এসে ডাকলে, চা খাবার দিইছি।

রৌশনকে বললাম, চল খাবে চল। ব্রেকফাস্ট দিয়েছে। এস রৌশন।

রৌশন খুব গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়েছিল। একটু চমকে উঠে বললে, এঁ্যা?

—ব্রেকফাস্ট দিয়েছে। এস।

—ব্রেকফাস্ট? দুধ তো খেলাম। আচ্ছা চল।

রাম পর্যাপ্ত খাবার দিয়েছিল। রুটি মাখন ডিম বিস্কুট ফল মিষ্টি যথেষ্ট পরিমাণে সাজিয়ে দিয়েছিল। রাম এসব বিষয়ে সত্যই হুঁশিয়ার এবং পারঙ্গম দুইই। তার উপর অভিজাত সমাজের সাহেবী সমারোহের উপর প্রবল আসক্তি আছে। ছিল খুব বড় বাড়িতে। সুতরাং রৌশনের মত মেমসাহেবী কেতার মেয়েকে দেখে সে তার সকল পারঙ্গমতা দেখিয়ে দিয়েছে।

রামই বললে, কফি করব ?

বিস্মিত হলাম, কফি ? ছিল না তো !

—আনিয়েছি। কাল টেলিফোনে স্টোরে বলেছিলাম, রাতে দিয়ে গেছে।

—তবে নিশ্চয় করবি। কাল রৌশন কফি চেয়ে পায় নি।

রৌশন হাসলে। খাবার উদ্যোগে হাত বাড়িয়ে ছুরি কাঁটা তুলে নিতে নিতে বললে, বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলাম আমি। আমি তোমাকে বলেছি, ছেলেবেলা থেকেই খারাপ আমি। কিন্তু একটা কথা বলিনি। আমি খারাপ। দিল্লীতে এসে আমি বাপুজী এই দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারছিলাম না। এই ছেঁড়া লুগা পরা, ফুটপাথে শোওয়া, ভিক্ষে করে খাওয়া এ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। থাকতাম কাশ্মিরী গেট যেখানে ওই এলাকায়। কিছুদিন যেতেই রাস্তাঘাট চেনা হল। জি বি রোডও চিনলাম। নীচের তলায় বড় বড় গোলদারী দোকান গদি গুদাম। উপরতলায় থাকে বাঈজী লোক। তাদের সাজ-পোশাক, বাইরের আলো, জলুস দেখে ভারী লোভ হল। দিনে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে উপরতলার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। অছিলা—ভিখমাঙা। রাত্রেও চলে যেতাম সুবিধে পেলেই। তখন গভর্ণমেণ্ট আইন করে এসব তুলে দেয় নি। তখন সন্ধ্যেবেলা জি বি রোড—আলোয়, সারেঙ্গী তবলার সঙ্গতে, বাঈজীর গানে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা তাদের রূপে রঙে পোশাকের বাহারে মনে হত—হমেনস্ত হমেনস্ত। আমার তো মনে হত। একদিন একজন লোককে বললাম, দিনের পর দিন দেখে ওকে চিনেছিলাম। ও ওই ওপরতলায় যায় আসে। ওদের সঙ্গে লোকটির আলাপ আছে তাও বুঝেছিলাম।

আবার থামল রৌশন, থেমে সংকোচ কাটিয়ে হেসে বললে, আই অ্যাম এ ব্যাড গার্ল। আর বাপুজী, এসব ব্যাপার আমি বুঝতাম, তখনই বুঝতাম। পাড়াগাঁয়েও এসব গল্প আছে। ছেলেবেলা

থেকেই শোনা যায়। বাঈজী হলে—। বাপুজী, ওর মানে আমি জানতাম। পুরো বুঝতাম। কিন্তু আমার ভয় হয় নি। ওই লোকটিকে বললাম, আমাকে তুমি বাঈজী করে দিতে পার? সে লোকটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালে। আমি বললাম, আমি গাইতে পারি। গাঁয়ের নাচও জানি। সে আমার থুতনি ধরে মুখটা তুলে আলোয় ভাল করে দেখে বললে, আয় আমার সঙ্গে। গেলাম চলে। মা বাপ ভাই সব পড়ে রইল ফুটপাথে, খোলায়। থাকল—থাকল। আমি সে ভাবি নি।

আবার থামল সে।

ভেবে নিয়ে বললে, সব কথা বলে লাভ নেই বাপুজী। আমি আমার স্বভাবটাকে বোঝাবার জন্যে বললাম। ওই আমার স্বভাব সেই আমার যে কাল হয়ে গেল বলতে পারব না। ছেলেবেলা হরিপীতমের মা গল্প বলত, ভারী সৎ ভারী ভাল হরিপীতমের মা, গল্প বলত রামসীতার, হরপার্বতীর, আর আমাদের বলত, এমনি যারা হয় তারা দেওতা হয়ে যায়, স্বরগ লোকে উ লোকের মসনদ মেলে—ভারী ভারী মহল মেলে, দাসী বাঁদী মেলে—ওরা যেখানে পা দেয় সেখানে পদ্ম ফুটে যায়। বিশ্বাস করি না, তবু সেই সব মনে পড়ে দিল উদাস হয়ে গিয়েছিল। অকারণ। অর্থহীন। বাপুজী, তোমার কাছে ঝুটা বাত বলব না। সত্যিই আমার কাছে অর্থহীন ওই সব গল্প এবং অর্থহীন এই সব কাহিনীর কথা মনে পড়ে দিল উদাস হওয়া। আমি হরদম ঝুটা বাত বলি, সে তুমি শুনেছ, জানও বোধ হয়। কাল যে ওয়ালপ্লেট তোমাকে কাশ্মীরের বলে দিয়ে গেছি, ওটা কাশ্মীরের খুব সস্তা জিনিষ। আমি নিজে ওর ওপর কিছু কাজ করে ঢঙটা অবশ্য পালটে দিয়েছি। দামের কাগজটাও আমার লাগানো।

এবার আমি বাধা দিলাম, তুমি জান এ কাজ?

—জানি না? আমি তো ওই উধম সিংদের ঘরের বেটী। পাঁচ

বরিষ থেকে ছোট হাতৌড়ি নিয়ে ছাঁচের উপর তামা-পিতলের পাত রেখে ঠুকঠুক করে ঠোকা শিখেছি। তা ছাড়া আমার হাত ছেলেবেলা থেকেই ভাল। জন্ম থেকে আমার বুদ্ধি যেমন মন্দ, তেমনি আর্টিস্টও আমি বোধ হয় জন্মাবধি। তারপর জি বি রোডে গিয়ে দু'বছর ছিলাম। এক ব্যবসাদারনা আমাদের পালছিল। আমার সঙ্গে আর তিনজন লেড়কী ছিল : হঠাৎ পুলিশ হানা দিয়ে আমাদের উদ্ধার করলে। তাদের দুজন ফিরে গেল তাদের বাড়ি। আমি বললাম, আমার বাপ মা মরে গেছে। সেই ফুটপাথে যেতে আমার দিল চায় নি। তখন এই আমীর বাপের গল্প বানিয়ে বলেছিলাম। তখন তো বাচ্চা লেড়কী। বারো তেরো বছর বয়স। সুরত তখন খুলছে সবে। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বাস করেছিল এবং পাঠিয়ে দিয়েছিল। অনাথ আশ্রমে। সেখানে এই আমার হাতের কাজ, ছবি আঁকার এলেম, এই কামের এলেম দেখে আর্ট ক্র্যাফ্‌ট্‌স শিখতে পাঠিয়েছিল। চার বছর সেখানে থেকে আর্ট ক্র্যাফ্‌ট্‌সের সঙ্গে কিছু ইংরিজী আর জীবনের স্টাইল শিখে বেরিয়ে এসেছিলাম। থাক, বাপুজী পিছনের সে সব কথা খারাব লেড়কীর সবই খারাব কথা। কালকের কথা তোমাকে বলতে এসেছি। সেইটে বিশ্বাস করাবার জন্য এত কথা বললাম, বলে ফেললাম ; কালকের সেই উদাস হয়ে যাওয়া দিলের আমেজ বল আমেজ, আমেজের জের বল জের এখনও রয়েছে। এতটা বলবার দরকার ছিল না। এতটা কেন, কিছুটাই বলারও জরুরৎ ছিল না। সোজা বললেই হত, তুমি বিশ্বাস করতে করতে, না-করতে নাই করতে। হয়তো পেট ভরে খেলে কাল আর সমস্ত রাত্রি কাঁদতামই না, ঘুমিয়ে পড়তাম ভরাপেটের খুশীতে।

খাওয়া শেষ ক'রে সে ন্যাপকিনে মুখ পুঁছছিল, রাম কফি ঢালছিল। সে তাকে বাধা দিয়ে বললে, তুম ছোড়ো জী, আমি বানিয়ে নিচ্ছি। বাপুজী, রৌশন খারাব মেয়ে, তার লজ্জা হায়াও

নেই। তবে সে কফি খুব ভাল বানাতে পারে। তুমি ভুলতে পারবে না। ক্ষুধা তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রৌশন পালটেছে। তার উদাস দৃষ্টি নেই, সে ক্লান্তি বিষণ্ণতাটুকু নেই, সে সেই ছলনাময়ী হয়ে উঠেছে।

রৌশন কফি তৈরি করতে করতে বললে, আমি কোণের টেবিলে বসে কাঁদছিলাম। মন খারাপ। ভাবছিলাম, বাপ মায়ের খবর করি—। এঃ, আই অ্যাম সরি—

কফি খানিকটা পড়ে গেল টেবিলে।

বললাম, থাক ব্যস্ত হয়ো না।

—মনটা এখনও ঠিক হয় নি বাপুজী। হ্যাঁ, উধম সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করি—তারা কোথায়?

—তা হলে তুমি মিথ্যে বলেছ, মা বাপ মরে গেছে?

—না জেনে বলেছি। তবে অনুমান—তারা মরে গেছে। জি বি রোডে—তার লাগোয়া বাঈ পাড়ায় বাপ কিছুদিন রোজ খোঁজ করে ফিরত। শুনেও ছিলাম, দু'চার রোজ বাড়ির ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখতামও। তারপর আর না। একদম না। বেঁচে থাকলে বাপ আমায় খুঁজতে ছাড়ত না। ওইখানেই খুঁজত। আমার মতিগতি তারা ভাল করে জানত। অবশ্য নাও হতে পারে। ঘেন্নায় ও অঞ্চল থেকে চলে গিয়ে থাকতে পারে। হয়তো উধম সিংয়ের মত ট্যাক্সিও চালাতে পারে, তবে কোনদিন নজরে পড়ে নি। আমি গগল্‌স পরে, মডার্ণ মেয়ে, দিল্লী চষে বেড়াই, টুরিস্টদের নিয়ে ফিরি, চোখে পড়ত।

একটু থেমে বললে, কাল ওই মেজাজের মধ্যে মনে হল তারা অন্য কোন কাজও তো করতে পারে। অন্য কোথাও গিয়েও তো থাকতে পারে। পাঞ্জাব রেফ্যুজী তো তামাম হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাবছিলাম আর কাঁদছিলাম। চোখের আঁসু প্ল্যাস্টিকের টেবিল ক্লথের উপর জমছিল, শুষে যাচ্ছিল না। হঠাৎ এক ছোকরা,

বদমাস ছোকরা, চিনি আমি, এবং ওকে এড়িয়ে চলি, হোটেলে ঢুকে আমার খোঁজ পেয়ে কেবিনের পর্দা ঠেলে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল ; মদের গন্ধ পেয়েও আমি মুখ তুলি নি। সে মাথায় টোকা দিয়ে ডাকলে, আজ তো পিয়ারীকে মিলে গিয়েছে। আজ তো পাকড় লিয়া।

এবার আমি চমকে উঠলাম। গলা শুনে চিনে চমকালাম। তেমনি ভাবেই মুখ নীচু করেই রইলাম। বললাম, আমাকে মেহেরবানী করে দিক করো না। আমার তবিয়ৎ ঠিক নেই, মেজাজ ঠিক নেই। যাও তুমি।

এই সময় বয় আমার অর্ডারের খাবার দিয়ে গেল। সে ছোকরা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার পাশে বসে বললে, আমার খানাও এই টেবিলে লাগাও।

আমি বললাম, না।

সে গুণ্ডা প্রকৃতির ছোকরা, সকলে ভয় করে, পয়সাও কমায়। সে জবরদস্তি বললে, আলবৎ, এই টেবিলে বসব আমি।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। —না।

সে খপ করে হাত টেনে ধরে বললে, বস পিয়ারী। আজ তোমাকে ছাড়ছি না। লোকে বলে তুমি চতুরালিতে ব্রিজবালার চেয়েও. সরেস। হেসে, গায়ে ঢলে পড়ে, রঙ্গিলা কথা বলে খেয়ে দেয়ে, কভি কভি দু'চারটে চিজ ভি প্রেজেন্ট নিয়ে বিলকুল পিছলে চলে যাও। আমাকে তো দেখে বিশ মিল দূর ভাগো। আজ পাকড় লিয়া। বইঠ যাও। খাও। উসকে বাদ চলো ট্যাক্সিতে। আমার কাছে বোতল আছে। চলো কুতবকে তরফ, নেহি তো চলো যাঁহা দিল চায়—

আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। ভিজে মেজাজ যেন আগুনলাগা বারুদখানা হয়ে গেল। আমি কি করছি বোধ হয় তাও

আমার খেয়াল ছিল না। আমি জবরদস্তি হাতখানা ছিনিয়ে নিলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, ছোড়ো!

সে হেসে বলল, আরে, জোর দেখায় যে! বলে আমাকে টানলে তার দিকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিলাম। জোর চড় দিয়েছিলাম। ব্যাস, চড় খেয়ে আধ মিনিট আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর চালাতে লাগল চড় ঘুষি। পড়ে গেলাম তো লাথি মারলে পিঠে। ছোট্ট কেবিনের মধ্যে হচ্ছিল এসব। আমি চীৎকার করছিলাম। হোটেলের লোক এসে টেনে ছাড়ালো। দুজনকেই নিয়ে গেল ম্যানেজারের কাছে। সে বললে, ওই আমাকে ডেকেছিল। এবং আমাকে পাশে বসিয়ে হাসিখুশিতে ভুলিয়ে পিকপকেট করেছে। দশ রূপেয়ার নোটে একশো রূপেয়া ছিল। সারজেন্ট এল। তার বদনাম, আমারও বদনাম আছে। আমার ব্যাগে তোমার দেওয়া টাকাটা ছিল। পাঁচ টাকার নোটে চল্লিশ টাকা। আমার নিজের ছিল পনের টাকা আর কিছু খুচরা। তাও এক রূপেয়া দো রূপেয়ার নোট। আমি খারাপ মেয়ে, কিন্তু কাল আমার কোন দোষ ছিল না। মন্দ হয়েছি বলেই কাঁদছিলাম। আর তুমি ওয়ালপ্লেট কিনেছ। ও ব্যবসা আমি করি। তা ছাড়া বাপুজী, তুমি আমাকে সত্যি বাপের মতই স্নেহ কর। যদি বিপদ হয় তবে তুমি আমাকে রক্ষা করবে বলে তোমার নাম আমি করেছিলাম। পুলিশ ছেড়ে দিলে আমাকে। আমি বললাম, আমি এ নিয়ে কেসও করতে চাই না। খুব মিনতি করলাম। হাত জোড় করলাম। ওকে ছেড়ে দাও। নইলে ও আমার হয়তো জানই নিয়ে নেবে। জানি না কি করেছে। বাড়ি গেলাম। পুলিশই মেহেরবানী করে পৌঁছে দিলে। ঘরে ঢুকে বুকের ভেতরটা আরও কেমন হয়ে গেল, উপুর হয়ে পড়ে সারারাত কাঁদলাম। মনে মনে কাল এও হল, কেন এ পথ ধরলাম। দুঃখের মধ্যে মা বাবার তো সুখ দেখেছি। হরিপীতম বিয়ের গল্প শুনত, মুখ উজ্জ্বল হত। হরিপীতমের বিয়েও

দিয়েছিল উধম সিং, গাঁয়েরই এক জাঠের ছেলের সঙ্গে, তার নামও গীতম সিং! চৌদ্দ বছরের বর, ন' বছরের বউ। তাদের সে মিষ্টি হাসি, চোখে চোখে ইশারা দেখেছি, ঠাট্টা করেছি। আমার ওই জীবন হলে কি হত?

থামল সে—অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর হেসে বললে, এ একটা একরাত্রের বোখারের মত হয়ে গেল। একদম পাঁচ ছও ডিগ্রী বোখার আর তার ঘোরে আবোল তাবোল স্বপ্ন দেখলাম, চেঁচালাম। সকালবেলা সেই ঘোরে তোমার কাছে এলাম।

হেসে উঠল, বললে, বোখার ছেড়ে গেছে বাপুজী। তুমি আমাকে মাফ করো। সত্যি মাফ করো। আমি আর কখনও তোমার কাছে আসব না। তোমার মত লোকের ধরম বেটী আমার মত মন্দ মেয়ে! না—না—না। এ হয় না।

আমিও কিছু বলতে পারলাম না। আমি তো বলেছি, আমার বদনাম আছে, আমি বুদ্ধিতে স্থূল, হৃদয়াবেগে চালিত হই। আবেগ আমার মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল। হতভাগ্য মেয়ে পাঁকে ডুবছে, অভ্যাসবশে পাঁককে চন্দন ভাবছে আনন্দ পাচ্ছে; মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধ হলে হাত বাড়াচ্ছে; কেউ নেই সংসারে মমতা করবার মত। তাকে হাত বাড়িয়ে একটু সাহায্য না-করে কি পারা যায়? তবু ভয় হচ্ছে। পালটা গল্প মনে পড়ছে;—কর্কট নাগ কার অভিশাপে দীর্ঘকাল আগুনের বেড়ার মধ্যে বন্দী ছিল। ত্রাণ কর বলে চীৎকার করছিল। কেউ উচিত মনে করে নি। তারা বুদ্ধিমান। দীর্ঘকাল পর বনে নির্বাসিত বুদ্ধিভ্রষ্ট নল রাজা হৃদয়াবেগে পরিচালিত হয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডে ঢুকে মৃতপ্রায় নাগকে বের করে এনে বাঁচিয়েছিলেন, কর্কট নাগ পরিত্রাণ পেয়ে প্রথম কাজ করেছিল পরিত্রাতা নলকে দংশন করে! সোনার বর্ণ নল কালো হয়ে গিয়েছিলেন সেই বিষে। রৌশনের সঙ্গে কর্কট নাগের তো প্রভেদ নেই। আমি চুপ করে নিজেকে সংযত করে রেখেছিলাম। ভাবছিলাম,

যাক—তাই যাক রৌশন। আর যেন না আসে কখনও।

রৌশন টেবিল ছেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জানালার ধারে।

সামনে সাউথ অ্যাভেন্যু ধরে আমাদের ফৌজের জোয়ানরা মার্চ করে চলছিল। সে তাই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। চলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে তাকাল। বিস্মিত হয়ে গেলাম। তার চোখের কোল থেকে দুটি জলের ধারা নেমে এসেছে। আবার কেঁদেছে রৌশন। এতক্ষণ ফৌজী মার্চ দেখছিল, না কাঁদছিল।

রুমাল বের করে চোখের জল মুছে সে বললে, কাল থেকে—। সেন্টিমেণ্ট—ইমোশন—বড় বেরাগা ব্যাপার বাপুজী। আমি এইবার যাব।

একটু থেমে বললে, আর আমি আসব না। আসা আমার উচিত নয়।

আমি নিজেকে কঠিন শাসনে স্তব্ধ রাখলাম।

সে আবার বললে, একটা অনুরোধ করব, রাখবে?

—কি? বল?

একশো টাকার দুখানা নোট বের করে সে বললে, তোমার দোস্তকে কোন ছুতো করে দেবে? উধম সিংকে?

চমকে উঠলাম। ওঃ! মূর্খ আমি। তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। আবার দু ফোঁটা জল তার চোখের কোলে কোলে ছলছল করছে। সে হাত বাড়িয়ে ধরেই রইল আমি নেব বলে।

বললাম, হরিপীতম। ওই একটি শব্দ ছাড়া উচ্চারণ করবার কথা খুঁজে পেলাম না।

হেসে সে বললে, হরিপীতম মর গেয়ি বাপুজী! ও নাম তুমি মুখে এনো না। আমি রৌশন। ব্যাড গার্ল।

—রৌশন, যেয়ো না—ফেরো।

—না বাপুজী আ—র ফেরা যায় না। বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়লে

সে। ওই জীবন, হোক বাপ মা, তাদের জন্যেও ও-জীবনে ফেরা যায় না। সে বিষণ্ণ হেসে ঘাড় নাড়তে লাগল অর্থাৎ সে নিরুপায়।

আবার বললাম, শোন, আমার বাত শোন—

—কি শুনব ? দেখ আমাদের দেশে বলে, সংসার ছেড়ে বনে বা তীর্থে তপস্যা করলে ভগবান মেলে। সে তো জিন্দিগীর সেরা লাভ। তাতে সব পায়, স্বর্গ মর্ত্য সব। কিন্তু ক'জন যায় ? সেই সংসারের অশান্তি দুঃখের সুখ ছাড়তে পারে না। টাকাটা দিয়ো।

—দাও। নিলাম টাকাটা।

খুট্ শব্দ করে দরজার ছিটকিনি খুলে সে বেরিয়ে গেল। তার আগে গগল্‌সটা পরে নিলে।

আট

আমার দোষ, আমি জীবনে ঘটনায় কোন জায়গায় ছেদ টেনে দিয়েও তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিই না। কারও সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েও আবার সে এলে তাকে দরজা খুলে সম্ভাষণ করি। অনেক ক্ষেত্রে নিজে গিয়েও সম্পর্কটা জুড়ে নিই, তাতে গিঁঠ থাকলেও তাকে বড় বলে ধরি না। রৌশন সম্পর্কেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

দেড় বছর পর। মার্চ মাস।

খবরের কাগজে দেখলাম, কুতুবমিনার হতে লাফ দিয়ে তরুণীর আত্মহত্যা। কলকাতায় লেক, দিল্লীতে কুতুব আত্মহত্যার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। রোমান্টিক আত্মহত্যাকারীদের, অর্দ্ধ উন্মাদদের, কি বলব, প্রিয় স্থান। কেমন করে লাফ দেয়, লাফ দেওয়ার পরমুহূর্ত থেকে মাটিতে পৌঁছুনো পর্যন্ত ওইটুকু সময় কি মানসিক অবস্থা হয় কল্পনা করতে পারি নে। মৃত্যুর পথ অনেক। পটাসিয়াম সাইনাইড সহজ পথ। তবু কেন যে—। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, তার

আগে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। তাই ঠিক। কিন্তু তার মধ্যে লেকের জলতলে বাসর পাতার কল্পনা, কুতুবমিনারের উপর থেকে লাফ দেওয়ার প্ল্যান আসে কি করে? এক বন্ধুর কাছে তার এক বন্ধুর রোমান্টিক আত্মহত্যার গল্প শুনেছিলাম। সে আমলে কুড়ি পঁচিশ টাকার ফুল কিনে খাটে ফুলশয্যা বিছিয়ে ব্লেড দিয়ে নিজের একটি ধমনী কেটে শুয়ে পড়েছিল। সে নিজে ছাত্র ভাল ছিল এবং বিজ্ঞানের ছাত্র। পটাসিয়াম সাইনাইড তার পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার ছিল না।

হেডলাইন দেখে নিয়ে আর পড়ি নি। থাক, কোন হতভাগিনী ব্যর্থতায় উন্মাদ হয়ে করেছে, সে আর পড়ে কি হবে?

প্রেম? যাকে চেয়েছে তাকে পায় নি? এই যুগে তার জন্যে আত্মহত্যা! কলকাতা পুলিশের একজন বিশেষজ্ঞ কর্মচারী বলেছিলেন, নব্বুই দিন। তরুণ আর তরুণী; এ বলছে ওকে না পেলে বিষ খাব, ও বলছে গলায় দড়ি দেব নয় ছুড়ি দেব। পালিয়ে গেছে, পাকড়ে এনে মেয়ের বাপকে বলেছি নাইন্টি ডেজ সাবধানে রাখুন, দেখা করতে দেবেন না, চিঠিপত্র লিখতে বা পেতে দেবেন না, বাস্ তাতেই হবে; নব্বুই দিন তিন মাস পর সে নিজেই বলবে, বাপরে কি ভুলই করেছিলাম। বিয়ের সম্বন্ধ করবেন পছন্দমত, দেখবেন নিজেই সেজেগুজে সলজ্জ হাস্যোজ্জ্বল নত মুখে এগিয়ে যাবে কনে দেখার আসরে। গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছি। ছেলেদের এক মাসও লাগে না। হাজার হলেও বেটাছেলে মানিক ছেলে।

থাক, ও নিয়ে ভাববার সময় ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। অন্য খবরে এগিয়ে গেলাম। মোটামুটি দেখে ঠেলে দিলাম কাগজ। কাজ নিয়ে বসলাম। কাজ, লেখার কাজ। এই লেখাটাই লিখছিলাম। কিছুদিন আগে একজন বন্ধু বলেছিলেন, একেবারে মর্ডান মেয়ে নিয়ে কিছু লেখ। তুমি লেখ নি। অবশ্য দেখে থাক তো লেখ নইলে লিখো না। মাঝখানে বন্ধুর বাড়িতে এক মার্কিন তরুণীর সঙ্গে

আলাপ হয়েছিল, তিনি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছেন। শাড়ি পড়েছেন তার সঙ্গে হর্স টেল খাটো চুল, পায়ে চটি। তাঁকে বন্ধু হেসে রসিকতা করে বলেছিলেন, মিস, তুমি কিন্তু ব্যাকডেটেড হয়ে গেছ; মডার্ন যাকে বলে তা আদৌ নও। হলে এখানে ছ' মাস এসেছ, ছ'টা প্রেম তো হওয়া উচিত ছিল। তোমার মায়ের কথা ভাব তো!

আমাকে বলেছিলেন, জানেন, সম্প্রতি ওর মা দ্বিতীয়বার উইডো হয়েছেন। শোকে অভিভূত হয়েছিলেন খুবই। হঠাৎ খবর পেলেন, তিনি লটারীতে একটা এরোপ্লেন পেয়েছেন। উঠে বসলেন। এবং প্লেনটার দখল পাওয়ামাত্র সেই প্লেনে চড়ে পৃথিবী ঘুরছেন। পৃথিবী দেখা উদ্দেশ্য অবশ্যই বটে কিন্তু মূল লক্ষ্য—টু ফাইণ্ড আউট সেই লোকটি যাকে তিনি চিরজীবন খুঁজছেন।

কথাটা সেই থেকেই উঠেছিল, সেই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন। অন্যদিকে লেখার তাগিদ ছিল; ভেবেছিলাম মডার্ন মেয়ে নিয়েই লিখব এবং বন্ধুকে উৎসর্গ করব। আমার সে মডার্ন মেয়ে রৌশন। তা ছাড়া আর কাকে নিয়ে লিখব? তার শেষ কথাটা কানে আজও বাজছে, মা বাপ কারুর জন্যেই আমি ফিরতে পারি না।

রৌশনকে নিয়েই লিখছি। মডার্ন মেয়ে বলব না। মডার্ন মেয়েদের সত্যিই জানি না, মডার্ন খোলসে একটি মন্দ মেয়ের কাহিনী। আজকেই এই বেলাতেই শেষ করব। শেষ করে উঠলাম ওই কথাতেই শেষ, ফিরতে আমি পারি না।

ছেদ টেনে দিয়ে চায়ের কাপ এবং সিগারেট নিয়ে বসলাম। টেলিফোন বেজে উঠল। তুললাম রিসিভার—হ্যালো।

—দাদাজী!

—আরে ভাই পেপারমে দেখা হ্যায়?

—কি?

—রৌশন ?

—রৌশন—কি ? কি করলে আবার ?

—আরে কুতুবমিনারকে উপরসে—

—এঁ্যা—? সে রৌশন ?

—হ্যাঁ। পড় নি ?

—হেডলাইন দেখেছি কিন্তু পড়ি নি।

সে রৌশন! টেলিফোনটা রেখে কাগজটা টেনে ঝুঁকে পড়লাম। হ্যাঁ, সে রৌশন। বেলা চারটের সময়।

—আঃ—। চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা মাংস-স্তূপ-মাখা নীলাভ মিহি শাড়ি, কিছু চুল। দুটো একটা প্রত্যঙ্গ শুধু গোটা। হয়তো আধখানা হাত, নয় তো—। আঃ ছি ছি, থাক, থাক। কিন্তু—কিন্তু—। রৌশন এ কাজ করলে—?

মা হতে যাচ্ছিল ?

না। রৌশন ডাক্তার ক্লিনিক সব চেনে। তা ছাড়া সে সন্তানটিকে কোন প্রসূতিভবনে প্রসব করে তাদের মারফতই কোন অরফ্যানেজে পাঠিয়ে দিতে পারত।

আর কি ? কোন জটিল জালে জড়িয়ে পড়েছিল ?

আজকের দিনে, রৌশন যে মেয়ে তাতে তার সামান্য পানোন্মত্ততার অপরাধ থেকে কালোবাজারের পথ ধরে কি অপরাধ তার পক্ষে অসম্ভব ? জাল পয়সা নোটের ব্যবসা, বিদেশের গুপ্তচর-বৃত্তি ; মনোহারিণী শক্তিতে সংবাদ সংগ্রহ করে চাণক্য পুরীতে বিক্রী, সবই রৌশন করতে পারে। হয়তো বা শেষের ওই ধরনের কোন জটিলতায় পড়ে থাকবে রৌশন নইলে এইভাবে আত্মহত্যা সে করত না।

আর একটা হতে পারে।

যাকে চাই তাকে পাই না বলে জীবনের অশান্তি ব্যর্থতা মিথ্যে না-হয় মেনে নিলাম কিন্তু যা চাই তাকে না-পেলে জীবনের অশান্তি তো আছে।

রৌশন বলেছিল, উপার্জন করি, কিন্তু অভাব আমার মেটে না। অনেক চাই আমি। অনেক।

জীবনে ফুলের মালা বদল করে বিয়ে হয়। কিন্তু ওই ফুলের মালার পাশে সোনার হার ছাড়া সে বিয়ে সুখের হয় না। বিয়ের পাওনা না পেলে সুন্দরী বধূরও শ্বশুরঘরে ঠাঁই হয় না, ঠাঁই হলেও শান্তি হয় না। তার নিজের মনেরও হয় না।

রৌশন যে চেয়েছিল অনেক। ফর্দ দেয় নি। এবং সে করা সহজ নয়। তবে এক কথায় বলেছিল, অনেক টাকার তার প্রয়োজন। সেই অশান্তির জ্বালায়?

মনে হল এটা সম্ভব।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। লেখাটা সেই দিনই পাঠাব ভেবেছিলাম, পাঠালাম না। দাদাজী হয়তো জানতে পারেন কিছু। আমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে আসা বন্ধ করেছিল কিন্তু দাদাজীর কাছে আসা বন্ধ করে নি। তাঁর সঙ্গে অতীত জীবনের কথার সম্পর্ক ছিল না; বা আমার মত ধরমবাপ-বেটীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। দাদাজী—দাদাজী, রসিক নাট্যোৎসাহী ব্যক্তি দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ বহুদিনের, নাট্য ও শিল্পলোকের অনেক শক্তি ও সূত্র তাঁর হাতে। সুতরাং রৌশন তাঁর কাছে আসত, এটা বা সেটার জন্যে। হয়তো প্রডাকশনে সাহায্য নয়তো ছোটখাটো পার্ট চাই বলে আসত। উদার দাদাজী শ্রদ্ধার বা স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ না-করলেও করুণার সঙ্গে গ্রহণ করতেন।

এসব দাদাজীই মধ্যে মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে বলতেন আমাকে। আমার কাছে সে আসত সেটা তিনি জেনেছিলেন। সম্পর্ক চুকলে পর একদিন হেসে বলেছিলেন, রৌশন মাকো ভাগিয়েছ, ভাল করেছ শঙ্করজী। কত টাকা তোমার মা বলার খেসারত দিয়েছ?

—কে বললে তোমাকে?

—খুদ রৌশন, আওর কৌন। তোমার বাড়ি কখনও আসবে

না সব কুচ ফারখৎ কর দিয়া, বললে আমাকে। তা, ওর বাত তো লাখোতে একটা সত্যি।

আমি বলেছিলাম, না, সত্যিই। আমিই ওকে আসতে বারণ করে দিয়েছি।

—ভাল করেছ।

—আর কিছু বলেছে?

—না। তোমার সম্পর্কে ওর বহুৎ রেসপেক্ট। বললে, একটা ওয়ালপ্লেট সে তোমাকে ঠকিয়ে বিক্রী করেছিল, তুমি ধরে ফেলে-ছিলে। তারপর বলেছিলে, তুমি আর না-এলেই আমি খুশী হব। বললে, ও মানুষ নিয়ে বনে না দাদাজী। বড়া কড়া ধাতকে আদমী।

বলেছিলাম, হ্যাঁ।

তারপরও মধ্যে মধ্যে বলতেন, রৌশন আয়ি থি। তুমি কেমন আছ জিজ্ঞাসা করছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করতাম, সে কেমন আছে?

—আরে ভাই, ওরা কখনও তবিয়তে বা বাইরে খারাপ থাকে না। রোগে তো ওরা হাসপাতাল যায় না, মোটর অ্যাকসিডেণ্টে পড়ে হাসপাতাল যায়। তবে দিলের কথা বলতে পারব না। নাঃ, ভুল বললাম শঙ্করজী, ওদের ও বস্তুটাই নেই। এখন থিয়েটারে মেতেছে। ইচ্ছে, বম্বেতে গিয়ে ছবিতে নসীব পরীক্ষা করবে। এখানে নাম হলে সুবিধে হবে আর আমার একটা রেকমেণ্ডেশন চায়। বাড়ি খাল করে ফেললে।

দাদাজীর বম্বেতে ছবির রাজ্যে সত্যই প্রতিষ্ঠা আছে।

আমি বলেছিলাম, দিয়ো না একটু লিখে। একটা চান্স পাক না। যদি পারে।

একবার বলেছিলেন, শঙ্করজী, শী ইজ গোয়িং টু হ্যাভ এ চান্স।

—কে?

—ও, তুমি ভুলে গেছ? রৌশন। তুমি বলেছিলে, আর মেয়েটা খারাপ হলেও, আই পিটি হার।

—দাদাসাহেব ইউ আর রিয়েলি গ্রেট।

—আরে ভাই, হাজার হলেও বাচ্চা লেড়কী, বাপ নেই মা নেই, অরফ্যান। তুনিয়ার ধূলোমাটি মেখেছে, মরে যায় নি, উঠেছে কোন রকমে, হাউ ক্যান ইউ হেট হার!

—নিশ্চয়। এটাই গ্রেটনেস।

দাদাজী প্রশংসার কথা চাপা দিয়ে বলেছিলেন, লিখে দিয়েছিলাম, বম্বে গিয়েছিল। একটা ছোট্ট রোল দিয়েছে। তাতেই খুশী। শী ওয়াজ ড্যান্সিং লাইক এ চাইল্ড।

দাদাজীই খবর দিয়েছিলেন, ছবিতে রৌশন একদম ব্যর্থ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, পুয়োর গার্ল!

উধম সিংহের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যেমন মধ্যে মধ্যে আসে তেমনি এসেছিল।

—নমস্তে দোস্ত বাবু সাহেব। আচ্ছা হ্যায়?

—নমস্তে সিংজী দোস্ত। তোমাদের ভালবাসার দৌলতে ভালই আছি। তোমার বালবাচ্চা সব ভাল?

—হাঁ। সব আচ্ছা। বড় লড়কাকে ফৌজে ঢুকিয়ে দিলাম। আচ্ছা বাবুজী, এ পেলেট কোথা কিনলে?

সে এগিয়ে গেল। রৌশনের প্লেটখানার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেল। কোথায় পেলে বাবুজী?

—কাশ্মীর থেকে এনে একজন দোস্ত দিয়েছে সিংজী।

—জান বাবুজী, এতে আমাদের বাড়ির ফুটকি চিহ্ন রয়েছে।

মুখ তুলে ভাবতে লেগে গেল, বললে, কে আছে ওখানে? আমরা চাচেরাভাইদের কেউ হবে। আমি ভেবেছিলাম তারা সব মরে গেছে। ওঃ বহুৎ নয়া ডিজাইন বানায়া। আচ্ছা চিজ।

মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করব মনে করেও জিজ্ঞাসা করলাম না। টাকাটা দেওয়ার কথা মনে হল। কি করে কি বলে দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মনে এল এবং তাই বললাম। বললাম, তোমরা নিজেরা এখানে যা তৈরি কর সে সব নতুন করে কর না কেন?

—আর বাবুজী, ওসব আচ্ছা লাগে না। সীতারাম, হরপার্বতী এসব ছেড়ে এই মাঝি আর মাঝিনী কি হবে? এ তো নদীর ঘাটে গেলেই মেলে। পথে মেলে ঘাটে মেলে। এ আবার বাড়িতে কেন?

—বেশ তো, তাই নয়া ডিজাইনে কর।

—রূপেয়া চাই বাবুজী। প্রথমে খরচ করতে হবে—তবে তো! কাম করবার লোক চাই। ভাল হাত চাই। আমার—

হঠাৎ থেমে গিয়েছিল সে। মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে এল। তারপর বলেছিল, আমার যে বড়া লেড়কা ছিল তার হাত ছিল আচ্ছা। খুব সরেস হাত। বাচ্চা বয়সে সে মরেছে কিন্তু সেই বয়েসেই তার মগজেও এসব খেলত।

আমি মৃদুস্বরে উচ্চারণ করেছিলাম, হরিপীতম!

চমকে উঠেছিল উধম সিং। বলেছিল, বাবুজী?

—বল!

—এ নাম কি করে জানলে তুমি?

—তুমিই বলেছিলে সিংজী। এখানে বস।

—বলেছিলাম?

—হ্যাঁ। মনে নেই?

—কিন্তু—

—কি কিন্তু? একদিন তোমাদের সব কথা আমাকে বলেছিলে। আমি ওয়েটিং চার্জ দিতে চেয়েছিলাম, নাও নি!

—সে মনে আছে। কিন্তু আমি তো ও নাম মুখে আনি না।

বিব্রত হয়েছিলাম। কিন্তু বুদ্ধিজীবি পণ্ডিতদের কাছে বুদ্ধিহীন

হলেও উধম সিংয়ের কাছে আমি বুদ্ধিমান। বলেছিলাম সেদিন তুমি কেঁদেছিলে সিংজী, সেই তারই মধ্যে বলে ফেলেছিলে নইলে আর আমি জানব কি করে?

—তা হবে! হয় তো দারুও খেয়ে থাকব।

—বোধ হয়। চোখের জল যখন বের হয় তখন মনের ঘরের দরওয়াজাগুলো খুলে যায় সিংজী, নইলে আঁসু বেরোয় কি করে?

হেসেছিল উধম সিং। বলেছিল, তা বলেছ ঠিক। দরওয়াজা বিলকুল যদি নাই খুলবে তবে আঁখো কি আঁসু নিকালে কি করে।

একটু থেমে আবার বলেছিল, ও লেড়কীর নাম আমি মুখে আনি না। বহুত দুখ পাই। কলিজা একদম উখাড়ে যায়। মর গেয়ি!

এরপর চুপ হয়ে গিয়েছিল সব। সেও চুপ আমিও চুপ। আবার ভাবছিলাম জিজ্ঞাসা করব কি না, কি করে মরল সে? ঠিক হবে? মন বলছিল, না।

সেই বললে, বাবুজী, দিল্লীতে এসে এই দিল্লী শহরে ওরা তাকে লুঠ করে নিয়ে গেল।

—কারা?

—আবার কারা? যারা ওখান থেকে তাড়ালে আমাদের। এখান থেকে যারা চলে গেল পাকিস্তান। তারাই। মেয়ে বড় ভাল ছিল, গুণ ছিল অনেক। ভিক্ষে করতে গেল একদিন আর ফিরল না। হারিয়ে গেল। জি বি রোডে বাবুজী যে সব মুসলমানী বাঈজী থাকে তারা তাকে গায়েব করে পাকিস্তান নিয়ে যাচ্ছিল। পথে কাটাকাটির সময় আমার বেটিও কাটা পড়েছে। মর গেয়ি উ!

চুপ হয়ে গেল সে, আমিও চুপ করে রইলাম। নিজেকে সতর্ক করলাম না, আর কোন কথা নয়। অন্ততঃ হরিপীতমকে নিয়ে নয়।

সে হঠাৎ বলে উঠল, লোকে দেখেছে। চোখে দেখা লোকে আমাকে বলেছে। তার বুকে উল্কি ছিল। লেখা ছিল পীতম।

পীতম আমার জামাইয়ের নাম। সে এক মেলায় ওকে নিয়ে গিয়ে শখ করে নাম লিখিয়েছিল। যে দেখেছে সে বললে, একটা মরা মেয়ের বুকে সে দেখেছে উল্কির লেখা।

মনে হয়েছিল উধম সিংয়ের সন্দেহ আছে।

এবার আমি বলেছিলাম, একটা কথা বলব তোমাকে।

সে তখনও ও কথাটা ভুলতে পারে নি। বলেছিল, আমার জামাই, সে বাবুজী ওই দশ এগার বছরের বউয়ের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল। নসীব, সব নসীব।

বলেছিলাম, ভুলে যাও সিংজী সে সব কথা। দুনিয়াতে এমনি একটা সময় আসে যখন দিন দুনিয়ার মালিক যিনি তিনিই বাউরা হয়ে যান।

—ই বাত ঠিক হ্যায় বাবুজী। ঠিক বলেছ। খোদা মালিক বাউরা হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াতে মানুষও সব ক্ষেপে যায়। ওঃ! দুখ আমার জামাইয়ের জন্যে। ছেলেবেলা থেকে এক গাঁয়ের লেড়কা লেড়কী। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল ছোট থেকে, বিয়ে হল—। ছোট মেয়ে আমার বাড়িতেই থাকত কিন্তু দেখা তো হত দুজনের। মহব্বতি ছিল, সে মহব্বতি বেহেস্তের মহব্বতি।

—শোন উধম সিং, একটা কথা বলব তোমাকে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ—হাঁ। বলেছ আর একবার। বল কি হুকুম?

—আমাকে দোস্ত বলে মান তো?

—আলবৎ? জরুর! একবার বলেছি, আবার দোসরা বাত কিসের? হাঁ, তবে তুমি বড় আদমী, আমি ছোট—

—না। দুনিয়াতে মানুষ ছোট বড় নয়। কাম আছে ছোট বড়। সেও ভুল, কাম হল কাম। আমার দোস্ত তুমি। তোমাকে বলবার কথা তোমার ভাল চাই; তুমি এই প্লেটের কাজ ভাল করে

কর। তুমি টাকার কথা বলছ। টাকা আমি দোস্ত হিসেবে দিচ্ছি। তুমি মাল কেন, যাতে খরচ করতে হবে কর। দুশো টাকায় হবে?

—দু-শো টাকা তুমি দেবে? কেন?

—বললাম তো দোস্ত হিসেবে দেব।

—ধার?

—না। ধার নয়।

—তবে কি? মেহেরবানীর দান?

—না দোস্ত দোস্তকে দিচ্ছে। তোমার হলে আমাকে দেবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বললে, খুব প্রেমসে দিচ্ছ তো?

—নিশ্চয়।

—তাহলে দাও। নেব। দেখ, খুব গরীব আমরা কিন্তু ভিখ মাঙি না। দাও। দেখি নসীবকে ভাল করা যায় কিনা।

টাকাটা নিয়ে নিশ্চিন্ত করেছিল আমাকে।

রৌশনও সঙ্গে সঙ্গে মনের দরজায় বলেছিল, বাপুজী, আর তোমাকে বিরক্ত করব না।

হঠাৎ এতদিন পর খবরটা শুনে মনে হচ্ছে অশরীরী রৌশন আমার এই ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলতে চাচ্ছে, বাপুজী, আজ এসেছি, কেউ দেখতে পাবে না বলে এসেছি। যাবার আগে দেখা করতে এসেছি। নমস্তে জানাতে এসেছি। বল, আনন্দ রহো। জিতা রহো তো নয়, জিন্দিগী শেষ হয়ে গেছে। বল আনন্দ রহো।

কলিং বেল বেজে উঠল। চমকে উঠলাম। সে চমকানো অল্প নয়। এই মুহূর্তে বেল বাজতেই মনে হল সত্যিই রৌশন এসেছে, বেল টিপছে। উঠে গিয়ে দরজা খোলবার আগে ঘুলঘুলিটা দেখলাম, কে? মানুষের মন বিচিত্র।

দেখলাম, পিওন।

খুললাম। পিওন বললে, রেজোস্ট্র চিঠি বাবুজী।

রেজেস্ট্রি চিঠি! কোথাকার? কলকাতা থেকে? হাতে নিয়ে দেখলাম—চমকে উঠলাম আবার। লিখছে, রৌশন কেয়ার অফ পোস্টমাস্টার দিল্লী···।

রৌশন!

চিঠিখানা সই করে নিলাম। হাতে করে নিয়ে বসেই রইলাম। রৌশন লিখেছে। কাল সকালের দিকে রেজেস্ট্রি করেছে। বিকেলে কুতুবমিনারে চড়ে ঝাঁপ খেয়েছে!

আজ এসেছে চিঠিখানা। মনে হচ্ছে রৌশনও এসেছে। কথা বলেছে চিঠির মধ্য দিয়ে।

কম্পিত হাতে খুললাম।

নয়

রৌশনের লেখাটি বড় সুন্দর। জন্মশিল্পী ছিল সে, এ কথা সেই মুহূর্তে অকপটে স্বীকার করেছিলাম। এবং এই চিঠি লেখার সময় মনের মধ্যে তার চঞ্চলতা অস্থিরতা ছিল বলেও মনে হচ্ছে না। বেশ ধীর চিত্তে লিখেছে। ভাষাটা গোলমেলে; বেচারী ভাল লেখাপড়া তো শেখে নি। অবশ্য তার জন্যে তার কোন দৈন্যবোধ ছিল না। উর্দু ভাল বলত কিন্তু আরবী হরফ আমি পড়তে পারিনে সে তা জানত তাই বোধ হয় হিন্দীতে লিখেছে। বিস্ময় বোধ করলাম এর জন্য। কারণ একালের ফ্যাশন ও ধারণা অনুযায়ী ইংরিজী যেখানে বৈদগ্ধের চরম পরিচয় সেখানে মডার্ন মেয়ে রৌশন ইংরিজী ছেড়ে হিন্দীতে লিখলে কেন। অস্বাভাবিক এটা। কালের একটি স্বভাব আছে, সে স্বভাব মানুষের প্রকৃতি এবং দেশমাটির প্রকৃত পরিচয়কে ঢেকে দেয়। থাক ও-সব কথা। রৌশন হিন্দিতে লিখেছে, তার

চিঠি পড়ছি আর আমার কল্পনাপ্রবণ মন যেন তার কান অর্থাৎ মনের কানে তার রবহীন কথা শুনতে পাচ্ছে।

পরম আদরণীয় বাপুজী,

সব আগে তোমায় নমস্তে জানাচ্ছি। আমার বহুৎ বহুৎ প্রণাম তোমাকে। আমি আজ মরতে যাচ্ছি। মরব আজ! মন আমার শান্ত; কোন অশান্তি নেই। ভেবে ভেবে ধীরে ধীরে মরবার সিদ্ধান্ত করেছি। মরা ছাড়া আমার পথ নেই। আজ এক বছর নিদারুণ অশান্তির মধ্যে কেটেছে। তোমাকে বলেছি, অনেক জঙ্গল পাহাড় অন্ধকার আমি জীবনে একা পার হয়েছি। তখন ভয় হয়েছে অনেক সময়। কিন্তু আমি তোমার শুধু মন্দ মেয়েই নই, আমি দুর্দান্ত মেয়ে। আমার সাহস তোমাদের থেকে অনেক বেশী। আমি ভয় পেয়েও হটে পিছন ফিরি নি, ভয়ের সঙ্গে লড়াই দিয়ে তাকে হারিয়ে দিয়েছি। তাতে অশান্তি ছিল না এমন বলি নে কিন্তু মজা ছিল যেন। এই মজাই আজ হারিয়ে গেছে। জিন্দিগীর নুন ফুরিয়ে গেছে। এক বৎসর দিন রাত কেঁদেছি, অশান্তিতে ভুগেছি। ভয়ের হাঁ বড় থেকে বড় হয়েছে। মরবার সংকল্পে যেই শক্ত হয়েছি অমনি সব পালিয়ে গেছে। সব এখন সাফা হয়ে গেছে, সামনে সিধা রাস্তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কুতুবের সেই চূড়া যেখানে অনেকবার উঠেছি। মনে হয়েছে বিলকুল দুনিয়া ছোট হয়ে খেলাঘর বনে গিয়েছে। আমি উপরে দাঁড়িয়ে আছি, কত সুখ এখানে। ওখান থেকে ঝাঁপ খাব। সেদিন বলেছিলাম, বাপ হোক মা হোক কারুর জন্যেই ওদের জীবনে ফিরে আসতে পারব না। অসম্ভব। ফেরা যায় না। পাথরে গড়া কুতুবমিনারে সিঁড়ি আছে বাপুজী। জিন্দিগীতে দেমাকে আর আরামে গড়া মিনার যখন মানুষ গড়ে তখন সিঁড়ি গড়ে না। উঠে যায় আর পায়ের ধাক্কায় সিঁড়িগুলোকে ঠেলে ফেলে দিয়ে যায় পাছে কখন কারুর ডাকে নেমে আসে ভুল করে। নামতে হলে পড়তে হয়। যারা ঠেলা খেয়ে পড়ে যায় তারা মরে হাড়গোড়

ভেঙেও বেঁচে থাকে কাঁদতে। আমি নিজে লাফ দেব। আমি মরে বেঁচে যাব। অনেক ভেবে স্থির মগজে খুশী দিলে রয়েছি।

দুনিয়ায় বাপ মা ছেড়েছি। এই জীবনে কারুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক, সত্যকারের সম্পর্ক ছিল না। শুধু তুমি এই অল্পকালের মধ্যে আমার মত মেয়েকে বাপুজী বলিয়েছ, কোন শরম কর নি, বিদেশীর কাছে আমাকে ধরমবেটী বলেছ। তুমি আপনার লোক। আর দাদাজী সাহেব। দাদাজী আমার ভোলানাথ। তাঁর এই গোস্যা, এই মেজাজ খোস, তাঁর কাছে মন্দ পাপ বিচার নয়, তাঁর বিচার মায়ামমতার। কত মায়া যে তিনি করেছেন তার কিছু জান, সব জান না। ভেবে চিন্তে খুব শান্তিতে খুশীতে মরতে যাচ্ছি তাই প্রথমেই আজ দাদাজীকে চিঠি লিখবার কথা মনে হল আর তোমাকে। তুমি পিতাজী, ধরমবাপ। আমার পাপ উপেক্ষা করে এগিয়ে এসে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছ এবং বলেছ, এই মন্দ মেয়েই আমার বেটী। তোমাদের না লিখে মন মানল না।

দাদাজী আমার অনেক উপকার করেছেন অনেক ভালবেসেছেন কিন্তু তিনি আমার জীবনের কথা জানেন না। তাঁর কাছে শুধু মাফি চেয়ে গেলাম। স্রিফ ক্ষমা, মাফি। আর লিখলাম, দুঃখ করো না। প্রণাম।

তুমি আমার জীবনের কথা জেনেছ। প্রায় সবটাই বলেছি। কিছুটা বলি নি তার খানিকটা পিতাজীর কাছে বলা যায় না। হাজার বেশরমী হলেও বলতে পারে না। তা আজও বলব না। আর কিছুটা বলব। যা বলেছি এমন ভাবে যে বলার মত বলা হয় নি। তোমার সঙ্গে নসীবের খেলে উধম সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার আসল বাপ, গরীব বাপ। আমি তার মন্দ বেটী। খারাপ বেটী। তুমি আমার কথা জেনে গেছ। তাই তোমাকে শুধু মাফি চেয়ে চিঠি শেষ করতে পারছি না। সব লিখছি।

আত্মহত্যা যারা করে তাদের বেশীর ভাগ চিঠি লিখে যায়। না-

লিখে বোধ হয় মরতে মন চায় না। কেউ দুনিয়াকে ছুষে যায়। কেউ লেখে, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়; তারা কিন্তু এই কথা লিখেই দায়টা বেশী করে চাপিয়ে দিয়ে যায় সেই লোকটির উপর, সেই তা বুঝতে পারে, অন্য কেউ তার পাত্তা পায় না। তার বিলকুল কথা সেই লোক মনের মধ্যে ভাবে আর আপসোস করে। যে মরে ওতেই তার মন খুশী হয়। আমার তো তা নয়। দায় আমার কারুর উপর দেবার নেই। তাই তোমাকে লিখে জানিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। মরে গিয়ে তো ভগবানের দরবারে (ভগবান যদি থাকেন) দাঁড়াতে হবে। তিনি তো পুছবেন, যে জিন্দিগী আমি তোমাকে দিলাম সে জিন্দিগী তুমি নিজের হাতে মাঝখানে বরবাদ করলে কেন? একজন অন্য জনের জান নিলে আমার কানুনে তার সাজাই হয়, তোমার জান তুমি নিয়েছ। তুমি বল, কেন নিয়েছ? তখন একটা জবানবন্দি তো দিতে হবে। এই জবানবন্দিটাই মরবার আগে সবাই তৈরি করে নেয়। আমিও তোমার কাছে পত্র লিখে তাই তৈরি করছি। এটাই সেখানে পেশ করব।

বলেছি তোমাকে সবই প্রায় মিথ্যা বলতে আমি ওস্তাদ মেয়ে। কিন্তু তোমাকে ঝুটা বাত বলি নি, অন্ততঃ আমার কথা যা বলেছি তার ভিতর। কিছু বাদ আছে।

শোন বলি।

এক গাঁওয়ে জম্মু এলাকায় থাকত উধম সিং, তার সংসার তার স্ত্রী, মেয়ে ছেলে। মেয়ে হরিপীতম। জন্ম থেকে মন্দ মেয়ে। মন্দ মেয়ে জন্মায় বাপুজী। গরীব জাঠের ঘর। সে সব বলেছি। তাদের পেশার কথাও বলেছি। হরিপীতম বচপন্ থেকেই মন্দ। বড় চালাক বড় চতুর। বুদ্ধি খুব। তার হাত ওই কারুকামে খুব মিহি, অল্পতেই ধরতে পারে, বুঝতে পারে; আবার বুদ্ধি খাটিয়ে শেখা কারিগরির উপরেও কারিগরি করতে পারে। ছবি আঁকতেও পারত; খড়ি দিয়ে কালি দিয়ে কাগজের উপর নকশা সে আঁকত

পাঁচ বছর বয়স থেকেই। আর চুরি করতে পারত খুব হুঁশিয়ারীর সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে। এমন কি পাঁচজনের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে অন্য লোকেদের মুখের দিকে চেয়ে তাদের কথা শুনত হাসত আর তার হাত চুরি করত। আর মিথ্যে এমন ভাবে বলত যে কেউ তা ধরতে পারত না, একবিন্দু সন্দেহও করত না। করতে পারত না। একটা ঘটনা বলি, তখন ছ'সাত বছর বয়স। গাঁওয়ের মধ্যে বড় সর্দারের বাড়ি নাতির অন্নপ্রাশনে গিয়েছি। সেখানে সর্দারের বাড়ির বেটী বহুরা বসে আছে। বাচ্চাকে সাজিয়ে গুছিয়ে এ কোলে করছে ও কোলে করছে। বাচ্চার হাতের সোনার গহনার একটা ছোট্ট সোনার ঘুন্টি কস্তার ডগায় দুলছিল। আমার লোভ হল। মনে হল ওটা চাই আমার। বুদ্ধি ঠিক পথ বাতলালে! বেরিয়ে গিয়ে খুঁজে জাঙ্গাল থেকে এক টুকরো ভাঙা কাচ নিয়ে এলাম। আমি ভিড়ের মধ্যে ঠিক ওর পাশে পাশে ঘুরতে লাগলাম। সময় ঠিক পাচ্ছিলাম না। একবার বাচ্চার বুড়ো দাদো এলেন আর এক বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে আশিস করতে। মেয়েরা ঘোমটা দিলে। বুড়ো দুজন সামনে এসে দাঁড়ালেন। বহুর কোলে বাচ্চা। ঝুমকিটা ঝুলছে। আমি ফাঁক পেয়ে কাঁচ দিয়ে সেটাকে কেটে টপ করে মুখে পুরে গিলে দিলাম। এসব আমার বাবা মা জানত না। বিশ্বাস করো। গাছে চড়তাম ফল পাড়তাম। গান গাইতে পারতাম, নাচতে পারতাম। গাঁওয়ের লোকেদের খুশী করবার ক্ষমতা আমার ছিল। তারা আমাকে মন্দ বলে তখনও বুঝতে তো পারত না। বয়সও হয় নি। গাঁওয়েই শ্বশুরবাড়ি। বিয়ে তখন আমার হয়ে গেছে। পাঁচ বছরে বিয়ে হয়েছিল। বর ছিল দশ বছরের। উত্তম সিং, ডাকনাম পীতম। তার দাদো, মায়ের বাপ তাকে বলত পীতম। দাদোর ছেলে ছিল না, এই পীতম ছিল তার সব। সে তিল ফৌজে হাওলদার। এই দাদোই আমাদের গাঁওয়ে এসে আমাকে দেখে পছন্দ করে দশ বছরের পীতমের সঙ্গে পাঁচ বছরের হরিপীতমের বিয়ে দিয়েছিল।

তুমি জান আমাদের বিয়ে হলেই মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায় না, 'গওনা' আছে। মেয়ে যুবতী হলে তবে শ্বশুরবাড়ি যায়। কাজেই বিয়ে হয়েও বাপের বাড়িতে ছিলাম। পীতম ছেলেবয়স, পাঁচ বছর বয়স থেকে থাকত দাদোর বাড়ি; আমাদের গাঁ থেকে দশ মাইল দূর, কিন্তু বিয়ের পর পীতম সেখান থেকে পালিয়ে আসত বাপের কাছে একটা ঘোড়ায় চড়ে। আসত আমার জন্যে। দুর্দান্ত শক্তগড়ন ছেলে। মনমেজাজ অদ্ভুত। আমার ভালও লাগত ভয়ও করত। বাপুজী, বিয়ের বাসরেই সে আমার চুলের মুঠো ধরে মেরেছিল। আমি কেঁদেছিলাম মায়ের জন্যে। সে এসে যে ক'দিন থাকত তার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হত। পথেঘাটে কি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখা, দু'চারটে কথা নয়; তার সঙ্গে দু'চার ঘণ্টা কাটাতে হত। জায়গা তার ছিল। সে গাঁওয়ের নগিচে একটা গোপন স্থান ঠিক করেছিল, কোন আগেকার আমলের কোন সরদারের ভাঙা মাটির গড়। নাদীর শাহের আমলে গড়টাকে গোলা মেরে একদম মাটির ডাঁই করে দিয়েছিল। তারা নির্বংশ হয়ে গিয়েছিল। সেই গড়ের মধ্যে একটা জায়গা সে বের করেছিল। সেইখানে দিনে একবার যেতেই হত। না গেলে পরের দিন সে আমাকে মারত। নিষ্ঠুরভাবে মারত। কিন্তু তখন ছেলে-মানুষ ছিলাম, ভাল লাগত। হয়তো বর বহু হয়েও ওই যে গোপনে দেখা তার মধ্যে একটা মজা ছিল। বোধ হয় গোপন অভিসারের স্বাদ আর রঙ ছিল। সেও ছিল দুর্দান্ত, আর ছিল গোঁয়ার। গল্প করত, বড় হয়ে সে ডাকাত হবে। এই গড়টাকে তলায় তলায় খুঁড়ে ঘর গড়ে নেবে। ঘোড়া রাখবে। হাতিয়ার রাখবে। রাত্রে বের হবে ডাকাতি করতে। বলত, তুই খানা তৈরি করে রাখবি—আমি এসে খাব। তোকে গহনা দেব, বলব, নে পর।

একবার মেলাতে গিয়ে সে উল্কিওলার কাছে আমার বুকে লিখিয়েছিল পীতম। আর নিজের বুকে লিখিয়েছিল হরিপীতম।

সে বড় গোঁয়ার ছিল। মুখে বলত ডাকাত হব কিন্তু বাপুজী

চুরিকে সে ঘেন্না করত। ওই যে সোনার ঘুন্টি আমি চুরি করে গিলেছিলাম সেটা পেট থেকে বের হয়েছিল। ময়লা থেকেই সেটাকে কুড়িয়ে আমি অনেকদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপর একদিন সেটা আমি তাকে দিয়েছিলাম, এটা তুমি নাও। বিক্রী করে—

সে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় পেলি ?

আমি হেসে বলেছিলাম, ডাকাতের বহু আমি। আমি চুরি করেছি।

—চুরি ? কার ঘরে ?

ঘটনাটা বলতে সে আমাকে খুব মেরেছিল। বলেছিল, চুরি আর ডাকাতি এক নয়। চুরিতে পাপ হয় ডাকাতিতে হয় না। বলে সেটাকে গাঁওয়ের ধারের দরিয়াতে ফেলে দিয়েছিল। আমার বহুৎ দুখ হয়েছিল। সোনার কোন গহনা আমার ছিল না। বাপ দেয় নি, শ্বশুরও না। আমি মন্দ মেয়ে বাপুজী। মানুষের মনে যাদের সাধ আশ কিছুতেই মেটে না এই আশই তাদের মন্দ করে তোলে।

এরপর বাপুজী, তার সঙ্গে তার বাপেদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল আমাদের। এমন হল যে এ ঝগড়া মিটবে না। তার আবার বিয়ে হবে। আমার সঙ্গে ফারখৎ হবে।

সেও এই মন্দ মেয়ের দোষ। তারও দোষ। হ্যাঁ তারও দোষ। ওই যে গাঁওয়ের বড় চাষী সরদার, ওদের বাড়ি এসেছিল এক মেহমান। ওই সরদারের শালার বেটা। তারা বড়লোক, এই সরদারের চেয়েও বড়লোক। তার বয়স উত্তমের মতই। বহুৎ খুবসুরত। কিন্তু উত্তমের মত শক্ত নয়, তার মত ডাকাত নয়। গোঁয়ার নয়। আমার তখন সাত বছর বয়স। বাপুজী গাঁওকে যত নির্দোষ সরল ভাব তা নয়। সেখানে ছেলেমেয়েরা শহরের থেকেও বোধ হয় পাকা, অল্প বয়সে সব শেখে। ওই ছেলেটা তাদের বহেনদের পুঁতির মালা দিচ্ছিল, আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমাকে বলেছিল, তুই নিবি ?

তখনই চোখের ভাষা জেনেছিলাম। সেই ভাষার সঙ্গে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখের ভাষা মিশিয়ে বলেছিলাম, দাও না।

সে বলেছিল, আমাকে চুমু দিস তো দেব।

ইশারায় ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, দেব।

তখন থেকেই আমি ঠক। ঠকাতে কোন দোষ নেই এ শিখে-ছিলাম। হাতে পেলে সেটা নিয়ে ছুটব, আর এ মুখো হব না এই ছিল মতলব। তাই দিয়েছিলাম ছুট। ওদিক মুখো হই নি। কিন্তু তার কপালে বিপদ আর আমার কপালেও। সে কি করে জেনেছিল যে আমি পীতমের সঙ্গে দেখা করতে যাই ওই ভাঙা গড়ে ঠিক দুপুরের সময়। সে সেদিন লুকিয়ে ছিল। আমাকে ঠিক ধরেছিল পথ আটকে।—বেইমানী!

আমি ভয় পেয়ে বলেছিলাম ছোড়ো ছোড়ো। কাল জরুর ময় যাউঙ্গী। ছোড়ো—

—নেহি।

—তব লেও তুমহারা মালা।

—নেহি। মালা নেব কেন? দাম নেব। তুই বলিস নি?

আমি মন্দ মেয়ে বাপুজী। বলেছিলাম নাও। তবে জলদি চুমো খেয়ে নাও। জলদি করো।

সে আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে কাছে টেনে বলেছিল, এই তো পিয়ারী।

বাপুজী, হঠাৎ একটা ঢেলা এসে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। চমকে উঠলাম। তাকে বললাম, পালাও, ভাগো। জলদি। পীতম তোমাকে মেরে ফেলবে।

—কে?

—পীতম। আমার বর।

—আসুক না, ছোটলোক চাষীর বেটা।

বলতে বলতে পীতম এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল তার উপর।

আমরা জাঠ রাজপুত আর সে বড়লোকের বেটা শিখ। তার কাছে ছোট কৃপাণ ছিল। সে কৃপাণখানা খুলে মারতে চেষ্টা করেছিল পীতমকে। কিন্তু পীতমের ছিল অনেক বেশী বল। কুস্তির অনেক প্যাঁচ সে তখনই শিখেছিল। সে তার ছুরিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখে নাকে খুব মার দিয়েছিল। আমার ভয় হয়েছিল খুব। তখন এখনকার মত বুদ্ধির বিচার করতে শিখি নি। আমার সেদিন বিচারে মনে হয়েছিল দোষ আমার। ও ছোকরা মরে যায় তো কি হবে? আমি ওই কৃপাণখানা নিয়ে পীতমকে বলেছিলাম, ছোড়ো উসকো। ছোড়ো নেহি তো!

বলতেই পীতম তাকে ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আমার উপর পড়েছিল এবং কৃপাণখানা নিয়ে মেরেছিল আমার কাঁধের নীচে হাতে। সে ছোকরা এই ফাঁকে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিল। বাচ্চা ছেলের ছোট কৃপাণ খুব ধারালো ছিল না, নইলে হয়তো সেই দিনই খতম হতাম। কিন্তু রক্ত পড়েছিল দরদর করে। পীতম দাঁড়িয়ে দেখে বলেছিল, আর কখনও করবি এমন?

বলেছিলাম, না।

—ওঠ। চল নদীর কিনারায়, রক্ত ধুয়ে দি।

নদীর ধারে যখন এসেছি তখন পিছনে গোলমাল শুনেছিলাম। একটা টিবির উপর উঠে সে দেখে বলেছিল, অনেক আদমী আসছে। সেই হারামী লোক নিয়ে আসছে। তুই বাড়ি যা, আমি পালালাম। চলে যাচ্ছি দাদোর বাড়ি, বুঝলি। বলে সে ঝোপঝাড় খানাখন্দের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ঘোড়ায় চড়ে। দাদোর দেওয়া যে ঘোড়াটা চড়ে সে আসত সেটাকে নিয়েই আসত ওখানে। সেটাই ছিল ওর ওই ভাঙা গড়ে আসবার অজুহাত। ওখানে ঘাস ছিল অনেক। ওর বাপের ঘোড়া ছিল ছোট ঘোড়া। তার সহিস ছিল না। পীতম ঘোড়ার যত্ন করত নিজে।

বাপুজী, এই নিয়ে ঝগড়া লাগল আমার শ্বশুরদের সঙ্গে আমার বাপের।

শ্বশুর বললে, ও বহু কখনও নেব না। বাপ বললে, আয় বাপ, হে ভগবান, কি খুনের সঙ্গে বেটীর সাদী দিয়েছি। সরদারেরা চটল শ্বশুরদের উপর। তাদের দুঃখ দিতে লাগল, যেমন বড়লোক গরীবদের দেয়। আমার বাপকে বললে, তোর বেটীকে দে, আমাদের বাড়ি থাকবে কাম কাজ করবে। সরদারনী বেটীর মত দেখবে।

তার মানে খুব ভাল নয় বাপুজী। বাপ আমার তা দেয় নি। বলেছিল, তার চেয়ে মরে যাক ও।

দু' বছর ঝগড়া চলল। পীতম কখনও কখনও গাঁওয়ে আসত লুকিয়ে। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করত না। মামার বাড়িতেই থাকতে লাগল। সেখানকার বাড়ির সেই তো সব পাবে। তার দাদো বিয়েরও সম্বন্ধ করতে লাগল। পীতম সেখানে পড়তেও লাগল। ইস্কুল ছিল সেখানে। দাদো তার খুব কড়া হয়ে গেল।

দু' বছর পর বাপুজীর সঙ্গে এক মেলাতে গিয়েছিলাম আমরা এই সব চিজ নিয়ে বেচতে আর মেলা দেখতে। তখন আমার বয়স দশের কাছাকাছি। মাথায় লম্বা ছিলাম, আমাকে বড় দেখাতো। আর সাজতাম খুব। সাজতে জানতাম। আমাদের গাঁওয়ে মুড়িওয়ালী ছিল ক' ঘর, তারাও গিয়েছিল। তারা মুসলমান। সেখানে হঠাৎ অন্য এক গাঁওয়ের এক ছোকরা এসে ওই চুড়িওয়ালীদের সঙ্গে মস্করা শুরু করলে আর খারাপ কথা বললে। এতে তাদের সঙ্গে আমাদের গাঁওয়ের দলের সঙ্গে লাগল ঝগড়া। পাঞ্জাব জম্মুর এসব ঝগড়া বড় খারাপ। বারুদে আগুন লাগার মত; দপ করে জ্বলে উঠলে বিলকুল একেবারে জ্বলে যায়। হাতে শুরু হলেই কোথা থেকে আসে লাঠি ছোরা তার সঙ্গে কৃপাণ তলোয়ার বল্লম। খুন গিরে যায়, লাস পড়ে যায়। তবে এ ঝগড়া খুব বড় ঝগড়া হয় নি। আমাদের গাঁয়ের লোক বেশী যায় নি। আট দশজন পুরুষ, দশ বারোজন মেয়ে।

চুড়িওয়ালী বেশী। ওরা ছিল আমাদের থেকে বেশী। হার আমাদেরই হত। মেলা যে গাঁয়ের সে গাঁয়ের লোকেরা এসে মেলার ঝগড়া বন্ধ করলে। কিন্তু ওরা বললে, চল্, পথে দেখা যাবে। আমরা ভয় পেলাম। বাপুজী, এই সময় এল পীতম আর তার মামার বাড়ির গাঁয়ের ছোকরার দল। সব একবয়সী, চৌদ্দ পনের ষোল; নও জোয়ান হব-হব করছে। মুখে ফিনফিনে দাড়ি গোঁফ। হাতে লাঠি। লাঠির ভিতর গুপ্তি। শিখদের কোমরে কৃপাণ।

পীতম বললে, চলো মেহমান। দেখা যাবে। এখনি চল না মেলার বাইরে দেখা যাক।

ওরাও এসেছিল মেলা দেখতে। ছোকরার দল। হিন্দু মুসলমান শিখ। এক এক গাঁও এককাট্টা একদল। ফরক নেই।

ফেরবার সময় পীতমদের দল গাঁও পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল। গাঁওয়ের লোকেরা বললে, গাঁওয়ের ছেলে চল গাঁওয়ে চল।

পীতম বললে, নেহি। এই বউটা কই ডাকলে?

আমি মুখ টিপে টিপে হাসছিলাম। বললাম, ফিরে এস।

সে বললে, না। তুই বড় হ। গওনা হোক তবে নিতে আসব। গাঁওয়ে সরদার আমার উপর রেগে আছে, যাব না।

বলতে ভুলেছি বাপুজী, পীতম ফেরবার সময় তার ঘোড়ার পিঠে আমাকে চড়িয়ে নিজে একটা অন্য ঘোড়ায় চড়ে, পিছনে আমার ঘোড়াটাকে হেঁকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছিল। আমি ঘোড়ায় চড়তে জানতাম। কিন্তু বড় ঘোড়ায় এত জোর ছোটা ছুটি নি। আমি দুই হাতে ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধরে এসেছিলাম। দলের লোক খুব হেসেছিল। আমাদের ঘরের মেয়ের মধ্যে মা ছিল, বাবার চাচারে বহিন আমার ফুফু ছিল। তারা হেসেছিল বেশী। পুরুষ ছিল ফুফুর এক মামা। বয়েস অনেক, বুড়া। সে আমাদের দাদো, সে তো হো হো করে হেসেছিল।

এগিয়ে আসতে আসতে বলেছিলাম, ময় মর যাউঙ্গী।

সে বলেছিল, যা তু মর যা। এমনি যদি মরে না যাস তো তোকে খুন করে খাদে ফেলে দেব বলেই তো এনেছি।

বলে আমার ঘোড়াটাকে আর না মেরে থামিয়ে আমাকে নামিয়ে আদরের লাঞ্ছনায় আমায় নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল।

গাঁওয়ে আমরা ফিরলাম। তারা দলবল নিয়ে সেই রাত্রেই ফিরে গেল।

আমাদের গাঁওয়ে হাওয়া ফিরল। মুসলমান জাঠ সবাই গেল সরদারের কাছে। উত্তমকে আসতে দেওয়া হোক। সে গাঁওয়ের ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে।

সরদারকে বলতে হল, আচ্ছা বেশ।

আমার বাপ জামাইয়ের নামে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কিন্তু পীতম এল না। আসা হল না। সে তখন ইস্কুলে পড়ছে। পীতমের দাদো বললে, লেখাপড়া শিখুক। গাঁওয়ে যাওয়া হবে না। গোঁয়ার চাষা বনে যাবে। বউকে বরং সময় হলে নিয়ে আসব। তাকে যেন তরিবৎ শেখানো হয়, কিছু কিছু লেখাপড়া শেখানো হয়। পীতমকে ফৌজে ঢোকাব, আপ্‌সর করে ঢোকাব। এখানকার পড়া হলে কলেজে দেব ওকে, ফৌজী কলেজে।

বাপুজী, এইটুকু তোমাকে আমি বলি নি।

কেন জানি না, শরম লেগেছিল। না, ওই ঘটনাগুলোকে বলবার মত মনেই করি নি। এসব কথা সে দিনও মনে হয়েছিল তাতে খানিকটা শরম হয়েছিল, আর নিজেই নিজেকে বলেছিলাম, এ আবার বলবার মত কথা নাকি? ওসব তো শ্লেটের উপর খড়ির লেখার মত। কত দুর্যোগের পানি বর্ষালো, কত আঁখের আঁসু ঝরল, তাতে ধুয়ে গেছে বেমালুম—বিলকুল। তবে এই শেষ চিঠি আমার, গোটা জিন্দিগীর জবানবন্দি। সত্যমিথ্যা সব কিছুর হিসাব ফিরিস্তি একটা কথা: বেশরমীর মত বেহায়ার মত শোনাতে পারে তোমার কাছে,

তবে দুনিয়ার মালিকের কাছে তো শরম নেই। শরম করলে চলবে না তাই বলছি, আমার জিন্দিগীতে পীতম শুধু দশ বছরের কনের চৌদ্দ পনের বছরের নামের বর নয়।

সে আমার জীবনের সত্যিকারের দুর্দান্ত পুরুষ। তার নির্যাতন প্রহার সমাদর উপহারের কথা ধোয়া শ্লেটের কালো বুকে কেটে বসে যাওয়া দাগের মত। অস্পষ্ট কিন্তু দাগ পড়েছে। এ কথাগুলো বলি নি তোমাকে। মনে পড়ছে তোমার, সেদিন যখন কথা বলেছিলাম তখন আমি মধ্যে মধ্যে থেমে থেমে বলেছিলাম। থেমেছিলাম এই কথাগুলোতে এসে। নিজে মনে করেছিলাম, একটি ভারী মিঠা কৌতুক বলে মনে হয়েছিল; থেমে হিসেব করে কতটা বাদ দেব ভেবে নিয়ে ফের বলেছিলাম। প্রথম দিন যেদিন ঝুটা বাপের পরিচয় দিয়েছিলাম, এক শিল্পপাগল বিপত্নীক আমীর আমার বাপ ছিল বলে (যেটা ইদানীং সর্বত্র দিতাম) সেদিন তোমাকে এই মেলার হুজ্জোতের কথাটা বলেছিলাম।

পরে যেদিন সত্য পরিচয় দি সেদিন বিয়ের কথা বলেছিলাম এই কথাগুলি বাদ দিয়ে। আমার এই জীবনের এই পালায়, যে পালায় বাপ মা সব কিছুকে পিছনে ফেলেছি বাপুজী, তাদের চোখে দেখতে পেতাম, তাদের দুঃখ কষ্ট সব চোখে দেখেও পিছনে ফেলেছি যেখানে সেখানে সেই গ্রাম্যজীবনের দশ এগার বছরের অপরিণত নারীত্বের স্বাদ স্মৃতির কতটুকু দাম? তাই বলি নি।

তারপর লাগল হাঙ্গামা; দেশ ভাগ হল। আগুন জ্বলল। কাশ্মীরে পাকিস্তানী হানা এল। হিন্দুস্তানের জোয়ানেরা ছুটল রুখতে। আমাদের এলাকা জম্মু হলেও পাকিস্তানের সীমানা থেকে পাঁচ সাত মাইল। কাশ্মীরের মধ্যেও হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া তখন। ও এলাকাও পাঞ্জাবের বেহদ্দ হয়ে গেল। গরীবদের দেশ ছাড়তে হল। প্রথমে খবর এল, পীতমের দাদোর গাঁয়ে বড় হাঙ্গামা হয়েছে। দাদোর বাড়ি লুঠ হয়েছে। দাদো বন্দুক নিয়ে

লড়াই করার সময় গুলি খেয়েছে। পীতম জখম হয়েছে। পীতমের বাপ ছুটল। আমার যাওয়ার মত মন ছিল না, তখন ভয়ে সব কাঁপছি। পীতমের মাও যায় নি। দু' দিন পর খবর হল ওরা এই দিকে এগুচ্ছে। হানা আসবে। আসছে। সকলে দেশ ছাড়ল। শুধু ভয় নয় বাপুজী। দেশে তখন সব হয়ে গেছে। গঁহু নেই, জোয়ার নেই, কাপড়া মেলে না। ভুখা—ভুখা—ভুখা। আর ভয়—ভয়—ভয়। ঠিক হল—চল দেশ ছেড়ে। কোথায়?

—হিন্দুস্তানের যেখানে হোক।

এলাম চলতে চলতে দেহলী। লালকিল্লা, জামা মসজেদ; কুতুব মিনার; দিল্লী ফটক, আজমীর ফটক, কাশ্মিরী ফটক, বাপরে বাপ।

বাসা হল ফুটপাথে; দিল্লীর রোদ দিল্লীর শীত ওই ফুটপাথে শুয়ে পোয়াতে লাগলাম। মনে আর কিছুই রইল না। শুধু ভিক্ষে। আর ভুখা। আর জীবনের দুঃখ। ধরম ইজ্জত সব তো চোখের উপর দেখলাম যেতে লাগল দামড়ির দামে। সরকার থেকে কিছু কিছু টাকা মিলত কখনও কখনও; কিন্তু নিয়মিত টাকা মেরে দিত দালালে আর চোর লোকেরা। সরকারী লোকও তাদের সঙ্গে ছিল।

আজ এখান, কাল ওখান। ওই দালালেরাই চালান করত চুরির সুবিধের জন্য। আর লোক তো পঙ্গপালের মত। দিল্লীতেও তখন হাঙ্গামা চলছে। আজ নেভে কাল জ্বলে। যখন জ্বলে তখন কিছু কিছু মুসলমান পালায় পাকিস্তান। আমরা এসে পড়লাম জি বি রোডের কাছে। গান গেয়ে ভিক্ষে করতাম। ক্রমে ক্রমে মনে আগুন ধরল। প্রথম ধরল বাপুজী, দিনের বেলা দিল্লীর সাজপোশাক-করা বেটীদের দেখে। একদিন কাছে একটা ইস্কুলে ওদের অভিনয় হচ্ছিল। আমি ঢুকে পড়েছিলাম কোন রকমে গলে। দেখে মনে হল, এয় খুদা, এই নাচগানের জন্যে এদের এত সাজ এত রঙ, এত সরঞ্জাম, এত রোশনি! হায়, হায়, হায়! তারপর দেখলাম বাঈজীদের। হায়, হায়, হায়! কি সুখ ওদের! কত আরাম

কত মজা! আর আমি ঘুরছি পথে পথে।

একদিন গিয়ে ধরলাম সেই একটা লোককে যাকে দেখতাম বাঈজীদের বাড়িতে ঢোকে বের হয়। সে আমাকে নিয়ে গেল এক প্রৌঢ়া ব্যবসাদারনীর কাছে। রাখবে একে? ও নিজে বলছে, বাঈজী হবে। গান জানে বলছে নাচও জানে। নাম বলছে হরিপীতম। এই ফুটপাথে থাকে। কাশ্মীরী।

বাঈজী হেসে বললে, মানে জানিস? বুঝিস?

বলেছিলাম, জানি। বুঝি।

—বল তো।

আমি তোমার মন্দ মেয়ে বাপুজী। আমি, মাথা হেঁট করে অবশ্য বলে দিয়েছিলাম।

সে বলেছিল, আচ্ছা। বহুত আচ্ছা।

তারপর প্রশ্ন করেছিল, ভয় করবে না?

—না।

—কিন্তু এতে পাবি কি?

—অনেক টাকা। ভাল কাপড় পোশাক।

—ঠিক আছে। আচ্ছা গানা শোনা তো।

গান শুনে সে বলেছিল, একে এখন থেকে বরবাদ করিস নে। ওকে গানা শিখতে দে। এর হবে। ওর নাম দে রৌশন। বাপুজী, বরবাদ, একদম বরবাদ হয়ে যেতাম কিন্তু এই গান বাঁচিয়ে দিলে। বাপুজী, লাল কুঁয়রের গল্প তখন জানতাম না। তা হলে সেদিন মনে মনে ভাবতাম, লাল কুঁয়র হব। তখন তো জানতাম না, আজাদ হিন্দুস্তান ডেমোক্রেটিক দেশ, এখানে বাদশা নেই সে আমলের মত কিংবা কাশ্মীরের মত রাজাও নেই।

এরপর পুলিশ হানা দিলে। উদ্ধার করে নিয়ে গেল।

তখন ওই পরিচয় তৈরি করলাম। আমি এক শিল্পপ্রাগ-

আমীরের বেটী। নইলে আবার যেতে হত সেই ফুটপাথে। উধম সিং জন্মদাতা বাপ, তার সঙ্গে তার দারিদ্র্যের জন্যে তার আগেই তো সম্পর্ক ছিঁড়েছি। আবার কেন? আর ফিরে যাওয়া যায়? বাঈজীর বাড়িতে তখন কিছু সাজগোজ রঙচঙএর স্বাদ পেয়েছি, সামনে দেখেছি সে যেন রঙমহলের দরওয়াজা খোলা। ভিতরটা ঝলমল করছে। সাড়ে দশ বছরে এসেছি দিল্লী। এখানে এসেছি এগার বছরে, তখন বয়স বারো। আর কয়েক বছর গেলেই ওই দরওয়াজায় ঢুকবার সময় হবে, একতিয়ার মিলবে। আমি ঢুকে গিয়ে রানী হয়ে বসব। এ স্বপ্ন ভাঙল। পুলিশ পাঠালে অনাথ আশ্রমে। সেখানে মেজাজ খারাপ হল। পালাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। হঠাৎ একদিন মিলল একখানা পিতলের থালা, সেটা লুকিয়ে রেখে দিলাম; একটা পেরেক আর পাথর জোগাড় করে তাতে ছবি আঁকলাম। সেটা পড়ল অনাথ আশ্রমের মেট্রনের হাতে। সে বললে, আর কি পার? আমি খড়ি নিয়ে ছবি এঁকে দেখালাম।

এর থেকে বদলালো জিন্দিগী। পাঠালে ওরা রেফ্যুজীদের শিল্প-শিক্ষার সেন্টারে। সেখান থেকে আর্টস ক্র্যাফ্‌ট্‌সের মাঝের তলায়। স্টাইপেণ্ড মিলল।

শিখলাম এখানে, অনেক শিখলাম। বুদ্ধি ছিল, ওই কাজে দখল ছিল। তাড়াতাড়ি শিখলাম। আর শিখলাম সাজপোশাক, নতুন জিন্দিগীর মানে। বাপুজী, এসব শিখতে আমার দেরি লাগে নি। জলদি জলদি শিখেছি। আর আমার মনের সাধ বেড়েছে। অনেক, অনেক চাই আমার। অনেক। তার সঙ্গে শিখলাম মেয়েদের কাছে হাসতে চলতে, পুরুষদের নিয়ে খেলতে। ওঃ কি যে মজা, কি যে আনন্দ! ঠকাতে কি করে হয় জানতাম। ছেলেবেলাতে নিজে শিখেছিলাম। আবিষ্কার করেছিলাম সেই শিখ ছোকরাকে ঠকিয়ে। ও হয়তো সব মেয়েই জানে। কিন্তু সব মেয়ে তো আমার মত মন্দ নয়। ওটাকেই পেশা করে না। সব মেয়েই একজন বা

দুজনকে ঠকায়। আমি আর্টস্ ক্র্যাফ্‌ট্‌সের সঙ্গে সাজগোজ, একালের সব রুচি সব রঙএর সঙ্গে, সব লোককে ঠকিয়ে এ দুনিয়ার কৌতুক রসে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে বলে যাব নেমে পড়লাম।

বাপ মা ভুলে গেছি। সেখানে ফিরে যাওয়া যায় না।

তুমি যেদিন মা বল সেদিন ভারী খারাপ লেগেছিল আমার।

হঠাৎ বাপুজী, আমাকে যেন কে টেনে ধরলে। ডুবে গিয়ে যেন জল খেলাম খানিকটা। চমকে গেলাম একদিন। আর্টস্ ক্র্যাফ্‌ট্‌স্ থেকে বেরিয়েই দিনকতক কাজ পেয়েছিলাম সরকারী ডেকরেশনের ইউনিটে। একদিন ডিফেন্স মিনিস্ট্রির একটা প্যাণ্ডেল সাজাবার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ফাংশন ছিল। ডিফেন্স মিনিস্টার কয়েকজন জোয়ান আর অফিসারকে মেডেল দেবেন।

প্যাণ্ডেলে আমি আর ক'জন ছিলাম, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাজসজ্জা নিখুঁত করে রাখবার জন্য। এটা পড়ে যায়, ওটা সরে যায়, সেটা বেঁকে যায়, হেলে যায়, সেগুলোকে ঠিক করে দেবার ভার আমাদের। সব ক'টিই মেয়ে। তারা শোভাও বাড়ায়। খুঁটিতে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একের পর এক জোয়ানেরা এসে মেডেল ডেকরেশন নিচ্ছিল।

হঠাৎ শুনলাম, লেফ্‌ট্‌নাণ্ট পীতম সিং!

চমকে উঠলাম। পীতম সিং!

দেখলাম ছ ফুট লম্বা জোয়ান। দাড়ি কামানো, সুচলো গোঁফ, সবল পদক্ষেপে এসে পায়ের জুতোয় জুতোয় খট শব্দ করে দাঁড়িয়ে মিলিটারী স্যালুট্ করলে। আমি দেখেছিলাম। আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কিসের একটা স্রোত বয়ে গেল। সে আগুনের স্রোত না হিমের স্রোত মনে নেই। কিন্তু নিদারুণ ভয় হয়ে গেল।

হঠাৎ মনে হল সামনে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি যেন আমার মুখের উপর। কাঁধের নীচে সেই ছুরির দাগের মধ্যে অসহ্য একটা ব্যথা অনুভব

করলাম। আমি বেরিয়ে পালিয়ে এলাম। এবং ওই জন্যেই আমার চাকরি গেল। তা যাক। পীতম আমাকে দেখতে পেলে খুন করবে। জীবনে যা করেছি তার জন্যে কোন অপরাধ-বোধ আমার ছিল না। বাপ উধম সিংকে দেখেও তা মনে হত না। কিন্তু পীতমকে দেখে আমার যে ভয় হল তার অর্থ ও ছাড়া আর কি হতে পারে। আমার যুক্তি তো সে মানবে না। যে ছুরি মেরে নিজের যুক্তিকে কায়েম করে তার সামনে অপরাধ মেনে দণ্ড নিতে হয়, নয় পালাতে হয়।

মনে আছে তোমার, তোগলকাবাদে সেই কুলুঙ্গিতে বসে থাকা? তার কারণ শুধু হুঁচোট লাগা নয়। একদল জোয়ান এসেছিল সেদিন সেখানে। তোমার এও মনে আছে বোধ হয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখানে একদল জোয়ান এসেছিল তারা চলে গেছে? ওদের আমার ভাল লাগে না।

তুমি প্রতিবাদ করেছিলে।

যেদিন তোমাকে সব কথা বলে শেষ বিদায় নিয়ে আসি সেদিনও আমি রাস্তা দিয়ে একদল ফৌজের মার্চ দেখেছিলাম। দেখেছিলাম, পীতম আছে কিনা? অথচ পীতমের থাকার কথা নয়।

পীতমের তখন আর্মি থেকে চাকরি গেছে।

কেন জান?

কাশ্মীর শ্রীনগরে সে একজন আধুনিকা তরুণীর হাত চেপে ধরেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, কে তুমি? কি নাম তোমার?

সে তাকে ধমক দিয়েছিল, ছাড় অসভ্য কোথাকার!

—নাম না বললে ছাড়ব না।

মেয়েটির চেঁচামেচিতে লোকজন আসে। মিলিটারী পুলিশ আসে। তাকে অ্যারেস্ট করে। সে বলেছিল, ওর নাম হরিপীতম, আমার স্ত্রী, হারানো স্ত্রী। ওর বুকে আমার নাম লেখা আছে উল্কিতে—পীতম।

কোর্টমার্শালে পীতমের শাস্তি হয়। চাকরি যায়।

আমার ভয় বেড়ে গিয়েছিল বাপুজী। পীতম হরিপীতমকে আজও

খুঁজছে। তাকে কে বোঝাবে হরিপীতম জন্মান্তরে রৌশন হয়ে জন্মেছে। আগের জন্মের স্বামীত্ব আর জন্মে দাবি করা চলে না। কোন মুলুকে কোন আইনে নেই। বিধাতাও এ দাবি স্বীকার করেন নি। এ হয় না।

আমি এর পর দিল্লী থেকে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হলাম। কোথায় যাব? বম্বে। সিনেমায় যদি নামতে পাই! তা হলে সব পাব। সব। অর্থ পাব সুখ পাব, তামাম লোকের মনোহারিণী প্রিয়া হব।

দাদাসাহেব আমার পরম উপকারী। তুমি স্নেহ করেছ। দাদাজী করুণা করেছে, উপকার করেছে। চিঠি নিয়ে বম্বে গেলাম। পার্ট পেলাম। ছোট পার্ট। গাঁয়ের গল্প, এক চাষী বউয়ের পার্ট। নায়িকার ভাইয়ের বউ। ঘরে ননদ এবং অন্য মেয়েদের সঙ্গে একটু নাচও ছিল।

পার্ট আমার ভাল হল না। কিন্তু তবু দমলাম না। ঘুরতে লাগলাম। অনেক মূল্য দিলাম। অনেকজনের সঙ্গে ড্রিংক করতে হল, মোটরে বেড়াতে হল। হোক, পার্ট আমার চাই।

হঠাৎ একদিন বাপুজী সমুদ্রের ধারে জুহুতে ছবির রাজ্যের এক-জনের সঙ্গে পরিহাস লাস্যের স্তাবকতা করছি, সে এসে সামনে দাঁড়াল।

আমি বিবর্ণ হয়ে গেলাম।

—হরিপীতম!

চোখে গগল্‌সটা পরে বললাম, কি বলছ? কাকে বলছ!

—তোমাকে? তুমি হরিপীতম।

—না।

—তোমার নাম তো রৌশন।···ছবিতে বহু সেজেছ? তাই বা বলতে হবে কেন। তুমি হরিপীতম। তোমার বুকে আমার নাম লেখা আছে।

সে হাত বাড়িয়ে ধরলে আমার জামা। বাধা দিলে আমার সঙ্গী। একটা ঘুষি মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে আমার জামা ধরে টানলে, আমি প্রমাণ বের করব। দেখতে দেখতে লোক জমে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল

তার উপর। একা তার কত শক্তি! সে চেঁচাতে লাগল, দুনিয়া ঢুঁড়ছি ওর জন্যে। হরিপীতম! ওর জন্যে আমি নরকে যেতে হয় যাব। ছাড় আমাকে। চিৎকার করে ডাকলে, হরিপীতম! হরিপীতম!

গোলমালের মধ্যে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালাম। শুধু জুহু থেকে নয়, বম্বে থেকে। খবর অবশ্য পেলাম, পুলিশ আমার খোঁজ করছে। সাক্ষী দিতে হবে। আমি পালিয়ে গেলাম কলকাতা। তাতে মামলা আটকাল না। মারপিট এবং আমার হাত টানার সাক্ষীর তো অভাব হয় নি। ওর জেল হয়ে গেল আট মাসের!

সে বলেছে শুনলাম, আদালতে, হরিপীতম আমার স্ত্রী, তাকে আমি খুঁজছি। সে আমার কাছ থেকে পালাচ্ছে। আমি তাকে সেদিন ধরেছিলাম। তার বুকে আমার নাম লেখা আছে পীতম। আমার বুকে তার নাম হরিপীতম। তাকে পেতে যে দণ্ড নিতে হয় নেব। স্বর্গ নরক যেখানে সে যাবে তার পিছন পিছন যাব। তাকে না পেলে আমার জীবন মরুভূমি। পেতেই হবে তাকে আমাকে।

আট মাস জেল শুনে সে বলেছিল, বহুৎ আচ্ছা, আট মাস পর তাকে ধরব আমি। যদি শুনি সে মরেছে তবে আমিও মরে তার পিছনে ছুটব।

বাপুজী, আমার সারা জীবনটা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে গেল সেই দিন। আট মাস আগে। নিরাশ্রয় হয়ে পথে দাঁড়ালাম। যেন সেই দিল্লীতে এসে সেই ফুটপাথের ধারে বাসা বাঁধলাম মনে মনে।

তোমাকে বলেছিলাম, আমি কারুর জন্যেই, মা বাপ সে যেই হোক, কারুর জন্যেই ওদের জীবনে ফিরে যেতে পারি না। পারব না। কেন যাব? অর্থহীন! আমি মডার্ন মন্দ মেয়ে রৌশন বাপুজী, সেই আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, বাপুজী, দুনিয়ায় মেয়েরা বাপ ভুলতে পারে, মা ভুলতে পারে, সন্তানও ভুলতে পারে কিন্তু তার সেই দিলের আদমী প্রাণের পুরুষকে ভুলতে পারে না। দয়া মায়া স্নেহ মমতা সব ভোলা যায় ভুখের রোটীর জন্যে, দুনিয়ার সুখের জন্যে, আরামের জন্যে,

খাতিরের জন্যে, ভোলা যায় না মহব্বতি, যে প্রেম পুরুষের পৌরুষ সাহস শক্তি প্রতিষ্ঠা আর ওই মেয়ের জন্য সব দিতে পারার ত্যাগ স্বীকার দিয়ে জড়ানো।

বাপুজী, আমার মন প্রাণ চীৎকার করতে লাগল, পীতম—পীতম—পীতম! পীতমকে চাই। পীতমকে চাই। পীতম!

মনে করলাম জেলে গিয়ে দেখা করব। কিন্তু সাহস হল না। বম্বে গিয়ে ফিরে এলাম। এসে করলাম কি জান?

সাহাদারার ওই দিকে গিয়ে গাঁয়ের মেয়ের জীবন অভ্যাস করতে লাগলাম। লম্বা চুল রেখে শুরু করলাম গাঁয়ের জীবন। হরিপীতম পীতম সিংয়ের স্ত্রী।

কিন্তু পারলাম না, কিছুতেই পারলাম না। সহ্য হয় না, হল না। আমার তপস্যা সিদ্ধ হল না। এই জীবন ছাড়তে পারছি না। নানান মানুষ এমনভাবে আমাকে এই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে, তারা টানছে। যেমন সেইদিন রাত্রে হোটেলে এক বদমাস আমাকে জড়িয়েছিল। নানান অভ্যাস আমাকে বেঁধেছে। দেবে না। তারা আমাকে পীতমের কাছে যেতে দেবে না। আমি কি করব?

কাল সে খালাস পাবে। আমার হিসেব সঠিক। রেমিশন বাদ দিয়ে হিসেব করেছি। আজ সাত দিন ভাবছি, কাঁদছি।

পীতমকে পেতেই হবে। মহব্বতি ভোলা যায় না!

কিন্তু এ জীবন আমাকে ছাড়বে না।

তাই জীবন থেকে ছুটি নেব। সংকল্প স্থির হতেই মন শান্ত হয়ে গেল। উঁচু থেকে নীচে নামতে হবে তো। তাই কুতব থেকে—।

নমস্তে পিতাজী!

তোমার মন্দ মেয়ে

রৌশন

কেটে দিয়ে লিখেছে, হরিপীতম!

প্রেম ও প্রয়োজন

মাঝখানে দালাল দাঁড়াইয়াছিল মহাজন কড়ি গাঙ্গুলী। সেই এহেন অঘটন ঘটাইল, তাহারই যোগাযোগে রমণদাস বিক্রয় করিল। রমণদাস দাম পাইল মন্দ কি ?

কড়ি গাঙ্গুলীর নিকট হইতে পাঁচশো টাকার বন্দকী দলিলখানা ফেরত পাইল, আমড়হরার জোতে বিঘা সাতেক জমি, আর হালের জন্য একজোড়া গরু। তবে ভবিষ্যতের আশা বিপুল। রমণ সেই আশাতেই ভোর হইয়া কাজটা করিল। কড়ি গাঙ্গুলী বোলেচালে ভবিষ্যৎটিকে রমণের চোখের সম্মুখে সুপ্রত্যক্ষ উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে রমণদাসের কাঁচা পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়া বেশ মিঠা হাসির রেশ ফুটিয়া উঠিল। লোহা নরম হইয়াছে দেখিয়া কড়িও সঙ্গে সঙ্গে ঘা দিয়া বসিল, কহিল—হবে কি ? সেদিন মনে কর তোর হয়েছে। কাল দেখবি যখন জুড়ি গাড়ী এসে তোর দোরে দাঁড়াবে।

রমণদাস মুগ্ধ হইয়া গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিয়া বসিল। ঘরে স্ত্রী ক্ষুণ ক্ষুণ করিতেই সে গাঙ্গুলীর কথাগুলিই তাহাকে সাড়ম্বরে বুঝাইয়া দিয়া বলিল—কথাটা একটু তলিয়ে বুঝিস, বুঝলি মাগী—তলিয়ে বুঝিস। নইলে মাটি আর গরুর জন্যে কি রমণদাস মেয়ে বিক্রী করে ?

—রমা যেদিন গয়না পরে গাড়ী চড়ে বাড়ির দোরে এসে নামবে সেই দিনই দেখবি। আর গাঁয়ের লোক যেদিন সুপারিশের জন্য এসে জ্বালাতন করবে সেই দিন বুঝবি। ঐ কড়ি গাঙ্গুলী, ওকেও আসতে হবে, দেখিস তুই—ও-ও এসে বলবে 'দাস, রমাকে বলে ওই কাজটা আমার করিয়ে দিতে হবে।' না হয় আমার দুটো কান তোর বঁটি দিয়ে কেটে দিস। কথাগুলো পরে না বোঝে তুই বুঝিস।

পরে পাঁচজনেও নির্বোধ নয়, সে কথাটা তাহারা বেশ বুঝিয়াছিল। কিন্তু পরের ঈর্ষা করা নাকি মানুষের স্বভাব। তাহারা রমণদাসের নিন্দার আর বাকী রাখিল না। পাড়াগাঁয়ে সংবাদপত্রের অভাব আছে সত্য কিন্তু সংবাদদাতার অভাব নাই। রমণের বন্ধু হেলু মণ্ডল আসিয়া কহিল—আর দাদা, এরই মধ্যে শালাদের ছটফটানির আর অন্ত নেই।

রমণদাস পুলকিত হইয়া কহিল—কি রকম, কি রকম শুনি।

হেলু কহিল—শালারা সব রাতারাতি ধম্মের গাছ হয়ে উঠেছে। কেউ ধম্ম দেখাচ্ছে, কেউ বলছে পতিত করব। মাগীগুলোর তো ঘাটে পথে ঐ কথা ছাড়া আর কথাই নেই। গালে হাত দিয়ে সব বলছে—হায় কলিকাল,—বিধবা মেয়ে, অ্যা!

রমণদাস হাসিতে শুরু করিল—কি বলছে, পতিত করবে. না? হি-হি-হি। ধম্ম—না কি ভায়া অ্যা-হি-হি-হি।

সে হাসি তাহার আর শেষ হয় না। স্তরে স্তরে গমকে গমকে বাহির হইতে শুরু করিল। হেলু উঠিয়া গেল। তখনও সে মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেছিল। হাসিতে হাসিতে সে তাহার স্ত্রীর নিকটে আসিয়া অতি বিস্তারে সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিল—দেখলি মাগী বলেছিলাম কি না? দেখলি, এরই মধ্যে শালাদের উসখুসুনি।

গোবরে পদ্ম ফোটে না, কিন্তু গবিবের ঘরে নীচ জাতির মধ্যে রূপ দেখা যায়। রমণদাস জাতিতে নিম্নবর্ণ; অবস্থায় দরিদ্র, কিন্তু তাহার কন্যা রমা রূপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে রূপ অপরূপ না হইলেও সুরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। রমাকে কাহারও একবার দেখিয়া আশ মেটে না। বারবার দেখিতে ইচ্ছা করে।

এই রমাই বিক্রয় হইল। ক্রয় করিলেন এই অঞ্চলের জমিদার মহেন্দ্রবাবু। বিপত্নীক জমিদারের বালক পুত্রকে প্রতিপালন করিতে একটি নারীর প্রয়োজন ছিল।

পত্নীবিয়োগের পর বাবু আর বিবাহ করিলেন না। বিগতা ভাগ্যবতী পত্নীর প্রতি প্রেম তাহার একটা কারণ হয়তো বটে, কিন্তু আরও একটা কারণ ছিল। মহেন্দ্রবাবু সেটা নিজ মুখেই বলিয়া থাকেন।

—কি হবে আবার বিয়ে করে? আবার কতকগুলো ছেলে-পিলের পাল বাড়ানো তো? সম্পত্তি টুকরো টুকরো করে কেটে ভাগ হবে। ও আমি পছন্দ করি না। বেশী কতকগুলো ছেলে-মেয়ে—ও হচ্ছে লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ।

চাঁদের কলঙ্করেখার মত ঐশ্বর্যের সঙ্গে সত্যের এ দাম্ভিকতা মানায় ভাল। সুতরাং পুত্রের জন্য এখন একটি নারীর প্রয়োজন হইল।

কড়ি গাঙ্গুলী ওরফে এককড়ি গাঙ্গুলী বাবুর মহালের মধ্যে মহাজনী কারবার করিয়া থাকে। বাবুর অনুগত বুদ্ধিমান লোক সে। বুদ্ধিমান কড়ি চট করিয়া বাবুর এই প্রয়োজনটির গুরুত্ব অনুভব করিল। বিজ্ঞাপন না দিলেও এই নারীটির কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের বিশেষ প্রয়োজন তাহাও সে অনুমান করিয়া লইল।

এদিকে রমণদাসের খতখানা যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে। আবার রমাও ভাসিয়া যাইতেছে। সবদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে অনুভব করিল এই সুযোগে রমার একটা গতি করিয়া দিলে সব সমস্যাই অতি সহজে মিটিয়া যায়। কারণ বাবুর মনে মনে ছকা বিজ্ঞাপনের নারীমূর্তিটির সহিত রমা যেন খুব ভাল মিলিয়া যাইতেছে। ভরসা করিয়া গাঙ্গুলী উঠিয়া পড়িল।

রমণদাসকে রাজী করিয়া সেদিন সে রমাকে লইয়া বাবুর দরবারে হাজির হইল। অজুহাত একটা নালিশের। বিধবা রমাকে দেবর ভাসুর খাইতে দেয় না, বিষয়সম্পত্তির ভাগ দেয় নাই। নালিশ তাই লইয়া, খোরপোশ কিংবা বিষয়ের ভাগ রমাকে পাইতে হইবে।

মহেন্দ্রবাবু তখন তাঁহার খাস বৈঠকখানার কামরায় বসিয়া ছিলেন। জনা দুই কর্মচারী সম্মুখের টিপয়টার উপর কতকগুলি খাতাপত্র ফেলিয়া তাঁহাকে বুঝাইতেছিল। গাঙ্গুলী আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

তারপর পিছনের পানে উদ্দেশ করিয়া একটা শোরগোল তুলিয়া ফেলিল।

আয় আয়,—এগিয়ে আয়। পেন্নাম কর পেন্নাম কর। সিঁড়ির নীচে উঁচু দাওয়ার দেওয়ালের আড়ে দাঁড়াইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। গাঙ্গুলীর হাঁকে সে কয় পা অগ্রসর হইয়া আবার দাঁড়াইয়া গেল। গাঙ্গুলী আশ্বাস দিয়া কহিল—ভয় কিসের রে বাপু? কান্নাই বা কিসের? বাবুর পায়ে গড়িয়ে পড়, সব উপায় হবে তোর।

রমা কিন্তু আড়ালেই দাঁড়াইয়া রহিল। গাঙ্গুলী বিরক্ত হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া কাছে আসিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল—চল ফিরে তোর বাবার কাছে। বাবা কি বলে দিলে তোকে? পায়ে চেপে ধরতে বলে দেয় নি? দয়া কি মানুষের অমনি হয়? বাবা তোর আর ভাত দেবে না তা মনে থাকে যেন।

রমা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল—সম্পত্তি তারাই ভোগ করুক কাকা, আমি খেটে খাব। বাবুর সামনে আমি যেতে পারব না।

সে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। কড়ি গাঙ্গুলী খাঁটি বাস্তব রাজ্যের লোক; সে রমার এই আকুলতা আমলেই আনিল না। একরকম জোর করিয়াই রমাকে সে মহেন্দ্রবাবুর সম্মুখে আনিয়া কহিল—পেন্নাম কর, পায়ের ধুলো নে।

কড়ি গাঙ্গুলীর হাঁকে ডাকে সকলেই একটা কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল। কিন্তু এমনটি কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

হরিণীর মত শঙ্কিতা, অতি কোমল ফুলের মত একটি নারী। জটিল বিষয়তত্ত্বটির যেন খেই হারাইয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু মেয়েটির মুখ হইতে দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারেন না। কর্মচারী দুইজনও চকিতের মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। মহেন্দ্রবাবু অকারণে নড়িয়া চড়িয়া ভাল হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। তারপর কড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি, কি হয়েছে এর? বঁস তুমি।

কড়ি এতক্ষণে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া কহিল—কাজটা শেষ হোক আপনার।

মহেন্দ্রবাবু কড়ির মুখপানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, হুঁ। তারপর আর একবার খাতাপত্রগুলি টানিয়া লইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কিন্তু জটিল বিষয়টি আরও যেন জট পাকাইয়া বসিয়া আছে। সহসা হাতের পেন্সিলটি ফেলিয়া দিয়া মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—এর পরে নিয়ে এসো। নিজেরা আগে ভাল করে বুঝে তার পরে বোঝাতে এসো।

কর্মচারী দুটিও বাঁচিল। তাহারা নিঃশব্দে খাতাপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। সিঁড়ির পথে নামিবার সময় তাহাদের চোখে চোখে কি একটা কথার আদানপ্রদান হইয়া গেল। এও একটু হাসিল, ও-ও একটু হাসিল।

মহেন্দ্রবাবু গাঙ্গুলীকে কহিলেন—কি, ব্যাপার কি?

গাঙ্গুলী রমাকে বলিল—বল, বাবুকে সব খুলে বল।

কিন্তু রমা যেন মূক হইয়া গিয়াছে।

গাঙ্গুলী একটা ধমক দিয়া কহিল—বল না রে বাপু।

রমা কিছু কহিল না। মহেন্দ্রবাবু গাঙ্গুলীকে একটা ধমক দিয়া উঠিলেন—তুমিই বল না হে বাপু। ছেলেমানুষকে এ রকম ধমক দিচ্ছ কেন?

ধমক খাইয়া গাঙ্গুলীর ছাতিটা দশহাত হইয়া উঠিল। আড়ম্বর করিয়া নালিশের বিবরণ সবিস্তারে গোচর করিয়া কহিল—এখন হয়েছে কি জানেন, হতভাগীর একূল-ওকূল দুকূল যেতে বসেছে। এক কূল খেলে কপাল, অন্য কূলে ভাই ভাজ দিচ্ছে কাঁটা। বাপ-মা তো আর ফেলতে পারে না। কিন্তু ভাই ভাজের সে সহ্য হয় না। আর তারা পুষতেই বা পারবে কোথায় বলুন। আমার কাছেই তো পাঁচশো টাকা দেনা। বাড়ি ঘর পর্যন্ত বন্ধক রয়েছে। এখন আপনার চরণে এনেছি, ভাসিয়ে দিতে হয়, কিনারা করতে হয়—যা করতে হয় আপনি করুন।

মহেন্দ্রবাবু কাঁচা লোক নন। বিষয় জট পাকাইতে তাঁহার মত তীক্ষ্ণধী লোক এ অঞ্চলে আর নাই। জলের ধারে দাঁড়াইয়া তিনি অথই

জলের মাছের সন্ধান করিতে পারেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি আবার একবার গাঙ্গুলীর মুখের পানে চাহিলেন। তারপর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন, শোন—এদিকে।

অন্তরালে গাঙ্গুলীকে কহিলেন, তোমার কি চাই বল।

ভূমিকা তিনি ভালবাসেন না। পরিষ্কার সোজা কথা তাঁহার। গাঙ্গুলী মাথা চুলকাইয়া একটু আমতা আমতা করিতেই তিনি সোজাসুজি কহিলেন—তোমার চেয়ে ঢের বদমাস আমি গাঙ্গুলী, তোমার মতলব কি খুলে বল দেখি।

গাঙ্গুলী প্রথমেই ধমক খাইয়া একটু ঘাবড়াইয়া গেল। সে কতকগুলা অসংলগ্ন কথা জড়াইয়া একটা অর্থহীন উত্তর দিয়া বসিল—আজ্ঞে তা ওর বাপ-মা—

মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—ওর বাপ-মায়ের দোহাই ছাড়ো। সে থাকলে তো ওর বাপকেই তুমি এখানে আনতে পারতে। ওকে নিয়ে এলে কেন?

—আজ্ঞে ওর নালিশ, ও বাদী—

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন—বাদী বিবাদী সাক্ষী সমন উকীল আদালত ওসব ছাড়ো। তোমার নিজের কথা বল। কি চাই তোমার? সেই টাকাটা উদ্ধার তো?

গাঙ্গুলী হাত জোড় করিয়া কহিল—আজ্ঞে এর বাপও পাঁচশো টাকা ধারে।

বাবু ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—অর্ধেক পাবে, আড়াই শো টাকা। খত ওর বাপকে দিতে হবে। আর যা দিতে হয় সে দেব আমি। ও থাক আমার বাড়িতে, ছেলেটাকে মানুষ করবে।

গাঙ্গুলী বাকীটা আর বাবুকে কহিতে দিল না; কৃতজ্ঞতার কলরব তুলিয়া বাবুকে নির্বাক করিয়া দিয়া কহিল—দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, সে তো ওর ভাগ্যি, মহাভাগ্যি। নে নে রমা, পেন্নাম কর, পেন্নাম কর। হতভাগা মেয়ে ইদিকে আয়। সে হিড়হিড় করিয়া রমাকে ওপাশ হইতে টানিয়া আনিয়া বাবুর সামনে আবার দাঁড় করাইয়া দিল। প্রণাম

করিবার হেতু বুঝিবার কোন প্রয়োজন রমার ছিল না। দুনিয়াতে সে পায়ের তলাতেই তো পড়িয়া আছে। আজ্ঞামাত্র প্রণামও সে করিল। কিন্তু ভাগ্য যে তাহার সহসা কেমন করিয়া সৌভাগ্য হইয়া উঠিল তাহা সে বুঝিল না। সে তো জানে ভাগ্য তাহার দগ্ধ হইয়া গেছে। পোড়া-কপালী যে তাহার ডাকনাম! একান্ত সরল বিস্ময়ে রমা তাহার ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া বামুনকাকার পানে চাহিল। বামুনকাকা গদগদ হইয়া কহিল—রাজার মা, তুই রাজার মা হলি রমা। খোকাবাবুকে মানুষ করবি, এখানেই থাকবি। না বিইয়ে গোপালের মা হয়েছিল এক যশোদা আর সেই ভাগ্যি হল তোর।

এ সংবাদে রমার বঞ্চিত চিত্তে একটা উল্লাস জাগিয়া উঠিল। সে উল্লাসের একটি তরঙ্গ তাহার অধরের তটরেখায় মৃদু উচ্ছ্বাসে দেখা দিল। মহেন্দ্রবাবু রূপের এই নব বিকাশে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গাঙ্গুলী বাবুকে প্রণাম করিয়া কহিল—তা হলে আজ আসি হুজুর।

একাগ্রতাভঙ্গে বাবু একটু চকিত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন—মেয়েটি তাহলে বাড়ির ভেতরে যাক।

জোড়হাত করিয়া গাঙ্গুলী কহিল—ওর বাড়িতে একবার বলা দরকার তো। তা কালপরশু যেদিন হোক আমি নিজে এসে—

বাধা দিয়া মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—পরশু নয় কাল। কালই ওকে তুমি নিয়ে আসবে। আর শোন, এদিকে এসো।

আবার অন্তরালে গাঙ্গুলীকে লইয়া গিয়া কহিলেন—বেশী চাল চালতে যেও না গাঙ্গুলী। তাহলে হবে সবই, মধ্যে থেকে মরবে তুমি। বুঝলে—

গাঙ্গুলী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—সর্বনাশ, সর্বনাশ। দেখুন দেখি আমার ঘাড়ে কি দশটা মাথা গজিয়েছে নাকি? কালই আমি ওকে নিজে সঙ্গে ক'রে এনে রেখে যাব।

বাবু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—আচ্ছা। আর নেহাত যদি কাল না হয় তবে পরশু।"

বাবু কহিলেন—হুঁ যাও।

গাঙ্গুলী কিন্তু গেল না। দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

বাবু কহিলেন—হ্যাঁ—তাহলে আজ যাও।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গাঙ্গুলী আবার ফিরিল। এবার যেন মরিয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল—আজ্ঞে আমার টাকার ব্যবস্থাটা তা হলে—

মহেন্দ্রবাবু ফিক করিয়া হাসিয়া কহিলেন, ভয় নেই, সে হবে। তোমার দায়ে আমি ইনসলভেন্সি নেব না। ও যদি কাল এখানে আসে তো পরশু তোমার ব্যবস্থা হবে। টাকাটা যে দেব সে আমি ওর সম্পত্তির দাম থেকে দেব। ও এসে ওর স্বামীর সম্পত্তি আমাদের লিখে দেবে। সেই দাম থেকে তুমি টাকাটা পাবে। তারপর ওর দেওর ভাসুরের সঙ্গে আমি বুঝে নেব। নইলে মানুষ কেনা তো আমার ব্যবসা নয়।

গাঙ্গুলী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তারপর আবার বাবুকে গিয়া কহিল—ও আর বাড়ি গিয়ে কি করবে? আজ থেকেই এখানে থাক। আমি বাড়ি গিয়ে সব বলব'খন।

বাবু কহিলেন—না যাক, একবার ঘুরেই আসুক। বেশ প্রসন্ন মন লইয়া গাঙ্গুলী ফিরিতে পারিল না। দেনাপাওনার সংসারে সে ধারে কারবার পছন্দ করে না। অন্ততঃ ধারে দেওয়া গাঙ্গুলীর নীতি নয়; দোকানী গুপো দত্তর কথাটা তাহার খুব ভাল লাগে। দোকানে ধার চাহিলে সে বড় বড় গোঁফ জোড়াটা নাড়িতে নাড়িতে সবিনয়ে কহে—বিলাত ফেলতে আমি পারব না বাবা। বিলাত এখান থেকে অনেক দূর। সে যাবার ক্ষমতা আমার নাই।

ধার দেওয়াকে গাঙ্গুলীর দেশে বলে বিলাত ফেলা। গাঙ্গুলীও মনে মনে তাহার এই বিলাতের কথা ভাবিতেছিল। তাহার বিলাত যাইতে তো লাগিবার কথা একদিন। কিন্তু মধ্যের ব্যবধানে সমুদ্র যদি অকস্মাৎ পরিধিতে বাড়িয়া যায়! কিংবা ফাঁপিতে থাকে, তবে? লাল কাঁকর বিছানো সরকারী পাকা রাস্তা বিস্তীর্ণ মাঠের বুক চিরিয়া

বিসর্পিল গতিতে চলিয়া গিয়াছে। দুই পাশে শ্যাম শোভাময় অবারিত মাঠ। উপরে আকাশ প্রসন্ননীল। আশ্বিনের প্রথমেই আউশ ধানের সদ্যোদ্গত মঞ্জরীগুলি হইতে একটি স্নিগ্ধ মৃদু গন্ধ উঠিতেছে। শরতের রৌদ্রের একটি সুপ্রসন্ন শুভ্রতা মানুষের চিত্তে অকারণে উল্লাস জাগিয়া তোলে। রমার চিত্তেও ঠিক এমনি মৃদু উল্লাস জাগিয়াছিল। রাস্তায় ঠিকাদারের লোক রাস্তা মেরামত করিতে লাগিয়াছে। সাঁওতাল পুরুষ-নারী সব, সকলের সবল কালো দেহে সুস্থতার একটি স্নিগ্ধ আনন্দ।

রুক্ষ চুলে জবাফুল গোঁজা, দৃঢ় দেহের সবল লীলায়িত গতির সঙ্গে সঙ্গে জবার শীষগুলি তালে তালে নাচিতেছে।

রমার বেশ লাগিল এদের। একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ার তলায় একটি নধরকান্তি শিশু একখানা ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের উপর শুইয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতেছিল। তাহার মা আসিয়া কৃত্রিম কোপে আপন ভাষায় তিরস্কারের মধ্য দিয়া তাহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইল। শিশুটি পরমানন্দে জননীর বুকভরা স্নেহধারা পান করিতে আরম্ভ করিল। মায়ের বুকের খাটো কাপড়খানি অবোধ শিশুর হাতের টানে খসিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নাই, কোন সংকোচ নাই মায়ের। লজ্জা যেদিক দিয়া মানুষের মনে আসে জননীটি বোধ করি সেদিকের পানে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল।

রমা বার বার মুখ ফিরাইয়া ওই মা ও শিশুটিকে দেখিতেছিল। গাঙ্গুলীকাকা বড় খরগতিতে চলিয়াছে, নতুবা একটু দাঁড়াইত সে ঐ গাছতলাটিতে। চলিতে চলিতে রমা সহসা প্রশ্ন করিল—বাবুর ছেলেকে দেখেছ তুমি কাকাঠাকুর? কাকাঠাকুর তখনও মনে মনে বিলাতের দূরত্ব সীমা জরীপ করিতেছিল। তবু সে অন্যমনস্কভাবেই কহিল—হুঁ!

—খুব সুন্দর না?

—হুঁ।

—কত বড় বটে ?

কাকাঠাকুর আর কথা কহিলেন না।

রমা আবার প্রশ্ন করিল—আমাদের ঘেটুর মত ?

গাঙ্গুলী সহসা দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—বকবক করে বকিস নে বাপু। এত বেহায়া তুই তা আমি জানতাম না। গলায় দড়ি দিস একগাছ।

এ তিরস্কারে মেয়েটির মৃদু আনন্দটুকু নির্বাপিত সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোর মত মিলাইয়া গেল। বড় বড় চোখ দুটির বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া রমা এককড়ির পানে চাহিল। বিস্মিত বিষণ্ণ সে দৃষ্টি। বাক্যের রূঢ়তায় সে আঘাত পাইয়াছিল। আর সবিস্ময়ে সে ভাবিতেছিল গলায় দড়ি দিবার মত বেহায়াপনা সে কি করিল!

মাথা অবনত করিয়া সে গাঙ্গুলীর পিছনে পিছনে চলিয়াছিল। চোখের জল যদি পড়ে তবে মা ধরণী সে অপরাধ তাঁহার আপন বুকে লুকাইবেন।

এ শিক্ষাটুকু রমা নিজে অর্জন করিয়াছে, কাহাকেও শিক্ষা দিতে হয় নাই।

বাবুর বাড়িতে ঢুকিয়া রমা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঐশ্বর্যের এমন প্রদীপ্ত আত্মপ্রকাশ সে আর কখনও দেখে নাই। তাহাদের গ্রামের চাটুজ্যেদের ছোট ছেলে কলিকাতায় কাজ করে। তাহার ঘর দেখিয়া তাহার কত আনন্দ হইত। ঘরটিতে একখানি তক্তপোষ, দেওয়ালে ছোট বড় কতগুলি ছবি টাঙানো। বাক্সগুলি বৃন্দাবনী ছিটের ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা থাকে। ছোট একটি টুলের উপর একটি কলের গান।

আর এখানকার প্রতিটি জিনিষ এত উজ্জ্বল যে স্পর্শ করিয়া দেখিতে রমার ভয় হইল। সাপের জিভের মত একটি সূক্ষ্ম দীপ্ত রশ্মি যেন বিকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ঘরের মেঝেগুলো এত পিছল আর শীতল

যে রমা চমকিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ নাই। সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া মেঝেটায় হাত বুলাইয়া দেখিল। কই, জল তো হাতে লাগে নাই। সে সবিস্ময়ে মেঝের উপর আবার হাত রাখিয়া মর্মরের শীতলতা অনুভব করিল।

কে পিছন হইতে কহিল—কি করছ ?

পিছন ফিরিয়া রমা দেখিল ও বাড়ির নলিনী দিদিমণি।

এই নলিনী দিদিমণিই খোকাবাবুকে এতদিন মানুষ করিতেছিল। নলিনী দিদিমণি নাকি ডাক্তারি-পাশ-করা মেয়ে। গিন্নীমায়ের অসুখের সময় সে এখানে আসিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর খোকাবাবুকে মানুষ করিবার জন্য তাহাকে রাখা হইয়াছিল। এখন আবার তাহাকে বাবুর ডাক্তারখানায় কাজ করিতে হইবে।

সলজ্জ বিস্ময়ে সে মৃদুস্বরে কহিল—এত ঠাণ্ডা !

—মার্বেল পাথর কিনা। মার্বেল পাথর ভারী ঠাণ্ডা হয়। এখানে সব ঘরেই মার্বেল দেওয়া আছে। ঘরে চলো না, দেখবে এখন মার্বেলের বেদী। গরমের সময় শোবে, দেখবে কত আরাম।

নলিনী হাসিল।

রমা সবিস্ময়ে নলিনীর পানে চাহিল। সে মার্বেল পাথর কি তাহা তো জানে না। কিন্তু সে প্রশ্ন করিতেও কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল।

নলিনী কহিল—এস, তোমায় সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিই। আমার ওপর আবার ভার পড়েছে।

চলিতে চলিতে নলিনী আবার কহিল—জান তো একজনের জবাব হলে তাকে কাজের ভার নতুন লোককে বুঝিয়ে দিতে হয়।

রমা জিজ্ঞাসা করিল—কেন ?

নলিনী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। রমাকে সে বিস্মিত দৃষ্টিতে আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কসাইয়ের কাছে জানোয়ার-বাচ্চা সুন্দর হলে কি আসে যায় ?

কাহাকে কি উদ্দেশ্যে কথাটা নলিনী বলিল রমা বুঝিতে পারিল না।

সে কহিল—কি বলছ দিদিমণি ?

—বলছি, ভগবানের বিচারের কথা। কসাইয়ের সঙ্গে ভগবানের কোন তফাত নেই।

রমা কহিল—ছি, ঠাকুর দেবতাকে অমন কথা বলতে নেই।

নলিনী হাসিয়া কহিল—আর বলব না। এস এখন যা করতে চলেছি তাই করি।

সমুখের ঘরখানায় ঢুকিয়া রমা অপূর্ব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। দেওয়ালের এমন সুন্দর রঙ। আকাশের রঙের সঙ্গে কোন তফাত নাই। তাহার মধ্যে আবার এমন সুন্দর লতা পাতা ফুলের সারি। নলিনীর অলক্ষ্যে সে চট করিয়া একবার দেওয়ালে হাত বুলাইয়া দেখিল। নলিনী তখন কলের পাখা দেখাইতেছিল। কেরোসিন তেলের জোরে নাকি পাখাটা আপনি ঘোরে।

দেওয়ালের গায়ে এত বড় বড় ছবি রমা আর কোথাও দেখে নাই। একটায় যেন ঠিক সূর্য উঠিতেছে। আবার একটায় আকাশের গায়ে ঘন মেঘ জমিয়াছে, মেঘের প্রতিটি স্তর দেখা যাইতেছে। আর একদিকে চাহিয়া রমা লজ্জায় মরিয়া গেল। উলঙ্গ একটি মেয়ের ছবি রহিয়াছে। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। ঠিক তাহারই পাশে আরও একটা। কিন্তু মেয়ে দুটি বড় সুন্দর। রমা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কহিল—চল দিদিমণি ও ঘরে যাই।

সে ঘরটায় প্রবেশ করিয়া রমা চমকিত হইয়া উঠিল। এ কি ! চারিদিকে সে আর নলিনী দিদিমণি।

রমার সুপরিস্ফুট চমক কাহারও চোখ এড়াইবার নয়। নলিনী হাসিয়া কহিল—আয়না-ঘর এটা। এই ঘরে সাজপোশাক করতে হয়। চুল বাঁধতে হয়।

—এত বড় আয়না ? মানুষের চেয়েও উঁচু ?

একখানি আয়না অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করিয়া দেখিতে দেখিতে সে আবার কহিল—এত আয়না কি জন্যে দিদিমণি ?

—আশপাশ পেছনে সামনে সব দেখা যায়। দেখবে যখন চুল বাঁধবে এ ঘরে বসে।

নলিনী একটা আশ্চর্য হাসি হাসিল। রমার তাহা ভাল লাগিল না। সে কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তার পূর্বেই নলিনী ত্রস্তভাবে কহিল—ওমা বাবু যে! এস এস, চলে এস।

নলিনী চকিতের মধ্যে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারোটি পুরুষ চারিদিক হইতে রমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। রমাও পলাইতে গেল। কিন্তু মার্বেলের অতি মসৃণতায় পা পিছলাইয়া সে একটি অতি অস্ফুট চিৎকার করিয়া পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। চারিদিকে দর্পণে ভীত-কম্পিতা স্খলিতবাসা তরুণীর অনাবৃত যৌবন তাঁহার বুকের মধ্যে যেন একটা নেশা জাগাইয়া তুলিতেছিল। শুধু নেশা নয়,—একটা অনুকম্পাকোমল মোহও তাহার মধ্যে ছিল। অবলা মেয়েটির এই ভীতিত্রস্ত ভঙ্গী তাঁহার বড় ভাল লাগিল। নতুবা এই পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার বিরক্ত হইবার কথা। অন্য কেহ এমনভাবে পড়িয়া গেলে তাহাকে অকর্মণ্য অপদার্থ বলিয়া ধমক দিতেন,—তাহার জবাব হওয়াও বিশেষ আশ্চর্যের কথা ছিল না। ভ্রূও তাঁহার কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই কোমল মোহটা তাঁহার সমস্ত মনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সঞ্চারিত হইতেছিল। সেই মোহবশে তিনি নিজেই আসিয়া রমাকে দুটি বাহুতে ধরিয়া তুলিলেন। স্পর্শেরও একটা রূপ আছে, অনুভূতি তাহা প্রত্যক্ষ করে। প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যেও ঘুমন্ত মানুষ সাপের শীতল স্পর্শে চমকিয়া জাগিয়া উঠে, অঙ্গ তাহার জুড়াইয়া যায় না। মহেন্দ্রবাবুর স্পর্শেও এমনি একটি রূপ ছিল; রমা শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্তে মুহূর্তে মহেন্দ্রবাবুর মুঠি দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। সবল

দৃঢ় পেষণে তাহার বাহু দুইটি যেন ভাঙিয়া যাইতেছিল। রমার যন্ত্রণার অবধি ছিল না। কিন্তু চিৎকার করিয়া কাঁদিতে তাহার সাহস হইল না। হাজার অবলা হইলেও সে নারী। পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধের স্বরূপ যে কি, একটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আপনি তাহার জানা হইয়া গেল। ভূমিষ্ঠ শিশুর ক্ষুধাবোধের মত এ বোধ নারীর নির্দিষ্ট বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আপনি জাগে। মানুষের মধ্যে এ প্রকৃতির জাগরণ।

রমা প্রতি মুহূর্তে একটা বিপর্যয়ের আশঙ্কা করিতেছিল। সমস্ত শরীর তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। বিদ্রোহ করিবার মত শক্তি এ সংসারে সকলের থাকে না, কিন্তু খানিকটা বাধা দিবার উপযুক্ত শক্তি সকলেরই আছে, চিৎকার করিতেও মানুষ পারে। কিন্তু এইজাতীয় মানুষের সে সাহস কখনও থাকে না। রমা ভয়ে চোখ মুদিয়া ফেলিল। তাহার চোখভরা জল চোখের পাতার চাপে গাল বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল। মহেন্দ্রবাবুর সুদৃঢ় মুঠি শিথিল হইয়া আসিল। কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবার দৃঢ় হইয়া উঠিল। তাঁহারও মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। অকস্মাৎ দুটি কথা রমার কানে আসিয়া পৌঁছিল—ছেড়ে দিন।

নলিনী দিদিমণির কণ্ঠস্বর।

নলিনীর কণ্ঠস্বরে একটা সম্ভ্রমপূর্ণ দৃঢ়তা ছিল। যে স্বরে আঘাত বা অমর্যাদা কাহাকেও করে না কিন্তু দৃঢ়তায় সে অলঙ্ঘনীয়। মহেন্দ্রবাবু নলিনীর সম্ভ্রমপূর্ণ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলেন। মৃদু আকর্ষণে রমার হাতখানি আকর্ষণ করিয়া নলিনী আবার তেমনি ভাবে কহিল—ছেড়ে দিন।

মহেন্দ্রবাবু ছাড়িয়া দিলেন। কম্পিতা রমার হাত ধরিয়া নলিনী ধীরভাবে অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণে মহেন্দ্রবাবু যেন সহজ মানুষ হইয়া উঠিলেন। চিত্তের অপরাধ-বোধের ক্ষণিক দুর্বলতা তাঁহার ক্রমশঃ কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ

তিনি ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিলেন। কর্তৃত্বাভিমানী মানুষের মনে যে সুলভ অপমানবোধ থাকে—সেই বোধ বিপুল ক্ষোভে জাগ্রত হইয়া উঠিল। প্রচণ্ড উগ্রতায় তিনি ভীষণ হইয়া উঠিলেন। একটা অদ্ভুত বিকৃত স্বর তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল—নলিনী!

শান্ত, সহজ স্বরে উত্তর আসিল—আসছি আমি।

মেয়েটার স্পর্ধায় মহেন্দ্রবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এমন সহজভাবে কেহ কখনও তাঁহার ক্রোধকে উপেক্ষা করে নাই। দারুণ ক্রোধে তিনি যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। কিন্তু সে তাঁহার অভ্যাস নয়। ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ কখনও তিনি পছন্দ করেন না। তাঁহার ক্রোধ কাজ করে সাপের মত। আলোকে সে বাস করে বিবরে; শত্রুর দুর্দশার রজনীর অন্ধকারে বিপুল গর্জ্জনে আত্মপ্রকাশ করিয়া আক্রমণ করে।

মহেন্দ্রবাবু আর সে ঘরে দাঁড়াইলেন না। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আপনার বসিবার ঘরে তিনি চলিয়া গেলেন। মুক্ত জানালার পাশে একটা ইজিচেয়ারে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন। আবার তিনি উঠিলেন। বড় আলমারীটা চাবি-বন্ধ ছিল না, থাকেও না—সেখান হইতে টানিয়া বাহির করিলেন বোতল ও ছোট একটি গ্লাস। মদ তিনি খান কিন্তু অপরিমিত পানকে তিনি ঘৃণা করেন। ছোট গ্লাসটি তাঁহার পরিমাপের পরিমিত নির্দ্দিষ্ট। গ্লাসটি পরিপূর্ণ করিয়া ঢালিয়া সেটুকু নিঃশেষে পান করিলেন। তাহার পর একটা সিগারেট ধরাইয়া ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। সিগারেটটা টানিতে টানিতে তিনি ভাবিতেছিলেন এটা বোধ হয় নলিনীর বিদ্বেষ। তাঁহার অধরে মৃদু একটি হাসি খেলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পূর্বের ক্ষোভ তাঁহার আনন্দে রূপান্তরিত হইতেছিল।

সম্মুখের ভেজান দরজা খুলিয়া গেল। সে শব্দে আকৃষ্ট হইয়া চাহিয়া দেখিলেন নলিনী ঘরে প্রবেশ করিতেছে। এটা তিনি প্রত্যাশা করেন

নাই। তাঁহার ক্রোধের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া কেহ কখনও দাঁড়ায় নাই। নলিনী কহিল—আমায় ডাকছিলেন আপনি?

মহেন্দ্রবাবু চেয়ারটার উপর খাড়া হইয়া বসিলেন। কথা তিনি মনে মনে খুঁজিতেছিলেন।

নলিনী আবার কহিল—কি বলবেন বলুন? আপনার সঙ্গে এক ঘরে এমন করে বসে থাকাটা লোকের চোখে বড় খারাপ ঠেকবে।

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন—কে তোমায় আসতে বললে? আসার ত কোন প্রয়োজন ছিল না।

একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া নলিনী একটু হাসিল। তারপর কহিল—তাহলে বোধ হয় আমারই ভুল হয়ে থাকবে। আমি যেন শুনলাম আপনি আমায় ডাকলেন। যাক্ আমারও একটু দরকার ছিল।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। নলিনী একখানা কাগজ বাহির করিয়া চেয়ারটার হাতলের উপর নামাইয়া দিল। তারপর একটা নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার জন্যই দরজাটা খুলিয়া ফেলিল।

কিন্তু পিছন হইতে মহেন্দ্রবাবু ডাকিলেন—শোন।

নলিনী ফিরিল। মহেন্দ্রবাবু কাগজখানা ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন—এর মানে?

শান্তস্বরেই নলিনী উত্তর দিল—ওর মানে ত খুবই সহজ। আমি কাজে জবাব দিচ্ছি। আমি আর এখানে থাকতে চাই না।

—কেন? মহেন্দ্রবাবুর ললাটে বিরক্তির সারি সারি কুঞ্চিত রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

নলিনীর চোখে মুখেও বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল—এর আমি কোন জবাব দিতে চাই না। এ বিষয়ে নিশ্চয় আমার স্বাধীনতা আছে।

মহেন্দ্রবাবু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বিবরের ভুজঙ্গ পরিপূর্ণ আলোকে আত্মপ্রকাশ করিতে চায় না সত্য, কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিলে সে

আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। বিপুল গর্জ্জনে তখন সে বাহির হইয়া আসে। একটা বেতনভোগিনীর বারবার এরূপ ঔদ্ধত্যে তাঁহার বাহ্যিক ক্রোধহীনতার মুখোস সহসা যেন খসিয়া গেল। কর্কশকণ্ঠে মহেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন—জান তুমি, এখানে তোমায় খুন করে দিলেও আমার কিছু হয় না। স্ত্রীলোক বলে রেহাই আমার কাছে নাই। সাবধান হয়ে কথা বল তুমি।

অকস্মাৎ এমন উত্তর নলিনী প্রত্যাশা করে নাই। সে কয়েক-মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হইয়া গেল। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে সে কহিল—তা আমি জানি। সে ত আমার না-দেখা নয়। আমি নিজের চোখেই যে তা দেখেছি।

এ কথায় মহেন্দ্রবাবু কেমন যেন হইয়া গেলেন। সর্বনাশী মেয়েটার অভিযোগটা যে ভীষণ। তিনি নলিনীর দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

নলিনী বলিয়াই গেল—আপনার স্ত্রীকে যেভাবে আপনি হত্যা করেছেন, স্লো-পয়জেন করা তার চেয়ে ভীষণ কিছু নয়। আইনের চোখে এটা হত্যাপরাধ নয় কিন্তু একদিন একজায়গায় এর বিচার হয় ত হবে।

এতক্ষণে মহেন্দ্রবাবুর মুখে হাসি ফুটিল। তিনি কহিলেন—বিচার যদি হয় তবে তোমার নাম সাক্ষীর তালিকায় থাকবে নিশ্চয়। যাক্ এসব মতলব ছাড়। আর একবার যদি এমন কথা তোমার মুখে শুনি —তোমায় সত্যিই আমি খুন করাব।

—তা হয় ত পারেন। কিন্তু সে আপনাদের ওই সরল নিরক্ষর চাষী প্রজাকে। আপনি ত আমার পরিচয় জানেন। বেশ্যার মেয়ে আমি। আপনাদের এই ধনী জাতদের সর্বনাশ করা আমার না হোক— আমার জাতের পেশা। আমার মা এখনও বেঁচে আছেন। আমাকে খুন করা খুব নিরাপদ হবে না জানবেন। আপনাদের জমিদার জাতটাই এমন আত্মম্ভরী। আপন এলাকার মধ্যে নিজেদের রাজা বলতেও

আপনাদের লজ্জায় বাধে না। তাই এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।

মহেন্দ্রবাবু এবার চুপ করিয়া গেলেন। শূন্য-গর্ভ বস্তু আঘাতের উত্তরে বিপুল গর্জন করিয়া উঠে, দুনিয়া তাহাকে ভয় করে না। কিন্তু নিরেট লোহার আঘাতে যে শব্দোত্তর আসে তাহা মৃদু তবে দৃঢ়তার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় তাহার মধ্যে থাকে। ওই দৃঢ় মৃদুস্বরের মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত আছে। সে উপেক্ষনীয় ত নয়ই বরং আঘাত-কারীর চিন্তার বস্তু।

মহেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ পর কহিলেন—আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার।

নলিনী ফিরিল। মহেন্দ্রবাবু আবার ডাকিলেন—হাঁা খোকার গয়নাগুলো আর তোমায় কিছু গয়না দেওয়া হয়েছিল—

নলিনী বাধা দিয়া কহিল—খোকার গয়না আমি খাজাঞ্চী বাবুর জিম্মায় দিয়েছি, কখানা তার গায়ে আছে। তার রসিদ আমি খাজাঞ্চী বাবুর কাছ থেকে নিয়েছি। আর আমার, সেগুলো তো আমারই প্রাপ্য। জীবনে কৃতকর্মের গ্লানিকে আমি ভুল বলে মাথায় করে নিয়ে যেতে চাই না। আমার জন্মগত পেশা বলেই জমা খরচ করতে চাই। সে আমার কাছে আছে।

এতক্ষণে মহেন্দ্রবাবু যেন কূল পাইলেন। তিনি চেয়ার হইতে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন—পুলিশে খবর দেব আমি।

নলিনী একথার কোন জবাব দিল না। ধীরভাবে দরজা খুলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু দ্রুতপদে অনুসরণ করিয়া দরজাটায় হাত দিলেন। কিন্তু কি মনে হইল আর দরজাটা খুলিলেন না। চিন্তান্বিত ভাবে চেয়ারটায় আবার বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার হাঁকিলেন—কানাই।

কানাই, বাবুর খাস খানসামা। সে আসিতেই তিনি কহিলেন—মেয়ে ডাক্তারের ফাইল নিয়ে কেরানীবাবুকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

আর শোন, আলমারী থেকে বোতলটা—না থাক্ একগ্লাস ঢেলে দিয়ে যা শুধু।

কানাই চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু আবার একটা সিগারেট ধরাইয়া বসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দরজাটার বাহিরে কে গলা ঝাড়িয়া আপনার আগমন বার্তা জ্ঞাপন করিল। মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—এস।

কেরানীবাবু আসিয়া একটা ফাইল চেয়ারের হাতলটার উপর নামাইয়া দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি ফাইলটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। দেখিয়া শুনিয়া ফাইলটা বন্ধ করিয়া বলিলেন—ইনি রেজিগনেশন দিচ্ছেন। কিন্তু এগ্রিমেণ্ট রয়েছে দেখছি আরও তিন মাসের। এঁকে একটা নোটীশ দিয়ে দাও যে আমরা তোমার রেজিগনেশন নিতে পারব না। তুমি যদি চলে যাও তবে ক্ষতির দায়ী হতে হবে। আর একজন কাউকে সদরে পাঠিয়ে দাও, সে উকিলদের কাছে জেনে আসুক এর জন্য ফৌজদারী সোপর্দ করা যায় কি না। শেষ পর্য্যন্ত টিকুক চাই না টিকুক প্রথমটায় এমন একটা কিছু করা যায় কি না।

নীরবে কেরানীবাবু ফাইলখানা তুলিয়া লইলেন। তারপর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—একটি ভদ্রলোক এসে বসে আছেন। টিউবওয়েল কোম্পানীর লোক নাকি।

মহেন্দ্রবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—হুঁ। কেরানীবাবুর আর কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। তিনি দরজার দিকে ফিরিলেন। পিছন হইতে বাবু কহিলেন—হ্যাঁ, তাকে থাকতে বল আজ। কাল তার সঙ্গে কথা কইব। গ্রামের মধ্যে তিনটে টিউবওয়েল করিয়ে দেব ভাবছি। বড় জলের কষ্ট গ্রামের মধ্যে।

কেরানীবাবু এবার দরজায় হাত দিয়েছিলেন। বাবু কহিলেন—আর তোমাদের খালি পালাই পালাই শব্দ। গভর্নমেণ্ট হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টে একখানা পত্র লেখ দিকি টিউবওয়েল বসানোর কথা জানিয়ে। গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন হয়ে গেল, কেউ যদি কিছু ভাবে!

কেরানীবাবু যাইতে যাইতে কহিলেন—কড়ি গাঙ্গুলী এসে বসে আছে।

অকস্মাৎ খড়ের আগুনের মত মহেন্দ্রবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন—যাও, যাও, যা বললাম তাই কর গিয়ে। ওটাকে দূর করে দিতে বল কাছারী থেকে।

ততক্ষণে কেরানীবাবু নিজের পশ্চাতে দরজাটার আড়াল দিয়া বাঁচিয়াছেন।

মহেন্দ্রবাবু চিন্তা করিতেছিলেন দেশের ম্যালেরিয়ার কথা। এ চিন্তা বড়লোকের সখ কি না কে জানে, কিন্তু তাঁহার এ চিন্তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। জীবনের পাপ, পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়, আত্মীয় সমাজ সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন গতিতে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ এক একসময়ে এই বিচিত্র মানুষটির মনে এই ধারার চিন্তা জাগিয়া উঠিত। তখন অর্থের প্রতি মমতা তাঁহার থাকিত না, আপন দেহের প্রতি দৃকপাত করিতেন না। অকস্মাৎ ভূমিকম্পজীর্ণ পাথরের বুক হইতে নির্ঝরিণী উৎসারিত হইত। আবার অকস্মাৎ সে উৎস রুদ্ধ হইয়া যাইত। সে দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসরও তখন তাঁহার থাকিত না। তখন তিনি নিজের মনে মনেই বলিতেন—নির্বোধ—নির্বোধের কাজ হয়েছে এটা। এক একসময় নির্বোধটা কেমন করে যে প্রবল হয়ে ওঠে।

দরজার বাহিরে আবার কাহার অতি কুণ্ঠিত মৃদু সাড়া পাওয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু ঈষৎ বিরিক্তভরেই কহিলেন—কে?

দরজা অল্প ফাঁক করিয়া কড়ি গাঙ্গুলীর লম্বা মুখখানি উঁকি মারিল।

রুক্ষস্বরে মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—কি?

—আজ্ঞে আমার একটু কাজ ছিল।

—পরে এস। আমার শরীরটা ভাল নেই।

দরজাটা বন্ধ হইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু অল্প একটু হাসিলেন। মানুষের এই ধরনের ভয় দেখিয়া বড় কৌতুক বোধ হয় তাঁহার। কিন্তু

কি একটা কথা অকস্মাৎ তাঁহার মনের মধ্যে উদিত হইতেই তিনি উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া ফেলিলেন। দরজার ধাক্কায় ওপাশে কে একজন মৃদু আর্তনাদ করিয়া উঠিল। বাবু দেখিলেন কড়ি গাঙ্গুলী নাকে হাত বুলাইতেছে। দরজার ধাক্কাটা বেচারার নাকেই আঘাত করিয়াছে। আঘাতের উপরেও বেচারা মহেন্দ্রবাবুর সহিত চোখাচোখি হইতেই চমকিয়া চোরের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু কিন্তু তাহাকে কঠোর কিছু বলিলেন না।

বরং মৃদুস্বরেই কহিলেন—এই যে তুমি আছ। ভালই হয়েছে, শোন দিকি।

কড়ি চতুর লোক, গরজের দাম সে বোঝে। মুহূর্তে তাহার ভোল পাল্টাইয়া গেল। সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বাবুর অনুসরণ করিয়া ঘরের মধ্যে বিনা আদেশেই একখানা চেয়ার টানিয়া জাঁকিয়া বসিল। এবং সেই প্রথম কথা কহিল—আপনার দরজাগুলো ভারী বিশ্রী।

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন—একটা বাঁদরকে চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সেটা লাফিয়ে বসল একেবারে চেয়ারটার মাথায়। ফলে চেয়ারটা গেল উল্টে। তখন বাঁদরটাও ঠিক একই কথা বলেছিল, বুঝেছ গাঙ্গুলী।

গাঙ্গুলী হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিল। 'সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' কথাটার দাম গাঙ্গুলীর বেশ জানা আছে, বহু ক্ষেত্রেই বহু ব্যঙ্গই হাসিয়া উড়াইতে হয় তাহাকে।

মহেন্দ্রবাবু তাহার হাসিটা কমাইয়া দিলেন। তিনি কহিলেন, শোন—আমি তোমার সেই টাকার কথা ভাবছিলাম। এখনও ত মেয়েটির দলিল হয় নি—

গভীর অভিনিবেশের সহিত গাঙ্গুলী শুনিতেছিল, এবং কথার শেষ যে কি হইবে তাহাও সে মধ্যপথে বুঝিয়া লইয়াছিল। সুতরাং সে মধ্য পথেই বলিয়া বসিল—তার আর কি? আজই দলিল হয়ে যাক।

—হ্যাঁ, তাই বলছিলাম, তুমি এখানে এসেছ, দলিলখানা তুমিই

থেকে ওর টিপ সই-টই সব করিয়ে দাও না। মেয়েটিও এখানে নতুন, কিছু ভাবতেও ত পারে।

হাসিয়া গাঙ্গুলী কহিল—আজ্ঞে না, সে ভয় কিছু নাই। জানোয়ারেও মাথা নাড়ে, কিন্তু রমা—

অকস্মাৎ বিরক্ত হইয়া বাবু কহিলেন—এইটেই আমি ঠিক পছন্দ করি না এককড়ি। মানুষের যদি আত্ম বলে বস্তু না থাকে—তবে সে কি মানুষ?

কড়ি একথার উত্তর বোধ হয় জানিত না, কিংবা সে যাহা জানে তাহা দিতে সাহস করিল না। মহেন্দ্রবাবু আবার কহিলেন—না, এই মানুষই ভাল এককড়ি। এদের রাগ কখনই হয় না। অন্যায়ে অবিচারে এরা দুঃখ করেই সন্তুষ্ট থাকে। যাক্, প্রয়োজনের পক্ষে এরা খুব ভাল। দেখ, এখানে যে মেয়ে-ডাক্তারটি আছে সে বোধ হয় মেয়েটিকে ভয় দেখিয়ে ভড়কে দিচ্ছে।

গাঙ্গুলী গরজের কথাটার এতক্ষণে হদিশ পাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার একখানা কণ্ঠস্বর দশখানা হইয়া উঠিল—দেখুন দিখি, সে হারামজাদীর কি সাধ্যি রমাকে ভাংচী দেয় আমি থাকতে! রাধে! রাধে! রমা সে মেয়েই নয়। বলুন না এখুনি তার চুলের মুঠি ধরে দিই আপনার পায়ের জুতোয় তার পিঠ ভেঙ্গে।

দরজার বাহিরে আবার সাড়া উঠিল।

বাবু কহিলেন—কে?

—আজ্ঞে আমি। এস্টেটের নায়েবের কণ্ঠস্বর।

—এস। জরুরী কাজ আছে কি কিছু?

—কয়েকটা মামলার দিন আছে কাল।

—হ্যাঁ যাই চল। কড়ি, তা হলে তুমি ওবেলা এস।

কড়ি চুপি চুপি কহিল—একটু বসলে হত না হুজুর? আমি দিতাম আপনার সামনেই রমাকে শাসিয়ে।

বাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি বললেন—এখন থাক।

কড়ি ছাড়িবার পাত্র নয়, সে কহিল—আমি তা হলে বরং রমাকে ডেকে একবার—।

মহেন্দ্রবাবু কথাটা কানেই তুলিলেন না। তিনি ডাকিলেন—কানাই, দরজাটা বন্ধ করে দে। তুমি বেরিয়ে এস গাঙ্গুলী। আর কানাই,—শোন।

মৃদুস্বরে কানাইকে কহিলেন—একটা চাপরাশীকে বলে দে মেয়ে-ডাক্তারের বাড়ীতে পাহাড়া থাকতে। ও বোধ হয় পালাবে।

নলিনী আপনার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে বসিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতেছিল। রমা একপাশে নীরবে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল।

নলিনী কহিল—ওই ব্র্যাকেটের ওপর থেকে ফুলদানী দুটো দিতে পার ভাই? আর ওই ছবিখানা। না ওখানা নয়, ওটা বাবুর ছবি। ওই যে পাশেই খোকাবাবুর ছবি—ওইখানা।

নলিনী ছবিখানা বাক্সে পুরিয়া তাহার উপর কাপড় ঢাকা দিল। তারপর আবার অন্য জিনিষ গুছাইতে আরম্ভ করিল। রমা মৃদুস্বরে কহিল—দিদিমণি।

কাজ করিতে করিতেই নলিনী উত্তর দিল—কি?

—তুমি কি সত্যিই আজ চলে যাবে?

প্রশ্নটির মধ্যে এমন কিছু ছিল না, কিন্তু রমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে বাক্যের প্রত্যক্ষ অর্থ ছাড়াও যেন অনেক কিছু ছিল। নলিনী মুখ ফিরাইয়া রমার দিকে চাহিল।

নলিনীর উদ্যত চোখ দুটির উপর সকরুণ দৃষ্টি মিলাইয়া রমা বলিল—আমার কি হবে দিদিমণি।

প্রশ্নটির অভ্যন্তরের প্রচ্ছন্ন হতাশার সকরুণ সুরটুকু নলিনীকে বিশেষ করিয়া স্পর্শ করিল। সে আবার হাতের কাজ ফেলিয়া নতমুখে বোধ হয় এই প্রশ্নেরই উত্তরের সন্ধান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—তুমি কি কিছু বুঝতে পেরেছ রমা?

ম্লান হাসিয়া রমা কহিল—হাজার বোকা হলেও আমি ত মেয়ে মানুষ দিদিমণি।

কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও নলিনী আপন মনে ভাবিতেছিল এই পৃথিবীর বুকের উপর সে অতি বাস্তব উলঙ্গ সত্য সুকঠোর ভাবে শুনাইয়া দিয়া দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম সব যে মেকী তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিবে, এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেও ঠিক সেই পথটি অতি সূক্ষ্ম রেখায় রেখায় অনুসরণ করিবে। কিন্তু রমার এ প্রশ্নের উত্তরে সে-পথ ধরাইয়া দিতে সে পারিল না। সে নিজেও আশ্চর্য হইয়া গেল।

রমা কহিল—দিদিমণি!

—ভাই!

—কি হবে আমার!

—সেই কথাই ত ভাবছি বোন। কিন্তু কূল কিনারা খুঁজে যে কিছু পাচ্ছি না।

—আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চল না দিদিমণি। আমি তোমার কেনা ঝিয়ের মত থাকব।

একটু চিন্তা করিয়া নলিনী ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল—না। তোমায় এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার মত শক্তি আমার নেই। এখানে এলে বের হয়ে যাওয়া সহজ কথা নয় ভাই। আমিও আজ ছ মাস ধরে পথ খুঁজছি। আজ তুমি এসেছ, আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে যদি পথ পাই। তবুও সে নিয়ে আমার ভাবার অন্ত নেই।

তারপর ঘরখানি নীরব নিস্তব্ধ। কূলহারা দুটি নারী অসীম শূন্যতার মধ্যে আজও যাহার সন্ধান হয় নাই, বাক্যে যাহাকে প্রকাশ করা যায় না, মন যাহাকে কল্পনা করিতে পারে না—রূপহীন—আকারহীন এক আশ্রয়ের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। বোধ করি তাহারই জন্য কয় ফোঁটা জল রমার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

কানাই খানসামা আসিয়া কহিল—এই যে তুমি এখানে রয়েছ। তোমাদের গাঁয়ের গাঙ্গুলী মশাই এসেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

গাঙ্গুলীর নাম শুনিয়া রমা বুঝিল কথাটা বলা হইয়াছে তাহাকেই, সে ব্যগ্রভাবে কহিল—কই, কোথায় কাকাঠাকুর ?

কানাই কহিল—এখানে কি এসেছে সে ! সে আছে ওদিকের ঘরে বসে। আমার সঙ্গে এস তুমি।

রমা উঠিয়াছিল, কিন্তু নলিনী তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—বস তুমি রমা। কানাই যাও, তুমি গাঙ্গুলী মশাইকে এখানেই পাঠিয়ে দাও।

সবিস্ময়ে কানাই কহিল—এখানে ?

—হ্যাঁ দোষ কি ? এটা ত আমাদের অন্দর নয়, আমাদের বাসা এটা। আমি ত সকলের সামনেই বের হই।

কানাই আমতা আমতা করিয়া কহিল—কি সব ওদের ঘরোয়া কথা।

—তা হোক আমি সরে যাচ্ছি ও-ঘরে। যাও তুমি তাকে এখানেই পাঠিয়ে দাও। রমা এখন যেতে পারবে না, ওকে আমার দরকার আছে।

কানাইকে যেন অগত্যাই যাইতে হইল। রমা নলিনীকে পরম আশ্বাসভরে কহিল—আর আমার কোন ভাবনা নাই দিদিমণি, আমি কাকাঠাকুরের সঙ্গে চলে যাব।

নলিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটি অদ্ভুত হাসি হাসিয়া কহিল—তোমাকে না দেখলে ভগবান যে সরল সে আমি বিশ্বাস করতাম না।

মৃদু হাসিয়া রমা কহিল—কেন দিদিমণি ?

প্রত্যুত্তরে নলিনী শুধু হাসিল।

কানাইয়ের গলা বাহির হইতে শোনা গেল—আসুন, এদিকে আসুন।

তাহার পেছন পেছন বারান্দার মোড় ঘুরিয়া গাঙ্গুলী দেখা দিল। রমাকে সম্মুখে দেখিয়া গাঙ্গুলী কহিল—এই যে রমা ? বেশ ভাল লাগছে ত ? তারপর—

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। নলিনীকে দেখিয়া সে অবাক

হইয়া গিয়াছিল। বাইশ তেইশ বছরের শ্যামবর্ণের মেয়েটি ত হেলা করিবার মত নয়! না থাক তাহার রমার মত রূপ কিন্তু এ যে সম্ভ্রম করিবার মত নারী, মনিবেদীর উপর এই ত শোভা পায়। গাঙ্গুলী ব্যাপারটা বুঝিল। এখানে প্রয়োজন রূপসী দাসীর। সঙ্গে সঙ্গে অল্পক্ষণ পূর্বের একটা কথাও মনে পড়িল, বাবু বলিতেছিলেন—না, এই মানুষই ভাল গাঙ্গুলী। এদের অধিকারবোধ নেই, এরা জীবনে শুধু দুঃখ করেই সন্তুষ্ট।

বাবুর বুদ্ধির উপর শ্রদ্ধার পরিমাণ তাহার বাড়িয়া গেল। দৃপ্তা নারী পুরুষের জীবনে একটা অশান্তি—এ বিষয়ে গাঙ্গুলী ভুক্তভোগী।

গাঙ্গুলীর চমক ভাঙিল নলিনীর কথায়। একটি নমস্কার করিয়া সে কহিল—আপনি এই ঘরে রমার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। আমি ও-ঘরে যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি গাঙ্গুলী নমস্কারের ত্রুটিটা সারিয়া লইয়া কহিল—না—না—না। আপনার যাবার কোন দরকার নেই। বরং আপনি থাকাই ভাল। ভালই হবে, সে ভালই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া নিজেই যেন তাহার ফলোপলব্ধি করিতেছিল। তারপর সে কানাইয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—তুমি তা হলে কানাই—তা হলে—

কানাইকে চলিয়া যাও বলিতে সাহস হইল না। কিন্তু সুস্পষ্ট ভঙ্গিতে ভাবটা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। কানাই তাহা গ্রাহ্যই করিল না।

নলিনী এটা লক্ষ্য করিল। সে কহিল—যাও না কানাই এখান থেকে। তোমায় উনি যাবার জন্য বলছেন।

কানাই হাসিয়া কহিল—আমার কাছে গাঙ্গুলী মশাই লুকোন না কিছু।

নলিনীর অসহ্য বোধ হইল। সে তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—তবু উনি আজ তোমায় যাবার জন্য বলছেন। না তোমার হুকুম আছে যে এখানে কেউ গোপন কথা কইতে পাবে না।

কানাই নলিনীর এই উত্তেজিত তীক্ষ্ণ ধরণটিকে বড় ভয় করিত। নলিনীর কথায় অপ্রস্তুতের মত সে পালাইয়া বাঁচিল।

সঙ্গে সঙ্গে গাঙ্গুলী একরূপ কানাইয়ের পিঠের উপরেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল, কহিল—লুকিয়ে কথা শোনা এখানকার লোকের একটা স্বভাব। এ বাড়ির ত সব বেটা গোয়েন্দা পুলিশ। আশ্চর্য দস্তুর কিন্তু!

নলিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—আপনাদের এখানে অনেক আশ্চর্য রকমের দস্তুর আছে দেখতে পাই। মানুষ কেনা বেচা পর্যন্ত হয় দেখছি।

এমনধারা বাঁকা অথচ পরিস্কার কথা গাঙ্গুলী কখনও শোনে নাই।

সে মহা লজ্জিত অপরাধীর মতই কহিল—সত্যিই আমার অপরাধের অন্ত নেই। কিন্তু বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমার অনুতাপের আর সীমা নেই! আর এমন যে হবে তা আমি বুঝতে পারি নি। বাবু যে ভদ্রলোক হয়ে এত বড় পাষণ্ড! ছি—ছি—ছি। আমায় বললেন, গাঙ্গুলী, সভ্য মানুষ ওরা, ছেলেমানুষ করা ওদের পোষায় না —তা তুমি যদি একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দেখে—ঈশ্বরের দিব্যি—মা—ভদ্রকালীর পুষ্প ছুঁয়ে আমি বলতে পারি বুঝলেন। আপনার ভাতে হাত পড়বে—

নলিনী তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—আমার সঙ্গে কথা কইবার ত কোন প্রয়োজন নেই আপনার। রমাকে কি বলবেন বলুন আপনি। আমি ও-ঘরে যাচ্ছি।

জোড়হাত করিয়া গাঙ্গুলী কহিল—গেলে ত চলবে না মা। সন্তানকে এ পাপ থেকে যে উদ্ধার করতেই হবে। চাষা-ভূষা মানুষ, কথার দোষ ধরলে ত চলবে না, মা।

রমা ব্যগ্রভাবে কহিল—আমার কি হবে কাকাঠাকুর?

গাঙ্গুলীর গলা যেন ভাঙিয়া আসিতেছিল, ঘোলাটে চোখ দুটি ছলছল করিতেছিল, সে কহিল—তাই ত মা রমা, তোর কি উপায় করি আমি?

রমা ব্যাকুলভাবে কহিল—আমায় এখান থেকে নিয়ে চল বামুন কাকা।

ব্যগ্রভাবে কড়ি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—পারবি? পারবি এখান থেকে লুকিয়ে পালাতে রমা? একবার যদি বেরুতে পারিস তুই এখান থেকে—তারপর আমি দেখে নেব। এমন লুকিয়ে রাখব তোকে। হুঁ-হুঁ বাবা আমারও নাম কড়ি গাঙ্গুলী।

—কেমন করে যাব কাকা?

—এই এই এঁকে ধর। উনিই যদি পারেন কোন রকমে। বুদ্ধি দেখছিস না—তেজ দেখছিস না?

নলিনী কহিল—মাপ করবেন। আমি বোধ হয় আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

মাপ করার অনুরোধটা কড়ি বোধ হয় শুনিতেই পায় নাই, সে উত্তর করিল—আজই তা হলে ওকে এখান থেকে কোন রকমে বার করে দিন, আপনার যাবার আগেই। ভালই হয়েছে, আমিও আছি এখানে আজ।

সঙ্গে সঙ্গে রমাও মিনতি করিয়া কহিল—তোমার পায়ে পড়ি দিদিমণি।

বাহিরের রুদ্ধ দ্বারে কে আঘাত করিল।

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কড়ি কহিল—নিশ্চয় শালা কানাই, লুকিয়ে শুনেছে বেটা সব। বিকৃত মুখখানা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, বিচ্ছিন্ন দন্তপাটী বিচ্ছিন্ন হইয়াই রহিল। নলিনী অগ্রসর হইয়া দুয়ারটা খুলিয়া কহিল—কে?

দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল সুবোধ বালকের মত সেই কেরানীবাবুটি। একখানি পিওন বই নলিনীর সম্মুখে ধরিয়া কহিল—চিঠি আছে একখানা।

সই করিয়া দিয়া চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়া নলিনী ঈষৎ হাসিল।

কেরানীবাবু কহিল—এরপর জবাব আদান প্রদান তো আদালত

মারফতেই হবার কথা। আজ্ঞে বিবেচনা করে দেখলে একবার ভাল হয়।

নলিনী নতমুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর কহিল—তাই হবে। আমার চুক্তির সময় আমি শেষ করেই দিয়ে যাব।

কেরানী কহিল—তা হলে তাই গিয়ে বলি বাবুকে ?

—বলবেন।

কেরানীবাবু চলিয়া গেল।

গাঙ্গুলীর আর থাকিতে সাহস হইতেছিল না। সে মৃদুস্বরে কহিল —আমিও তাহলে যাই, বুঝলেন। বেটা সরিঙ্গী আবার দেখে গেল। ওই যে দেখছেন সরিঙ্গী চেহারা আর কান্না কান্না মুখের ভাব—ও শালা একেবারে টিপে ষষ্টী—ছেলে খান দশটি। বিশ্বাস নাই বেটাকে। তাহলে আজই কোন রকমে—বুঝলেন কি না, তারপর আমি বুঝে নেব।

সে আর দাঁড়াইল না। চিরাভ্যস্ত দ্রুত পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। কানাই দরজার পাশেই ছিল। গাঙ্গুলী তাহাকে দেখিবামাত্র কহিল—বাবা এ কড়ি গাঙ্গুলীর ভেল্কী। মেয়ে-ডাক্তারের মত ফিরে গেল—সে থেকে গেল। বললাম, বাবা এত সুখ ঐশ্বর্য পাবে কোথায় ?

কানাই সে কথার কোন জবাব দিল না, কহিল—বাবু ডেকেছেন আপনাকে।

কড়ির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ব্যগ্রভাবে কহিল—কেন রে কেন ?

—সে আমি জানব কি করে বলুন দেখি ? দাঁত মুখ খিঁচাইয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—সে আমি বেশ বুঝেছি—এ তুই বেটা দুম্মুখের কাজ।

তারপর চলিতে চলিতে সে আপন মনেই বলিল—যেমন রাজা রামচন্দ্র তেমনি হয়েছে চর দুম্মুখ। যাবেন লক্ষ্মী পাতালে। আমার করবি ঘেঁচু—আমি থোড়াই কেয়ার করি। কড়ি গাঙ্গুলীরও তেজারতি

চল্লিশ হাজার, সে বাবা তোবলা মোবলা নয়। আর ভগবান এত লোককে নেন—এ বেটাকে নেয় না গো।

কানাই তখন অনেকটা পিছনে একটা চাপরাশীকে হাত মুখ নাড়িয়া কি বুঝাইতেছিল। সে সংবাদ গাঙ্গুলীর অপরিজ্ঞাত ছিল না। আড়চোখে আশপাশ দেখার একটা বিশেষ দক্ষতা ছিল তাহার।

রমা কহিল—কোন রকমে আমাকে এখান থেকে বের করে দাও দিদিমণি। আমি কাকাঠাকুরের সঙ্গে—

নলিনী কহিল—না রমা, বাঘের মুখ থেকে অজগরের মুখে তুলে দিতে সাহায্য আমি করতে পারব না। এখানে থাকলে দুমুঠো খেতে তুমি পাবে, কিন্তু কড়ি গাঙ্গুলীর হাতে পড়লে জীবনে কোন দুঃখ হতেই নিষ্কৃতি তুমি পাবে না।

তারপর চোখ দুটি তুলিয়া সকরুণভাবে রমা কহিল—তবে আমার কি হবে দিদিমণি?

হাসিয়া নলিনী কহিল—ভয় কি ভাই, তোমার অদৃষ্টের সঙ্গে নিজেকে জড়ালাম আমি। তাতে আমার ভাগ্যে যা থাকে থাক।

রমা ব্যগ্রভাবে কহিল—তাই তুমি যাচ্ছ না দিদিমণি?

নলিনী কহিল—হ্যাঁ। তারপরেই ডাকিল, কানাই, কানাই।

কানাই তখনও চাপরাশীটার সহিত কথা কহিতেছিল। নলিনীর ডাকে সে আসিয়া দাঁড়াইতেই নলিনী বাক্স খুলিয়া কয়খানা গহনা তাহার হাতে দিয়া কহিল—এই গয়নাগুলো খাজাঞ্চীর কাছে জমা রেখে এস ত। একটা রসিদ এনো যেন।

কানাই কহিল—আপনি তা হলে যাচ্ছেন না, কেমন দিদিমণি?

বিষণ্ণভাবে নলিনী কহিল—এখনও আমার অদৃষ্টের ভোগ যায় নি কানাই, চুক্তির সময় পার হয় নি। কিন্তু ও চাপরাশীটা ওখানে কেন? আমার ওপর পাহারা পড়েছে বুঝি?

কলরব করিয়া কানাই কহিল—দেখুন দেখি, কি যে বলেন আপনি। এই বেটা ভূত, হিঁয়া কাঁহে বসকে রতা হ্যায়? ভাগ—ভাগ হিয়াসে।

ঘরের দেওয়ালের ব্রাকেটের ওপর একটা টাইমপিস টিক্ টিক্ করিয়া চলিতেছিল। নলিনী সেটার দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ছ'টা বাজিয়া গিয়াছে। নির্বাক স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে রমা কখন মেঝের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নলিনী বাহিরের বারান্দায় বাহির হইয়া গেল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে দিবসান্তের নিষ্ক্রিয়তা ঘনাইয়া উঠিতেছে। দূরে শুধু কয়টা ছাগল তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। নলিনী চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘুমন্ত রমাকে নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া তুলিল।

নিদ্রাভঙ্গে রমা চকিতের মত উঠিয়া কহিল—কি দিদিমণি?

—এস, উঠে এস।

—কোথায়?

—এস না আমার সঙ্গে। একটু মাঠের দিকে যাব। ঘরের মধ্যে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছে।

রমা গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া নলিনীর পিছন ধরিল।

সূর্য তখন অস্ত গিয়াছে। অতলের অন্ধকার মাটির বুক ভেদ করিয়া অস্তরাগদীপ্তি আকাশের দিকে উঠিতেছিল। মহেন্দ্রবাবুর বাড়ির সীমানার শেষপ্রান্তে বাগান-ঘেরা পুকুরটার মধ্যে ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিয়াছিল—তাহারই মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিল। দু-পাশের ছোট ছোট আম-গাছগুলির মধ্যে দিয়া পায়ে-চলা সরু পথখানি ধরিয়া নলিনী আসিয়া দাঁড়াইল পুকুরটির এ প্রান্তে। তারপর কাঁটা তারের বেড়াটা কোনরূপে পার হইয়া একেবারে মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল।

রমা বিস্মিত হইয়া কহিল—আর কোথা যাবে দিদিমণি?

নলিনী কহিল—স্টেশন। এই পথ ধরে গেলেই সোজা হবে, ওই দেখ সিগনালের আলো দেখা যাচ্ছে।

—স্টেশনে কেন যাবে?

—এই ট্রেনেই আমরা কলকাতা চলে যাব।

রমার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। সে কহিল—আবার কবে ফিরে আসবে?

—আবার কি ফিরে আসে রমা? লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছ না?

—কিন্তু তোমার জিনিষ-পত্তর গয়না কাপড় সব যে পড়ে রইল।

বিরক্তি ভরেই নলিনী কহিল—থাক। বেশী কথা তুমি কয়ো না রমা—কে কোথায় শুনতে পাবে।

নীরবে দ্রুত পদেই তাহারা চলিয়াছিল। কিন্তু রমা অকস্মাৎ আবার বলিয়া উঠিল—অত সুন্দর কাপড়গুলো—গয়না—আক্ষেপের একটা দীর্ঘনিশ্বাস বোধ করি আপনি তাহার বুক হইতে ঝরিয়া পড়িল।

চলিতে চলিতেই নলিনী বলিল—ও-গুলো তুমি নেবে রমা?

রমার লজ্জা হইল, সে চুপ করিয়া রহিল। নলিনী আবার কহিল—ও-গুলো সব তোমাকে আমি দিতে পারি।

বিস্মিতকণ্ঠে—একটা বিচিত্র স্বরে রমা বলিয়া উঠিল—সমস্ত!

—সমস্ত, সমস্তই তোমাকে আমি দিচ্ছি রমা। তুমি একটা কাজ কর।

এবার রমা যে স্বরে উত্তর দিল—সে স্বর কিন্তু পূর্বের স্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অকস্মাৎ যেন সে কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণভাবে সে কহিল—ও সব নিয়ে আমি কি করব দিদিমণি?

নলিনী বিস্ময়ভরে প্রশ্ন করিল—কেন—গয়না পরবে!

ম্লান কণ্ঠেই রমা উত্তর দিল—আমি যে বিধবা দিদিমণি।

নলিনী এ কথার জবাব দিতে পারিল না। একটি সকরুণ বেদনায় তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল—লজ্জাও হইয়াছিল। না ভাবিয়া

চিন্তিয়া এমন একটি প্রশ্ন করার জন্য মনে তাহার গ্লানির অন্ত ছিল না। দুইটি নারীই ইহার পরে নীরবে চলিয়াছিল। সকরুণ বিষণ্ণতার মধ্যে যেন সমস্ত কথার উপাদান হারাইয়া গিয়াছে।

স্টেশনে আসিয়া নলিনী রমাকে লইয়া প্লাটফর্মের একপ্রান্তে অন্ধকারপ্রায় একটি স্থানে বসিয়া কহিল—বেশী কথাবার্তা বলো না রমা; রেলে না চড়লে বিশ্বাস নেই।

তখনও ট্রেন আসিতে খানিকটা বিলম্ব ছিল। এদিকে ওদিকে দুই চারিটি যাত্রীর দল বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিল। স্টেশনের বাহিরে একটা চায়ের দোকানে একটা ছোঁড়া হাঁকিতেছিল—চা গরম—বাবু বিড়ি পান।

কোন গাড়ীর একটি গরু কখন দড়ি খুলিয়া পলাইয়াছে—গাড়োয়ানটা গরুটাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমাগত তাহাকে গাল দিতেছিল—এমন শালার বে-আক্কেলে গরু তো আমি দেখি নাই।

কাহাদের একটি বউ আসিয়া রমাদের অনতিদূরে বসিল। পেঁটরাটি নামাইয়া সঙ্গের পুরুষটি কহিল—বস তুমি এইটার ওপর—আমি পান বিড়ি লিয়ে আসি।

রমা নলিনীকে চুপি চুপি কহিল—বউটির সঙ্গে আলাপ করব দিদিমণি?

অন্ধকারের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়—নলিনী দৃষ্টি হানিয়া বসিয়াছিল লাইনের ধারে।

সে রমার কথায় মুখ ফিরাইয়া কহিল—না। বস চুপ করে।

নলিনীর মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল একটি বিষণ্ণ চিন্তার ধারা, সেই চিন্তাতে আবার সে নিমগ্ন হইয়া গেল। টিকিটের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই নলিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিল—তুমি বস রমা আমি টিকিট করে আনি।

টিকিট ঘরের জানালার ধারে নলিনী একখানা দশ টাকার নোট আগাইয়া দিয়া কহিল—দুখানা হাওড়ার টিকিট দেবেন তো।

চুড়ি-পরা মসৃণ-ত্বক হাত দেখিয়া আর কণ্ঠস্বর শুনিয়া টিকিটবাবুটি আলোটি জোর করিয়া দিলেন। জানালার জালতির গায়ে নাকটা চাপা পড়িয়া চ্যাপ্টা হইয়া গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি কহিলেন—কোথাকার ?

তাহার অদ্ভুত মুখভঙ্গি দেখিয়া নলিনী মনের এই অবস্থাতেও না হাসিয়া পারিল না। সে কহিল—হাওড়ার।

—একখানা ?

—না—দুখানা।

টিকিটের আলমারীর খোপে খোপে দৃষ্টি বুলাইয়া তিনি হাওড়ার টিকিট অনুসন্ধান করিতেছিলেন—আর মুখে বলিতেছিলেন—হাওড়া হাওড়া হাওড়া।

অকস্মাৎ আবার তিনি জালতির গায়ে নাক চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ ক্লাস ?

—থার্ড ক্লাস।

—হুঁ—থার্ড ক্লাস—হাওড়া হাওড়া। খুঁজিতে খুঁজিতে নলিনীর ভাগ্যক্রমে টিকিট পাওয়া গেল। টিকিট দুখানা লইয়া নলিনী রমার কাছে আসিয়া কহিল—উঠে এস রমা।

—দাঁড়ান আপনি।

নলিনী চমকিয়া উঠিল, প্লাটফর্মের আলোগুলো তখন সবেমাত্র জ্বলিতে শুরু করিয়াছে—সেই আলোতে নলিনী পিছন ফিরিয়া দেখিল দুটি লোক। একজন পুলিশের পোশাক পরা ভদ্রলোক ; অপরজন মহেন্দ্রবাবুর মোকদ্দমা সেরেস্তার কর্মচারী মিত্তির মশায়।

নলিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া সে কহিল—আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ।

নলিনী নীরবে তাহাদের বক্তব্যের অপেক্ষা করিল।

পুলিশ কর্মচারীটি কহিল—আপনার বিরুদ্ধে একটা চার্জ আছে।

আপনি এখানকার হাসপাতালের যন্ত্রপাতি আর মহেন্দ্রবাবুর বাড়ির কিছু টাকা চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

নলিনীর মনে হইল পায়ের তলা হইতে মাটিটা যেন সরিয়া যাইতেছে। সে এ আশঙ্কা করে নাই। অপর যে কোন অভিযোগ শুনিবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল কিন্তু এই চুরির অভিযোগ তাহার কল্পনাতীত। এ যুগে যে এর চেয়ে ঘৃণ্য অভিযোগ আর কল্পনা করা যায় না।

কিছুক্ষণ পর সে প্রশ্ন করিল—কেউ কারও নামে চুরির অভিযোগ করলেই কি আপনারা তাকে এ্যারেস্ট করে থাকেন?

দারোগা কহিল—হ্যাঁ তাই নিয়ম। অবশ্য চুরি যে হয়েছে তার সন্তোষজনক প্রমাণ দেখিয়ে—আমাদের বিশ্বাস করাতে হবে। তারপর ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার অধিকার গৃহস্থের বা অভিযোগকারীর থাকবে।

—ও। দেখুন আমারও আজ গয়না চুরি গেছে। আমি জানি সে গয়না মজুত আছে এখানকার মহেন্দ্রবাবুর খাজাঞ্চীখানার সিন্দুকে।

এবার কথা কহিল মিত্তির মশায়—বাবুর মোকর্দ্দমা সেরেস্তার কর্মচারীটি—কবে আপনার গয়না চুরি গেল?

—আজই।

—সে সংবাদ আপনি পুলিশে দেন নি কেন?

—আমার ইচ্ছা হয় নি।

মৃদু হাসিয়া কর্মচারীটি কহিল—এও যে একটা মস্ত বড় অফেন্স আপনার। এর জন্যও পুলিশ কেসে পড়তে হবে আপনাকে।

নলিনী কঠিন হাসি হাসিয়া কহিল—অর্থাৎ অপরাধ যত কিছু সবই আপনাদের রচনায় আমাকেই পাকে পাকে ধরেছে। বেশ—এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন।

দারোগা কহিল—আমার সঙ্গে আপনাকে আসতে হবে। আসুন।

—চলুন। এস রমা।

রমা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ওদিকে ট্রেনটা আসিয়া পড়িয়াছিল। যাত্রীর কলরবে স্টেশন প্লাটফর্মটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

নলিনী ও রমাকে লইয়া স্টেশন ঘরের মধ্যে পুলিশ কর্মচারীটি তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলেন।

—আপনার জিনিষপত্রগুলো একবার দেখতে চাই আমি।

নলিনী দৃপ্ত ভাবেই উত্তর দিতেছিল। সে উত্তর দিল—জিনিষ-পত্র তো সঙ্গে কিছু নেই আমার। থাকবার মধ্যে আমার পরনে যা রয়েছে—তাই। এর মধ্যে কি কিছু লুকিয়ে রাখতে পারি বলে আপনার মনে হয়?

মিত্তির মশাই বলিয়া উঠিল—অন্য জিনিষ না থাকতে পারে—কিন্তু টাকা কি নোট বা গয়না এ-সব; —না কি বলছেন দারোগাবাবু এ্যাঁ?

সভয় বিস্ময়ে নলিনী চমকিয়া উঠিল, বলিল—আপনারা কি আমার দেহ তল্লাস করে দেখতে চান?

মিত্তির মশায়ই জবাব দিল—আইন তো তাই বটে। তার আর আমরা কি করব বলুন—এ্যাঁ—না কি বলছেন দারোগাবাবু?

নলিনী স্টেশনঘরের টেবিলটার উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুর লজ্জা গোপন করিল। জীবনে লজ্জাকর বিপদের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ান ছাড়া মানুষের যখন কোন উপায় থাকে না—তখন অনেক সময় সে জোর করিয়া টানিয়া আনে কৃত্রিম একটা দম্ভপূর্ণ সাহসিকতা। কিন্তু তাহার জীবন যেমন অল্প তেমনি যে মূল্যহীন। মুহূর্তে মুহূর্তে স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মত সে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। নলিনীর ঠিক এমনি একটি অবস্থা আসিয়াছিল। সে টেবিলের উপর মুখ গুঁজিয়া উদ্যত ক্রন্দন সম্বরণের চেষ্টা করিতে চাহিল।

বাহিরের একটা ছোঁড়া ফিরি করিয়া ফিরিতেছিল—গরম চা—চা গরম বাবু।

দারোগা হাঁকিল—এই বেটা চা গরম—এই। দে ত এখানে চা দু-কাপ। আপনি খাবেন চা? আমাদের লেডি-ডাক্তারকে বলছি।

নলিনী টেবিলের উপরেই মাথা নাড়িয়া অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিল।

মিত্তির মশায় কহিল—তবে আর দু কাপ নেবেন কেন?

দারোগা বলিল—আপনি?

গলার মালায় হাত দিয়া মিত্তির মশায় উত্তর করিল—আজ্ঞে না, চা কি পান, কি তামাক, বিড়ি কি সিগারেট ও আমি খাই না। ও-গুলো তো জীবনে নেসেসিটি নয়, না কি বলেন দারোগাবাবু? জীবনে চা খেয়েছি তিন কাপ। বুঝলেন কিনা—১২৯৫ সালে আষাঢ় মাসে। বেশ মনে আছে ২৫শে আষাঢ় আমার সর্দি করেছিল খুব—চা তখন দেশে নতুন উঠেছে, সেই একদিন এক কাপ খেয়েছি। আর সেকেণ্ড কাপ খাই এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে গিয়ে—সে হল আপনার ১৩০২ সালের ১২ই মাঘ। রাত্রে পড়তে পড়তে ঘুম আসছিল, সেদিন খাইয়েছিল আমাদের ক্লাস ফ্রেণ্ড—হরগোবিন্দ সেন—সে এখন মুন্সেফ।

দারোগা কহিল—জানি তাঁকে আমি, হুগলিতে ছিলেন তিনি—

সঙ্গে সঙ্গে মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—ছিল বোধহয় নাইন্টিন এইট থেকে নাইন্টিন ইলেভন পর্যন্ত হুগলিতে ছিল হরগোবিন্দ। সেই দিন আমাকে খাইয়েছিল। আর একদিন বর্ষায় খুব ভিজে জিয়াগঞ্জ স্টেশনে এক কাপ চা কিনে খেয়েছি। সে বোধ হয় ১৩২৭ সালের শ্রাবণে—১৬ই শ্রাবণ। তা নইলে আমি জীবনে চা কখনও খাই নি। দোকানে মিষ্টিও কখনও খাই নি আমি—মিষ্টির মধ্যে বাতাসা আর গুড়। হোটেলেও ভাত কখনও খাই না, যেখানে যাই আলু-ভাতে-ভাত—ওই একপাকে যা হল আর কি—তাই খাই। আমার ব্যাগে সব থাকে—চাল, ডাল, আলু, নুন, মসলা—শিশিতে তেল—

দারোগা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—তাহলে ব্যাগও তো আপনার মস্ত বড়। চামড়ার—

জিভ কাটিয়া মিত্তির মশায় বলিল—রাম রাম—ক্যাম্বিসের, চামড়ার জুতোই আমি পায়ে দিই না। ক্যাম্বিসের—

মিত্তির মশায়ের কথায় একটা বাধা পড়িল। একজন আগন্তুক দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল—মাস্টার মশায় টিকিটটা কাকে দেব? কেউ নেই ত গেটে। টেবিল-ল্যাম্পের আলোক পরিপূর্ণভাবে আগন্তুকের দেহের উপর পড়িয়াছিল। একটি ছাব্বিশ সাতাশ বছরের যুবক—গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ তাহার, শুভ্র একটি পাঞ্জাবিতে তাহাকে মানাইয়াছিল বড় চমৎকার।

দারোগা তাহাকে দেখিবামাত্র নমস্কার করিয়া বলিয়া উঠিল—নমস্কার সঞ্জীববাবু, এই ট্রেনে নাকি?

সঞ্জীবও প্রতি নমস্কার করিয়া বলিল—নমস্কার। আজ্ঞে হ্যাঁ এই ট্রেনেই এলাম জামালপুর থেকে। তারপর আপনারা কোথায়?

দারোগাবাবু কোন উত্তর দেবার পূর্বেই মিত্তির মশায় চেয়ার ছাড়িয়া বিলক্ষণ হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল—প্রণাম। ভাল আছেন সঞ্জীববাবু। প্রত্যুত্তরে সঞ্জীব ঠিক তেমনি ভাবে প্রত্যভিবাদন করিয়া কহিল—প্রণাম। হ্যাঁ ভালই আছি। তারপর আপনি কেমন?

ভদ্রলোক একেবারে আঁতকাইয়া উঠিলেন, অদ্ভুত ভঙ্গিতে কহিলেন—রাধে, রাধে, রাধে! ই—কি ব্যবহার মশায়—আপনার, ই—কি ব্যবহার মশায়? ই—তো ভাল নয়? আপনি ব্রাহ্মণ আমি শূদ্র—

হাসিয়া সঞ্জীব কহিল—প্রণাম করলে আমি প্রণামই করে থাকি মিত্তির মশায়। কারও প্রণাম গ্রহণ করবার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি না।

মিত্তির মশায় অবজ্ঞাভরে কহিল—এ-সব হল আজকালকার ফ্যাশান—না কি বলেন দারোগাবাবু। বাঙালীর মত ফ্যাশানের দাম আর কোনও জাতে নাই। এ্যাঁ—না কি বলেন দারোগাবাবু—য়্যাঁ?

সঞ্জীব উত্তর দিল—সেইটেই বাঙালীর জীবনে বড় ভরসার কথা মিত্তির মশায়। সংস্কারকে লঙ্ঘন করতে পারে, নতুনকে সাগ্রহে বরণ

করে নিতে পারে—এমনি জাতই পৃথিবীকে ভবিষ্যতে নতুন কিছু দিতেও পারে। যাক মাস্টার মশায় গেলেন কোথায়? টিকিটখানা দিই কাকে?

মিত্তির মশায় কিন্তু কথাটা এত সহজে ভুলিতে পারিল না। সে কহিল—আচ্ছা আপনি জাত মানেন না?

—না।

—তবে পৈতে রাখেন কেন আপনি গলায়?

হাসিয়া সঞ্জীব কহিল—পৈতে তো রাখি না।

—রাখেন না?

—না।

—আপনি তা হলে অতি—অতি—। যোগ্য বিশেষণ বোধহয় মিত্তির খুঁজিয়া পাইল না।

সঞ্জীব কৌতুক ভরে কহিল—অতি অতি—তারপর কি বলুন মিত্তির মশায়!

দারোগাও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। মিত্তির মশায়ের অঙ্গ কিন্তু জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে বলিয়া উঠিল—জানি না মশায়, যান। বামুনকে গাল দিয়ে আমি পাপের ভাগী হই আর কি? না কি বলেন দারোগাবাবু এ্যাঁ? নাইন্টিন ফোরে বর্দ্ধমানে রমেশ চাটুজ্যে উকিল ব্রাহ্মধর্ম যখন নেয় বুঝলেন কিনা, তখন এমনি একদিন আমার সঙ্গে মহা তর্ক। আমি বলেছিলাম মশায় এর পর বুঝবেন—এখন রক্তের তেজ আছে—এর পর বুড়ো বয়সে বুঝবেন। হয়েছেও তাই—গত বৎসর মাঘ মাসে বোধ হয় ১৮ই তারিখে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। কত দুঃখই করলেন রমেশবাবু, বললেন মিত্তির মশায়, এ হয়েছে আমার সাপের ছুঁচো গেলা, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে গেলাম।

সঞ্জীব টিকিটখানা টেবিলের উপরে রাখিয়া দিয়া কহিল—থাক টিকিটখানা এইখানেই। আমি যাই, রাত্তির হচ্ছে।

দারোগা অনুরোধ করিয়া বলিল—আরে বসুন না মশায় যাবেনই তো। চা খান এক কাপ।

এই—এই বেটা চা-গরম।

বাধা দিয়া সঞ্জীব কহিল—থাক দরকার হবে না দারোগাবাবু। অনর্থক ব্যস্ত হবেন না আপনি।

দারোগাবাবু প্রশ্ন করিল—তারপর কদিন থাকবেন এখানে? করছেন কি আজকাল?

এ প্রশ্নে সঞ্জীব হাসিয়া ফেলিল। কহিল—একটা কথা মনে পড়ে গেল দারোগাবাবু। একজনের গাড়ী মেরামতের দরকার হয়েছিল, পথে কামারকে দেখে পথেই ধরেছিল যে এটা তুমি এখানেই মেরামত করে দিয়ে যাও।

দারোগাও হাসিয়া উঠিল—তারপর বলিল—মাপ করতে হবে সঞ্জীববাবু—যে উদাহরণটা দিলেন ও অভ্যেস এ সংসারে একটা লোক বাদ দিয়ে বোধকরি ন'শো নিরানব্বই জনের। কে বেশী খাটতে চায় বলুন?

সঞ্জীব বলিল—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে।

বাধা দিয়া দারোগাটি কহিল—থাক, সঞ্জীববাবু, প্রশ্ন আমি বুঝেছি। কিন্তু এ প্রশ্ন আপনার কাছে প্রত্যাশা করিনি। পৃথিবীতে চিরদিন নতুন এবং সরলকে সন্দেহ বা চোখে চোখে সবাই রেখে এসেছে, এবং ভবিষ্যতেও বোধকরি রাখবে। যাকে বোঝা যায় না সেই এ সংসারে আশঙ্কার বস্তু।

—যাক ও কথা মশাই—ও আলোচনায় ফল নেই। আপনার কথার বরং উত্তর দিই। এখন এখানে কিছুদিন থাকব। মায়ের শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না—তার ওপরে বয়সও হয়েছে তাঁর, কোনদিন হয়ত মারা যাবেন, শেষ মুহূর্তে দেখা হবে না—বা হয়ত সৎকারই হবে না।

চট করিয়া মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—মা মারা গেলে কি করবেন আপনি—কোন মতে সৎকার করবেন?

সঞ্জীব বলিল—কথাটা আপনি এখনও ভোলেন নি দেখছি। মায়ের সৎকার আমার হিন্দু মতেই করতে হবে, কারণ মা আমার নিষ্ঠাবতী

হিন্দু। তাঁর অভিপ্রায় এবং তাঁর ধর্মপদ্ধতি অনুযায়ী, তাঁর সৎকার হওয়াই সঙ্গত। নইলে সৎকার যে কোন মতে করতে আমার বাধা নেই। যে কোন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বা সৎকারে আমি যোগ দিতে পারি বা দিয়ে থাকি। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন সে ভাবিল—তারপরে কহিল—বেশ লাগে আমার অন্ধকার রাত্রে নির্জন বসতিহীন প্রান্তরে জ্বলন্ত চিতার উপর শবদাহ দেখতে। চোখের ওপর দেহখানা ছাই হয়ে যায়—জ্বলন্ত আগুনের উপর থাকে শুধু ওই সত্যটি আর চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে লীন হয়ে যায় স্বার্থপর সংসার।

অকস্মাৎ সে হাসিয়া কহিল—বড্ড বেশী ভাবপ্রবণ হয়ে গেছি দেখছি। থাক চলি দারোগাবাবু।

নলিনী মুখ তুলিয়াছিল—অশ্রুর চিহ্ন তখনও মুখে পরিস্ফুটরূপে দেখা যাইতেছিল। সে কহিল—একটু দাঁড়ান।

সঞ্জীব বিস্মিত হইয়া কহিল—আমাকে বলছেন? আপনাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে আগে—ও আপনি লেডি-ডাক্তার না?

নতমুখে নলিনী বলিল—হ্যাঁ। বড় বিপদে পড়ে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি।

সঞ্জীব দারোগার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—দারোগা বোধ হয় প্রস্তুতই ছিল—

সে বলিল—আপনার বোধ হয় এর মধ্যে থাকা উচিত হবে না সঞ্জীব-বাবু। এঁর বিরুদ্ধে চুরির চার্জ দিয়ে ডায়েরী করেছেন মহেন্দ্রবাবু।

নলিনী উত্তেজিত ভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—না—না——মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা। আমি আর যাই হই চুরি করতে আমি পারি না। আমায় আটকে রাখতে চায় এরা। সে আর কিছু বলিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

সঞ্জীব দারোগার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি চুরি করেছেন ইনি দারোগাবাবু?

মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—এ আপনার ইললিগাল হচ্ছে মশায়।

পাবলিক সারভেণ্টের কর্তব্যে বাধা দেওয়া বে-আইনি। নাইন্টিন টোয়েনটি নাইনে ডিসেম্বরের রেকর্ড খুলে দেখবেন সিমিলার কেস এই থানাতেই হয়েছে

সঞ্জীব সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না, সে দারোগাকেই প্রশ্ন করিল —কি চার্জ দারোগাবাবু?

দারোগা বলিল—হাসপাতালের ইনস্ট্রুমেণ্ট আর কিছু নগদ টাকা ইনি নাকি চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন কলকাতা।

—সে সব জিনিষ কি এর কাছে পাওয়া গেছে?

—না। তবে কিছু টাকা—একখানা দশ টাকার নোট স্টেশন মাস্টারের কাছে পেয়েছি, ইনি টিকিট করেছেন তা দিয়ে—নোটখানার পেছনে মহেন্দ্রবাবুর এস্টেটের স্ট্যাম্প মারা আছে।

নলিনী কহিল—সে আমার মাইনের টাকা। ওঁদের এস্টেট থেকেই মাইনে পেয়েছি আমি।

সঞ্জীব বলিল—আপনারা এখন কি করতে চান দারোগাবাবু?

দারোগা প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া উত্তর দিল—আপনি কি এঁর জামিন হতে পারবেন সঞ্জীববাবু? কেসের সময় হাজির করে দেবেন। কিন্তু এ ব্যাপারটায় আপনি হাত না দিলেই ভাল হত—বোধ হয় আপোসেই মিটে যেত। আর জানেন ত মহেন্দ্রবাবুকে—

মৃদু হাসিয়া সঞ্জীব বলিল, জানি, সেই জন্যেই এঁর কথায় অবিশ্বাস করতে পারছি না আমি।

মিত্তির মশায় অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল—এই মাগীর পরিচয় জানেন?

রূঢ় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সঞ্জীব কঠিন স্বরে কহিল—চুপ করুন আপনি।

পিছনে মনিবের জোর থাকিলে কুকুর সহজে ভড়কায় না। এতবড় জমিদারের কর্মচারী এতটুকুতে দমিল না, বলিয়া উঠিল—মাগী খৃষ্টান—

স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সঞ্জীব বলিল—আর কিছু বলবার আছে আপনার?

এই দৃষ্টিতে মিত্তির মশায় একটু দমিয়া গেল সে ঈষৎ মৃদুভাবে বলিল—বাবুর—বাবুর রক্ষিতা—

—আর কিছু ?

মিত্তির মশায়ের বাক যন্ত্রটার দম যেন ফুরাইয়া গেল, অতি শিথিল মৃদুভাবে সে কহিল—না।

ও-পাশে টেবিলটার উপব মাথা বাখিয়া নলিনী মুখ লুকাইয়া ছিল। রুদ্ধকণ্ঠেব কয়েকটি কথা ভূমিতলে প্রতিধ্বনিত হইয়া সকলের কানে আসিয়া পৌঁছিল—সত্যি সত্যি।

সঞ্জীব এক মুহূর্তের জন্য নলিনীর পানে তাকাইয়া কহিল—আমি এঁব জামিন হচ্ছি দাবোগাবাবু।

দারোগা উঠিয়া কহিল—আসুন তাহলে থানায়, জামিননামায় সই করে দিতে হবে আপনাকে।

জামিনে আবশ্যকীয় কাগজপত্রে সহি ইত্যাদি শেষ করিতে রাত্রি অনেকটা হইয়া গেল। মিত্তির মশায় প্রয়োজনীয় বিবরণটুকু নীর হইতে ক্ষীরের মত ছাঁনিয়া ছানিয়া ছোট নোট বইখানিতে নোট করিয়া লইল। তারপর আসন ছাড়িয়া উঠিবাব সময় সঞ্জীবকে বলিল—প্রণাম সঞ্জীববাবু, কাজটা আপনার মত লোকের যোগ্য কাজ হল। আর কি জানেন, এ কাজ মানায়ও আপনার মত লোককে।

সঞ্জীব হাসিয়া কহিল—প্রণাম। কিন্তু আপনাদের চোখেও কি আমাদের যোগ্যতা ঠেকে মিত্তির মশায় ?

মিত্তির মশায় সঞ্জীবের কথা শেষ হইবার পূর্বেই লাফাইয়া উঠিয়াছিল, রাধে রাধে, গোবিন্দ হে! আপনি যে কি করেন সঞ্জীববাবু, ছি-ছি-ছি। না—না, রাধে রাধে—এ আপনার ভারি অন্যায় মশায়। আপনি ভারি ইয়ে।

সঞ্জীব উত্তর দিল—স্টেশনে তো এর আগে অনেক কথা হয়ে গেল, তারপর যে আপনি এমনি ভুল করে বসবেন এ আমি কেমন করে বুঝব বলুন!

মিত্তির মশায় সহসা সঞ্জীবের হাত দুটি জড়াইয়া ধরিয়া অনুনয় করিয়া কহিল—দোহাই সঞ্জীববাবু, আমাকে আর পাপের পঙ্কে ডোবাবেন না। পায়ের ধূলো আমায় দিন। আর রহস্য করবেন না।

সঞ্জীব ধীরভাবে কহিল—আমি কি রহস্যের ভঙ্গিতে আপনার সঙ্গে কথা কয়েছি এতক্ষণ? আমার তো তা বোধ হয় না। সত্যিই আপনাকে আমি বলছি—আপনাকে আমি রহস্য করি নি—এ আমার ধর্ম! আপনার ধর্মে যেমন কতকগুলো আচার আছে এও তেমনি আমার ধর্মের নিয়ম, আচার, আমার চেয়েও হীন বলে কারও প্রণাম গ্রহণ করি না।

মিত্তির মশায় তাহার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পরিত্যক্ত চেয়ারটায় আবার বসিয়া পড়িল। তারপর ঊর্দ্ধমুখে থানার চাল কাঠামোর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনাদের থানাটি কিন্তু বেশ চমৎকার, দারোগাবাবু। চালের কাঠামো কি! অথচ দেখুন একশো বছরের বেশী দিনের ঘর। আজকাল এমন ঘর আর হয় না—না কি বলেন, এ্যাঁ?

—নবগ্রামে একখানি এমনি ঘর আছে—বুঝলেন, হারাধন চাটুজ্যের ১২২৫ সালের ঘর, অথচ এখনও কি শক্ত।

সঞ্জীব দারোগাকে নমস্কার করিয়া নলিনীকে কহিল—আসুন।

মিত্তির মশায় দারোগাকে বলিতেছিল—এরও বয়স অনেক দিনের। ষড়দলে সাল সন লেখা আছে। ১৩০৩ সালে এ থানায় আমি প্রথম আসি, বুঝলেন দারোগাবাবু তখন দেখেছি, বোধ হয় ১২৪৮ সাল লেখা আছে নয় দারোগাবাবু, এ্যাঁ?

ততক্ষণে সঞ্জীব নলিনী ও রমাকে লইয়া রাস্তার উপর নামিয়াছে। দারোগাবাবু মিত্তির মশায়ের কথার কি একটা জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু মিত্তির মশায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আগে আলোটা একবার দেন তো মশায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই আলোটা তুলিয়া লইয়া একটা জায়গার মাটি লইয়া মাথায় বুকে বুলাইয়া

লইল। ঐ স্থানটিতেই সঞ্জীব দাঁড়াইয়া ছিল। আলোটা নামাইয়া দিয়া মিত্তির মশায় কহিল—দেখুন দেখি মশায় এঁচোড়-পক্ক বামুনের ছেলের কাজ। আরে বাপু বামুনের ছেলে তুই। দেশের অধঃপতন দেখুন দেখি একবার। রাধে রাধে! ধর্ম গেলে আর রইল কি? নমস্কার দারোগাবাবু; কিন্তু কাজটা আপনি ভাল করলেন না মশায়। জামিনটা না দিলেই হত। বড় দারোগাবাবু থাকলে—

দারোগাবাবু মৃদু হাসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন—ঐ ছেলেটি বড় পাকা ছেলে মিত্তির মশায়—সাহস হল না। পরশু খবরের কাগজেই বোধ হয় যেটুকু ঘটল এ সংবাদটুকুও দেশময় রটে যাবে। নিজের মাথার দামটা নিজের কাছে খুব বেশী মিত্তির মশায়! কি বলেন আপনি?

মিত্তির মশায় আবার চাপিয়া বসিল। কহিল—যা বলেছেন মশায়। এর একটা বিহিত—

দারোগাবাবু বলিলেন—আপনার বাবুকে বলুন না। একটা দুগ্ধপোষ্য বালককে জব্দ করতে তিনি পারছেন না! ওরে আমার খাবার তৈরী করতে বল তো। তাহলে—

জোড়হাতে বিনীত নমস্কারের ভঙ্গিতে ঘাড় দোলাইয়া সদর রাস্তার দিকে পথ নির্দেশ করিয়া দিলেন।

মিত্তির মশায় অগত্যা উঠিল। থানা হইতে পথে নামিতে নামিতে আপন মনেই বলিয়া উঠিল—পড়ে ডেঁপোটা একবার একটা ফৌজদারী মামলায়!

রাস্তায় নামিয়া সঞ্জীব কহিল—তারপর আপনি এখন কোথায় যাবেন?

নলিনী অসঙ্কোচেই উত্তর দিল—আপনার বাড়ি। নইলে আর এ গ্রামে আমায় আশ্রয় কে দেবেন বলুন? আপনার পরিচয় শুনেছিলাম—দু একবার দেখেওছিলাম—তাই স্টেশনে আপনার আশ্রয়

চেয়েছিলাম। নইলে এখানে অপর কোথাও আশ্রয় নিলে ঘুমিয়ে উঠে দেখতাম যেখানকার মানুষ সেখানেই আছি।

সঞ্জীব একটু নীরব থাকিয়া বলিল—সে প্রস্তাব আমি আগেই করতাম এবং করাই উচিত ছিল। কিন্তু তাতে একটু অসুবিধা—আপনাদেরই অসুবিধা হবে বলে মনে হয়।

বিচিত্র হাসি নলিনীর মুখে দেখা দিল। সে কহিল—আমাদের অসুবিধা!

—হ্যাঁ, আপনাদেরই অসুবিধা। কথাপ্রসঙ্গে শুনেছেন বোধ হয় আমার মা সেকেলে নিষ্ঠাবতী হিন্দু। তিনি হয়ত—

নলিনী বাধা দিয়া কহিল—মার কটু কথা বা ঘেন্নাই যদি তিনি করেন, সে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ হবে সঞ্জীববাবু—। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল- আমার পরিচয় তো আপনার কাছে গোপন নেই—আমাদের জাতের গর্ভধারিণীদের মুখের পরিচয় আপনি জানেন না তাই এমন কথা বললেন। এক পাশে বারান্দায় শুয়ে থাকব রাত্রিটার মত।

সঞ্জীব কহিল—কিন্তু সে যে আমার চোখে বড় খারাপ ঠেকবে। আপনারা আমার অতিথি—

হাসিয়া নলিনী কহিল—হাজতের চেয়ে যে সে অনেক ভাল সঞ্জীববাবু। তা ছাড়া প্রচলিত যুগপ্রথায় অতিথিরও যে ক্লাসিফিকেশন সমাজে চল হয়ে গেছে। এইতো আপনাদের এখানে বাবুদের বাড়িতে সেদিন দেখলাম মুসলমান রাজকর্মচারীর এঁটো কাপ ধরে নিতে দশ বারোখানা হাত একসঙ্গে এগিয়ে এল। আর তারই সঙ্গে ছিল একটি ব্রাহ্মণ কনেস্টবল—সে বেচারা চা পেলেই না সেদিন,—সে জলে ভিজেও ছিল, সেই ভিজে অবস্থায় সত্যিই হয়তো তারও এক কাপ চায়ের দরকার ছিল।

সঞ্জীব বলিল—এটাতে গৃহস্থের আতিথ্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু যতখানি ওজনের দোষ আপনি চাপাচ্ছেন ততখানিও সত্যি নয়

বলে আমার মনে হয়। জাতিভেদ আমি মানি নে। যে মানে তার কাছেও অতিথির জাতিভেদ থাকা উচিত নয়। সুতরাং স্বজাতি ভিন্ন জাতির কথাটা ধরা যায় না। তারপরে যে ভেদ সেটা হয়েছে গুণ কৌলিন্যে—ধন কৌলিন্যের অপরাধ ওখানে স্পর্শ করে নি। ওইটেই আমার মনে হয় সব চেয়ে হীন কৌলিন্য—ওটা একটা অপরাধ।

সঞ্জীবের এ কথাটা নলিনীর বেশ পছন্দ হইল না কিন্তু যে লোকটি তাহাকে এ হেন বিপদে মাত্র একটি অনুরোধে জীবনের অমার্জনীয় অপরাধ উপেক্ষা করিয়া উদ্ধার করিল—আবার আশ্রয় দিতে চলিয়াছে, তাহার সহিত এ লইয়া তর্ক করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে ভাবিল মতের মর্যাদার চেয়ে কৃতজ্ঞতার পরিমাণ তাহার বহুগুণে বেশী হওয়া উচিত। আজ যদি সে মতের মর্যাদা করিতে চায় তবে সে নিজের অমর্যাদাই করিবে বেশী।

অবসর পাইয়া রমা মৃদুস্বরে বলিল—দিদিমণি আমাদের বাড়ি চল না?

নলিনী স্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তুমি কি অদ্ভুত ছেলেমানুষ রমা! এই রাত্রের অন্ধকারে—এই দেশের পথ দিয়ে তোমাদের বাড়ি যেতে তোমার সাহস হয়?

লজ্জিত হইয়া রমা কহিল—না—না। তবে বাবুর মা বকবে বলছিলে যে তাই—

সঞ্জীব ব্যস্তভাবে একথার জবাব দিল—না না না। সে ভয় নেই। মা কটু কথা কখনও বলবেন না। তবে তিনি স্পষ্টভাষিণী। স্পষ্ট সত্য অনেক সময় রূঢ় হয়। আর ছোঁওয়া নাড়ার বাছবিচার তিনি করে থাকেন, এই পর্যন্ত।

নলিনী হাসিয়া কহিল—কাকে কি বলছেন সঞ্জীববাবু? কটু কাকে বলে সে ও বোঝে না। সত্যই বা কি বস্তু সেও ও জানে না।

ওর কথা আপনি ধরবেন না। ভাল করে না দেখলে ও যে কি সে বিচার করা যায় না।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—উনি কে ?

—ও উনি নয়। জগতে ও সকলের স্নেহাস্পদা হবার যোগ্যা। ওর পরিচয় এর পরে বলব। ওর দৃষ্টিতে এ সংসারে খারাপ ও কাউকে দেখে নি। ওদের গ্রামের মহাজন এককড়ি গাঙ্গুলীও ওর কাছে দেব-তুল্য ব্যক্তি।

সদর রাস্তা হইতে একটা গলির পথে মোড় ফিরিয়া সঞ্জীব কহিল —তাইতো—একটা আলো হলে ভাল হত। অচেনা গলি, পথে চলতে—

অকস্মাৎ পাশের কোন অন্ধকার গোপন স্থান হইতে একটি লোক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। সঞ্জীব চমকিয়া প্রশ্ন করিল—কে ?

চাপা গলায় উত্তর হইল—আমি—আমি গাঙ্গুলী-খুড়ো, এককড়ি গাঙ্গুলী। তারপরে ভাল আছ তো বাবা সঞ্জীব ?

সঞ্জীব বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—আপনি এখানে এমনভাবে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় ছিলেন ? এমন ধারা চাপা গলায়—

—দেওয়ালের কান আছে বে বাবা, দেওয়ালেরও কান আছে। ক্ষেত্রেকর্ম বিধিয়তে—বুঝলে বাবা। এ গাঁয়ে তুমি যে কথাটি চেঁচিয়ে বলেছ—তিন কান করেছ সেইটাই গিয়ে কাছারীতে রিপোর্ট হয়েছে।

সঞ্জীব এখানকারই মানুষ—এখানকার মানুষের পরিচয় তাহার অজ্ঞাত নয় এবং এখানকার প্রচলিত ভাষার প্রচলনগুলোর অর্থও সে জানে। কাছারীর উল্লেখ করিতেই সে বুঝিল এ জাল রচনায় গাঙ্গুলীর মত কৃতী কৌশলী ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন হস্তও আছে। সে কহিল—এ ব্যাপারে তাহলে আপনি সব জানেন।

স্বভাবসিদ্ধ দ্রুতকণ্ঠে গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—পাষণ্ড, পাষণ্ড, মহাপাষণ্ড, বুঝলে বাবাজী, চণ্ডাল নরাধম বেটা। ধন থাকলেই কিছু মানুষ হয় না, ধার্মিক হয় না, মহাপুরুষ হয় না। জিজ্ঞাসা কর এই এঁকে—আমাদের লেডি-ডাক্তারকে, ভাল মানুষের মেয়ে উনি—নিজে অতি ভাল লোক। মুখের সামনে বললে মনে হবে তোষামোদ করছি,

কিন্তু সত্যি বলছি আমি, অতি মহৎ লোক উনি। ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর তুমি কি মহাপাষণ্ড চণ্ডাল—ইতর—

অনর্গল অর্থহীন প্রলাপের কোন জবাব হয় না। সঞ্জীব বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিল—কি সব বাজে বকছেন আপনি? চুপ করুন।

ইহাতেও গাঙ্গুলী নিরস্ত হইল না। সে এদিক ওদিক চাহিয়া লইয়া সঞ্জীবের কানের কাছে সহসা মুখটা লইয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল—ওই শালা মহেন্দ্রবাবু।

সঞ্জীব উষ্ণভাবে কহিল—বুঝলাম কিন্তু তার প্রতিবিধান আমি কি করতে পারি? তাছাড়া ওরকম ধারা গালাগাল দেওয়া পছন্দ করি না গাঙ্গুলী মশায়।

গাঙ্গুলী উচ্ছ্বাসভরে কহিল—সেই কথাই তো বলি—যে ধার্মিক হবে, যার মনুষ্যত্ব থাকবে, সৎশিক্ষা যার আছে, সে তো এই কথাই বলবে। এই তো তাদের কাজ। এই এত বড় গ্রামে সহায়হীনা দুটি স্ত্রীলোক বিপদাপন্ন হল, তা কোন বেটার সাধ্যি হল না আঙুলটি তুলতে—। যত সব গরু ভেড়ার জাত, বিষকুম্ভ পয়োমুখম—

নলিনীর বিরক্তি বোধ হইতেছিল—সে পিছন হইতে বলিয়া উঠিল—সে ধরনের মানুষ আমরা দেখেছি গাঙ্গুলী মশায়। এ নিয়ে মিছে আর চিৎকার করবেন না আপনি।

চট করিয়া গাঙ্গুলী জবাব দিল—সে তো হাজারে হাজারে সংসারে রয়েছে—দেখবেন বৈ কি। এই আমাকেই দেখুন না। আমিও তো তাই। নইলে ওই চণ্ডাল ইতরের তাঁবেদারী করি আমি স্বার্থের জন্য—।

নলিনী অপ্রস্তুত হইয়া গেল। তাহার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটাকে উলঙ্গ-ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া দেওয়ায় সে লজ্জিত না হইয়া পারিল না। তাহার মনে সন্দেহ জন্মিয়া গেল যে হয়তো বা লোকটাকে যাহা সে ভাবিয়া আসিয়াছে ততখানি হীন সত্যই সে নয়। স্বার্থের দাস

তো সংসারে হাজারে ন' শো নিরানব্বই জন। কিন্তু স্বার্থে অন্ধ সেই নয় যে স্বার্থপরতা হেতু গ্লানি অন্তরে অন্তরে অনুভব করে। মানুষ তাহার অন্তরে আজও বাঁচিয়া আছে।

সঞ্জীব কহিল—আমার কাছে কি আপনার কোন দরকার আছে? অত্যন্ত শুষ্ক কণ্ঠস্বর এবং ভঙ্গিটি পর্যন্ত উগ্র।

গাঙ্গুলী কিন্তু বিরক্ত হইল না। সে মোলায়েম করিয়া বলিল—আছে বৈ কি বাবা। সৎকর্ম করলে আশীর্বাদ করতে হয়। সেটা যে অবশ্য কর্তব্য। সেই আশীর্বাদ করব বলেই—নইলে আমার গাড়ী সন্ধ্যে থেকে এসে বসে আছে। আর এই রমাকে নিয়ে যাব। ওর বাপ মা কেঁদে কেঁদে নদী গঙ্গা ভাসালে। মহাপাতক থেকে মুক্ত হব বাবা আমি। তোমারই দৌলতে—সৎসাহসে, নইলে মহাপাপে ডুবতে হত আমাকে।

নলিনী ইহার উত্তর দিল—কাল ওকে নিয়ে যাবেন গাঙ্গুলী মশায়। এই রাত্রে—

বাধা দিয়া গাঙ্গুলী কহিল—কোন ভয় নেই আপনার—কোন ভয় নেই। এমন পথ দিয়ে নিয়ে যাব যে কীটপতঙ্গে টের পাবে না।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—সে হবে না গাঙ্গুলী মশায়। ও যখন আমার আশ্রয়ে এসেছে তখন তো এমন ভাবে আপনার হাতে দিতে পারব না আমি। কাল ওর বাপকে সঙ্গে করে এখানে আসবেন, আমি বিবেচনা করে তখন যা হয় করব।

চমকিয়া উঠিয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—তার মানে?

পরিষ্কার কণ্ঠে সঞ্জীব উত্তর দিল—তার মানে আপনাকে বিশ্বাস করে ওকে আপনার হাতে আমি দিতে পারব না।

—আমি যজ্ঞোপবীত ছুঁয়ে দিব্যি করছি—

—যজ্ঞোপবীতে আমার বিশ্বাস নেই গাঙ্গুলী মশায়—আমার নিজেরও পৈতে নেই।

কয়েক মুহূর্ত হতবাক হইয়া থাকিয়া গাঙ্গুলী বলিল—আচ্ছা বাপু

সে তুমি নাই বিশ্বাস কর কিন্তু রমা যখন যেতে চাচ্ছে তখন তুমি আটক করবার কে শুনি ?

সঞ্জীব কোন কিছু বলিবার পূর্বেই নলিনী রমার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, রমা ?

যেন তাহার বিশ্বাস করিতেই কষ্ট হইতেছিল।

মৃদুস্বরে রমা কহিল—আমি বাড়ি যাব দিদিমণি।

গদ গদ হইয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—ওই ওই, শুনলে তো বাবা সঞ্জীব। রমা বলছে ও বাড়ি যাবে।

নলিনী বলিয়া উঠিল—কিন্তু উনি যে আমাদের জন্যে জামিন হয়ে এলেন সে জামিনের—

মধ্যপথেই সঞ্জীব কহিল—না, সে শুধু আপনার জন্যে। ও মেয়েটির বিরুদ্ধে অভিযোগও ছিল না—জামিনও আমায় হতে হয় নি।

তারপরে রমাকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল—যাও তুমি তাহলে ওঁর সঙ্গে। বলিয়া সম্মুখের গৃহদ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—মা মা মা।

পিছন হইতে গাঙ্গুলী আবার ডাকিয়া বলিল—ওগো বাবাজী আর একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে। আমার সেই বন্ধকী তমসুকখানা—অনেকদিন হয়ে গেল—তোমার বাবার আমলের ব্যাপার।

সঞ্জীব যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—কি—কি বলছেন আপনি ? সে তো—

ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া হ্যারিকেন হাতে একটি বর্ষীয়সী মহিলা বাহির হইয়া কহিলেন—সঞ্জীব ? কখন এলি বাবা ? আর কার গলা শুনছিলাম ? এ মেয়েটি কে রে ?

সঞ্জীব কহিল—দাঁড়াও সে সবই শুনবে। গাঙ্গুলী মশায়—কই গাঙ্গুলী মশায় ?

গাঙ্গুলীকে দেখা গেল না, রমাও নেই—নিরন্ধ্র অন্ধকার পিছনে থম থম করিতেছিল।

নলিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, কহিল—কাল স্নানে যখন যাবেন তখন আপনার পায়ের ধূলো নেব। আজ ভাগ্যে আমার নেই মা।

মা মেয়েটির মুখের ওপরে আলো ধরিয়া আর একবার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া কহিলেন—ইনি এখানকার মেয়ে-ডাক্তার নয় রে সঞ্জীব ?

সঞ্জীব তখনও বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে গাঙ্গুলীর সন্ধান করিতেছিল, সে সেই অবস্থাতেই উত্তর দিল—হ্যাঁ মা।

মায়ের মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি একটু সরিয়া গিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন—ইনি এখানে কেন ?

কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় চমকিয়া উঠিয়া সঞ্জীব মুখ ফিরাইল। সে কোন উত্তর দিবার পূর্বে নলিনীই উত্তর দিয়া বসিল—আপনার বাড়ি অধিকাংশ লোকেই যে জন্য আসে, মা আমিও সেইজন্য এসেছি। আমি বড় বিপদে পড়েছি, মা। এখানকার মহেন্দ্রবাবু আমায় জেলে দিচ্ছিলেন আমি চুরি করেছি বলে। পথে স্টেশনে সঞ্জীববাবুর দেখা পেয়ে ওঁর আশ্রয় চেয়েছিলাম। ইনি জামিন হয়ে আমায় উপস্থিত মুক্ত করে এনেছেন।

মায়ের মুখ আরও থম থম হইয়া উঠিল। তিনি সঞ্জীবকে কহিলেন—এর পরিচয় তুমি জান সঞ্জীব ?

কণ্ঠস্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ক্রোধ যেন রন্ রন্ করিতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—জানি মা, স্টেশনে মহেন্দ্রবাবুর কর্মচারী সতীশ মিত্তিরের কাছে সমস্ত পরিচয় পেয়েছি। সে যত গ্লানিকর ইতিহাস ছিল সব আমায় জোর করে শুনিয়ে তবে ছেড়েছে। ইনিও অকপটে সত্য যেটুকু স্বীকার করেছেন। কিন্তু মা ইনি যাই হোন, ইনি স্ত্রীলোক আর বেশ বুঝলাম আমি, মিথ্যা ষড়যন্ত্রে এঁকে ফেলবার

চেষ্টা হচ্ছে শুধু মাত্র বিপদাপন্ন করে এঁকে আয়ত্ত করবার জন্য। সে ক্ষেত্রে—

উষ্ণভাবে কথার অবশেষটুকু যেন মা শেষ করিয়া দিলেন, কহিলেন—তাই তোমার অমনি দয়া হয়ে গেল—কেমন?

সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল, এ-কথার কোন জবাব দিল না। উত্তর দিয়া মাকে সে আর অধিক উত্তপ্ত করিল না। নলিনীর বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। এতখানি কল্পনা করে নাই সে। তাহার মনে হইতেছিল এর চেয়ে থানা হাজত বহুগুণে ছিল ভাল। সেখানে যতই না দুঃখ থাকুক অনধিকারের হীনতা সেখানে তাহার ছিল না। আর চোরের অপমান তো তাহার হইয়াই গিয়াছে। লাঞ্ছনা সেখানে যতই থাকুক—গঞ্জনা সেখানে ছিল না।

মা কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে কহিলেন—এস বাড়ির ভেতর এস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে আর হবে কি? এস গো তুমিও এস, তোমার আর দোষ কি বল? আমার দয়ার সাগর ছেলে তোমায় না আনলে তো আর তুমি আসতে না বাছা! এ যদি আগে জানতাম আমি তবে যে গর্ভে আগুন ধরিয়ে দিতাম। নাও মহাপুরুষ, মুখ হাত ধুয়ে ফেল—কাপড় ছাড়, না এই আশ্বিনের রাত্রেই স্নান হবে?

সঞ্জীব কহিল—স্নানই করব। সে ব্যাগ খুলিয়া কাপড় গামছা বাহির করিতে বসিল।

মা নলিনীকে কহিলেন—তুমি মুখ হাত ধোও বাছা। এস আমার সঙ্গে, এস জায়গা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

নিজেই তিনি এক বালতি জল লইয়া অগ্রসর হইলেন। দুইটি ঘরের মধ্যস্থলে তিনদিক আবরিত বেশ একটি নিরিবিলি স্থান। তলদেশটি বাঁধানো থাকায় কোন অসুবিধা নাই। একদিকের দেওয়ালের হুকে একটি কেরোসিনের ডিবে ঝুলাইয়া দিয়া কহিলেন—কাপড় ছাড়বে তো বাছা?

ঘাড় নাড়িয়া নলিনী ইঙ্গিতে জানাইল—না।

রূঢ়স্বরে মা বলিয়া উঠিলেন—খৃষ্টান হও আর যাই হও বাছা—ময়লা কাপড় ছাড়াটা উচিত। একি আচারভ্রষ্ট তোমরা! এগুলোতে ধর্ম হোক আর না হোক শরীর তো ভাল থাকে। ও তোমার কাপড় চোপড় কিছু নাই বুঝি? দাঁড়াও সঞ্জীবের কাপড় একখানা এনে দি তোমায়।

অল্পক্ষণ পরেই একখানা কাপড় আনিয়া বুকে ঝোলাইয়া দিলেন। একটি সাবান নামাইয়া দিয়া কহিলেন—এই নাও সাবান রইল। আর জল যদি দরকার হয় তবে আমায় ডেকো, বুঝলে?

মুখ হাত ধুইতে ধুইতে নলিনী ভাবিতেছিল এইবার মা বোধ হয় পুত্রের উপর আর একদফা ঝাল ঝাড়িবেন।

এবার আর তাহার উপস্থিতি হেতু ওই দুর্দান্ত মুখরারও যেটুকু চক্ষুলজ্জা আছে—সেটুকুও থাকিবে না। সে শিহরিয়া উঠিল।

মায়ের গলাও শোনা গেল।

মা বলিতেছিলেন—কি খাওয়া হবে মহাপুরুষ? দুটো ভাতে ভাত চড়িয়ে দিই কি বলিস?

ছেলে কহিল—তাই দাও।

—তবে তুই পুকুরে স্নান করতে যাবি আর শম্ভু বাগদীকে বলবি দুটো আড়ার মাছ দিয়ে যাবে সে।

—সে বলব। কিন্তু তুমি বস তো একটু, একটা কথা শোন দেখি।

—কাল সকালে শুনব কথা। যা তুই এখন স্নান করে আয়—আমার অনেক কাজ। উনোনে আঁচটা দিয়ে দিই।

নলিনী এই সময় মুখ হাত ধুইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মাতা-পুত্রের কথার সুরে সে ভরসা পাইয়া হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সাহস করিয়া সে বলিয়া ফেলিল—আঁচটা আমি দিয়ে দেব মা?

মা ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—না বাছা, তুমি আমার ঘরে আগন্তুক অতিথি মানুষ। তোমাকে ও কাজ করতে দেওয়া আমার পাপ হবে।

তুমি বরং বস ওখানে, সঞ্জীব তোর সতরঞ্চিটা দে তো বের করে পেতে।

সঞ্জীব ঘর খুলিয়া একখানা সতরঞ্চি বাহির করিয়া বিছাইয়া দিল, কহিল—মা ঠিকই বলেছেন, আপনি অতিথি, আমরা আপনার পরিচর্যা করব। আপনি বিশ্রাম করুন একটু। আপনার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে আজ।

উনোনের মুখে বসিয়া আঁচ দিতে দিতে মা বলিলেন—আহা কচি মেয়ে তার উপর অত্যাচার দেখ তো?

সে কণ্ঠস্বর ওই মুখরার কণ্ঠে বিস্ময়ের বস্তু। সে স্বরকারুণ্য নলিনীকে স্পর্শ করিল। সে সতরঞ্চির উপর বসিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল। নিঃসঙ্গ অবস্থায় সমস্ত দিনের যুদ্ধক্লান্ত মনের অবসাদ সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহখানিকে যেন নাগপাশের মত বেড়িয়া ধরিল। এমনি একটি মুহূর্তের শুধু যেন অপেক্ষা ছিল, সেই মুহূর্তটি পাইবামাত্র দেহটা যেন এক নিমেষে ভাঙিয়া গেল, ক্লান্ত দেহখানি এলাইয়া দিয়া সে সতরঞ্চির উপর শুইয়া পড়িল। ঊর্দ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে শরতের নিবিড় নীল আকাশভরা ঔজ্জ্বল্য তাহার ভাল লাগিল। ভাল লাগিবারই কথা—মনে মনে তখন তাহার ক্লান্ত আনন্দ, তাহার বিপদ আজ সুসহায়ের আশ্বাসের মধ্যে নিরাপদে কাটিয়া গিয়াছে। তারার মালার মধ্য দিয়া শুভ্র ছায়াপথখানি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এখনও বর্ষার বাতাস বন্ধ হয় নাই। পূবে সজল হাওয়া ঝির ঝির করিয়া বহিতেছিল। নলিনীর চোখ দুটি আসন্ন ঘুমে নিমীলিত হইয়া আসিতেছিল।

স্বপ্নহীন নিশ্চিন্ত নিদ্রা হইতে সে জাগিয়া উঠিল সঞ্জীবের মায়ের ডাকে। ডাকিয়া তুলিয়া তিনি কহিলেন—বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছ মা, ডেকে তুলতে আমারই কষ্ট হচ্ছিল। ওঠ মা, মুখে দুটো দিয়ে নাও।

নলিনী লজ্জিত হইয়া কহিল—বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মা কহিলেন—ঘুমের আর দোষ কি মা? মুখে একটু জল দাও, ওই ঘটিটাতেই জল আছে।

মুখে হাতে জল দিয়া নলিনী প্রশ্ন করিল—সঞ্জীববাবু খেয়েছেন ?

মায়ের কণ্ঠস্বর উগ্র হইয়া উঠিল—বলো না বাছা সে আপদের কথা—আমার জীবনের অশান্তি সে। এই রাত্রে বেরিয়েছেন মহাপুরুষ, তার এক নাইট স্কুল আছে, তাই দেখতে। তুমি খেয়ে নাও বাছা—তার অপেক্ষায় তুমি আর কতক্ষণ বসে থাকবে। রাত এগারটার গাড়ী চলে গেল। সে যখন আসবে তখন খাবে। এই রাত্রে খবর না নিলে তার আর ঘুম হচ্ছিল না। কখনও কোন দিন যদি শান্তি সে দিলে আমায়।

সঞ্জীবের জন্য অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকিলেও সে সাহস নলিনীর হইল না। মুখ ফুটিয়া বলিতে তাহার ভয় হইল—কি জানি এই দুর্মুখী কি বলিয়া বসিবে! আহার তাহার শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় সঞ্জীব আসিয়া উপস্থিত হইল। মা কহিলেন—পায়ে জল দে ফের। যত সব ছোটলোক পাড়া মাড়িয়ে এলি তুই।

সঞ্জীব স্যাণ্ডেলটা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—ছোটলোক কথাটা তোমার ব্যবহার করা উচিত নয় মা। এবার আমি ওদের বলে দেব—না খেয়ে ওরা শুকিয়ে মরবে তবু তোমার সাহায্য নেবে না আর।

মা গর্জন করিয়া উঠিলেন—এত রাত্রে কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলি নাকি তুই? যা বলছি তাই কর। মুখ ফসকে ভুল হয়ে যাওয়াটা দোষের নয়।

হাসিতে হাসিতে সঞ্জীব পা ধুইয়া কহিল—গিয়েছিলাম একবার হারাধনদার বাড়ি। ও বুড়ো তো সব জানে। ও-ও বললে, বাবা কড়ি গাঙ্গুলীর টাকা সব শোধ করে দিয়েছেন। পঁচিশ টাকা কম ছিল। তা সে টাকা ভদ্রলোকের মীমাংসায় বাবা রফা পেয়েছিলেন। গাঙ্গুলী আজ কাল করে দলিলখানা আর ফেরত দেয় নি। হারাধনদাও কতবার ওই দলিলের জন্য গাঙ্গুলীর কাছে গিয়ে ফিরে এসেছে। তোমায় শুনতে বললাম তখন—শুনলে না তুমি। আমি এই কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—কেন ? এ কথা হঠাৎ ওঠবার কারণ কি হল ? কড়ি কি ফের সেই টাকা দাবী করছে নাকি ? তার গলাও যেন শুনছিলাম তখন।

আসনে বসিয়া সঞ্জীব কহিল—হ্যাঁ মা। সেই কথাই বলছিল আজ। আমার পেছনে পেছনেই আসছিল। তুমি দরজা খুললে যে সময়—সেই সময় পালাল।

ভাতের থালাটা কোলের কাছে আগাইয়া দিয়া মা কহিলেন—আরও কত হবে এর পরে। এই তো প্রথম।

সঞ্জীব একটু বিস্মিত হইয়া কহিল—কি বলছ, কিছু যে বুঝতে পারলাম না, মা।

ঈষৎ হাসিয়া মা জবাব দিলেন—ভীমরুলের চাকে আজ খোঁচা দিয়েছ—তার পাল্টা আক্রমণের সময় বুঝতে পারলাম না বললে চলবে কেন ?

সঞ্জীব আরও বিস্মিত হইয়া কহিল—বল কি মা ? একি মহেন্দ্র বাবুর কাজ ?

—হ্যাঁ বাবা। এতে ভুল নেই। কড়ি গাঙ্গুলী মহেন্দ্রবাবুর পোষা কুকুর, সে যা করে মনিবের মনস্তুষ্টির জন্যই করে থাকে। তবে তার নিজের পেট ভরাটা হল প্রথম লক্ষ্য।

সঞ্জীব খাইতে খাইতে ভাবিতেছিল—অকস্মাৎ সে বলিয়া উঠিল—

—এতদূর হীন মানুষ হতে পারে ? আমি তো তার কোন অনিষ্ট করি নি।

মা বলিলেন—ওরে গ্রহদেবতায় মানুষের যখন অনিষ্ট করে তখন বিপন্নের উপকার করলে তারা উপকারীর উপর সন্তুষ্টই হন। কিন্তু মানুষ যখন মানুষের অপকার করে তখন বিপন্নের উপকার করতে গেলে মানুষ হয় রুষ্ট—মানুষের রাগের ভাগ নিতে হয়।

সঞ্জীব নীরবে আহার করিয়া গেল। মা আবার তাহাকে কহিলেন —ভয় কি বাবা ? ভগবান আছেন, তিনি কখনও সৎকাজে কারও অমঙ্গল করেন না।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—ভগবান তো জানি নে মা, আমি তোমাকেই আমার ভগবান বলে মানি। ভয় আমি করব না।

মা জ্বলিয়া উঠিলেন—এইটেই তোমার সবচেয়ে বড় অপরাধ সঞ্জীব। ভগবান মানি না, কি? এ যদি কর সঞ্জীব তবে তোমার সঙ্গে আমার বাস করা চলবে না।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—মানি নে তো বলি নি আমি, বললাম জানি না।

মা বলিলেন—ওরে তাকে আগে মানতে হয় তবেই তাকে জানতে পারা যায়।

নলিনীর চোখ ভরিয়া জল আসিল। এত গভীর নিষ্ঠার সহিত ভগবানকে নির্দেশ তাহার কাছে কেহ কখনও করে নাই। সে যেন দেবস্থলের সান্নিধ্য অনুভব করিল। আকাশ ভরা তারার দিকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সকালে যখন নলিনী উঠিল তখনও রৌদ্র ভাল করিয়া উঠে নাই। গ্রামপ্রান্তের বৃক্ষসন্নিবেশের অন্তরাল ছাড়াইয়া সূর্য তখনও চোখের সম্মুখে আকাশের কোলে দেখা দেয় নাই। কিন্তু বাহিরে আসিয়া সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। সঞ্জীবের মায়ের তখন স্নান হইয়া গিয়াছে। তুলসী মঞ্চের নীচে বসিয়া তিনি দেবার্চনা করিতেছিলেন। ওদিকে রান্নাঘরের বারান্দায় উনোনে কয়লা গম্ গম্ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে। কেট্‌লীতে চায়ের জল গরম হইতেছিল

সঞ্জীবের মা পূজায় বিরতি দিয়া বলিলেন—মুখ হাত ধুয়ে ফেল বাছা। মাঠে যেতে সঞ্জীব চায়ের জল চাপিয়ে দুধ আনতে গেছে।

নলিনী তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইবার স্থানে গিয়া দেখিল—মাজন,

বাঁশের একটি জিভছোলা, সাবান সমস্ত দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালের গায়ে হুকে একখানি ধোওয়া ফিতেপাড় কাপড় ঝুলিতেছিল। ওপাশ হইতে মা আবার ডাকিয়া কহিলেন—মোটা কাপড়ই দিতে হল বাছা, সঞ্জীবের তো খদ্দরের কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় নেই। কি করব?

এই পরিচর্যায় নলিনীর লজ্জার আর সীমা রহিল না। তাহার অপরাধ যেন পাহাড় প্রমাণ হইয়া উঠিল। সে একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল তারপর শুধুমাত্র কাপড়খানি ঘাড়ে ফেলিয়া খিড়কির দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে ফিরিল একেবারে স্নান সারিয়া।

সঞ্জীব উনোনের কাছে বসিয়া চায়ের জল ফোটা দেখিতেছিল। সে সদ্যস্নাতা নলিনীকে দেখিয়া কহিল—এ কি আপনি কি ওই ডোবাটায় স্নান করে এলেন নাকি?

ঈষৎ হাসিয়া নলিনী তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল, তখনও তাহার ভাল করিয়া মাথা মোছা হয় নাই।

মা পূজা সারিয়া উঠিতেছিলেন—তিনি কথাটা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—ও কি বাছা—কি ধারার মানুষ গো তুমি? আমি জল রাখলাম, সব উয্যুগ করে রাখলাম—সে তোমার পছন্দ হল না বুঝি? শেষে জ্বর হলে তোমার সেবা করবে কে বলত? নিজেরও তো একটা বিবেচনা বলে জিনিষ আছে।

নলিনী হাসিমুখেই ঘরের ভিতর হইতে উত্তর করিল—আপনার তোলা জলে কি আমি স্নান করতে পারি, মা? সে পাপ যে কখনও খণ্ডন হত না আমার।

সঞ্জীবের মা অতি রূঢ়ভাবে বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু এঁদো ডোবায় ডুব দিয়ে জ্বর হলে যে তখন আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। তখন যে আমার জাত বাঁচানো দায় হবে।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—উনি ডাক্তার মানুষ মা, রোগ ওঁদের ভয় করে।

মা বলিয়া উঠিলেন—তা করবে বৈকি। সে ভয় করে না কারুর

—তোদের গাঁয়ের প্রবল-প্রতাপ মহেন্দ্রবাবুকেও না। দে বাপু দে একটা কুইনিনের পিল ওকে দে। চায়ের সঙ্গে খেয়ে নাও বাছা। আমাকে আর বিপদে ফেল না।

নলিনী বাহিরে আসিয়া কি একটা বলিতে গেল। কিন্তু তাহার মুখপানে চাহিয়াই সঞ্জীবের মা বলিয়া উঠিলেন—রাম—রাম ও কি বিচ্ছিরি করে চুল ফিরিয়েছ তুমি গো? মাঠের মতন কপাল বের করে—কি ভঙি হয়েছে তোমার? যাও যাও সঞ্জীবের ঘরে আয়না চিরুণী আছে, চুলটা ভাল করে ফিরিয়ে এস—কেমন করে হাল ফ্যাসানে চুল বাঁধ গো তোমরা। একে তো ওই ছিরি তোমার রূপের—তার ওপর ও কি ভঙি করে রেখেছ? কালো কুচ্ছিত মানুষ আমি দেখতে পারি না বাপু।

সঞ্জীব ঈষৎ বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইঙ্গিতে অনুনয় করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—ও ঘরে সামনেই টেবিলের ওপর আয়না চিরুণী পাবেন। কিছু মনে করবেন না, মায়ের আমার—

নলিনী মৃদু হাসিয়া কহিল—কেন আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন বলুন তো?

সঞ্জীব খুশী হইয়া উঠিল—সে বলিল—যাক তাহলে, শীগগির আসবেন—চা তৈরি করছি আমি।

যাইতে যাইতে নলিনী কহিল—চা খাব না আমি।

সবিস্ময়ে সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কেন?

নলিনী তাহার আরক্ত চোখ দুটি ফিরাইয়া লইয়া কহিল—আপনারা আমায় মনে করেছেন কি বলুন তো? মেয়েমানুষ হয়ে আমি এতবড় লজ্জাহীনা যে আপনার তৈরি চা আমি খাব।

নলিনীর চোখে জল আসিয়াছিল। সে দ্রুতপদে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সঞ্জীব মৃদুস্বরে মাকে কহিল—ছি মা লোকে কুৎসিত হলে কি—

মা দেবার্চনা শেষ করিয়া পূজার স্থান মার্জনা করিতেছিলেন—

তিনি সবিস্ময়ে ঝংকার দিয়া উঠিলেন—তা বলে কালোকে কালো বলব না? ওর চোখ আর চুল ছাড়া কোনখানটা মুখের ভাল বল দেখি!

সঞ্জীব মৃদুস্বরে কহিল—তা হয় তো নয়—কিন্তু মনে তো কষ্ট হতে পারে।

মা কহিলেন—ওরে না—মেয়েমানুষ এত বোকা নয়। তারা স্নেহ ঘেন্না বেশ ভাল বুঝতে পারে। ভাল যদি না বাসব তবে মুখখানি ওর যাতে সুন্দর লাগে তা করতে আমি বলব কেন?

চুল ফিরাইয়া নলিনী হাসিমুখে আসিয়া বসিল, কহিল—সরে বসুন আপনি, চা আমি তৈরি করব।

সঞ্জীব ইতস্ততঃ করিতেছিল। মা বলিয়া উঠিলেন—দে না বাপু এগিয়ে—মেয়েমানুষেরই তো কাজ ওসব। আমি তো ওসব তোদের ছুঁইও না।

নলিনী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে কাপ কেটলী আগাইয়া লইয়া চা তৈয়ারি করিতে বসিল।

মা কহিলেন—দেখ তো বাছা কেমন টুকটুকে লাগছে মুখখানি। কেশ দিয়েছেন ভগবান বেশ করবার জন্য—। বেশ না করলে মানাবে কেন? তা না উটকো-মুখী চওড়া কপাল বের করে—ছি।

এক কাপ চা সঞ্জীবকে আগাইয়া দিয়া নিজে একটা টানিয়া লইল। তারপর সঞ্জীবকে কহিল—কুইনিন ট্যাবলেট?

মা তরকারির বঁটি পাড়িতেছিলেন—কথাটা তাঁহার কানে গিয়াছিল। ঘর হইতে কাগজ-মোড়া কুইনিনের পিল আনিয়া আলগোছে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—তুইও একটা খা সঞ্জীব। আর ওগো বাছা—এগুলি বাপু তোমাকে ধুয়ে নিয়ে আসতে হবে বুঝেছ।

নলিনীর মনের গ্লানি সব ঘুচিয়া গেল। সে আনন্দে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—বেশ।

সঞ্জীব সহসা প্রশ্ন করিল—আপনি কি আজই কলকাতা যাবেন?

নলিনী যেন এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না—সে চকিত হইয়া উঠিল—কহিল—হ্যাঁ তাই যাব। আজই বৈকি।

উৎসাহহীন অন্যমনস্ক চিত্তে নলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কি উদ্দেশ্যে যে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে কিছুতেই তাহা স্মরণ করিতে পারিল না। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভ্রূ ললাট কুঞ্চিত করিয়া সে চিন্তা করিল। অবশেষে অকস্মাৎ মনে হইল জিনিষপত্র-গুলি গুছাইয়া লইতে হইবে, আজই তাহার কলিকাতা যাত্রার দিন।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। মনে হইতে তাহার হাসি আসিল। গুছাইয়া লইবার মধ্যে আছে তাহার একখানি তোয়ালে। আর সবই সে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। যে কাপড়খানা সে পরিয়া আছে সেখানি পর্যন্ত অপরের। মনটা তাহার বিষাইয়া উঠিল—এমন করিয়া পরমুখাপেক্ষী অনুগ্রহ-ভিখারী হইয়া থাকার লজ্জাকর বেদনা মনের মধ্যে সূচের মত বিঁধিতেছিল। কলিকাতা যাইবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ও-ঘরে দাওয়ার উপর বসিয়া মা ছেলেতে কথাবার্তা কহিতে-ছিলেন। মা কি বলিতেছেন আর সঞ্জীব একখানা কাগজে সেইগুলিই বোধ হয় লিখিতেছে। নলিনী বেশ সাড়া দিয়াই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল।

মা মুখ তুলিয়া কহিলেন—বস। সঞ্জীব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল। নলিনী একপাশে বসিল। মা ছেলেকে কহিলেন—হল, মুড়ি-ভাজুনীর কাপড় লিখলি?

সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ। কিন্তু আর তোমার কত আছে? এই তো দশ জোড়া হয়ে গেল।

মা বলিলেন—আরও আছে। যারা চিরকাল পেয়ে আসছে তারা এ পুজোর সময় কাপড় না পেলে ছাড়বে কেন? জানিস কীর্তি না করতে পারি বৃত্তি কখনও লোপ করতে নেই।

হাসিয়া সঞ্জীব কহিল—মা, এই বৃত্তিতেই আমাদের সর্বনাশ হল। দান নিয়ে নিয়ে জাতটার ভিক্ষে করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল।

ভ্রূকুটি করিয়া মা বলিলেন—দান কাকে বলছিস তুই? দান করে লোকে দয়া করে। আর বৃত্তি হল সম্মান। এ যে তারা নেয় এই আমাদের ভাগ্যি। আর শাকওয়ালী, মাছওয়ালী এদের তো হল পাওনা। সম্বছর তারা আমাদের উপকার করে, খাটে, তার জন্য এ তো তাদের ন্যায্য প্রাপ্য।

সঞ্জীব আবার হাসিল, কহিল—বেশ, বল আর ক-জোড়া চাই।

—কার কার হল বল দেখি।

ফর্দ্দটায় চোখ বুলাইয়া সঞ্জীব পড়িয়া গেল, পূজোর শাড়ি লাল পেড়ে একজোড়া, কুমারী পূজোর শাড়ি একজোড়া। গুরু প্রণামী থান একজোড়া, পুরোহিতের ধুতি একখানা। ব্রাহ্মণডিহির রাম চাটুজ্যের বৃত্তি ধুতি একখানা। কানাই গাঙ্গুলীর বৃত্তি ধুতি—

বাধা দিয়া মা বলিলেন—ধুতি নয় থান লেখ। কানাই গাঙ্গুলী মরে গেছে, বিধবা মেয়ে পরবে, থানই ভাল। তারপর?

—মাহিন্দার রাখালের মোটা ধুতি একজোড়া, গেঞ্জি একটা—

—ওদের কাপড় চওড়া পাড় নিয়ে আসবি। অভাবী মানুষ, সময় অসময় ওর বউও যেন পরতে পায়।

সঞ্জীব সংশোধন করিয়া লইয়া কহিল—ঠিক বলেছ মা। তাহলে কৃষেণদেরও ঐ রকম হবে তো?

মা কহিলেন—হ্যাঁ। তারপর পড়ে যা।

—মেছুনীর শাড়ি একখানা। রোজকার মুদীর একখানা, গয়লানীর শাড়ি একখানা, ঘাসওয়ালীর শাড়ি একখানা। তারপর তোমার মুড়ি ভাজুনীর কাপড়—কি রকম হবে বলে দাও।

—ওখানা ধুতিপাড় নিয়ে আসবি। বিধবা মানুষ শাড়ি তো হবে না।

—বেশ, তারপর?

—ধোপানীর শাড়ি লেখ। আর ভাল ধোওয়া শান্তিপুর কি ফরাসডাঙ্গার শাড়ি একখানা। কিম্বা আজকাল খদ্দরের ঢাকাই শাড়ি বেশ ভাল দেখে তাই নিয়ে আসবি।

সঞ্জীব কহিল—কার জন্যে, ফর্দ্দে নাম লিখব কার ?

মা বলিলেন—কোন নাম লিখতে হবে না এমনি লেখ না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইলি যে ? তোর বড় বদ অভ্যেস হয়ে পড়ল সঞ্জীব। কথায় কথায় তোকে আমায় কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি। লেখ, আটপৌরে তোর আবার খদ্দর চাই বুঝি, খদ্দর দু জোড়া। আর পোষাকী একজোড়া, ভাল জামা একটা।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আমাকে কি এখনও ছেলেমানুষ পেলে মা যে পূজোতে আমার পোষাক চাই।

দৃঢ়স্বরে মা বলিলেন—হ্যাঁ চাই। আমি বলছি তুই লেখ। আমি মরি তারপর তোর যা ইচ্ছে হয় করিস। হ্যাঁ, আর মেয়েদের ভাল জামা যা পাওয়া যায় নিয়ে আসবি, তার সঙ্গে সেমিজ দুটো।

সঞ্জীব লেখা শেষ করিয়া কহিল—এইবার আমি লিখি—মায়ের গরদের থান একখানা, আটপৌরে দু জোড়া—

বাধা দিয়া মা বলিলেন—আটপৌরে একজোড়া লেখ, আমার কাপড় জমে আছে, তোর পুরানো কাপড়ে আমার অনেক চলে যায় যে। আর তোর পুরানো কাপড় আমায় সব দিয়ে যাবি। ওয়াড় দেব, সলতে পাকাতে হবে।

সঞ্জীব কহিল—বেশ। কিন্তু ফর্দ্দ শেষ হল তো ?

—হ্যাঁ। আর মসলাপাতি যা, সে গাঁয়ের থেকে আনলেই হবে।

এতক্ষণে অবসর পাইয়া নলিনী বলিল—আমি তা হলে আজকেই যেতে চাই, মা।

গম্ভীর ভাবে মা বলিলেন—পূজোর পর যাবে। চার দিন পর পূজো, এ সময় ঘর থেকে কাউকে যেতে দিতে আছে ?

নলিনী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কহিল—তা হোক, আমি তো

দৈবক্রমে আপনাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছি, আমার যাওয়া আসায়--

বাধা দিয়া মা বলিলেন—বড় জেদী ছেলে মেয়ে তোমরা বাপু এ কালের। পূজোর সময় কুকুর বেড়াল মানুষ বাড়ি থেকে তাড়ায় না, তা তুমি তো মানুষ। না বাছা, ও সব মতলব ছাড় তুমি। তিনি চলিয়া গেলেন।

নলিনী কহিল · সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব বলিল—এ ক'দিন এখানেই থেকে যান।

—না।

মৃদুস্বরে সঞ্জীব কহিল—আপনার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে এখানে?

দৃঢ়স্বরে নলিনী উত্তর দিল—হ্যাঁ। অশুচির মত—

বিবর্ণমুখে সঞ্জীব বলিল—সে তো আমি আপনাকে বলেছিলাম--

—হ্যাঁ বলেছিলেন। কিন্তু অশুচি অস্পৃশ্যকে এত সেবা যত্ন করে আরো অপমানের বোঝা অসহ্য করে তুলবেন এ তো বলেন নি। সঞ্জীববাবু, এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

ও-ঘর হইতে মা ডাকিয়া বলিলেন—ওগো ও মেয়ে, তোমার ময়লা কাপড় চোপড় কি কি আছে বের করে দাও দেখি। আজ সব ধোপার বাড়ি যাবে। পূজোর পর আট দিন আবার কাপড় দিতে নেই।

নলিনী উত্তর দিল না।

সঞ্জীব কহিল—উনি আজই চলে যাবেন, মা।

ভ্রূকুটি করিয়া মা বলিলেন—যাব বললেই যাওয়া হয় না। আমার সংসারেরও একটা কল্যেণ অকল্যেণ আছে। আর বলি হ্যাঁ গা বাছা —তোমাকে কি এখানে কেউ কাঁটার ওপর বসিয়ে রেখেছে যে, যাই যাই ছাড়া আর কথা নেই তোমার? এস জল খাবে এস, আর কি কি ময়লা কাপড় আছে বের করে দাও।

নলিনী মৃদুস্বরে কহিল—আমার কাপড় তো এই একখানি ছাড়া—

মা বলিলেন—ওরে সঞ্জীব, গাঁয়ের দোকান থেকেই ধোওয়া সূতীর কাপড় একজোড়া এনে দে এখুনি। সেমিজ আনবি দুটো। ওগো বাছা, এস না, তোমার জলখাবার হাতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব আমি? বড় বেয়াড়া স্বভাব তোমাদের।

নলিনীকে উঠিতে হইল।

সঞ্জীব হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। আহার নলিনীর মুখে উঠিতেছিল না। বার বার ভিতরের উদ্বেলিত অশ্রুরাশি তরঙ্গোচ্ছ্বাসে দু চোখের তটভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া প্লাবন বহাইতে চাহিতেছিল।

সঞ্জীব ব্যস্ত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, এখনও খাওয়া হয় নি! নিন, নিন, শেষ করে নিন। একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিল। সঞ্জীব কহিল, বাগ্দী পাড়ায় একটা ডেলিভারী কেস আছে। কাল সকাল থেকে ব্যথা খাচ্ছে।

নলিনী আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িতেছিল, মা পাশ হইতে বাধা দিয়া কহিলেন—আগে খেয়ে নাও তারপরে যাবে। কতক্ষণে হবে, তার ঠিক কি?

নলিনী কহিল—আর আমি খেতে পারব না, মা।

মা কহিলেন—খেয়ে নাও বলছি, খুব খেতে পারবে। নইলে আমি জোর করে খাইয়ে দেব তোমাকে। আমি এখনও স্নান করি নি তা মনে রেখ।

নলিনী আবার বসিল।

রোগিণীর অবস্থা সত্য সত্য খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার পরমায়ুর বলেই হউক আর নলিনীর কৃতিত্বের জন্যই হউক নলিনী নিরাপদে প্রসব করাইয়া হাসিমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

সঞ্জীব কহিল—আপনার মুখের হাসিতে বুঝতে পারছি—সংবাদ সুসংবাদ।

উচ্ছ্বসিত হইয়া নলিনী বলিল—ভগবানের দয়া, আমার শক্তিতে কিছু হত না সঞ্জীববাবু।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—ভগবানকে মনে মনে প্রণাম করুন। হাত আপনার ক্লেদাক্ত, কপালে স্পর্শ করে সেখানে ক্লেদের ছাপ মারবেন না।

নলিনী নিষেধ মানিল না। যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—এ ক্লেদের ছাপ ধুলে মুছে যায় সঞ্জীববাবু।

কিন্তু উত্তাপ হইতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিয়া সঞ্জীব বাধা দিয়া বলিল—হাত পা ধুয়ে ফেলুন আগে।

নলিনী দেখিল সাবান, তোয়ালে, গামলায় জল, সব প্রস্তুত হইয়া আছে। গামলায় জল হইতে ধোঁয়া উঠিতেছিল। তাহারই একপাশে একখানা নতুন ধোওয়া-সূতীর লাল পাড় শাড়ি ও একটি সেমিজ রাখা হইয়াছে।

সঞ্জীব কহিল—বসুন আপনি, আমি জল তুলে দি।

নলিনী লজ্জিত সুরে বলিয়া উঠিল—না—না সে হবে না। আপনি জল তুলে দেবেন সে হবে না।

আশ্চর্য হইয়া সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কেন?

সলজ্জভাবে নলিনী বলিল—না—ছি, পুরুষের সেবা কি স্ত্রীলোকে গ্রহণ করতে পারে সঞ্জীববাবু?

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—আপনি ভুল করছেন, আমরা কর্মসাথী, কমরেডস্।

খাস বৈঠকখানার বারান্দার ইজি চেয়ারের উপর বসিয়া মহেন্দ্রবাবু দাঁত দিয়া আঙুলের নখ কাটিতেছিলেন। এই আচরণটুকু তাঁহার গভীর চিন্তামগ্নতার পরিচায়ক। সম্মুখে টি-পয়টার উপর কয়েকখানা

বই পড়িয়াছিল। একখানা তাহার Criminal Procedure Code, একখানা How to make money, একখানা Goat-keeping, অপর দুইখানা বাংলা বই—একখানা জ্যোতিষ দর্পণ, অপরখানি সংক্ষিপ্ত বেদান্তসার।

মিত্তির মশায় আসিয়া আভূমি-নত নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বাবু সজাগ হইয়া উঠিলেন। খাড়া হইয়া বসিয়া কহিলেন—এই যে এসেছ। মামলাটা কতদূর কি হল?

মিত্তির মশায় বলিল—পূজোর ছুটি সামনে, ছুটির আগে আর কিছু হবে না। তবে রিপোর্ট সেখানে গিয়েছে—পুলিশ অফিসে।

বাবু আবার নখ কাটিতে মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পর কহিলেন—মামলাটি চালিয়ে ফল নেই। ওটা এইখানেই চেপে দাও। অনেক কিছু কেলেঙ্কারী হবে—দারোগাবাবুর কাছে একবার যাও—তুমি। আর ধীরেন কেরানীকে একবার ডেকে দাও।

মামলায় মিত্তির মশায়ের নিষ্ঠা প্রবল। সে কহিল—আজ্ঞে থেফ্‌ট্ কেস, ডায়েরী করে মামলা তুলে নিতে গেলে শেষে যে বিপদে পড়তে হবে। সঞ্জীব পিছনে রয়েছে, যদি পাল্টা মামলা কিছু রুজু করে?

বাবু কহিলেন—হুঁ। তা হলে লেডি ডাক্তারকে বাদ দিয়ে হাসপাতালের চাকরটাকে ঠেলে দাও। যন্ত্রপাতিগুলো কাউকে দিয়ে ওর ঘরে রাখিয়ে দাও। জেল হলে ওর মেয়ে-ছেলেকে কিছু টাকা দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সার্চ করিয়ে দাও—বুঝলে?

মিত্তির মশায়ের তাহাতে আপত্তি ছিল না। ব্যক্তিবিশেষকে আসামী করিতে মস্তিষ্ক পীড়ার তাহার কোন হেতু ছিল না। মামলা চলিলেই তাহার হইল।

সে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—যে আজ্ঞে। নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

পিছন হইতে ডাকিয়া বাবু বলিলেন—ধীরেন কেরানীকে পাঠিয়ে দাও। তারপর জ্যোতিষ দর্পণখানা তুলিয়া লইয়া কয়েকটা পাতা উল্টাইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতে বসিলেন। স্থানটায় Napolean's Fate Book-এর প্রশ্নোত্তরে মীমাংসার নিয়ম ও কুণ্ডলী চক্র অঙ্কিত ছিল। কয়েকবার বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে অন্তরের কোন গোপন সমস্যার ফলাফল দেখিলেন। হয় তো উত্তর মনঃপূত হইল না, বইখানাকে সজোরে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া খুলিলেন বেদান্তসার বইখানা। বেদান্তেও বোধ করি চিত্ত স্থির হইল না।

বই বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খুলিলেন বোতলের ছিপি। গ্লাস দুই পানীয় পান করিয়া খাটখানার উপর বসিয়া গুন গুন করিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। আধ্যাত্মিক দেহতত্ত্বের গান একখানি।

বাহিরে আসিয়া দুর্বল কণ্ঠের ক্ষীণ সাড়ার ইঙ্গিতে ধীরেন কেরানীকে কহিলেন—ও তুমি।

মাথা চুলকাইয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন—শোন, এক কাজ কর দেখি। নতুন যে এ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটি হয়েছে সেই সোসাইটির তরফ থেকে আমাদের সঞ্জীব মুখুজ্যেকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে এস। লেখ যে আমাদের সকলের একান্ত ইচ্ছা যে আপনার মত কর্মী এই সোসাইটির ভার গ্রহণ করেন। আপনার সম্মতি পেলে আমরা সেই মত ব্যবস্থা করব। বুঝলে?

ঘাড় নাড়িয়া বেচারী ধীরেন জানাইল—হ্যাঁ সে বুঝিয়াছে।

হাতের নখ কাটিতে কাটিতে বাবু বলিলেন—এই বেলাতেই পাঠিয়ে দেবে, বুঝলে?

সম্মুখের প্রকাণ্ড হাতাটার ওপাশেই সরকারী রাস্তার ওপর একটা কোলাহল জাগিয়া উঠিতেই কথাটা আর অগ্রসর হইল না। দেখা গেল প্যাকাটির মত একটা মানুষ গলা ফাটাইয়া বিক্রম প্রকাশ

করিতেছে, আর লাফ মারিয়া মারিয়া আকাশের দিকে উঠিতেছে! লোকটা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, জান না, বেটা তুমি আমাকে জান না। ধারো না তুমি আমার কাছে বেটা বদমাস? নালিশ করব আমি। যা তা পেয়েছ তুমি আমাকে? আমার নাম এককড়ি গাঙ্গুলী।

বাবু কহিলেন—দেখ তো হে—কার সঙ্গে কি হল গাঙ্গুলীর।

ধীরেন কহিল—ডাকব এখানে?

হাসিয়া বাবু কহিলেন—ডাকবে বৈকি। ওর আগমন সংবাদ জানাবার জন্যই ও ঠিক এই জায়গাটিতেই এমন করে লাফ মেরে চীৎকার করছে। ডাক এখানে।

ধীরেন অগ্রসর হইয়া গেল। তখনও গাঙ্গুলী চীৎকার করিতেছিল এবং লাফ দিতেছিল।

মধ্যে মধ্যে হাতার দেওয়ালের ওপরে তাহার ছোট্ট মাথাটি পুতুল নাচের পুতুলের মত দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল।

অকস্মাৎ সব পরিবর্তিত হইয়া গেল, আস্ফালন নীরব, ছায়াছবির মত গাঙ্গুলীর মাথাও আর উপরে ঠেলিয়া উঠিল না। বাবু বুঝিলেন ধীরেন ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়াছে।

অল্পক্ষণ পরেই গাঙ্গুলী হাতার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাবুই প্রশ্ন করিলেন—কি হল কি, গাঙ্গুলী?

গাঙ্গুলী ভনিতা আরম্ভ করিল—আজ্ঞে আপনার রাজ্যের বিচারই এই। বুকে বসে সব দাড়ি ছিঁড়তে চায়। পাওনাদারের পাওনা—পাওনাই নয়—সে চোখা কাগজে আছে—ইচ্ছে হয়তো দেব নইলে দেব না। এখন আমার যা পাওনা তাই তুমি দাও।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাবু কহিলেন—এ তো হল ভনিতা। তারপর ঘটনাটা কি শুনি?

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে এই বেটা তারা মোদক। রমা বলেছিল,—কাকা, খোকার জন্য চার আনার মিষ্টি নিয়ে এস।

খোকা মানে রমার ভাইপো—তাকে সে মানুষ করেছে কিনা। পয়সা বেচারার হাতে ছিল না, বললে—দুদিন পরে পয়সাটা দেব কাকা। তাই বললাম বেটাকে—ওরে, দে চার আনার মিষ্টি। লিখে রাখ রমণ দাসের নামে—দুদিন পরে দামটা পাবি। বেটা বলে কিনা—আজ্ঞে না, ধার দিতে পারব না।

মোদক ছোকরাও পিছন পিছন আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল। সে কড়জোড়ে কহিল—হুজুর, আমি বললাম, আপনার নামে লিখে রাখি। তা গাঙ্গুলী মশায় বলেন—না আমার নামে লিখবি কেন? ঐ রমণ দাসের নামে লিখে রাখ। তোর গরজ তো ভারী রে ব্যাটা। মোয়া খাবেন কিষণচাঁদ আর কড়ি গুণব আমি? আজ্ঞে যার তার নামে—।

বাবু বলিলেন—যা তুই, ভাল মিষ্টি এক টাকার বেশ করে হাঁড়িতে বন্ধ করে এখানে এনে দিয়ে যা। খাতায় লিখে রাখবি।

রোকাটা লইয়া মোদক দেখিল—বাবু সহি করিয়াছেন গাঙ্গুলীর হইয়া—শ্রী এককড়ি গাঙ্গুলী, বঃ শ্রী মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বুকের হাসিটা মুখে ঠেলিয়া উঠিবার পূর্বেই সে চলিয়া গেল।

বাবু হাসিয়া বলিলেন—মিষ্টিগুলো তোমার বাড়িতে আর খালি হাঁড়িটা ওদের কাছে পৌঁছবে না তো এককড়ি?

অকস্মাৎ গাঙ্গুলী প্রবল বেগে হাসিয়া উঠিল—সে হাসি তাহার আর থামিতে চায় না। হাসিতে হাসিতেই সে বলিল—বেশ বলেন আজ্ঞে আপনি। শুধু হাঁড়িটা ওদের বাড়ি পৌঁছবে না তো—এ্যা-হি-হি-হি। বেশ বলেন।

তারপর হাস্য সম্বরণ করিয়া কোঁচায় মুখ মুছিয়া বলিল—কেমন বংশ হুজুরদের দেখতে হবে। স্বর্গীয় কর্তাবাবুর রসিকতায় নাকি মরা মানুষকেও হাসতে হত।

বাবু উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন—গাঙ্গুলীকে বলিয়া গেলেন—বস তো তুমি, কথা আছে।

অল্পক্ষণ পরেই একটা সিগারেট টানিতে টানিতে আসিয়া ইজি চেয়ারটায় চাপিয়া বসিলেন।

গাঙ্গুলী কহিল—আমাকে কি বলবেন বলছিলেন ?

সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ছাড়িতে ছাড়িতে বাবু বলিলেন—হুঁ। মুখের ধোঁয়াটা নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া গেলে বলিলেন—তুমি শেয়াল পণ্ডিতের কথা জান, এককড়ি ?

পরম বিস্ময়ে গাঙ্গুলী বলিল—সে আবার কি আজ্ঞে ?

সিগারেটে আর একটা টান মারিয়া বাবু বলিলেন—শোন। এক অতি ধূর্ত শেয়াল ছিল। সে নদীর ধারে গর্তের মধ্যে লেজ পুরে দিত। গর্তের মধ্যে কাঁকড়াগুলো রাগে তার লেজের রোঁয়া কামড়ে ধরত। অমনি সে লেজটিকে বের করে কাঁকড়াগুলিকে ভক্ষণ করে ভাবত, কি পণ্ডিত সে। বনের সাধারণ জন্তুগুলোও ভাবত—কি বুদ্ধিমান শেয়াল পণ্ডিত! ক্রমশঃ তার সাহস বাড়তে লাগল। চাতুরি খেলে কুকুর বাচ্চা—বেড়াল বাচ্চা—ভালুক বাচ্চা খেয়ে দেমাক চরমে তার বেড়ে গেল।

গাঙ্গুলী শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে ছেলে বয়সে কি আমোদই হত এই সব গল্প শুনে।

বাবু বলিলেন—দেখ তো ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপরে বোতল গেলাসটা আছে, নিয়ে এস তো গাঙ্গুলী। কানাইটা যে কোথায় যায় ?

গাঙ্গুলী বোতল গ্লাস আনিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বোতল গ্লাস লইয়া ফিরিবার মুখে দেখিল, দুয়ারের দুই বাজুতে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া বাবু দাঁড়াইয়া। ঘরের চারিদিকের অপর দেওয়ালগুলি বন্ধ। এদিকের দেওয়ালের গায়ে কতকগুলা শিকার করা জানোয়ারের চামড়া টাঙানো রহিয়াছে। তাহারই ঠিক মধ্যস্থলে দুইখানা তলোয়ার গুণচিহ্ন রেখার মত পরস্পরকে কাটাকাটি করিয়া ঝুলিতেছে। তাহারই উপরে ঢাল। দুয়ারের পাশেই র‍্যাকের মধ্যে সারি সারি বন্দুক ঊর্দ্ধমুখে শোভা পাইতেছে।

বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—শোন তারপর বাকি গল্পটা তোমায় বলি শোন। বনের কতকগুলো নির্বোধ জানোয়ারকে প্রতারণা করে তার সাধ হল বাঘের সঙ্গে চাতুরী খেলবে। পণ্ডিত নাম তার সার্থক করবে। বাঘের কাছে সে একদিন এল, হুজুর ভাল শিকার আছে। কিন্তু আমার একটা শিকার পাঁকে পড়ে গেছে সেটা উদ্ধার করে দিতে হবে আগে। বাঘ রাজী হল কিন্তু বললে, আমার শিকার আগে এনে দাও। এই নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হল ক্রমে।

তারপর—অদ্ভুত বিকৃত স্বরে গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—বড় তেষ্টা পেয়েছে আমার হুজুর, একটু জল—।

ঈষৎ হাসিয়া বাবু বলিলেন—বোতলে জল—গেলাস তোমার হাতেই রয়েছে গাঙ্গুলী, একটু খাও। গলাও ভিজবে—বুকেও একটু বল পাবে।

সত্যই গাঙ্গুলী গ্লাসে পানীয় ঢালিতে ঢালিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। শুষ্ককণ্ঠ সিক্ত করিয়া লইয়া গাঙ্গুলী দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিল বাবুর হাতে বন্দুক। একটা দরজার পিঠে হেলান দিয়া সম্মুখের দরজায় একটি পা তুলিয়া এবার তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। দুই-হাতে বন্দুকটা লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন।

চোখে চোখ পড়িতেই বাবু কহিলেন—জান এককড়ি—এই বন্দুকটা আমার বহুদিনের বন্দুক। এতে কখনও একটি গুলিও আমার নষ্ট হয় নি।

গাঙ্গুলী মেঝের উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কহিল—দোহাই হুজুর রক্ষে করুন। আমি আজই সন্ধ্যে তক রমাকে এনে দিয়ে যাব। দোহাই হুজুর।

—দেখো।

—নইলে আমার দশটা বাবা।

—আরও চাই আমার, সঞ্জীবের বাপের সেই তমসুকখানা, বুঝলে?

—সে আমার কাছেই আছে মা-বাপ।

বন্দুক রাখিয়া দিয়া পথমুক্ত করিয়া দিয়া বাবু কহিলেন—বাইরে এস।

বাহিরে আসিয়া জোড় হাত করিয়া গাঙ্গুলী কহিল—কিছু দেবেন না হুজুর—সঞ্জীবের দলিলটার জন্য? সুদে আসলে পাঁচশো হয়েছে হুজুর।

সে বাবুর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

বাবু বলিলেন—পা ছাড় এককড়ি। দেব—কিছু দেব তোমাকে। আজই দেব।

অপরাহ্নের দিকে সঞ্জীব বেড়াইতে বাহির হইতেছিল। নলিনী চায়ের পেয়ালাটা আগাইয়া দিয়া কহিল—একবার রোগীটিকে দেখতে হত যে।

চায়ের পেয়ালাটা লইয়া সঞ্জীব বলিল—সত্যি কথা, চলুন, দেখে আসবেন, চলুন।

নিজের জন্য চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে নলিনী বলিল—চলুন। তারপর আবার বলিয়া উঠিল—আপনাদের দেশ কিন্তু আমার বড় ভাল লাগে। লাল মাটির দেশ—তারই মাঝে মাঝে সবুজ মাঠ বড় চমৎকার।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া সঞ্জীব বলিল—যাবেন বেড়াতে, আমার সঙ্গেই চলুন না।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—মা রাগ করবেন না তো?

সম্মুখে ওদিকে ভাঁড়ার ঘরে মা পূজার পাতি গুছাইয়া ভাণ্ডারে তুলিতেছিলেন। সঞ্জীব ডাকিল—মা।

—কি রে?

—আমাদের মেয়ে ডাক্তারকে আজ একবার আমাদের দেশের মাঠ দেখিয়ে নিয়ে আসি। কোন কাজ নেই তো তোমার?

—ও আবার আমার কি কাজ করবে? তা যা না। যাবার মুখে বাগ্দীপাড়ার হারাণকে বলে যাস বাগ্দী-বউকে যেন পাঠিয়ে দেয় একবার। আর দুটো মাছের জন্য বলে যাবি—নলিনীর বড় কষ্ট হচ্ছে খাবার।

সঞ্জীব নলিনীকে তাড়া দিয়া বলিল—নিন, নিন—তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন, দেরী করবেন না।

একটু উচ্ছ্বসিতভাবেই নলিনী বলিয়া উঠিল—আগে আপনি নিন—চা খেয়ে পেয়ালাটা আমায় দিন দেখি। চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে আনতে হবে না?

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়া সঞ্জীব বলিল—আমার এঁটো কাপ আমি ধোব আজ—আপনার কাপটা যদি আমায় না দেন তো নিজে ধুয়ে ফেলুন।

হাতের কাপটা ছোঁ মাড়িয়া কাড়িয়া লইয়া নলিনী বলিল—ভারী অবাধ্য আপনি—

কথাটা অর্দ্ধসমাপ্তই থাকিয়া গেল। পর মুহূর্তেই সে এক রকম ছুটিয়া খিড়কির পথে কাপ কেটলী হাতে বাহির হইয়া গেল। ঘাট হইতে ফিরিয়া সে একেবারে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সঞ্জীব হাঁকিল—হল আপনার? কোন উত্তর আসিল না। আবার কিছুক্ষণ পরে সে ডাক দিল—আসুন বেলা যায় যে!

নলিনী বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—চলুন।

তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সঞ্জীব মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—বাঃ চমৎকার! চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে। নার্সের বাংলা সংস্করণ দেখেছি। কিন্তু রূপে শোভায় এমন সেবিকামূর্তি এর আগে আমি দেখি নি মিস গাঙ্গুলী।

নলিনীর পরিধানে ছিল শুভ্র বেশ—হাফ হাতা একটি ব্লাউস, তাহার উপর মিহিপাড় সঞ্জীবের ধুতি একখানি হাল ফ্যাসানে বেড় দিয়ে পরা, পায়ে স্যাণ্ডেল, আর মাথায় ছিল সাদা একখানি রুমাল ইরাণী মেয়েদের ছাঁদে বাঁধা। তাহার দীঘল সুশ্যাম দেহখানি শুভ্র পরিচ্ছদে সত্যই মানাইয়াছিল চমৎকার। কিন্তু মাথায় ওই ইরাণী মেয়েদের ছাঁদে বাঁধা রুমালখানি তাহার সে শোভা শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। নার্সদের মত মস্তক-আবরণ বাঙালীর মেয়েকে এমন মানায় না।

নলিনীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—ওতে আমি লজ্জা পাই, সঞ্জীববাবু।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আমরা কমরেডস মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তা হলেও আমি স্ত্রীলোক, আপনি পুরুষ।

মৃদু ঘাড় নাড়িয়া সঞ্জীব বলিল—না মিস গাঙ্গুলী, কর্মক্ষেত্রে কর্মের সমারোহের মধ্যে থাকে শুধু মানুষ। কর্মের প্রকৃত অধিকারবোধ ছাড়া অপর সমস্ত সত্ত্বা ভুলে যেতে হয়। কমরেডস কথাটির গুরুত্ব বড় বেশী।

সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিয়া নলিনী দেখিল—প্রশান্ত উচ্ছ্বাসহীন মুখ।

ধীরে ধীরে সে বলিল—কিন্তু মার্জনা করবেন সঞ্জীববাবু, সেখানে তা হলে তো সৌন্দর্য্যের মোহে উচ্ছ্বাস প্রকাশের অধিকার বা অবকাশ না থাকাই উচিত।

দূরে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সঞ্জীব বলিল—উচ্ছ্বাস নয় আনন্দ। আনন্দ উপলব্ধির পথ যে রোধ করা যায় না মিস গাঙ্গুলী। এ পথ রোধ করতে পারে কে জানেন—পারে এক মৃত্যু। আর পরস্পরকে দেখে আনন্দ পাওয়াই হল বন্ধুত্ব। কমরেডস হতে হলে ওটা চাই, না হলে চলে না।

নলিনী নীরব হইয়া রহিল। কেন জানি না কোন যুক্তিই তাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিল না। সে নীরবে মাথা নীচু করিয়া চলিয়াছিল। অপ্রশস্ত লোক-চলা আঁকা-বাঁকা পথে সঞ্জীব চলিয়াছিল আগে, সে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল পিছনে পিছনে।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—কি হারাণদা, রোগী কেমন আছে?

নলিনী দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল বাগ্দী পাড়ায় তাহারা আসিয়া গিয়াছে। সম্মুখের বড় বাঁশ ঝাড়ের ছায়াঘন পরিচ্ছন্ন তলদেশটিতে তাহাদের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। পাশেই অদূরে তার পাঁচটি দিগম্বর ছেলে পরস্পরের গায়ে ধূলা ছিটাইয়া কলহ করিতেছিল। বড় ছেলেটি অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—এই এই—দাদাঠাকুর আইচে। চুপ, চুপ, সব চুপ কর।

একজন বলিল—এই শালা সতে, হুকোটা নামা কেনে। শালা টানছে দেখ লবাবের মত।

হারাণ সঞ্জীবকে কহিল—রোগী আপনাদের কিপাতে ভালই, দাদাভাই—। 'আহা মেম ডাক্তারের যে যতন।

স্মিত হাস্যে নলিনী কহিল—চল, একবার দেখে আসি চল।

হারাণ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—এ অবেলাতে থাক মা। ছুঁলে তো চান করতে হবে। কাল বরং চানের আগে—

বাধা দিয়া নলিনী বলিল—না, না, না, কে বললে আমাকে চান করতে হবে? মানুষ ছুঁলে কি মানুষকে চান করতে হয়?

হারাণ বলিল—তবুও এ বেলা থাক মা। কাল সকালেই দেখবেন। আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের পূজো-আচ্চা হবে।

নলিনীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এই অস্পৃশ্য জাতি—যাহারা আপন অস্পৃশ্যতার কাল্পনিক অপরাধ নির্বিবাদে মাথায় করিয়া অসঙ্কোচে বিশ হাত দূরে সরিয়া যায়—তাহাদের নিকটও কি সে অস্পৃশ্য! ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল—বেশ তো সঞ্জীববাবু, আপনি একবার পাল্‌সের বিটটা গুণে দেখে আসুন না।

জোড় হাত করিয়া হারাণ বলিল—আজ থাক মা, যে দিন আমাদের দেবতার পূজো হয় সে দিন ডাক্তার কবরেজ সব বন্ধ। তাঁর উপর নির্ভর করে চিরদিন তো থাকতে পারি না, একটা দিন কি একটা বেলা তাও যদি না থাকতে পারি তবে আর তাঁকে মান্য করা কেনে।

কথা কয়টিতে নলিনীর মনের গ্লানি এক মুহূর্তে যেন ধুইয়া মুছিয়া পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে বলিল—তাই হবে হারাণদা। তোমাদের বউকে একবার মা ডেকেছেন। কিছু মাছ দিয়ে আসতে বলেছেন।

তারপর সঞ্জীবের হাতখানি নিঃসঙ্কোচে ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া কহিল—আসুন, আসুন সঞ্জীববাবু বেড়াবার সময় চলে যাচ্ছে। আপনাদের দেশ আমার বড় ভাল লাগে।

চলিতে চলিতে সঞ্জীব বলিল—কি কুসংস্কার দেখুন। এ ওদের ভাঙা দরকার।

দৃঢ়কণ্ঠে নলিনী বলিল—মাফ করবেন সঞ্জীববাবু, ওখানে ওদের চেয়ে আপনি অনেক দুর্বল। ওখানে ধরে নাড়া দিতে গেলে অক্ষমতায় নিজের কাছেই লজ্জা পাবেন আপনি।

সঞ্জীব মৃদু স্বরে কহিল—কিন্তু ভাঙতে হবে ওদের আত্মধ্বংসী হীনত্ব বোধ। ওদের মধ্যে আশ্রয় গেড়ে রয়েছে।

নলিনী উচ্ছলিতভাবে বলিয়া উঠিল—যা করবেন ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে করুন সঞ্জীববাবু। ভুলবেন না—এ ভারতবর্ষ—আর্যভূমি।

সঞ্জীব কথায় বাধা দিল, সে বলিল—মাটি, মৃত্তিকাময়ী পৃথিবীর একটা অংশ। রাজা ভরতের শাসনাধীন থেকে নাম পেয়েছে ভারতবর্ষ।

নলিনী আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল—সে তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—ভুল, ভুল, এ আপনার ভুল।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—ভুলের পর ভুল রচনা করেই তো মানুষ প্রগতির ইতিহাস রচনা করে চলেছে। হয়ত আমার মত ভুল

কিন্তু সে নিয়ে ঝগড়া করার যোগ্যস্থান এটা নয়, মিস গাঙ্গুলী। ওরা সব কেমন ভাবে আমাদের দিকে চেয়ে আছে দেখুন।

নলিনী দেখিল উলঙ্গ শিশুর দল হাঁ করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে।

যে ছেলেটা প্রকাণ্ড হুঁকাটা টানিতেছিল সে হুঁকা পর্যন্ত টানিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

ঘরের দুয়ারে দুয়ারে শান্ত বধূর দল অবগুণ্ঠানান্তরাল হইতে কৌতুকোজ্জ্বল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে।

সঞ্জীব বলিল— তার চেয়ে চলুন নির্জন মাঠে গলা ফাটিয়ে তর্ক করা যাবে।

একটা উলঙ্গ ছেলে অকস্মাৎ হি হি করিয়া হাসিয়া কহিল— হি হি হি, বর কনেতে ঝগড়া লেগে গেছে মাইরি—হি হি হি।

মুহূর্তে নলিনী আপনার হাতখানি টানিয়া লইল।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল - আপনি ছেলেমানুষ, মিস গাঙ্গুলী। ওই হাড়িদের কথায় কান দেন আপনি?

গ্রামের বসতি ছাড়াইয়াই আশ্বিনের সবুজ অবারিত মাঠ বিপুল আলস্যে অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা শ্রেণীবদ্ধ তালগাছ শরতের প্রসন্ন নীলাভ শূন্য পথে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে, সম্মুখে দিকচক্রবালে গ্রাম-বন-শোভার ঘন সবুজের সহিত আকাশের প্রগাঢ় নীলিমা নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ।

চলিতে চলিতে নলিনী বলিয়া উঠিল—সকল সত্ত্বা ভুলে কমরেড হওয়া যায় সঞ্জীববাবু। কিন্তু যাকে আপনি অস্বীকার করতে চান সেই ঈশ্বরকে বুকের মধ্যে অহরহ অনুভব করা চাই।

সঞ্জীব বিস্মিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

নলিনী বলিয়া গেল—হারাণের কথা শুনলেন? সে সত্যি সত্যিই আজ ভগবানের উপর নির্ভর করে আছে। তাঁকে আজ সে অনুভব করছে। তাঁরই ছোঁয়াচ আমাকেও লাগল। মুহূর্তে আমি আমার

সমস্ত সত্ত্বাকে ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম এতগুলো লোক আমাদের দিকে চেয়ে আছে। নিঃসঙ্কোচে আপনার হাত ধরলাম।

মৃদু হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—কিছু মনে করবেন না। আপনি বড় বেশী সেন্টিমেণ্টাল।

হাসিমুখেই নলিনী উত্তর দিল—সেণ্টিমেণ্ট ভাবের উচ্ছ্বাসই হল জীবনের লক্ষণ সঞ্জীববাবু। সমুদ্রে নদীতে তাই প্রাণের উচ্ছ্বাস ওঠে তরঙ্গের পর তরঙ্গে। ঘটি বাটির জলে তরঙ্গ ওঠে না। মাটির বুকে ওঠে ফসলের উচ্ছ্বাস। কিন্তু পাথরের বুকে ওঠা শেওলার দাগও স্থায়ী হয় না। তাতে গড়া হয় শুধু মৃতের ওপর কবর, স্মৃতিমন্দির।

সঞ্জীব মৃদু মৃদু হাসিতেছিল

সবুজ মাঠের বুকচেরা আলপথ পায়ে পায়ে শেষ হইয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা। দুধারের ঘন সবুজ মাঠের মধ্য দিয়া বিসর্পিল গতি লাল কাঁকরের পথ ক্রমশঃ উঁচু হইয়া চড়াই-এর উপরে উঠিয়াছে। দুধারে বনফুলের গাছগুলি সবুজ ফল-ভারে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বড় শিরীষ, বেল, অশ্বত্থ ও আউচ ফুলের গাছ। আউচ ফুলের গাছগুলি মুক্তার মত ছোট ছোট সাদা ফুলের স্তবকে স্তবকে যেন আলো হইয়া আছে। পথের ধারেই হাতের কাছে একটা গাছ হইতে নলিনী একটা ফুলের স্তবক ভাঙিয়া লইল।

একটি সরু ডালের মাথায় অজস্র ফুলে-পাতায় কে যেন তোড়া সাজাইয়া রাখিয়াছে।

স্তবকটা দেখাইয়া নলিনী বলিয়া উঠিল—এই ফুলের গোছাটাকে কি বলবেন সঞ্জীববাবু? এ থেকে বোধ হয় ফল হয় না। একে কি বলবেন প্রকৃতির সেন্টিমেণ্ট-এর সৃষ্টি, শক্তির অপচয়?

স্বভাবগত মৃদু হাস্য সহকারে সঞ্জীব উত্তর দিল—প্রকৃতির সেন্টিমেণ্ট কখনও মাত্রা ছাড়ায় না নলিনী দেবী, মাত্রাবোধেই সংসারে হয়েছে ছন্দের সৃষ্টি। এই ছন্দকে অতিক্রম করলেই সংসারে যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। সেন্টিমেণ্ট-কে আমি নিম্নস্থান দিই না। সেন্টি-

মেণ্ট-ই সংসারের বৃহৎ কর্মের প্রেরণা দেয়। কিন্তু সেন্টিমেণ্ট অতি মাত্রায় হলেই কর্ম হয় পণ্ড। প্রকৃতিকে সর্বশক্তির মূল আদ্যাশক্তি বলে মানি আমি। কিন্তু ইচ্ছাময়ী বলে ফুলে ফলে পূজা আমি করতে পারি নে।

চড়াইয়ের মাথায় উঠিয়া পথটা প্রকাণ্ড একটা বাঁক ফিরিয়াছে। সঞ্জীব বলিল—আসুন বাঁ দিকে ভাঙি। আর পথ নয়, অসমতল প্রান্তর। একটু সাবধানে চলবেন।

নলিনী সঞ্জীবের কথাই চিন্তা করিতেছিল। তাহার কথায় সে চিন্তা ছাড়িয়া সম্মুখের দিকে সজাগ দৃষ্টি প্রসারিত করিল। লাল কাঁকরের টিলা, ছোট পাহাড়ের মত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট কাঁটাবন। লাল মাটির বুকটা কালো রঙের গোল কাঁকর আর নানা বর্ণের পাথরে সমাচ্ছন্ন। সন্তর্পণে স্যাণ্ডেল চালাইয়া টিলার মাথার উপর উঠিয়া নলিনী মুগ্ধ হইয়া গেল। সম্মুখে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায় টিলার পর টিলা, এ উহার বুকে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুইটা টিলার মধ্যস্থলে উপত্যকার মত সমতল ভূমিতে শস্যক্ষেত্রে হিল্লোলিত-শীর্ষ ধান্য-লক্ষ্মীর অপরূপ শোভা। ক্ষেত্রগুলির বেড়ায় বেড়ায় তাল-বৃক্ষের সারি।

নলিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—চলুন, চলুন আগে ওই টিলাটার ওপরে গিয়ে উঠি।

টিলাগুলির গা বাহিয়া ঝর্ণার জলধারার পথে পথে নদীর জন্মকথার ইতিবৃত্ত লেখা। ক্ষুদ্র রেখাগুলি নীচে নামিতে নামিতে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া ক্রমশঃ গভীর ও পরিসর হইয়া চলিয়াছে। এ যেন ভূপৃষ্ঠের একখানি মানচিত্র।

নালার গর্ভে নামিয়া পড়িয়া নলিনী বালুকারাশির উপর ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল। নালাটার দুই পার্শ্বে জলে-কাটা মাটির গায়ে বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের কোনটি লাল, কোনটি প্রগাঢ় হলুদ, কোনটি কালো। এখানে ওখানে বিবিধবর্ণ আকারের উপলখণ্ডের স্তূপ।

ছয়া বাছিয়া নলিনী পাথর কুড়াইয়া আঁচল ভরিতেছিল। সহসা একটা কাঁটাবন হইতে ফর ফর শব্দে দুইটা পাখি উড়িয়া গিয়া দূরে টিলার মাথায় বসিয়া কলরব করিয়া ডাকিয়া উঠিল। নলিনী চমকাইয়া উঠিল।

অদূরে দাঁড়াইয়া সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—তিতির পাখি।

নলিনী হাসিয়া আবার পাথর কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

পিছন হইতে সঞ্জীব ডাকিল—একটা জিনিষ দেখুন।

নলিনী দেখিল সঞ্জীবের হাতে বড় একটা লাল কাঁকরের চাপ। একটা পাথরের উপর সেটাকে রাখিয়া আর একটা পাথর দিয়া আঘাত করিতেই কাঁকরের ঢেলাটা ভাঙিয়া চুর চুর হইয়া গেল। তাহার মধ্য হইতে বাহির হইল সুকোমল গভীর রক্তবর্ণের মৃৎপিণ্ড। সেই মৃৎপিণ্ড দিয়া একটা পাথরের গায়ে গভীর রক্তবর্ণের দাগ টানিয়া দিয়া সঞ্জীব বলিল—এই হল গিরিমাটি। হলুদ রঙের এই মাটিও পাওয়া যায়।

নলিনী আবদারের সুরে বলিল—দিন না, দিন না দেখে দেখে সংগ্রহ করে দিন না, সঞ্জীববাবু।

কয়েকটা টুকরা সংগ্রহ করিয়া লইয়া সঞ্জীব বলিল—চলুন ওপরে ওঠা যাক। সরু একখানি রাস্তা। দু পাশে খৈরী কাঁটার বন। মাঝে মাঝে শরবন বায়ু আন্দোলনে শির শির করিয়া দুলিতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—ডাক্তার মানুষ আপনি—একটা ওষুধ চিনে রাখুন। এর নাম হচ্ছে ষড়পঙ্ক—ব্যথায় খুব ভাল ওষুধ।

নলিনী বিস্মিত হইয়া কহিল—এ কি শরবন নয়।

কোন উত্তর না দিয়া একটা পাতা ছিঁড়িয়া সঞ্জীব দুহাতে দলিয়া নলিনীর নাকের কাছে ধরিল। চমৎকার একটা গন্ধে নলিনীর বুক ভরিয়া গেল। গোটা কয়েক পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া নলিনী প্রশ্ন করিল—কি নাম বললেন ষড়পঙ্ক—নয় ?

হ্যাঁ। কিন্তু এদিকে দেখুন—সূর্য অস্ত চলেছে। তখন তাহারা টিলাটার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে।

নলিনী বলিয়া উঠিল— কিন্তু একি চমৎকার ফল সঞ্জীববাবু!

সঞ্জীব ঘুরিয়া দেখিল একটা বড় খৈরী কাঁটার গাছ আচ্ছন্ন করিয়া একটা লতা উঠিয়াছে, আর সেই লতায় ধরিয়া আছে অপরূপ রাঙা রাঙা ফল।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—এ ওর ধার করা রূপ নলিনী দেবী। আপনাদের অধর শোভা চুরি করে ওর এত শোভা—ওর নাম হচ্ছে বিম্বফল।

নলিনী কয়েক মুহূর্তের জন্য মাটির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল—আমরা কমরেডস সঞ্জীববাবু।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—নিশ্চয়। নইলে বিম্বফল না বলে বলতাম তেলাকুচার ফল। চলিত ভাষায় আমাদের এখানে ওর নাম তেলাকুচা।

দূরে আর একটা টিলার উপর দিয়া একখানা গরুর গাড়ি চলিয়াছিল। তাহারই পাশে সাঁওতালদের একটা পল্লী। দিবসান্তে কুটীরে কুটীরে ধোঁয়া উঠিতেছে, এতক্ষণে উহাদের রান্না চড়িল। সম্মুখে একটা টিলার অন্তরালে সূর্য ঢলিয়াছে।

সঞ্জীব বলিল—চলুন বাড়ি ফেরা যাক।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিলেও পূর্ব দিগন্তে শুক্লা শারদ চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্রকলার আলোক দেখা দিয়াছিল। সন্তর্পণে পথ চলিতে চলিতে সঞ্জীব বলিয়া উঠিল – কে?

ওদিক হইতে একজন মানুষ চলিয়া আসিতেছিল। সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল!

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কে? কে তুমি?

তারপর মৃদুস্বরে আত্মগতভাবেই বলিল—স্ত্রীলোক বলে বোধ হচ্ছে।

নলিনী অগ্রসর হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত মানুষটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল – কে রমা?

ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া রমা কহিল—দিদিমণি ?

নলিনী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—তুমি, এখানে, এমন সময় কোথায় চলেছ রমা ?

কাঁদিতে কাঁদিতেই রমা কহিল—আমায় বাঁচাও দিদিমণি। আবার গাঙ্গুলী কাকা আমায় বাবুদের বাড়ি পাঠাবে। বাবু বাবাকে টাকা দিয়েছে। বাবা আমায় বিক্রী করেছে, আজই সন্ধ্যেবেলা আমায় নিতে গাড়ী আসবে। তখন আমি বুঝতে পারি নি, আমায় বাঁচাও তোমরা।

নলিনী প্রশ্ন করিল—কিন্তু এ পথে এই সন্ধ্যেবেলা তুমি যাচ্ছিলে কোথায় ?

—আমার মাসির বাড়ি। ঐ সামনের গাঁয়ে আমার মাসির বাড়ি।

সঞ্জীব কহিল—সেখানে যাবে তুমি ?

আকুলস্বরে রমা বলিল—না, না বাবু। তখন আমি বুঝতে পারি নি। মায়ের জন্য মন কেমন করেছিল তাই চলে গিয়েছিলাম। বাবু!

নলিনী কহিল—সঞ্জীববাবু!

প্রশান্ত স্বরে সঞ্জীব উত্তর দিল—এস রমা।

বিজয়া দশমীর দিন।

এখানে নবপত্রিকা ও ঘট বিসর্জনান্তেই বিজয়া সম্ভাষণ আরম্ভ হয়, এই চিরদিনের প্রথা। সঞ্জীব বিজয়া সম্ভাষণের জন্য নতুন বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া ডাকিল—মা।

কেহ কোন উত্তর দিল না। সে আবার ডাকিল—মা।

এবার সম্মুখের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল নলিনী, বলিল—মা ত এখনও অঞ্জলি দিয়ে ফেরেন নি।

সঞ্জীব সে কথার কোন জবাব দিল না, বলিয়া উঠিল—একি, আপনি এখনও কাপড়চোপড় ছাড়েন নি যে?

নলিনী কহিল—কেন?

—বেশ যা হোক। এত বড় পূজোটা গেল সে দেখলেন না। এদিকে দেখি ঈশ্বর পূজায় আপনার দারুণ নিষ্ঠা। তার ওপর আজ বিজয়া দশমী বাঙালী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বদিন। আজ নববস্ত্র পরিধান করে নতুন উদ্যম নিয়ে আমাদের হয় নব বৎসর।

নলিনী চুপ করিয়া রহিল। সঞ্জীবের চোখের দৃষ্টি তখন উল্লাসে উচ্ছ্বসিত, সহজ দৃষ্টিশক্তি থাকিলে সে দেখিতে পাইত কালো মেয়েটির বর্ণ বিষণ্ণতার ঘন ছায়ায় সজল মেঘের মত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

সে উৎসাহ ভরেই বলিয়া গেল—দেখবেন, এক্ষুনি রাস্তা দিয়ে দলে দলে গ্রামের লোক দুর্গা মায়ের ঘাটে চলবে। সেখানে জীবনে জয় কামনা করে হাতে অপরাজিতার বলয় পরবে, হরিদ্রার প্রসাদ খেয়ে দেহের পবিত্রতা রক্ষা করবে। তারপর বিজয়া সম্ভাষণ আরম্ভ হবে। স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে সাজসজ্জা করে বাড়ি বাড়ি প্রণাম করে ফিরবে। পূজো আপনি দেখলেন না—আজ আপনাকে বেরুতেই হবে। কাপড়চোপড়—তাহার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্বেই নলিনী ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সঞ্জীব বিস্মিত হইয়া গেল। মেয়েটির গতির মন্থরতা এতক্ষণে তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া সে ডাকিল—মিস গাঙ্গুলী। কোন উত্তর আসিল না। সঞ্জীব এবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। নলিনী স্তব্ধ হইয়া তক্তাপোষখানির উপরে বসিয়াছিল। সঞ্জীব স্নেহ-কোমল স্বরে আবার ডাকিল—নলিনী দেবী!

ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া নলিনী তাহার দিকে চাহিল। বলিল—বলুন।

—কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলুন, বিজয়ার সময় আর বেশী নেই। আজ নতুন সাজসজ্জা করতে হয়, উঠুন।

নলিনী একটু হাসিল—উদয়াকাশের বিলীয়মান তারকার মতই সে হাসি সকরুণ ক্ষীণ। সে হাসিটুকুর রেশ তাহার অধরতটে থাকিতে থাকিতেই সে বলিল—না।

—কেন? আপনার কি হল—

অস্থির হইয়া নলিনী বলিয়া উঠিল—না, না, আমায় মাফ করবেন সঞ্জীববাবু। আমি যেতে পারব না।

তাহার চোখ ছল ছল করিতেছিল। উচ্ছ্বসিত কয়টি ফোঁটা মাটির উপর ঝরিয়াও পড়িল। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত নলিনীর বেদনার কারণটুকু সঞ্জীবের মনে সুপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সে নত মুখেই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

পিছন থেকে নলিনী বলিল—আমায় একটু কাঁচা হলুদ এনে দেবেন?

সঞ্জীব বলিল—দেব। কিন্তু মনকে এমনভাবে পীড়িত করবেন না মিস গাঙ্গুলী। যে ভুল যে ভ্রান্তি পেছনে ফেলে এসেছেন তার দিকে ফিরে চাইতে গেলে সম্মুখের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হয়। তাতে জীবন হয় পঙ্গু। ভুলে যান, ও কথা ভুলে যান আপনি।

অতি কাতরস্বরে পিছন হইতে উত্তর আসিল—পারি নে, পারছি নে, বোধ হয় সে পারা যায় না সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব মুখ ফিরাইতে দেখিল, অন্তরের উচ্ছ্বসিত বেদনার আবর্তে ছোট্ট নদীটির মতই সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নলিনী কাঁদিতেছিল। সঞ্জীব নিকটে দাঁড়াইয়া কোমলস্বরে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—ছি কাঁদবেন না মিস গাঙ্গুলী, কাঁদবেন না।

নলিনী তবুও কাঁদিতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—কিষের লজ্জা আপনার? কার চেয়ে ছোট আপনি? দয়া মায়া মহত্ত্ব সত্যনিষ্ঠায় আপনি তো কারও চেয়ে ছোট নন। উঠুন, উঠুন কাঁদবেন না। নলিনীর হাত ধরিয়া সে একবার মৃদু আকর্ষণ করিল।

নলিনী বলিয়া উঠিল – না, না। আমায় একটু একা থাকতে দিন।

—দিদিমণি!

ডাক শুনিয়া সঞ্জীব মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া রমা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল – কিছু বলছ রমা?

ত্রস্তভাবে দৃষ্টি নত করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে রমা বলিল—দিদিমণিকে ডাকছিলাম, তা থাক।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মুখ বাড়াইয়া নলিনী বলিল—আমায় ডাকছ রমা?

রমা তখন চলিয়া গিয়াছে।

সঞ্জীব বলিল—আমি যাই তা হলে। মনকে কিন্তু এমন ভাবে অনর্থক পীড়ন করবেন না। আমার অনুরোধ রইল।

সে চলিয়া গেল। নলিনী আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠেই ডাকিল—রমা! রমা!

দরজার পাশ হইতে রমা উঁকি মারিয়া বলিল – দাদাবাবু চলে গিয়েছেন দিদিমণি? আমি যাব?

এই মুহূর্তে অন্য কেহ এ কথা বলিলে নলিনী অপমান বোধ না করিয়া পারিত না। কিন্তু এই নির্বোধ মেয়েটার কথায় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। সে কহিল—হ্যাঁ চলে গেছেন তিনি। এস তুমি। কিছু বলছিলে আমায়?

ঘরের মধ্যে রমা প্রবেশ করিয়া বলিল—বিজয়া দেখতে যাবে না দিদিমণি? কাপড়চোপড় ছাড়।

নলিনী কহিল—না ভাই আমি যাব না। আমার শরীর খারাপ করেছে, তুমি বরং যাও।

রমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর একান্ত সঙ্কুচিতভাবে বলিল—তোমার ওই পুরনো কাপড় আর সেমিজটা আমি আজ পরব দিদিমণি? আমার কাপড়টা বড় মোটা। আর তোমার কাপড়ের পাড়টা কেমন ভাল।

নলিনী পরম স্নেহভরে স্বল্প হাস্যের সহিত ঘাড় দোলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

প্রবল উৎসাহে রমা বলিয়া উঠিল—নেব দিদিমণি ?

হাসিয়া নলিনী স্পষ্টাক্ষরে সম্মতি দিল—নাও। তোমায় দিলাম ও-গুলো।

চঞ্চলা বালিকার মতই লঘুপদে রমা চলিয়া গেল। ওই চঞ্চল গতির স্পর্শ ছোঁয়াচের মত যেন নলিনীর মনে রঙ ধরাইয়া দিল। সে চাহিয়া রহিল রমার ওই চঞ্চল গতি চিহ্নিত গমন-পথটির দিকে, মৃদু হাসির রেশটুকু মুখে তার লাগিয়াই ছিল। কতক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখের খোলা জানালার দিকে সে চাহিল। সে ভাবিতেছিল—সে কেন রমা হইতে পারে না ? অপরাধ-বোধহীন এমন একটি অকুণ্ঠিত শিশুচিত্ত কেন তাহার নয় ? মনশ্চক্ষুর কেন এমন একটি অকলঙ্ক শুভ্র দৃষ্টি তাহার নাই ? রমার দৃষ্টিতে তাহার গাঙ্গুলী কাকা ভাল মানুষ, মহেন্দ্রবাবুকেও সে ভাল লোক ভাবে।

অকস্মাৎ একটি কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—রমা! রমা! রমা।

হাসিমুখে রমা আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—আমায় ডাকছ দিদিমণি ?

নলিনী দেখিল তাহার কাপড় বদলানো হইয়া গিয়াছে—পরণে তাহার সেমিজ আর তাহারই মাদ্রাজী শাড়িখানা। অপটু হাতের বিন্যাসে সেমিজটা কুঁকড়াইয়া গিয়াছে। পরিধান করিবার অপকর্ষ ভঙ্গিতে কাপড়খানা শ্রীহীন ভাবে বিন্যস্ত, কিন্তু রূপ যাহার আছে—পরিচ্ছদ বিন্যাসের শ্রীহীনতা তাহার শ্রীকে পীড়িত করিতে পারে না। এই বেশ-বিন্যাসেই তাহাকে মানাইয়াছে বড় চমৎকার।

নলিনী বলিল—আমার তখন মনে হয় নি রমা। তুমি সঞ্জীব-বাবুকে জিজ্ঞাসা করে তবে যেন বেরিও।

রমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন দিদিমণি ?

একটু বিরক্ত হইয়া নলিনী কহিল—এত ছেলেমানুষ তো তুমি নও, রমা? জান তো—এটা হল মহেন্দ্রবাবুর রাজ্য। তার বিপক্ষে যে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা না করে বেরিয়ে যদি কোন বিপদ ঘটে তখন কি হবে?

রমা নীরবে চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পর আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—তুমি দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দাও দিদিমণি।

কেন, কে জানে, বেশ-বিন্যাসপরায়ণা রমাকে নলিনীর বড় ভাল লাগিতেছিল না।

নলিনী এবারও বিরক্তিভরে বলিল—কেন? তুমিই গিয়ে জিজ্ঞাসা কর না?

রমা মুখ নামাইয়া চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে বলিল—আমার বড় লজ্জা লাগছে দিদিমণি। তখন দাদাবাবু কি মনে করেছেন বল ত?

—কখন? এই ছন্নছাড়া মেয়েটির কথাবার্তার অর্থও যেন ছন্নছাড়া। সে অর্থ নলিনীর বোধগম্য হইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল —কখন?

—যখন সেই তোমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি এসে পড়লাম। রমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে সুস্পষ্ট লজ্জার রেশ গুঞ্জন করিয়া করিয়া ফিরিতেছিল।

কঠিনস্বরে তিরস্কার করিয়া নলিনী বলিয়া উঠিল—ছি রমা, তুমি এত নীচ।

রমার মুখ ম্লান হইয়া গেল—সে সকরুণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে চেষ্টা করিল নলিনীর মুখের দিকে। কিন্তু পারিল না, অবশেষে নতমুখেই মন্থর পদক্ষেপে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আর কখনও বলব না দিদিমণি।

নলিনী একান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিল—এই রমা! হায় রে হতভাগ্য মানুষ! পাপকে এড়াইবার পথ নাই—কোন পথ নাই!

মনের কোন অন্ধকার কোণে সে লুকাইয়া থাকে, অকস্মাৎ সুযোগমত বীভৎস হাসি হাসিয়া মুখ তুলিয়া একদিন আত্মপ্রকাশ করে। চিন্তা করিতে করিতে পক্ষ বিস্তার করিয়া মন চলিয়া যায় কত দূর দূরান্তর। এক সময় তাহার মনে হয় ইহার জন্য দায়ী মানুষ নিজে। শিক্ষা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের প্রবেশের গোপন পথ রচনা করিয়াছে সেই স্বয়ং। রমার বুকেও সে প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছে।

বাড়ির বাহির হইতে কে ডাকিতেছিল—সঞ্জীববাবু! সঞ্জীববাবু!

সঞ্জীব বাড়িতে ছিল না। মাথায় ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিয়া মা দাওয়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণ স্বর অপেক্ষা উচ্চ-কণ্ঠেই কহিলেন—কে?

—আমি মহেন্দ্রবাবুর কর্মচারী।

মা বলিলেন—সঞ্জীব তো বেরিয়ে গেছে বাবা। সে ফিরে আসুক বলব তাকে আমি। কি দরকার আমায় বলে যেতে পার। এস না বাবা, ভেতরে এস।

লোকটি দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—তিনি এলেই আসব বরং আমি, দেনা পাওনার ব্যাপার।

একটু হাসিয়া মা বলিলেন—দেনা পাওনার ব্যাপার হলে আমিই জানব ভাল। সে তো বাইরে বাইরে ফেরে, সে এসব জানেও না। কিসের দেনা পাওনা, কার সঙ্গে দেনা পাওনা?

—আঁজ্ঞে একখানা তমসুক আছে। বারো বছর হতে চলল উশুলের পর। তামাদী হবে, তাই বাবু পাঠালেন।

—কে? মহেন্দ্রবাবু? কিন্তু তার কাছে তো ঋণ আমরা কখনও করি নি।

মাথা চুলকাইয়া কর্মচারীটি জবাব দিল, আঁজ্ঞে দলিলখানা হচ্ছে এককড়ি গাঙ্গুলীর। সে বাবুকে দলিলখানা বিক্রী করেছে। প্রায় পাঁচশো টাকা বাকি দাঁড়াচ্ছে।

এই সময়ে এদিকের দরজা দিয়া সঞ্জীব প্রবেশ করিয়া কহিল—বেশ যা হক তুমি, মা। সমস্ত ঠাকুর বাড়ি খুঁজে খুঁজে আমি হায়রাণ। বাবুর কর্মচারীটিকে দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—কি ব্যাপার মা? আপনি যে এ সময়ে ঘোষ মশায় ?

ঘোষ মশায় বলিল—বাবু পাঠালেন আপনার কাছে। এককড়ি গাঙ্গুলীর একখানা বন্ধকী দলিল তিনি কিনেছেন। সেখানা তামাদীর মুখে। তাই, খবর দিয়ে পাঠালেন তিনি। আপনার বাবার সম্পাদন করা তমস্থক, আপনি জানেন বোধ হয়।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সঞ্জীব উত্তর করিল—বাবা সে ঋণ শোধ করেছেন বলেই আমাদের ধারণা। তবে যদি সত্যিই পাওনা থাকে তবে নিশ্চয় শোধ দেব আমি। বাবার ঋণ কখনও রাখব না।

বাধা দিয়া মা বলিয়া উঠিলেন—তুই চুপ কর সঞ্জীব। শোন গো বাছা, তোমার বাবুকে গিয়ে বলবে সে দলিলের টাকা সঞ্জীবের বাপ শোধ দিয়ে গেছেন। পঁচিশ টাকা বোধ হয় বাকি ছিল, কিন্তু সে টাকা রফা পাওয়ার কথা ছিল। গাঙ্গুলী আজ কাল করে দলিলখানা ফেরত দেয় নি। ও টাকা আমাদের দেয় নয়—আমরা দেব না।

বাবুর কর্মচারী ঘোষ মশায় বিজ্ঞ হাস্যের সহিত বলিল—কিন্তু মা, দলিলে যখন বাকি রয়েছে, দলিলও যখন ফেরত হয় নি, তখন আদালতে গেলে যে আদায় হবেই ; তখন আদালত খরচাও লাগবে।

মা এবার তার স্বভাবগত কঠোরতার সহিত বলিলেন—তাই দেব। পঁচিশ টাকার বাকিতে যদি পাঁচশো টাকা দিতেই রাজার হুকুম হয় তাও দেব। কিন্তু সে মীমাংসা না হলে এক পয়সাও দেব না। বল গিয়ে তোমার বাবুকে।

কর্মচারীটি সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—সঞ্জীববাবু।

মা উত্তর দিলেন। বলিলেন—ও আর নতুন উত্তর কি দেবে বাবা ? আমি থাকতে ও কে ? ওই ওর উত্তর। এই কথাই তোমাদের বাবুকে গিয়ে জানাও তুমি।

লোকটি তবুও সঞ্জীবকে প্রশ্ন করিল—এই জবাবই কি ঠিক সঞ্জীব-বাবু? একটা আপোষ করলে হত না?

মা বলিয়া উঠিলেন—দেখ বাবা, আজ বিজয়া দশমীর দিন, আজ কাউকে রুক্ষ কথা বলতেও নেই—কারও কাছ থেকে শুনতেও নেই। যাও তুমি বাবা, যা বললাম তাই গিয়ে তুমি বল।

জমিদারের কর্মচারী আর বাস্তু-ঘুঘুতে বড় বেশী নাকি তফাত নাই। বাস্তু-ঘুঘু তাড়াইলেও যায় না, একটু সরিয়া গিয়া আবার গলা ফুলাইয়া ফুলাইয়া ডাকে। ঘোষ মশায় এতটুকু বলাতে দমিবার পাত্র নয়, বেশ একটু মোলায়েম করিয়া সে বলিল, বললেই তো হয়ে গেল মা, হাতের তীর বেরিয়ে গেল। ঝগড়া বিবাদ বাধানো সোজা মা, মেটানোই কঠিন। তার চেয়ে একটা আপোষ, সঞ্জীববাবু একবার গেলেই—

মা বলিলেন—জানি, কিন্তু সঞ্জীব যাবে না। তুমি যাও।

গম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি বাড়িটা ব্যাপ্ত করিয়া যেন রন্ রন্ শব্দে বাজিতেছিল। ঘোষ মশায় আর অপেক্ষা করিতে সাহস করিল না। ছোট একটা নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

রান্নাঘরের বারান্দায় আহারের ঠাঁই করিয়া দিয়া মা বলিলেন—আয় খেয়ে নে সঞ্জীব। বিজয়ার সময় আর বেশী নেই।

আসনের উপর বসিয়া সঞ্জীব বলিল—একটা কথা ভেবে দেখবার আছে মা। তুমি ভেবে দেখো। মহেন্দ্রবাবুকে মোকর্দ্দমায় হারিয়ে জিততে পারা যাবে না। আপীলের পর আপীল করে আমাদের তিনি ধ্বংস করবেন। এটা হল তাঁর একটা অস্ত্র। এই করেই বহুলোকের সর্বনাশ তিনি করেছেন। অথচ মাথা উঁচু করে চলেন। উনি হারেন কোনখানে জান মা—যেখানে লোক ওঁর মিথ্যে-অন্যায় দাবী জেনেও টাকা ফেলে দিয়ে আসে সেখানে। সেখানে উনি মাথা হেঁট করেই থাকেন—আর মাথা তুলতে পারেন না।

দৃঢ়স্বরে মা বলিলেন—না।

সঞ্জীব বলিল—তা ছাড়া পঁচিশ টাকা তো বাকি ছিল। রফার কথা সত্যি কি না কে বলবে? বাবাকে ঋণী করে রাখা—

বাধা দিয়া মা কহিলেন—তার পাপ তোকে স্পর্শ করবে না সঞ্জীব—সে পাপ আমার।

সঞ্জীব আর কোন কথা কহিল না। নিশ্চিন্ত হইয়া নীরবে সে আহার করিতে বসিল।

কিছুক্ষণ পরে মা বলিলেন—নলিনীকে তুই কলকাতায় রেখে আয়। আমাদের যা হয় হবে—কিন্তু আশ্রয় যখন দিয়েছি—তখন বিপদের আঁচ যেন ওদের গায়ে না লাগে।

পরদিন সঞ্জীব নলিনী ও রমাকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইয়া গেল।

রমার সম্পর্কে কি করা হইবে বহুক্ষণ চিন্তার পর নলিনী বলিয়াছিল—রমাকে আমি নিয়ে যাই সঞ্জীববাবু। ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে যদি নার্স করে তুলতে পারি তাহলে ওর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

সঞ্জীব উল্লসিত আগ্রহে বলিয়াছিল—এই, এই কথাটাই যেন আবিষ্কার করতে চাচ্ছিলাম মিস গাঙ্গুলী। তাই হোক—এর চেয়ে ভাল কিছু ওর পক্ষে হতে পারে না।

ট্রেনে চড়িয়া সঞ্জীব ও নলিনী তর্ক বিতর্কে কামরাখানা যেন মাতাইয়া তুলিল। সুবিধাও হইয়াছিল বেশ—তাহারা তিনটি প্রাণী ব্যতীত অপর কেহ সে গাড়ীতে ছিল না। রমা এক কোণে বসিয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে উল্কা বেগে। সম্মুখ হইতে গ্রামের পর গ্রাম ছুটিয়া আসে আবার পিছনে পড়িয়া যায়। প্রতি গ্রামখানিকেই রমার মনে হয় ওই আমাদের গ্রাম। ক্রমশঃ দেশের রূপ পরিবর্তিত হইতেছিল।

এবার গ্রামগুলি আরও নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন—মৃত্তিকার রঙ কালো। সে গেরুয়া মাটির দেশ আর নাই।

এদিকে সঞ্জীব তখন বলিতেছিল—আর নয় মিস গাঙ্গুলী, বর্দ্ধমান এগিয়ে আসছে। চীৎকার করে ক্ষিধেকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। এতেই পকেট অনেক খালি হয়ে যাবে।

নলিনী বলিল—যে আপনার খাওয়া! পাখিতেও বোধ হয় আপনার চাইতে বেশী খায়।

সঞ্জীব হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—হয়েছে। খাওয়া নিয়ে বাড়িতে দিবারাত্র মায়ের গার্জেনীর ঠেলায় অস্থির। গাড়ীতেও শেষকালে বান্ধবী গার্জেন হয়ে উঠলেন। আমার অদৃষ্ট।

নলিনীও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—না, আপনাকে পারবার জো নেই। সকল কথাকেই আপনি হাসির ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চান।

উচ্চ হাসির শব্দে রমা জানালা হইতে মুখ ফিরাইয়া এদিকে চাহিল। কিন্তু পরক্ষণেই মাথার ঘোমটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া আবার জানালার বাহিরে ঝুঁকিয়া পড়িল।

সঞ্জীব বলিল—না, না এমন করে বাইরে ঝুঁকে থেকো না রমা। চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে। হয়তো লাইনের পাশের গাছপালার ডালে আঘাতও লাগতে পারে।

রমা একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল, কিন্তু মুখ ফিরাইল না। মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে কি যে বলিল তাও বেশ বোঝা গেল না।

নলিনী তাহাকে টানিয়া লইয়া স্বস্নেহে বলিল—দেশের জন্যে মন কেমন করছে রমা?

মৃদু হাসিয়া রমা বলিল—না।

—তবে, তবে এমন করে রয়েছ যে?

অতি মৃদুস্বরে রমা বলিল—তোমরা কথা কইছ—। আর সে বলিতে পারিল না।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কি?

নলিনীর মুখখানাও রাঙা হইয়া উঠিল, সেও কথার কোন জবাব দিল না।

বিজয়া দশমীর পর দিন কাছারীতে বসিয়া মহেন্দ্রবাবু পরামর্শ করিতেছিলেন সদর-নায়েবের সঙ্গে। একটি জাল রচনার প্রণালী ও কৌশলই ছিল আলোচ্য বিষয়।

বাবু বলিলেন—দেখ, ওকে টাকা দিলে জলে পড়বে বলে আমার মনে হয় না। সে হ্যাণ্ডনোটেই হোক আর মর্টগেজেই হক। প্রথমেই মর্টগেজে নিতে চাইলে ও এগুবে না।

সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া বলিলেন—মানী লোক তো। মানের ভয়টা এ জগতের লোকের সব চেয়ে বেশী।

নায়েব চুপ করিয়া রহিল।

বাবুই বলিতেছিলেন—এই সব ইডিয়টদের কথা মনে হলে আমার হাসি পায় হরিচরণ! ধর্ম দেখায় এরা। আত্মনং সততং রক্ষেৎ—এই কথাটাই হল বাস্তব জগতের সব চেয়ে বড় ধর্মের কথা অথচ এটাকেই করে ওরা অবহেলা।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার হাসিয়া বলিলেন—আমায় এরা বলে অধার্মিক পাপী, অথচ আমার ঐশ্বর্য সম্পদের ঈর্ষা করতে ছাড়ে না। আঙুর ফল টক গল্পটা খুব ঠিক, যাক, এক কাজ কর তুমি, কোনও থার্ড পার্টিকে দিয়ে ওর কাছে প্রস্তাব করে পাঠাও যে টাকা হ্যাণ্ডনোটেই দেওয়া হবে। সেই যেন অনুরোধ উপরোধ করে এটা করে দিচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক হওয়া চাই। ওই সব লোকের মত ইডিয়ট ধর্মপরায়ণ গর্ধভ হলে সব মাটি হবে।

নায়েব এতক্ষণে কথা কহিল। সে অতি মৃদুভাষী লোক। শ্রোতার যে কানটি তাহার দিকে থাকে সেটি ভিন্ন অন্য কানে তাহার কথা যায় না।

সে বলিল—এতগুলো টাকা, একটু ভেবে দেখা উচিত। হ্যাণ্ডনোটে টাকা দেবেন, কিন্তু কাল যদি সে সম্পত্তি হস্তান্তর করে কি বেনামী করে ফেলে!

পেন্সিলের প্রান্তদেশটি ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরিয়া মহেন্দ্রবাবু নীরব হইয়া রহিলেন। কপালের রেখাগুলি কুঁচকাইয়া চিন্তারেখাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে তিনি বলিলেন, না। তারপর বলিলেন স্পষ্ট ভাষায়, এ বুদ্ধি ওর হবে না। বললাম তো ও একটা গর্ধভ।

মৃদু হাসিয়া নায়েব বলিল—এ কালে বুদ্ধি দেবার তো লোকের অভাব নেই। বুদ্ধি অপরে দেবে।

হাসিয়া বাবু বলিলেন—তুমি ছেলেমানুষ। বাস্তব সংসারের অভিজ্ঞতা এখনও হয় নি তোমার।

আইনের কূটকৌশল যত কিছু, সবই তো আইনের বইয়েই আছে। সে সব বই উকিলই পড়ে কিন্তু সবাই রাসবিহারী ঘোষ হয় না কেন? বুদ্ধি দিলেও সে নেবার ক্ষমতা ওর নেই।

নায়েব চুপ করিয়াই রহিল। স্বল্পভাষী লোক। তর্ক ভালবাসে না।

বাবু বলিলেন—এসব বুদ্ধি ওর কানে ঢুকবে কিন্তু মাথায় যাবে না। মন সায় দেবে না। বললাম তো ধর্মভীরু মানী লোক ওরা, প্রথমে ভাববেন ধর্ম, তারপর ভাববেন সুনামের কথা তারপর হবে ভয়, কি জানি ফন্দী যদি না টেঁকে।

নায়েবের এসব মন্তব্য তবুও বেশ মনোমত হইল বলিয়া বোধ হইল না, কুণ্ঠিত ভাবেই সে বলিল—দেখুন যা আপনার ইচ্ছা হয়।

বাবু বলিলেন, পাশার ঘুটি আড়ি না দিয়ে গেলে উপায় নেই। আড়ি দিয়েও মার খায় আক্ষেপ করে না। কিন্তু পার হয়ে গেলে ষোল আনাই লাভ। দাও ওকে, হ্যাণ্ডনোটেই ওকে টাকা দাও। এক বছর পরে তুমি মর্টগেজ আমার কাছে করে নিয়ো।

তারপর আবার ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া বললেন—লোক চেনার

ক্ষমতা তোমাদের হয় নি এখনও। ওরা সব বড় মজার লোক। মরাল অব্লিগেশনের দড়ি একবার পরাতে পারলেই নিশ্চিন্ত। সে দড়ি ওরা কখনও ছিঁড়বে না, ছিঁড়তে চেষ্টা পর্যন্ত করবে না, ভাববে লোহার শিকল। হাঁসের মত, জানত হাঁসের ঘরে দড়ি ফেলে দিলে হাঁসগুলো ভয়েই মরে যায়, দড়িটাকে সাপ ভেবে।

নায়েব এবার বলিল—তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি।

—হ্যাঁ। মৌজা বনমালীপুর আমার চাই। ঘর থেকে বেরিয়েই পরের সীমানায় পা দিতে হয়। আর লাভও, মৌজাটাও ভাল। যে কোন উপায়ে, কে? কি বলছ তুমি?

সঞ্জীবের উত্তর বাহক ঘোষ মশায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে সঞ্জীব মুখুজ্যের ওখানে গিয়েছিলাম আমি। সে বললে—

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাবু বলিলেন—পরে শুনব। এর চেয়ে ওটা জরুরী বিষয় নয়। যাও, ওঘরে আপনার জায়গায় গিয়ে বসে কাজ কর এখন।

ঘোষ মশায় চলিয়া গেল।

নায়েবের সঙ্গে কথা শেষ করিয়া ঘোষ মশায়কে ডাকিলেন। বলিলেন—কি বললে, সঞ্জীব? জ্ঞান হয়েছে একটু?

সঞ্জীব ও তাহার মায়ের কথাগুলি অলংকার দিয়া বর্ণনা করিয়া ঘোষ বাবু বলিল—আজ্ঞে ছেলের চেয়ে দেখলাম মায়ের তেজই বেশী।

মহেন্দ্রবাবু গুম হইয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—আচ্ছা যাও তুমি।

নায়েবকে বলিলেন—সঞ্জীবের নামে একটা আর্জ্জি করে দাও।

নায়েব বলিল—ওর মা যা বলেছে সেটা একবার ভেবে দেখবার কথা। শেষ পর্যন্ত এতে ঠকতে হবে হুজুর।

স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বাবু বলিলেন—হাইকোর্ট পর্যন্ত আপীল লড়তে সঞ্জীবের খড়ের চাল বিক্রী হবে না?

তার চেয়ে একটা ক্রিমিনাল কেস করলেই বোধ হয় ঠিক হবে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে মহেন্দ্রবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তিটির মুখের দিকে চাহিলেন।

এবার অতি মৃদু স্বরে কয়টি কথা তাঁহাকে বলিয়া নায়েব সহজ স্বরে বলিল—ওর বাপ মা আত্মীয় স্বজন সবাই আমাদের পক্ষে রয়েছে। মেয়েটা হাতে আসে ভালই, নইলে ওকে মাইনর বলে চালিয়ে দিতে হবে। এ সেকসনে আর পার নাই। পাঁচ ছ বছর নির্ঘাত।

বাবু আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, কড়ি গাঙ্গুলীর কাছে একটা লোক পাঠিয়ে দাও।

মনে উচ্ছ্বাসের বাহ্যিক প্রকাশকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করেন। খাস বৈঠকখানায় বসিয়া ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড খুলিয়া তাহার নীরস ধারাগুলির নাগপাশে বাঁধিয়া মনের উচ্ছ্বাসটুকু নিথর করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় সঞ্জীবকে পনের ষোল দিন অপেক্ষা করিতে হইল। একটা মধ্যশ্রেণীর হোটেলে উঠিয়া নলিনীর জন্য একটা বাসার সন্ধান করিতেই প্রথম আট দশ দিন কাটিয়া গেল। বাসা তখনও ঠিক হয় নাই। সেদিন তখন কথা হইতেছিল বাসা লইয়াই।

নলিনী বলিল—বড় রাস্তার ওপরে হলেই ভাল হয়। প্রথম প্র্যাকটিসের মুখে আগে প্রয়োজন ডাক্তারের অস্তিত্বটা লোককে জানানো। খান দুই ঘর, রান্নাঘর, কলঘর, বাথরুম এই হলেই যথেষ্ট আমার পক্ষে। বাসার খরচ চালানো তো বড় সোজা কথা হবে না। একটু হাসিয়া নলিনী আবার বলিল—আর চাকরী নয় সঞ্জীববাবু। কষ্ট অবশ্য কিছু হবে। কিন্তু পুরুষের তাঁবেদারী করার চেয়ে সে কষ্ট অনেক সহনীয়।

সঞ্জীব বলিল—চাকরী করলেই যে পুরুষের তাঁবেদারী করতে হবে, এর কোন মানে নেই মিস গাঙ্গুলী।

তেমনি হাসিয়া নলিনী বলিল—আছে বৈকি সঞ্জীববাবু। সমস্ত পৃথিবীটারই যে এখনও ষোল আনার মালিক আপনারা। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে যে দেশ যতই চীৎকার করুক, সকল দেশেই স্ত্রী-স্বাধীনতা আসলে একটি শূন্যগর্ভ পাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। বাইরে দেখাবার জন্য মঙ্গল-কলসের মত সৌখীন পাত্রই একটা তৈরি হয়েছে, কিন্তু অন্তঃসার-শূন্য। তাই চীৎকারটাও খুব প্রবল আর উচ্চ। আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দিন—সব দেশেই সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক হল পুরুষ। অবশ্য এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। কারণ তারা স্ত্রীলোকের চেয়ে বলশালী।

সঞ্জীব বলিল—বলপ্রয়োগ করাটাই যে নীতিবিগর্হিত হয়ে উঠছে দিন দিন, মিস গাঙ্গুলী।

হাসিয়া নলিনী বলিল—ও কথার কোন অর্থ হয় না সঞ্জীববাবু। পৃথিবীতে যদি নীতি প্রচার হয় যে, লোভের মূল হল দৃষ্টি, অতএব সবাই চোখ বন্ধ করে থাক, সেটা যেমন অসম্ভব এটাও ঠিক তাই। দৃষ্টিশক্তি থাকতে অন্ধ হওয়ার কল্পনা যেমন হাস্যকর, বল থাকতে সে বল প্রয়োগ করবে না, এ কল্পনাও ঠিক তাই। না, চাকরী আর নয়। আমাদের দেশে প্রভুর সেবা করতে হয় আবার সর্বভাবে।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আপনি যে রীতিমত বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলেন। অদূর ভবিষ্যতে পুরুষের সঙ্গে যদি নারীর কখনও যুদ্ধ হয়, তবে আপনিই বোধ হয় হবেন বিদ্রোহের ধ্বজা-বাহিনী।

নলিনী নীরব হইয়া রহিল, কি যেন সে ভাবিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে গাঢ়স্বরে ধীরে ধীরে বলিল—পুরুষ জাতটাকে আমি ঘৃণা করি না সঞ্জীববাবু। তাকে প্রভু বলে নারীকে মানতেই হবে। তাকে মানতে চাই আমি পিতারূপে—স্বামীরূপে, পরিণত বয়সে সন্তান-রূপে। প্রতিপালক প্রভুরূপে তাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি—

ভয় করি। বন্ধুরূপেও তাকে আমি পেতে চাই না। বন্ধুত্বের আবরণের মধ্যেও পুরুষ নারীর অজ্ঞাত শত্রু।

সঞ্জীবের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল—মিস গাঙ্গুলী, আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। এ আলোচনা এখন থাক।

সেই গাঢ়স্বরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অকম্পিত দৃষ্টি মেলিয়া নলিনী বলিয়া গেল—সাপের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বের মত এ বন্ধুত্ব ভয়ানক। সাপও পোষ মানে না—মানা সম্ভব হয় না; কিন্তু কি করবে সে, তার বিষ দাঁতের জন্য তো সে দায়ী নয়। বন্ধুত্বের বিনিময় করতে গিয়ে সে বিষ দাঁত একদিন না একদিন মানুষের দেহে বিঁধে যায়। নারী-পুরুষেরও তাই, সঞ্জীববাবু। অসতর্ক মুহূর্তে ব্যবধান ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেই সে পুরুষের বন্ধুত্ব হয়ে দাঁড়ায় উন্মত্ত মোহ। নারীরও বুকে বিষ আছে, কিন্তু সে বিষ নীলকণ্ঠের মত গোপন করে রাখে তারা। মোহে নারীর উন্মত্ততা আসে না, সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। নলিনীর রূঢ় বাক্যে সে আঘাত পাইলেও অপরাধ গ্রহণ করে নাই। নির্য্যাতিতা মেয়েটির বুকের অসহনীয় বেদনার জন্য, তার করুণার আর অন্ত ছিল না। ঘরের মধ্যে নলিনী একাই বসিয়া রহিল। নির্জনতার অবকাশের মধ্যে আছে একটি উচ্ছ্বাস প্রকাশের মোহ।

নলিনীর ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আয়ত চোখ দুইটির কূল ভরিয়া অশ্রু টলমল করিতেছিল।

রমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশভূষায় একটি বিশেষত্ব ছিল। মাথার এলানো চুলগুলি রুক্ষ ধূসর সৌন্দর্য্যে মেঘের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে। দেহের তৈলমসৃণ সুগৌর বর্ণ মসৃণতাহীন উগ্রতায় ঈষৎ রক্তিম।

নলিনী তখনও আপনার কথাই ভাবিতেছিল। সে তাহাকে লক্ষ্য করে নাই।

রমাই সলজ্জভাবে হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—চুলে বড় আঠা ধরেছিল তাই সাবান দিলাম আজ। কিন্তু মুখ হাত যে বড় জ্বলছে দিদিমণি।

কোলের আঁচলে চোখের জলের লজ্জাটুকু মুছিয়া লইয়া সে বলিল—ওই দেখ টেবিলের ওপর স্নো রয়েছে, একটু মেখে ফেল। দেখেছিস বোধ হয় আমি মুখে মাখি, হ্যাঁ ওইটে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে সঞ্জীব আসিয়া বলিল—একটা সুসংবাদ আছে মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী বলিল—আপনি মঙ্গলের অগ্রদূত সঞ্জীববাবু। মঙ্গল আপনার অনুসরণ করে, আর আপনাকে লঙ্ঘন করে যেতে হয় রাজ্যের অমঙ্গল।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আজ এত বেশী ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলেন কেন বলুন তো? রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ'এ পড়েছিলাম এ্যাসিডিটি বেশী হলে এই রকম লক্ষণ দেখা দেয়। ওষুধও তিনি বাতলেছেন, বাই কার্বোনেট অফ সোডা। তাই বরং একটু খেয়ে দেখুন।

হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া নলিনী বলিল—মহাকবির চরণে অসংখ্য প্রণাম নিবেদন জানাচ্ছি। কিন্তু তাঁর প্রেসক্রিপসন মত ওষুধ আমি খেতে পারব না। উচ্ছ্বাস আসে বৈকি সঞ্জীববাবু। সত্য যে সুন্দর, সুন্দরই আনে মোহ, আর মুগ্ধ অন্তরই হল উচ্ছ্বাসের উৎপত্তি-স্থল। মিথ্যা তো বলি নি আমি, অসীম পৃথিবীর জন্য বিরাট মঙ্গল আপনি আনতে পারেন না, সে শক্তি আপনার নাই। সমগ্র দেশও তো আপনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু দু দশটি মানুষের মঙ্গল সেও তো সংসারে দুর্লভ, সেই বা ক'জনে—

বাধা দিয়া সঞ্জীব বলিল—শুনুন শুনুন, আমার সংবাদটা শুনুন আগে। একটি ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে। কথায় কথায় তিনি বললেন, তারা ক'জন বন্ধু মিলে একটা ডাক্তারখানা খুলেছেন। অনেকটা ডক্টরস ব্যুরো গোছের ব্যাপার। আসল উদ্দেশ্য

হল পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে প্রতিষ্ঠিত করা। তারা লেডি ডাক্তারের সাহায্যও নেবেন। আমি আপনার নাম করলাম। কিন্তু আপনার মত না নিয়ে কথা দিতে পারলাম না।

নলিনী বলিল—কি বলে ধন্যবাদ দেব আপনাকে, আমি যে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার ভবিষ্যতের চিন্তার অর্দ্ধেক ভার লাঘব করে দিলেন।

সঞ্জীব তেমনি লঘুভাবে বলিল—এখন একটা বাসা ঠিক করতে পারলেই ব্যস্, আমি খালাস। কি বলেন?

মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—হ্যাঁ। সে উঠিয়া পাশের ঘরে যাইতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—ব্যাঙ্কে যাবেন, বলছিলেন না?

—হ্যাঁ যাব একবার। কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে আমার। পাশ বইখানা আছে, চেক বই নেই। চেক বই একখানা নিয়ে আসব আর টাকাও কিছু বার করতে হবে।

—বেশ, আপনি তৈরি হয়ে নিন তাহলে।

—আপনার পাওনার হিসেব একটা তৈরি করে দেবেন দয়া করে। কত টাকা হবে জানালে টাকাটা আনার সুবিধা হত।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—সে জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না মিস গাঙ্গুলী! এখন সে শোধ করবার দরকার নেই। সঞ্চয় যেটা আছে সে নষ্ট করবেন না। উপার্জন থেকে বরং ক্রমে ক্রমে শোধ করবেন।

মুখ ফিরাইয়া নলিনী বলিল—না। উপকারের ঋণ শোধ করবার অহঙ্কার আমার নেই সঞ্জীববাবু। আজীবন সে ঋণ আপনাদের কাছে আমার থাক। কিন্তু অর্থের ঋণ অতি হেয় জিনিষ, সে আমি রাখতে চাই না।

এবার সঞ্জীব ঈষৎ ক্ষুব্ধ না হইয়া পারিল না। তবুও সে নীরব রহিল।

ঘরের বন্ধ দরজাটা ঠেলিয়া নলিনী বলিল—কে? রমা? কি করছিলে তুমি এখানে?

বিবর্ণ মুখে রমা কি বলিল বেশ বুঝা গেল না। কিন্তু সেদিকে মনযোগ দিবার মত অবসর বা মনের অবস্থা নলিনীর ছিল না। সে কাপড় বদলাইতে ওঘরে চলিয়া গেল। কাপড় চোপড় পাল্টাইয়া বাহির হইবার মুখে রমাকে বলিল—আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। একি রমা কাপড়ের নীচে সেমিজ পর নি, ছিঃ। সেমিজ পরে ফেল একটা। আর এ ঘরে চাবি বন্ধ করে ও ঘরে বসে থাক। সাবধানে থাকবে, বুঝলে। অন্য কোন ঘরে যাবে না।

রমা বলিল – আমার জন্য একটা স্নো আনবে দিদিমণি।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—সময়ে সময়ে অদৃষ্টকে দেবতা বলে মানতে ইচ্ছা করে। যখন তিনি সুপ্রসন্ন দৃষ্টি দেন তখন কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না।

সামান্য কতক কতক আসবাবপত্র কিনিয়া বাসাখানিকে বাসোপযোগী করিয়া বাসায় আসিয়া ওঠা হইল।

সঞ্জীব বলিল—গৃহপ্রবেশের দিন আপনার আজ। বেশ ভাল করে রান্নাবান্না করুন। আমি হলাম ব্রাহ্মণ, ভোজন করে দক্ষিণা নিয়ে আশীর্বাদ করে বিদায় হব।

নতমুখে নলিনী বলিল—আমার হাতে ভাত খাবেন আপনি ?

তাহার মুখের উপর অকুণ্ঠিত পরিপূর্ণ দৃষ্টিখানি নিবদ্ধ করিয়া সঞ্জীব অভ্যাস মত হাসিয়াই উত্তর দিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর হাস্যস্পর্শে লঘু নয়, গভীর আন্তরিকতায় মর্মস্পর্শ করে সে স্বর। সে বলিল—আমরা কমরেড, মিস গাঙ্গুলী। আপনি আমার চেয়ে হীন নন, আমার চেয়ে অস্পৃশ্য নন, পৃথিবীর সমতল বুকের উপর আমরা মানুষ।

উজ্জ্বল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সঞ্জীবের চোখে চোখ রাখিয়া নলিনী বলিল—অপরাধ যদি করি মার্জনা করবেন দয়া করে। আপনি কি বিপ্লববাদী ?

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—না, আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ মিস গাঙ্গুলী।

বিরাট দেশের দৈন্য দুর্দশা দেখবার মত দৃষ্টি আমার নেই। আমি আমার পল্লীটুকুর মধ্যে কাজ করি। আর করি যারা চারদিক থেকে সমাজের সকল স্তরের চাপে পিষ্ট। পল্লীকে আমি নতুন রূপ দিতে চাই। তাতে যদি ভেঙে যায় পুরাতন, যাক ভেঙে। ভেদাভেদহীন মানুষের একটি বসতি শ্রীময়ী শক্তিময়ী, শান্তিময়ী পল্লী আমি গড়ে তুলব।

নলিনী মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। কথা শেষ হইবার পরও সে কথা কহিতে পারিল না।

সঞ্জীবই আবার বলিল—প্রয়োজন হলে সাহায্যের প্রার্থনা করব মিস গাঙ্গুলী। আমার বিশ্বাস আপনার সাহায্য পাব।

নলিনী গাঢ় স্বরেই বলিল—আমার জীবন কৃতার্থ হবে সেদিন, সঞ্জীববাবু।

হাত বাড়াইয়া সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—হাতে হাত দিন, আমরা কমরেডস।

নিঃসঙ্কোচে হাত দিয়া নলিনী বলিল—কমরেডের জন্যে কি রান্না করব বলুন। কমরেড কি খেতে ভালবাসেন।

সঞ্জীব বলিল—ভাল রান্না হলে সবই আমার ভাল লাগে। তবে পাতের প্রথম দিকে যেগুলো থাকে সেইগুলোর ওপর আমার লোভ বেশী। কারণ শেষের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পেট আসে ভরে। তখন সেগুলো আর ভাল লাগে না।

নলিনী হাসিয়া উঠিয়া গেল। পাশের ঘরটার দরজা ঠেলিয়া সে ডাকিল—রমা।

দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া রমা কি করিতেছিল, নলিনীর কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

নলিনী দেখিল, সে তাহার কেশ প্রসাধনের সামগ্রীগুলি লইয়া আধুনিক রুচি অনুযায়ী কেশবিন্যাসের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। নলিনীর কিন্তু আজ রাগ হইল না। তাহার মন ছিল তুষ্ট, সে স্নেহসিক্ত স্বরেই

বলিল—ও বেলা ভাল করে চুল বেঁধে দেব তোমার। এখন এস তো ভাই, রান্নার বাঁটনাগুলো বেটে দেবে এস তো।

মাসখানেক পরে সেদিন অপরাহ্নে সঞ্জীব বেড়াইতে বাহির হইতেছিল। মা বলিলেন—আজ আবার ধোওয়া কাপড় ভাঙলি যে সঞ্জীব? যে কাপড় পরছিলি সে তো তেমন ময়লা হয় নি।

সঞ্জীব বলিল—নিচের দিকটা রাঙা ধূলোয় লাল হয়ে গেছে মা। তা ছাড়া কাল সকালেই একবার কলকাতা যাব তাই—

কথা শেষ না হইতেই মা বলিয়া উঠিলেন—এখন কলকাতা কি জন্যে আবার?

ছেলে হাসিয়া বলিল—কোথাও যাব বললেই তোমার মাথা ধরে। না মা?

স্থির দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন—কাজটাই কি শুনি?

—আমাদের কো-অপারেটিভ স্টোরের জিনিষপত্র আনতে হবে মা।

মা বলিলেন—এতদিন তো এই সদর শহর থেকেই জিনিষপত্র আসছিল। এখন আর কলকাতা না হলে চলছে না।

ছেলে কহিল—তখন আমাদের পুঁজি ছিল কম, জিনিষপত্রও আসত কম। কলকাতা আসা যাওয়ার খরচ পোষাত না। এখন আমাদের আয় বেড়েছে। কলকাতা গেলেই এখন সুবিধে হবে।

মা প্রশ্ন করিলেন—কবে ফিরবি?

—পাঁচ সাত দিনের বেশী হবে না বোধহয়।

—উঠবি কোথায়?

—কেন বন্ধুর বাড়ি, কিম্বা কোন মেসে উঠব। ঠিক করি নি কিছু।

মা বলিলেন—অ।

তারপর ওঘরে যাইতে যাইতে অকস্মাৎ মা বলিয়া উঠিলেন—চুলগুলো আজকাল কি ফ্যাশনে কাটাচ্ছিস রে? একেবারে ঘাড়ের চামড়া বের করে—ছিঃ।

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আচ্ছা, সামনের দিকটা খানিকটা কেটে ফেলব কলকাতায়।

মা বলিলেন—চার আনা পয়সা দিয়ে? তুই আজকাল বড় বাবু হয়ে উঠেছিস সঞ্জীব।

হাসিয়াই সঞ্জীব বলিল—চার পয়সাতেও চুল কাটা হয় মা সেখানে।

গম্ভীর ভাবে মা বলিলেন—চার পয়সা কিম্বা চার আনার জন্যই শুধু বলি নি আমি! সত্যিই তুই আজকাল বাবু হয়ে উঠেছিস। এ ভাল নয়।

আশ্চর্য হইয়া সঞ্জীব বলিল—বাবুগিরি তো কিছু করি নি মা। নিজেই নিজের বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কিছুক্ষণ পর পুনরায় বলিল—সত্যিই কি আমি বাবু হয়ে পড়েছি মা? কিন্তু তুমিই তো আমায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য তিরস্কার করতে।

ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন—পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা আর বিলাসিতায় পার্থক্য আছে বাবা। তারপর সস্নেহে আবার বলিলেন—ছেলেকে মা মানুষ করে তোলে কারিগরের হাতের পুতুলের মত। সে পুতুল যদি মনের মত না হয় সঞ্জীব, তবে আর আক্ষেপের সীমা থাকে না বাবা। মায়ের মনে হয় এর চেয়ে আমার মৃত্যু হল না কেন?

সঞ্জীব নীরবেই সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ পর সে ডাকিল—মা!

মা আর সেখানে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন না। ঘরের মধ্যে তিনি আপনার কাজ করিতেছিলেন। তিনি সেখান হইতেই উত্তর দিলেন—কিছু বলছিস আমায়?

ঘরের দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সঞ্জীব বলিল—আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি মা ?

সস্নেহ হাস্যে মায়ের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—তুই আমার পাগল ছেলে রে! মা কি ছেলেকে উপদেশ দেয় না ?

রাত্রে সঞ্জীব খাইতে বসিলে মা বলিলেন—মহেন্দ্রবাবু নালিশ করেছেন। বিকেলবেলা তুই বেড়াতে গেলে সমন জারী করে গেল।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—মামলা মোকর্দ্দমার কিছুই জানি নে আমি মা। তুমিই এই ঝঞ্ঝাট টেনে আনলে, এ পোয়ানো আমার পক্ষে ভারী কঠিন হবে।

মা উত্তর দিলেন কঠিন স্বরে—তা তো হবেই বাবা। এতে তো আর দেশোদ্ধার হবে না।

সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল। মা বলিলেন—বেশ আমিই যাব আদালতে। তোমার সংসারে এসে সুখ তো হল আমার ষোল আনা। এইটুকুই বা বাকি থাকে কেন ? এও হবে।

সঞ্জীব বলিল—সে তো আমি বলি নি মা। আমি বলছি—আইন কানুন সম্বন্ধে কিছুই আমি জানি না।

রুষ্টভাবে মা বলিলেন—তুই মানুষ না জানোয়ার ? মোকর্দ্দমার কিছুই জানি না বলে হাঁ করে চেয়ে রইলি যে! সবই কি লোকে মায়ের পেট থেকে শিখে আসে ? কলকাতা যাবি তুই পরে। কালই তুই সদরে যা। সেখানে উকিল আছে, আইনের পরামর্শ দেবার জন্যই। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা করতে হবে, করে আয়।

সঞ্জীব বলিল—বাঃ রে! তুমি বলে না দিলে এই পথই বা আমি জানব কি করে ?

অত্যন্ত কঠোর ভাবে মা বলিয়া উঠিলেন—ন্যাকামি করিস না সঞ্জীব। সব আমি সইতে পারি, ন্যাকামি আমার সহ্য হয় না। বাবা, আসলে এ ব্যবস্থাটাই তোমার মনঃপূত হয় নি। নইলে আইন না জানার জন্যে কিছু যেত আসত না। আইন না জানলেও শেখা যায়।

কই বাবা, নলিনীর জামীন হবার সময় তো আইন না জানায় কিছু যায় আসে নি। মায়ের পরামর্শের দরকারও হয় নি। সেদিন তো আইনের ধারা নিজেই জেনে নিয়েছিলে।

নতমুখে সঞ্জীব বলিল—তাই হবে মা, কালই সদরে যাব।

মা বলিলেন—এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সঞ্জীব। নিজের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার যদি না করতে পার, তবে পরের অধিকার রক্ষা করতে যাবে কোন্ সাহসে? আর আইন আদালত তো ছোট জিনিষ নয় বাবা। যে কোন রাজ্যে বাস করতে গেলে সে রাজ্যের আইন যে না জানে তাকে বলি আমি মূর্খ।

সঞ্জীব বলিল—তা হলে উকিলকে কি ভাবে কি বলতে হবে সে সব বলে দাও আমায়, আমি নোট করে নেব।

মা বলিলেন—রচনা করে শিখিয়ে দেবার তো কিছু নেই এতে। সত্য যা, উকিলকে তাই বলবে। সে সবই তো জান তুমি। তবে মনোবিবাদ হেতুই যে মহেন্দ্রবাবু এ মোকর্দ্দমা করেছেন, সত্য হলেও এটুকু আমাদের না বলাই ভাল। তাতে তাঁর দুর্নাম রটবে, আর নলিনী-রমারও কলঙ্ক রটবে।

সঞ্জীব বলিল—সত্য যা ঘটেছে সেইগুলোই আমি লিখে নিতে চাচ্ছিলাম মা। যদি ভুলেই যাই কোনটা। লিখে নেওয়াটা ভাল।

—আচ্ছা সেগুলো গুছিয়ে আমি লিখে দিচ্ছি। তুই তা হলে কাল এখানে ফিরে পরশু কলকাতায় যাবি।

—না মা। তাতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। আমি বরং ওই পথেই কলকাতায় চলে যাব। তোমায় চিঠিতে খবর দিয়ে যাব বরং।

হারাণ বাগ্দী এই সময় বাড়িতে প্রবেশ করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া একটা হাঁড়ি নামাইয়া দিল। বলিল—খেজুরের গুড় আছে মা খানিকটে। দাদাবাবু বলেছিলেন কলকাতায় নিয়ে যাবেন।

সঞ্জীব বলিল—নলিনীকে দিয়ে আসব মা।

মা প্রশ্ন করিলেন—নলিনীর ঠিকানাটা কি রে? ওখানে চিঠি-

দিলেই তুই পাবি বোধ হয় ?

সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ মা, সেই ভাল হবে। দরকার হলে ওখানেই চিঠি দিয়ো তুমি। যেখানেই থাকি রোজ একবার খবর নেব নলিনীর বাসায়।

মহকুমায় উকিলের সাহায্যে মোকর্দ্দমার কাজকর্ম শেষ করিয়া সঞ্জীব কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল রাত্রে। উঠিয়াছিল সে ভবানীপুরে একটা মেসে। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া অভ্যাসমত সে বেড়াইতে বাহির হইল। শীত সবে পড়িতেছে। বিলাসিনীর সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বসনের মত ক্ষীণ কুয়াশায় শহরের সর্বাঙ্গ আবৃত। অভ্যাস ও নিয়মমত দ্রুতপদে সঞ্জীব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের পাশ দিয়া পূর্বমুখে বড় গির্জাটার নিকট চৌরঙ্গিতে আসিয়া উঠিল। ট্রাম, বাস তখন চলিতে শুরু করিয়াছে। একখানা ট্রাম চলিতেছিল ধর্মতলার দিকে। রাস্তার জংশনের উপর ট্রামস্টপে ট্রামখানা বোধ হয় সঞ্জীবকে দেখিয়াই থামিয়া গেল। অকস্মাৎ সঞ্জীব বিনা কারণে ট্রামখানায় উঠিয়া পড়িল। কণ্ডাক্টর আসিয়া টিকিটের জন্য দাঁড়াইতেই সঞ্জীবের সে কথাটা খেয়াল হইল। তাইতো, কোথায় যাইবে সে ? পরক্ষণেই একটি সিকি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—শ্যামবাজার।

শ্যামবাজারে নলিনীর বাসায় আসিয়া ঘরের বাহির হইতেই সে বলিয়া উঠিল—সুপ্রভাত মিস গাঙ্গুলী।

দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল রমা। আড়ম্বরহীনা, একান্ত সঙ্কুচিতা সরলা পল্লীর সে মেয়েটি তো এ নয়। সযত্ন মার্জনায়, সুচারু প্রসাধনে শান্ত সৌন্দর্য তাহার উগ্র, উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, দেহের বর্ণ-লাবণ্যে রক্তাভা যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। তৈলহীন চুলগুলি রেশমের মত কোমল ও চিক্কণ। সূক্ষ্ম সরলরেখার মত সিঁথি টানিয়া হালফ্যাশনে সযত্ন-বিন্যাসে বিন্যস্ত। হাতে দুগাছা চুড়ি।

রমা আনন্দে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল দাদাবাবু! কণ্ঠস্বরের মধ্যে সুপরিস্ফুট লজ্জার পরিচয়।

সঞ্জীবের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই। এই সেই রমা!

মুখ নত করিয়া রমা আবার বলিল—বসুন দাদাবাবু। দিদিমণি স্নান করছেন। আসবেন এক্ষুণি।

এতক্ষণে সঞ্জীব বলিল—তোমায় আমি চিনতেই পারি নি রমা। পাঁড়াগায়ের মেয়ে বলে আর চিনবার উপায় নেই তোমাকে।

রমা মুখ নত করিয়াই রহিল। কিন্তু তাহার অনাবৃত মুখের যে অংশটুকু দেখা যাইতেছিল সেইটুকুরই রক্তাভ বর্ণ হইয়া উঠিল সুরক্তিম।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃষ্টমনে সঞ্জীব বলিল—এদিকে তো দেখতে শুনতে শহুরে হয়েছ। কিন্তু কাজে কর্মে কতদূর এগুলে পরীক্ষা দাও দেখি। চায়ের জল চড়িয়ে দাও। চা তৈরি করতে শিখেছ?

হাসিমুখে রমা বলিল—চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে এসেছি। চা তো এখন আমিই তৈরি করি।

—আর কি কি শিখলে বল। নার্সের কাজ শিখছ তো?

ঘাড় নাড়িয়া রমা বলিল—হ্যাঁ। থারমোমিটার দিতে পারি, দেখতে পারি। ফুটবাথ দিতে শিখেছি। মাথায় জলপটি দিতে পারি। এখন ফার্স্ট এড শিখছি, দাদাবাবু।

উৎসাহ প্রকাশ করিয়া সঞ্জীব বলিল—বাঃ বাঃ। এ যে অনেক শিখে ফেলেছ দেখছি। তারপরে লিখতে পড়তে শেখাও যে দরকার। সেটা আরম্ভ করেছ?

রমা বলিল—দিদিমণির কাছে পড়ছি—প্রথমভাগ আরম্ভ করেছি। কাল জল, লাল ফুল পড়ছি এখন। ঐ যা- -চায়ের জল পড়ে যাচ্ছে বোধ হয়।

রান্নাঘরের দিক হইতে একটা সোঁ সোঁ শব্দ উঠিতেছিল।

রমা লঘুপদে বাহির হইয়া গেল। সে গতির মধ্যে তরঙ্গায়িত একটি ভঙ্গি আছে। সঞ্জীবের সেটুকু বড় ভাল লাগিল। পরম স্নেহভরে রমার গমন পথের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

—নমস্কার! সদ্যস্নাতা নলিনী ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিল।

সঞ্জীব আসন ছাড়িয়া উঠিয়া সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—শুধু নমস্কার নয়, সুপ্রভাত কমরেড।

অপরাজিতার ফুলটি যেন মৃদু বাতাসে দুলিয়া উঠিল। লাজনম্র মৃদু হিল্লোলে ঈষৎ চঞ্চল হইয়া শ্যামলা মেয়েটি হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—কমরেড! তারপরে পাশের চেয়ারে বসিয়া সে বলিল—ভারী মন কেমন করে কিন্তু সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আমাদের বুঝি করে না মনে করেন? সত্যি মিস গাঙ্গুলী, এখান থেকে বাড়ি গিয়ে বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকত। আপনি যখন ছিলেন তখন বাড়ির একটা নতুন শ্রী হয়েছিল। অভাবের মধ্যে প্রতিনিয়তই সেটা এখন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

নলিনী পিছন ফিরিয়া কি যেন একটা দেখিয়া লইল। তারপর বলিল—মা ভাল আছেন সঞ্জীববাবু? তিনি আমার নাম করেন?

সঞ্জীব বলিল অসংখ্যবার। বলেন মেয়ে কি বউ নইলে সংসার মানায় না। নলিনী থেকে সেটা আমি বেশ বুঝেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার বিপদ। বলেন, বিয়ে কর তুই। কি, ওটা কি কুড়োচ্ছেন আপনি?

নত হইয়া নলিনী কি একটা কুড়াইতে চেষ্টা করিতেছিল। সে বলিল—একটা পায়রার পালক। ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া সে বলিল—বিয়েতে নেমন্তন্ন করবেন তো আমাদের?

সঞ্জীব হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া সে বলিল—তপস্বী শিব আমাদের দেবতা, নলিনী দেবী। আমাদের দেবতার কোপানলে মদন হয়েছিল ছাই। প্রেমে আমাদের অধিকার নেই নলিনী দেবী। নিমন্ত্রণের আশা আপনার একান্ত দুরাশা বলেই মনে হয়।

নলিনী সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে ধীরভাবে বলিল—মদন ছাই হয়েছিল—কিন্তু

অতনু অবিনাশী সঞ্জীববাবু। গৌরীর তপস্যা শিবের বরদান ইত্যাদি যত কৈফিয়তের দোহাই দিন আপনারা, অতনুর জয়-গৌরব তাতে ঢাকা পড়ে না। যাক ও কথা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, নারী জাতিকে এত তুচ্ছ মনে করেন কেন?

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—অবিচার করছেন আমার ওপর। নারী জাতিকে তুচ্ছ আমি মনে করি নে। না হলে আপনাকে কমরেড বলতাম না কখনও। নারী জাতিকে সহকর্মিণী বলে গ্রহণ করতে আমি দ্বিধা করি না, মিস গাঙ্গুলী। কিন্তু সহধর্মিণীরূপে কল্পনা করতে পারি না, তাতে আমার ভয় হয়। ভূজলতার বন্ধন শৃঙ্খলের চেয়ে কঠিন এবং দৃঢ়।

নলিনী একথার কোন উত্তর দিল না। নীরবে সে পালকটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

রমা ঘরে চা লইয়া প্রবেশ করিল। পরিপাটি শৃঙ্খলার সহিত কাপ দুইটি টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল—ময়দা মেখে রেখেছি, লুচি ক'খানা ভেজে নিয়ে আসি। চলে যাবেন না দাদাবাবু।

চা পান করিতে করিতে নলিনী বলিল—ক'দিন ধরে আপনার কথাই ভাবছিলাম আমি। আপনার পরামর্শ না নিয়ে কিছু স্থির করতে পারি নি সঞ্জীববাবু। রমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন আপনি?

সঞ্জীব কোন উত্তর দিল না, জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে প্রশ্ন করিয়া সে নলিনীর মুখের দিকে চাহিল।

নলিনী বলিল—বাইরের মত বোধ করি ওর মনেও একটা পরিবর্তন এসেছে। এখন ওর দায়িত্ব নিতে আমার ভয় হচ্ছে সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—না, না, না মিস গাঙ্গুলী। একান্ত সরল ও।

নলিনী বলিল—সরলের চেয়েও বেশী, রমা বুদ্ধিহীনা। সেখানেই বিপদের ভয় বেশী। আপনাদের চেয়ে ওদিকে আমাদের দৃষ্টি অনেক প্রখর। এতদিন ও ছিল শিশু। এখন কিন্তু ওর ভেতরে ক্রমে ক্রমে মনের বয়স বাড়ছে। হয় তো দেহের বয়সের সঙ্গে মনও ওর একদিনে সমবয়সী হয়েই উঠল।

সঞ্জীব চিন্তান্বিতভাবে বলিল—প্রতিকারের কি করা যায় বলুন তো?

নলিনী বলিল—প্রতিকারের প্রকৃষ্ট পন্থা ছেড়ে দিয়েই আজ এ অবস্থা। বিধবা বিবাহ কি আপনি সমর্থন করেন সঞ্জীববাবু? সেই হবে এখন প্রকৃষ্ট উপায়।

সঞ্জীব আনন্দে বলিয়া উঠিল—সেই সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে ভাল মিস গাঙ্গুলী। এর চেয়ে ভাল সত্যি কিছু হতে পারে না। আহা হা, এমন সুন্দর ফুলের মত মেয়েটি মা হয়ে সংসারে ধন্য হোক। ওর রূপের প্রতিবিম্ব পেয়ে পৃথিবীও সুন্দর হবে।

নলিনী কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পর সে অকস্মাৎ উঠিয়া চায়ের পেয়ালা দুটি লইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—পেয়ালা দুটো ধুয়ে ফেলা দরকার।

সঞ্জীব বলিল—আমিও তাহলে উঠি।

নলিনী তখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সঞ্জীব একটু আহত হইল। সে অনুভব করিল, নলিনীর অন্তরের মধ্যে কোথায় আছে যেন চোখে না ঠেকার মত অতি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণধার একটি কাঁটা। ব্যবহারের মধ্যে সুতীক্ষ্ণভাবে পর পর যেন সেটা বিঁধিতে থাকে। ফিরিবার পথে বার বার সে এই কথাটাই চিন্তা করিল। সে স্থির করিল অপ্রয়োজনে সে আর নলিনীর ওখানে যাইবে না।

সেদিন সকালেই নলিনী একটা কলে বাহির হইয়াছিল। ফিরিতে হইয়া গেল বারোটারও বেশী। রমাও সঙ্গে গিয়াছিল, সে পিছনে পিছনে ওষুধ ও যন্ত্রপাতির বাক্সটা হাতে করিয়া আসিতেছিল। ঘরের দরজাটা খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই নলিনীর নজরে পড়িল একখানা খামের চিঠি।

কাহাকেও না পাইলে পিয়ন দরজার ফাঁক দিয়া এমনিভাবে চিঠিপত্র ভিতরে ফেলিয়া দিয়া যায়। চিঠিখানি সে কুড়াইয়া লইল। দেখিল

তাহাকেই কে লিখিয়াছে। হস্তাক্ষর পরিচিত বলিয়া বোধ হইল না। চিঠিখানি ছিঁড়িয়া প্রথমেই সে দেখিল লেখকের নাম। সেখানে লেখা ছিল—আশীর্বাদিকা, শুভার্থিনী 'সঞ্জীবের মা'। চিঠিখানা সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়িয়া গেল।

"কল্যাণীয়াসু,

মা নলিনী, আমার অসংখ্য আশীর্বাদ জানিবে। আশা করি তুমি ও রমা কুশলেই আছ। তোমাকে আজ একটি বিশেষ গুরুতর বিষয় জানাইতেই এই পত্র লিখিতেছি। তুমি বুদ্ধিমতী, আশা করি ভুল বুঝিবে না। তোমরা আধুনিক যুগের শিক্ষিতা মেয়ে। কিন্তু মা, সংসারের অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে আমাদের অনেক বেশী। মা, একটা বয়স আছে, যে বয়সে সম্বন্ধহীন স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা আমরা ভাল মনে করি না। এমন ক্ষেত্রে বিপদও অধিকাংশ স্থলেই হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি মনে করি সঞ্জীব ও তোমার মধ্যে বন্ধুত্বের জের আর না চলাই ভাল। তাহাতে তোমাদের উভয়েরই মঙ্গল হইবে বলিয়া আমার ধারণা। আমার ছেলেকে আমি জানি। সে কখনও তাহার সচেতন বুদ্ধিতে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে না। কিন্তু মা, কোন তুচ্ছতম বস্তুই তো মানুষ জ্ঞাতসারে হারায় না। হারাইলে তাহাকে হারান বলে না, বলে বিসর্জন দেওয়া। তাহা সে কখনও করিবে না। কিন্তু যদি অজ্ঞাতসারেই সে কোনদিন নিজেকে হারাইয়া ফেলে, তবে তাকে দোষ দিব কি করিয়া?

সঞ্জীবকে এ বিষয়ে সচেতন করিতে যাওয়া আমার পক্ষে লজ্জার কথা। আর আকর্ষণ যদি ইতিমধ্যে প্রবলই হইয়া থাকে তবে মায়ের অবাধ্য হওয়া বা মিথ্যার আশ্রয় লওয়া যুবক পুত্রের পক্ষে বিচিত্র নয়।

একদিন সে তোমার উপকার করিয়াছে। আজ তাহার প্রতিদান আমি দাবী করি। তুমি তাহার পথ হইতে সরিয়া যাও। তুমি নিজেও তোমাদের সমাজের মধ্যে বিবাহ করিয়া সুখী হও এই আমার উপদেশ। আশীর্বাদ করি জীবনে সুখী হও। ইতি"

নলিনীর পায়ের তলায় বসুন্ধরা যেন দুলিতেছিল। বিবর্ণমুখে শূন্য দৃষ্টিতে সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চোখের সম্মুখে সব যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু একটি মুখ—অবশ্য অগণ্য অসংখ্য হইয়া সারি সারি সে ভাসিয়া চলিয়াছে। নিস্পন্দ দেহের মধ্যে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল শুধু দুটি ঠোঁট, দুটি বায়ুতাড়িত বটপত্রের মত।

রমা লজ্জিত স্বরে ডাকিল—দিদিমণি!

সেই বিহ্বলতার মধ্যেই নলিনী উত্তর দিল—এ্যাঁ।

—কি হয়েছে দিদিমণি?

নলিনী উত্তর দিল না।

রমা আবার ডাকিল—দিদিমণি!

এবার নলিনী সচকিত হইয়া উঠিল। কহিল—রমা? কিছু বলছ?

—কি হয়েছে দিদিমণি?

তখন নলিনীর ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছিল। কোনরূপে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে উত্তর দিল—কিছু হয় নি রমা। তুমি রান্নাটা চড়িয়ে ফেল গিয়ে। আমার একটু কাজ আছে, সেরে ফেলি।

রমা চলিয়া গেলে টেবিলের উপরে মাথা রাখিয়া সে যেন ভাঙিয়া পড়িল। তারপর সে যখন মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিল, তখন সম্মুখের দেওয়ালের আয়নায় দেখিল তাহার ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিচিত্র এক হাসি। পত্রখানার অতর্কিত আঘাতে নিজের ক্ষণিক বিমূঢ়তার জন্য বার বার তাহার প্রতিবিম্বখানি ব্যঙ্গ হাস্যের তীক্ষ্ণ সায়কে তাহাকে যেন জর্জর করিয়া তুলিতেছিল।

ধূমকেতুর বিরহে পৃথিবীর শোক! এই সম্পূর্ণ সজাগ মুহূর্তে সঞ্জীবের সহিত জীবন-সূত্রে গ্রন্থি দেওয়ার কল্পনা যে কতবড় হাস্যকর তাহা ক্ষণপূর্বের অশ্রুসজল চোখের সম্মুখে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আরও হাসি পাইল তাহার সেই পল্লীবাসিনী প্রৌঢ়ার আশঙ্কার কথা ভাবিয়া। কত মূল্য দেন তিনি তাঁহার এই স্বপ্নবিলাসী ভাবপ্রবণ অক্ষম সন্তানটির পরে।

যাক, উপকারের প্রত্যুপকার তাহাকে করিতে হইবে। স্বপ্নবিলাসের মধ্যে একখানা কাঁচকে সে রত্নের যত্নে অঞ্চলে বাঁধিয়াছিল। সেই অঞ্চলপ্রান্তটুকু কাটিয়া দিতে হইবে।

দোয়াত কাগজ কলম টানিয়া লইয়া সে পত্র লিখিতে বসিল।

আটটার সময় নলিনীর ডিসপেন্সারী যাইবার সময়। কিন্তু উত্তেজনা বশত গত রাত্রে নলিনীর ভাল ঘুম হয় নাই। প্রাতঃকালেই নিয়মমত স্নান সারিয়াও দেখিল শরীর তখনও যেন তেমন সুস্থ নয়। সে স্থির করিল, ডিসপেন্সারীতে আজ আর সে যাইবে না।

চিঠিখানি গতকালই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ প্রাতঃকালে সঞ্জীব পাইবে। তাহার মনে আবার ঐ চিন্তা আসিয়া পড়িল।

সঞ্জীবেরও কি আকর্ষণ জন্মিয়াছিল তাহার উপর? না, তাহার অতি সাবধানী মায়ের কল্পনা এ? আবার তাহার ঠোঁটে দেখা দিল সেই হাসি। উঃ, কত বড় মূর্খের মত অন্ধ আবেগে ছুটিয়াছিল সে?

—নমস্কার মিস গাঙ্গুলী!

নলিনী চমকিয়া উঠিল। দরজা ঠেলিয়া সঞ্জীব ভিতরে প্রবেশ করিল। মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করিয়া নলিনী বলিল—আপনি?

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ। অবাঞ্ছিত অতিথিই বটে। আপনার পত্র আমি পেয়েছি। কিন্তু আমি মর্যাদাহানি সহ্য করতে পারি নে। সেইজন্য তার কৈফিয়ত নিতে এসেছি।

নলিনীও মাথা তুলিল দৃপ্ত ভঙ্গিতে। তারপর ধীরে অকম্পিত কণ্ঠে বলিল—বলুন।

সঞ্জীব বলিল—শুধুমাত্র যদি আপনি আমায় এখানে আসতে নিষেধ করে চিঠি লিখতেন তা হলেই যথেষ্ট হত। কিন্তু কারণের উল্লেখ করে আপনি আমার মর্যাদায় আঘাত করেছেন। আপনার সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই আমি সম্বন্ধ পাতিয়েছিলাম কমরেডএর। কর্মের পাকে আর বিপাকেই বলুন আপনার সঙ্গে আমার দেখা।

নলিনী বাধা দিয়া বলিল—সে ঋণ, সে কৃতজ্ঞতা আমি অস্বীকার করি নে সঞ্জীববাবু। কিন্তু নারী-পুরুষের কমরেডশিপে আমার আস্থা নেই।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—এইখানে আপনি আমায় সবচেয়ে বড় অপমান করেছেন। আমার অন্তরের আন্তরিকতায় দোষারোপ করেছেন।

নলিনী বলিল—যদি করেই থাকি সঞ্জীববাবু তবু সে মিথ্যা করি নি। আপনার মনের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। নইলে আমি চলে এলে আপনার বাড়ি অকস্মাৎ শ্রীহীন হয়ে উঠল কেন শুনি?

সঞ্জীব দৃঢ়ভাবে বলিল—আমার দুর্ভাগ্য যে আপনি স্ত্রীলোক। আপনি পুরুষ হলেও আপনার বিদায়ের পর আমার বাড়ি ঠিক এমনি শ্রীহীনই ঠেকত নলিনী দেবী।

নলিনী সহসা এতবড় অপমানজনক কথাটার উত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে ধীরে ধীরে বলিল—তাহলে তো আর আপনার মর্যাদাহানীর কথাই উঠতে পারে না সঞ্জীববাবু। আমার নিক্ষিপ্ত বিষবাণ আমার বুকেই ফিরে এসে বিঁধল।

সঞ্জীব কথার উত্তর দিল না। মনে তাহার রুক্ষতার জন্য অনুতাপ দেখা দিয়াছিল।

নলিনী বলিল—আর পত্রেও তো আপনি আমার প্রতি আকৃষ্ট এমন কথা লিখিনি আমি। আমি লিখেছি—

আর সে বলিতে পারিল না। অবরুদ্ধ অশ্রুর পীড়নে রক্তিম মুখে সে অন্য দিকে চাহিয়া আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিল।

অনুতাপে লজ্জায় সঞ্জীব আপনাকে এবার অপরাধী না ভাবিয়া পারিল না।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া নলিনীর হাতদুটি ধরিয়া বলিল—আমায় মাপ করুন নলিনী দেবী।

ধীর আকর্ষণে হাত দুইটি ছাড়াইয়া লইতে লইতে নলিনী বলিল—

ছাড়ুন। তারপরে মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া সে কি যেন বলিতে গেল। কিন্তু সে বলা তাহার হইল না। তাহার পরিবর্তে রোষে ক্ষোভে রক্তিম হইয়া সে বলিয়া উঠিল—রমা!

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সঞ্জীব দেখিল ও ঘরের অর্ধোন্মুক্ত জানালার অন্তরালে জাগিয়া রহিয়াছে রমার মুখ। সমস্ত মুখে তাহার কে যেন সিঁদুর মাখাইয়া দিয়াছে। বিচিত্র একাগ্র দৃষ্টিতে সে এই দিকেই চাহিয়াছিল।

নলিনী আবার ডাকিল—রমা।

রমা যেন সম্বিত পাইয়া সরিয়া গেল।

নলিনী দ্রুতপদে ও-ঘরের দিকে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সঞ্জীব শুনিল নলিনী বলিতেছে—এতবড় নির্লজ্জ তুমি রমা! ছি, তোমায় আমি ভাল মনে করতাম।

নলিনী এ-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সঞ্জীবকে বলিল—ওকে কি আপনি আজই নিয়ে যাবেন?

সঞ্জীব বলিল—সে কথার আলোচনাও করবার আছে মিস গাঙ্গুলী। ওর ভার আপনি নিন। দেখে শুনে বিয়ে দিন।

নলিনী হাত জোড় করিয়া বলিল—মাফ করবেন সঞ্জীববাবু। রমার দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। তা ছাড়া ও এখানে থাকা মানেই আপনার আমার মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখা। সে সূত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে ছিন্ন হয়ে যাক।

সঞ্জীব বলিল—তা হলে নমস্কার মিস গাঙ্গুলী। কাল এসে ওকে আমি নিয়ে যাব।

পরদিন গাড়ীতে জিনিষপত্র তুলিয়া রমা ও সঞ্জীব গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। দুয়ারের সম্মুখেই নলিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সঞ্জীব হাস্য মুখেই বলিল—নিজেদের সমাজে বিবাহ করবেন লিখেছেন। কায়মনোবাক্যে কামনা করি আপনি সুখী হন। কিন্তু কমরেডকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলবেন না। আমরা ইতরজন, শুধু মিষ্টান্নের প্রত্যাশী।

নলিনী দুটি হাত জোড় করিয়া বলিল—কমরেড আর নয় সঞ্জীব-বাবু। ও সম্পর্কের আজ থেকে অবসান হোক।

সঞ্জীব বলিল—এর চেয়ে বড় কোন সম্পর্ক আপনার সঙ্গে যে ধারণা করতে পারি নে মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী তখন আর সেখানে ছিল না।

সঞ্জীবদের গ্রামের স্টেশনে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল বেলা পাঁচটায়। রমাকে সঙ্গে লইয়া সঞ্জীব বাড়ি আসিয়া ডাকিল—মা।

সম্মুখেই ঘরের মধ্যে চোখে চশমা দিয়া মা সেলাই করিতেছিলেন। ছেলের ডাকে তিনি মুখ তুলিলেন। মুখ তুলিয়া কিন্তু আর উত্তর দেওয়া তাঁহার হইল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া তিনি দেখিতেছিলেন রমাকে। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন—রমা নয়?

মায়ের বিস্ময়ের হেতু সঞ্জীব বুঝিয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ। সে রমা আর নেই মা।

গম্ভীরভাবে মা উত্তর দিলেন—তাই দেখছি। কিন্তু ওকে নিয়ে এলি যে? টেনে জঞ্জাল ঘাড়ে করা কি তোর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল সঞ্জীব?

জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে সঞ্জীব বলিল—নলিনী আর ওকে রাখতে চাইলেন না, মা।

—কেন?

একটু ইতস্তত করিয়া সঞ্জীব বলিল—সে অনেক কথা মা। মোট কথা তিনি আর আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না। রমাও তো আমাদের লোক।

সঞ্জীব আবার বলিল—যতখানি বস্তু নলিনীর মধ্যে প্রত্যাশা করেছিলাম মা, তা তাঁর মধ্যে নেই। নিতান্ত সাধারণ মেয়ে নলিনী।

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মানুষের চরিত্র কাচের মত জিনিষ নয়, তাকে এক নজরে চেনা যায় না বাবা। কাজ দেখেও বিচার

করা সম্ভব নয়। কাজের আড়ালে থাকে কারণ। সেই কারণ না জেনে বিচার করতে গেলে ঠকতে হয় বাবা।

সঞ্জীব একথার কোন উত্তর দিল না। সে রমাকে বলিল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন রমা? বস তুমি।

মৃদুস্বরে রমা কহিল—হাত পা ধুয়ে আসি আমি।

সে চলিয়া গেলে সঞ্জীব বলিল—ওর বিয়ে দেবার কথা ভাবছিলাম মা। নলিনীও আমায় সেই কথাই বলছিলেন।

মা বলিলেন—হুঁ। কিন্তু এ কথাটায় কি তুই আমার সম্মতি পেতে আশা করিস সঞ্জীব?

—উচিৎ যা, তাই তোমার কাছে প্রত্যাশা করি মা।

দৃঢ়কণ্ঠে মা বলিয়া উঠিলেন—বিধবার বিয়ে আমার কাছে অধর্ম। উচিৎ অনুচিতের অনেক উপরে।

—তা হলে ওর কি ব্যবস্থা করব মা?

—যা তোমাদের খুশি। আমার মতের সঙ্গে এখানে তোমাদের মতের মিল হবে না। ওকে এখানে আনাই তোমার ভুল হয়েছে।

একটু চিন্তা করিয়া সঞ্জীব বলিল—সত্যিই কাজটা অবিবেচনার হয়ে গেছে মা। এখন উপায় এক তোমার আশ্রয়।

মা বলিয়া উঠিলেন—না সঞ্জীব, ওকে বাড়িতে আমি রাখতে পারব না। ওকে তুমি ওর বাপের ওখানে রেখে এস।

—সে যে ওর সর্বনাশ করা হবে মা।

অকস্মাৎ রুক্ষ হইয়া মা বলিলেন—দেশের লোকের সর্বনাশ দেখবার আমার কিছু কথা নেই সঞ্জীব; ও আগুনের খর্পর আমি বাড়িতে রাখতে পারব না।

সঞ্জীব এমন কথা তাহার মায়ের নিকট হইতে প্রত্যাশা করে নাই। মায়ের জন্য অন্তরে অন্তরে তাহার একটা অহঙ্কার ছিল। হোন তিনি কটুভাষিণী কিন্তু সঞ্জীবের ভাল কাজে কখনও তিনি বিদ্রোহ করেন নাই। এমন কি আপন ধর্মাচরণের প্রবল নিষ্ঠা, সুকঠোর শুচিতা

বিপন্ন হইলেও না। আজ তাহার কথায় সঞ্জীব একটু আঘাত পাইল। সে মায়ের কথার মধ্যে অবিশ্বাসের গন্ধ পাইল। সে উত্তপ্ত স্বরেই বলিল—একটা দিন অপেক্ষা কর মা। কালই ওকে নিয়ে আমি কলকাতায় যাব। কোথাও না কোথাও ওর স্থান হবেই।

মা বলিলেন—বেশ তাই যেয়ো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার স্বর এত উগ্র হল কেন?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঞ্জীব বলিল—তোমার ওপর আভিমান করবারও কি অধিকার নাই আমার, মা?

মা উত্তর দিলেন, কিন্তু পূর্বের কণ্ঠস্বরে নয়। বিচিত্র এ কণ্ঠস্বর। বর্ষার পরিপূর্ণ নদীর মত মমতায় উজ্জ্বল বেগবতী, মুমূর্ষের অকপটোক্তির মত সকাতর মর্মস্পর্শী সে স্বর। তিনি বলিলেন—সঞ্জীব, সংসারে সকল মায়ের সব চেয়ে বড় কাম্য কি জানি নে বাবা। কিন্তু তোর মায়ের কাম্য শুধু তোর চরিত্র, তোর সুনাম। সেই বস্তুতে যদি কেউ মিথ্যের কালিও মাখিয়ে দেয়, তা হলে যে মৃত্যু ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না বাবা।

দিনের উপর মৃত্যুর স্পর্শের মত রাত্রির ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। ম্লান সন্ধ্যালোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ না দেখিলেও সঞ্জীব স্পষ্ট অনুভব করিল তাহার তেজস্বিনী মায়ের চোখে জল দেখা দিয়াছে।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই বাড়ির বাহির হইতে কে ডাকিল—বাবাজী, রয়েছ নাকি বাড়িতে? ওগো বাবাজী সঞ্জীব।

একটা হ্যারিকেন হাতে লইয়া সঞ্জীব বাহিরে আসিল। দেখিল বাহিরের দাওয়ার ওপর আলোর পাশে দাঁড়াইয়া কড়ি গাঙ্গুলী। মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও মৌখিক ভদ্রতা প্রকাশ করিল সঞ্জীব।

এককড়ি গাঙ্গুলী বলিল—এলে কখন বাবা কলকাতা থেকে? শরীর ভাল আছে?

শুষ্কভাবেই সঞ্জীব বলিল—আজ বিকেলেই এসেছি। শরীরও বেশ ভালই আছে।

—বেশ, বেশ। তোমাদের ভাল হলেই আমাদের ভাল। তারপর তোমার সঙ্গে যে কথা ছিল বাবাজী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, একটা কিছু আন না বাবাজী, পেতে বসা যাক।

বাহিরের ঘর হইতে একখানা কম্বল আনিয়া সঞ্জীব অগত্যা বিছাইয়া দিল। গাঙ্গুলী তাহার উপর চাপিয়া বসিয়া বলিল—বস বাবাজী বস। উঃ শীতও আচ্ছা পড়েছে এবার। বুড়ো হাড় আমাদের কনকন করছে। তার ওপর বাতব্যাধি, কদিনই বা বাঁচব আর—হরিবোল হরিবোল।

সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল। এ-কথার উত্তরে বলিবার মত কিছু সে খুঁজিয়া পাইল না।

গাঙ্গুলী বলিল—তারপর বাবাজী, রমা আমাদের বেশ ভাল আছে তো? আহা বাবা, তোমার কৃপাতেই হতভাগিনীর একটা গতি হল।

সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ, ভালই আছে রমা। তাহার মনের মধ্যে আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এমন নির্লজ্জ পাষণ্ড যে মানুষ হইতে পারে এ ধারণা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব। কড়ি গাঙ্গুলী তাহার অপরিচিত নয়, পাষণ্ড বলিয়াই তাহাকে সে জানিত। কিন্তু তবু তাহার ধারণা ছিল কড়ি গাঙ্গুলী আর তাহার চোখে চোখ জুড়িতে পারিবে না।

গাঙ্গুলী বলিতেছিল—তাই তো বলি বাবা, আমাদের সব ছেলে-গুলোকে, শিখবি যদি তবে আমাদের সঞ্জীবকে দেখে শেখ। বিদ্যের গুণ দেখ। বর্ষার জলভরা মেঘ যেন, যেদিকে যাবে ছায়ায় জলে সব শীতল করে দিয়ে যাবে।

সঞ্জীবের মনের মধ্যে বিরক্তি ঘৃণা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়াও বাঁকা ভাবেই সে বলিয়া ফেলিল—আপনার স্নেহের কথা আমি ভাল করেই তো জানি গাঙ্গুলীকাকা।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাঁটুতে হাত দিয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—গুরুর দিব্যি, ইষ্ট দেবতার দিব্যি! মিথ্যে বলি তো মাথায় বজ্রাঘাত হবে বাবা, এ কাজ আমার নয়। ওই পাষণ্ড আমাকে ঘরে ভরে বন্দুক দেখিয়ে দলিলখানা কেড়ে নিলে আমার কাছ থেকে।

সঞ্জীবের বিভক্তির মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল।

গাঙ্গুলী আবার বলিল, যে জবাব তুমি দিয়েছ বাবাজী, বুঝেছ কি না, ওতেই কিস্তি মাৎ। ওর ঠেলা—

—বামুনকাকা!

গাঙ্গুলীর কথা অসমাপ্ত থাকিয়া গেল। সে মুখ তুলিয়া দরজার আলোকিত মধ্যস্থলে রমাকে দেখিয়া হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সবিস্ময়ে সে যেন প্রশ্নই করিল—রমা? রমা তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। লণ্ঠনের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া গাঙ্গুলী কহিল—আহা-হা-মা, চোখ জুড়োল তোকে দেখে। এমন হয়েছিস তুই, এ্যাঁ! একেই বলে সৎসঙ্গে কাশীবাস।

রমা সলজ্জভাবে বলিল—আমাদের বাড়ির সব ভাল আছে কাকা?

—আর ভাল মা! তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে তোর মা নদী গঙ্গা ভাসিয়ে দিলে। চারিদিকে খোঁজ খবর করে কোন পাত্তা পাই না। কেউ বলে মরেছে। কেউ কিছু—কেউ কিছু। একটা খবরও তো দিতে হয় বাপু। তারপর খবর পেলাম, সঞ্জীব দয়া করে তোকে কলকাতায় রেখে ডাক্তারী না কি শেখাচ্ছে।

রমা প্রশ্ন করিল—খোকা ভাল আছে?

—হ্যাঁ। দিন রাত তোর নাম করে। বলব আমি তোর বাবাকে হ্যাঁ দেখে এস গিয়ে তোমার মেয়েকে। দেখে চক্ষু জুড়িয়ে এস।

সঞ্জীব বলিল—যাও এখন ভেতরে যাও রমা।

কুণ্ঠিতভাবে রমা বলিল—যাই। কিন্তু তবু সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভিতর হইতে সঞ্জীবের মায়ের ডাক আসিল—রমা।

রমা আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না। ভিতরে চলিয়া গেল।

গাঙ্গুলী বলিল—একটা কথা বলছিলাম বাবাজী।

—বলুন।

—একটা মিটমাট করে ফেল বাবাজী। জান তো দুষ্টকে দূর হতে করি পরিহার।

সঞ্জীব বলিল—আমার শরীরটা বেশ ভাল নেই গাঙ্গুলীকাকা। আমি উঠছি। মাপ করবেন আমাকে। সে আলোটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—দাঁড়াও বাবা। হ্যারিকেন বদল হল কিনা দেখে নি, দু মাস হল কিনেছি—আমার আবার নতুন আলো।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আমারটা আরও নতুন। আজই কলকাতা থেকে এনে জ্বেলেছি।

তবুও গাঙ্গুলী আপন হ্যারিকেনটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া রাস্তায় নামিল। যাইতে যাইতে আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বাবাজী।

সঞ্জীব তখন দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ভোরবেলায় সঞ্জীবের তখনও ঘুম ভাঙে নাই। মা ডাকিলেন—সঞ্জীব, সঞ্জীব।

সঞ্জীবের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উত্তর দিল—মা।

—উঠে আয় শীগ্‌গির!

গায়ের কাপড়টা জড়াইয়া লইয়া সঞ্জীব দরজা খুলিয়া বলিল—কি মা?

—বাড়ির চারিদিকে পুলিশ।

সবিস্ময়ে সঞ্জীব বলিল—পুলিশ! পুলিশ কেন মা?

মা বলিলেন—বলতে তো পারব না বাবা। গ্রহ নক্ষত্রের কথা জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়মে গণনা করে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের ষড়যন্ত্রের কথা কোন শাস্ত্রমতেই তো জানা যায় না বাবা। দেখ তুই এগিয়ে দেখ।

বহির্দ্বার খুলিয়া দেখিল—সম্মুখেই দাঁড়াইয়া থানার সাব-ইন্সপেক্টরবাবু।

সঞ্জীবকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—নমস্কার, সঞ্জীববাবু। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। বাড়িটাও সার্চ করে দেখতে হবে।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—অপরাধটা কি শুনতে পাই না ?

সাব-ইন্সপেক্টর বলিলেন—বলতে আমারও লজ্জা হচ্ছে সঞ্জীববাবু। অপরাধ আপনার দাঁড়াচ্ছে নারীহরণ। রমণদাসের নাবালিকা কন্যা রমা দাসীকে অসদভিপ্রায়ে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছেন—। সে কি আপনার বাড়িতে আছে ?

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঞ্জীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আছে। রমা—রমা। মা রমাকে পাঠিয়ে দাও তো।

রমা বাহিরে আসিল। সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার পিতা রমণদাস তাহাকে দেখিয়া একটা কৃত্রিম ক্রন্দনে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সাব-ইন্সপেক্টর তাহাকে ধমক দিয়া কহিলেন—চুপ কর বেটা বদমাস চোর ! তারপর সঞ্জীবকে বলিলেন—তাই তো সঞ্জীববাবু, শেষ পর্যন্ত আপনার মাকেও না জড়ায়।

সঞ্জীব বলিল—অপরাধ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি সাব-ইন্সপেক্টর-বাবু। তারপর আবার বলিল—একটু অপেক্ষা করুন আমি গায়ে জামাটা দিয়ে মাকে প্রণাম করে আসি।

সাব-ইন্সপেক্টর বলিল—তাই তো সঞ্জীববাবু, আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের যে সীমা দেখতে পাচ্ছি না। এমন একটা অপরাধ—

ম্লান হাসি হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—অপরাধ কারও নয় সাব-ইন্সপেক্টরবাবু, এ আমার স্বখাত সলিল।

মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া সঞ্জীব ডাকিল—মা।

তেজস্বিনী মায়ের ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। নীরবে তিনি ছেলের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রব সংযত হইলেও রোদন বাঁধ মানিল না, দর দর ধারে দুই চোখ বাহিয়া সঞ্জীবের নত মস্তকে ঝরিয়া পড়িল।

দিন কয় পর।

সেই আয়না ঘরের মধ্যে রমাও আজ আবার দাঁড়াইয়াছিল। রমা বাবুর বাড়িতে আসিয়াছে। সঞ্জীবের গ্রেপ্তারের পর সে বাড়ি গিয়াছিল। সমস্ত ঘটনা সে বুঝিয়াছিল কিনা কে জানে কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ উদ্বেগ তাহার ছিল না। রমার মা বলিয়াছিল—খোকাবাবুকে মানুষ করবার জন্যে আবার তোকে নিতে লোক পাঠিয়েছেন বাবুরা। দেখ, যাবি তুই ?

মায়ের মুখের উপর চকিত একটি দৃষ্টি হানিয়া সে সলজ্জভাবে মুখ নত করিয়াছিল। মায়ের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিতের আভাস তাহার কাছে আজ অপ্রকাশ রহিল না।

বুকের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ঘন আবেগ গর্জনমান উতলা মেঘের মত মুখর হইয়া উঠিল। সে অনুভব করিল বাহির পর্যন্ত তাহার সে গর্জনের প্রতিধ্বনিতে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। হৃদস্পন্দন ঘনবেগে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিতেছিল।

চকিতে তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছিল সেই ঘর সেই দুয়ার। ঘরের মধ্যে চেয়ারের উপর যেন বাবু বসিয়া আছেন, টেবিলের উপর চায়ের কাপে সে যেন সলজ্জ নত মস্তকে চা ঢালিয়া দিতেছে। সে অনুভব করিল বাবুর সস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি যেন তাহার সর্ব অবয়বের আরতি করিয়া ফিরিতেছে। সলজ্জ পুলকে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল।

পট পরিবর্তিত হইয়া গেল।

তাহার কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল—খোকাবাবুর সুকুমার ছবিখানি। খোকাবাবুকে কোলে লইয়া সে যেন মৃদুস্বরে গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইতেছে। অকস্মাৎ যেন বাবু আসিয়া গেলেন। অনাবৃত মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে গিয়াও যে দিতে পারা যায় না। দুষ্ট খোকা যে কাপড় চাপিয়া ধরিতেছে। বাবুর অধরে মৃদু হাস্যরেখা! সমস্ত দেহ তাহার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সমস্ত দেহে রক্তধারা যেন উত্তাল তরঙ্গে আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

আবার পট পরিবর্তিত হইয়া গেল।

তাহার মনে হইল—সেই আয়না ঘরে বসিয়া সে যেন চুল বাঁধিতেছে। হাতের কাছে সরু-দাঁড়ার চিরুনীটা যে নাই। ঝি-কে ডাকিয়াও যে পাওয়া যায় না। ঝিটা বড় অবাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে তিরস্কার করা দরকার। এ কল্পনায় মন তাহার ভরিয়া উঠিয়াছিল।

আজ আয়না ঘরে দাঁড়াইয়া সেই সব ছবিগুলি আবার তাহার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অধরে বিকশিত হইয়া উঠিল হাসির কুঁড়ি। উপরে দেওয়ালের গায়ে সেই ছবিগুলি। আজ রমা ভাল করিয়া ছবিগুলি দেখিতে লাগিল। পুরুষের আলিঙ্গনে আবদ্ধ মেয়েটির মুখে কি বিচিত্র হাসি। রমার মুখ হইয়া উঠিল গাঢ় রক্তিম।

এপাশে আর একখানি ছবি। অর্দ্ধনগ্ন একটি মেয়ে। তাহার এলানো চুলের কয়টা গোছা নগ্ন বুকের উপর ঘুমন্ত কালো সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িয়া আছে। বুকের কাপড় সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে আপন শুভ্র-সুন্দর বক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। ছবিখানি দেখিতে রমার বিমূঢ় মনে কি ইচ্ছা হইল কে জানে। সেও আপনার বক্ষবাস মুক্ত করিয়া নগ্ন বুকের দিকে চাহিয়া দেখিল। দর্পণে দর্পণে সেই প্রতিবিম্ব! রমা মুখ তুলিয়া দর্পণের দিকে চাহিতেই তাহার অধরে ফুটিয়া উঠিল সলজ্জ মৃদু হাসি।

অকস্মাৎ দরজা খোলার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে দশ বারোটি পুরুষ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

রমা চিনিল—চারিদিকের দর্পণে বাবুর প্রতিবিম্ব। সলজ্জ ত্রস্তভাবে সে বক্ষাবরণ সুবিন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই সে পুরুষের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে লীন হইয়া গেল।

দর্পণে দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। রমা এক সময় সেই প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার কমনীয় হাত দুখানি কখন পুরুষটির কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। লজ্জায় সে চোখ বুজিল।

নলিনী বজ্রাহতার মত স্তম্ভিত নির্বাক হইয়া গেল, সঞ্জীবের প্রতি বিচারকের দণ্ডাদেশ শুনিয়া। পাঁচ বৎসরের কঠোর কারাবাসের আদেশ। সঞ্জীব যেমন স্থির গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। সঞ্জীবের তরফের উকিল নলিনীকে পত্র দিয়া আনাইয়াছিলেন। সঞ্জীবের নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে সকলের চেয়ে বড় সাক্ষী সেই। লাঞ্ছনার তাহার সীমা রহিল না। আদালতের কঠোর বাস্তবতা সম্বন্ধে জ্ঞান তাহার ছিল না। কাজেই এতখানি সে প্রত্যাশা করে নাই।

বিপক্ষ হইতে সরকারী উকিল তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি কি মহেন্দ্রবাবুর উপপত্নী ছিলে? নলিনীর মুখ বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল। মাথা যেন তাহার আপনি নত হইয়া মাটির বুকের মধ্যে মিশিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। মনে হইল পৃথিবীর বায়ু যেন কে হরণ করিয়া লইয়াছে। উকিল ধমক দিলেন—চুপ করে থাকলে চলবে না, উত্তর দাও।

আপনাকে সংযত করিয়া নলিনী দৃপ্তভাবে মাথা তুলিয়া কি যেন বলিতে গেল। কিন্তু বাধা দিল সঞ্জীব। সে কোন কিছু উচ্চারণ করিবার পূর্বেই সঞ্জীব বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল—মহামান্য বিচারকের কাছে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হইয়াছিল সে রমার এজাহার শুনিয়া। সেই রমা—সুদীর্ঘ একটা মিথ্যা ইতিহাস সুচারুভাবে গুছাইয়া গুছাইয়া তোতা পাখির মত আওড়াইয়া গেল। এক চুল এদিক ওদিক করিল না। চকিতা হরিণীর মত সে এক একবার সঞ্জীবের দিকে চাহিতে লাগিল। আর এক একবার চাহিতেছিল সে, যেদিকে মহেন্দ্রবাবু বসিয়াছিলেন সেইদিকে।

রায়ে বিচারক রমার সম্বন্ধে মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, আসামীর মত দৃঢ় চরিত্রের শিক্ষিত যুবককে এই জঘন্য

অপরাধে অপরাধী বিশ্বাস করা যেমন কঠিন, বাদিনী রমার মত একান্ত সরলা মেয়েটির বর্ণিত সকরুণ ইতিহাস অবিশ্বাস করাও তেমনি কঠিন।

এমনি করিয়া বিচারের অভিনয় শেষ হইয়া গেল।

নলিনী নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া বিচারালয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। চেতনা হইল তাহার সঞ্জীবের ডাকে।

ডক হইতে বাহির হইয়া সঞ্জীব ডাকিল—মিস গাঙ্গুলী।

নলিনীর চোখের জল আর বাঁধ মানিল না।

সঞ্জীব বলিল—যেটুকু অসম্মান আপনার হয়ে গেল তার ওপর আমার হাত ছিল না। আমায় মাফ করবেন।

নলিনী কোন কথা কহিল না। কহিল না নয়, কহিতে পারিল না। একটা শোকার্ত আবেগে অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

সঞ্জীব সেটুকু বুঝিল। সান্ত্বনা দিয়াই সে বলিল—হাসিমুখে উৎসাহ দিয়ে বিদায় দিন মিস গাঙ্গুলী। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পাথেয় চাই আমার। আপনাদের উৎসাহ—মায়ের আশীর্বাদ আমার সেই পাথেয়।

বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া নলিনী এতক্ষণে বলিল—এ কি করলেন আপনি? আমার লাঞ্ছনা নিবারণ করতে মিথ্যা দোষ আপনি স্বীকার করে নিলেন?

সঞ্জীব বলিল—দোষ স্বীকার না করলেও এ জাল থেকে উদ্ধারের আমার উপায় ছিল না। বড় সুকৌশলে জাল রচনা করেছিলেন মহেন্দ্রবাবু।

একটু নীরব থাকিয়া নলিনী বলিল—কিন্তু এরই নাম কি বিচার?

—ভুলকে এড়াবার পথ যে মানুষের নেই নলিনী দেবী। বিচারকও যে মানুষ। আর তাঁরই বা দোষ কি বলুন? মানুষ যতদিন মিথ্যা বলতে না ভুলবে, বিচারককেও ততদিন ভুল করতে হবে। তবু মানুষের মহত্ত্ব যে সে বিচার করবার চেষ্টা করে।

কনেস্টবল সঞ্জীবকে বলিল—চলিয়ে, চলিয়ে।

সঞ্জীব হাস্যমুখে বলিল—তাহলে নমস্কার মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী বলিয়া উঠিল—মাকে কিছু বলবেন না?

সঞ্জীব চলিবার জন্য বিপরীত মুখে ঘুরিয়াছিল, সে আবার ফিরিল, ঠোঁট দুইটা এবার কাঁপিয়া উঠিল। চোখের বুকে বিন্দুর মত ছোট হইয়া আকাশের সূর্য তখন প্রতিবিম্বে ধরা দিয়াছে।

একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—না, কিছু বলব না। জেলের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আবার সে দাঁড়াইল।

নলিনী তাহার গমনপথের দিকেই চাহিয়াছিল, চোখে চোখ মিলিতেই সঞ্জীব বলিল—বলবেন, সঞ্জীব আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছে।

সঞ্জীবের বার্তা সে বহন করিবার ভার গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু যাইবার মুখে পথে পা দিয়া সে অনুভব করিল—কি ভীষণ সে গুরুভার। তাহার বুক যে সে গুরুভারের পেষণে ভাঙিয়া যাইতেছে! মায়ের সম্মুখে এই বার্তা লইয়া দাঁড়াইবার কল্পনা করিতেও সে শিহরিয়া উঠিল। সে তো জানে, কত আশা কত কল্পনা, কত অহঙ্কার এই সন্তানটিকে লইয়া সেই তেজস্বিনী প্রৌঢ়ার। আবার তেমনি সুগভীর মমতায় অন্ধ তিনি। আজও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানটিকে শিশুর মত নিজের উপদেশে চালিত করার প্রবৃত্তি তাঁহার যায় নাই। না হইলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না, শঙ্কা যায় না। নলিনীর ইচ্ছা হইল একখানা পত্রে সমস্ত জানাইয়া তাহার কর্তব্য শেষ করে। কিন্তু তাও সে পারিল না। দ্বিধার মধ্যেই ট্রেনে চলিয়াছিল। অবশেষে পরের ট্রেনে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় সে সঞ্জীবের গ্রামে আসিল। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্য দিয়া একান্ত একাকী সে সঞ্জীবের বাড়ির দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতেছিল কেমন করিয়া সে বাড়ি ঢুকিবে! বারবার তাহার মনে হইল, না আসিলেই সে ভাল করিত।

বাড়িখানা নিস্তব্ধ—যেন থম্‌থম্ করিতেছে। ম্লান সন্ধ্যালোক

গৃহবেষ্টনীর মধ্যে গাঢ় অন্ধকারের রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নলিনী ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাঝ আঙিনায় দাঁড়াইল।

কোথাও কোন সাড়া নাই। জনহীন নীরবতার মধ্যে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক নিস্তরঙ্গ প্রবাহের মত একটানা তীক্ষ্ণস্বরে অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। নলিনী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই। শুধু মাটির বুক হইতে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঘনাইয়া ঘনাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছে—অবরুদ্ধ প্রগাঢ় বেদনার মত।

সহসা তাহার মনে হইল ও-পাশের মুক্তদ্বার ঘরখানার মেঝের উপর কে যেন পড়িয়া আছে। বুকখানা তাহার চমকিয়া উঠিল।

শঙ্কিত পদে অগ্রসর হইয়া সে দেখিল সত্যই তিনি মা। অনুচ্ছ্বসিত গভীর বেদনায় স্থিরভাবে মাটির বুকে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। স্পর্শ করিতে তাহার সাহস হইল না। সে সকরুণ স্বরে ডাকিল—মা।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা মুখ তুলিতে তুলিতে বলিলেন —কে?

উত্তর নলিনীর কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। সে নীরবে আপনার উচ্ছ্বাস দমিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টায় নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মা মুখ তুলিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—নলিনী? এস মা বস। তারপর চারিদিকের পানে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন —উঃ সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল যে। এখনও সন্ধ্যে জ্বালা হয় নি! তুমি একটু বস মা নলিনী। আমি সন্ধ্যেটা জ্বেলে ইষ্ট স্মরণ করে নিই।

নলিনী বিমূঢ়ার মত বসিয়া রহিল। সে শুধু ভাবিতেছিল মাকে সে সংবাদ দিবে কেমন করিয়া?

সমস্ত কর্তব্য শেষ করিয়া আলো হাতে মা আসিয়া বলিলেন—মুখে হাতে জল দাও মা নলিনী। ট্রেনে এসেছ, কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেল। আমি উনানটা ধরিয়ে ফেলি, তুমি চায়ের জল একটু চড়িয়ে দাও।

নলিনী মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিল—না মা, চা আমি খাব না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন—আজ দু মাস চায়ের

সরঞ্জাম নামানো হয় নি আমার। আবার পাঁচ বছর পার না হলে আর নামানো হবে না। জান কি মা নলিনী, জেলে চা দেয় কি না?

নলিনী নীরব হইয়া রহিল।

প্রদীপের আলোয় মা দেখিলেন নলিনীর চোখের তলের মৃত্তিকা, বিন্দু বিন্দু করিয়া ভিজিয়া উঠিতেছে। তিনি বলিলেন—কাঁদছ মা নলিনী? আমিও অনেক চেষ্টা করলাম কাঁদবার কিন্তু কান্না এল না। একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঊর্দ্ধমুখে শীত শেষের গভীর নীল আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি নীরব হইলেন।

আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে শুক্রগ্রহ দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহার প্রভায় রাত্রির অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছিল। সেই প্রায়ান্ধকার আলোকের মধ্যেও সে অনুভব করিল মায়ের প্রশান্ত মুখখানি বেদনার্ত গভীর উদাসীনতায় সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে, কৃষ্ণরাত্রির সমুদ্রের মত। আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি বলিলেন—হারাণ এসে আমায় খবর দিলে। আমি শুকনো চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম শুধু। মুখে কথা এল না, কান্না এল না। সে বোধ হয় আশ্চর্য হয়েই চলে গেল। তারপর এই এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে সঞ্জীবের বাল্যকাল থেকে এ পর্যন্ত কত কথাই একে একে মনে করলাম। বুকের মধ্যে কান্না তোলপাড় করছে কিন্তু বাইরে বেরুবার পথ যেন পাচ্ছে না।

নলিনী ডাকিল—মা। তাহার শঙ্কা হইল মায়ের সংজ্ঞা বোধ হয় লোপ পাইতেছে।

মা বলিলেন—সঞ্জীব আমায় কিছু বলে যায় নি? হারাণ বলছিল, যাবার সময় তোমার সঙ্গেই শুধু তার কথা হয়েছিল।

একান্ত অপরাধীর মত নলিনী বলিল—বলেছেন।

মা ধীরভাবে কথাটি শুনিবার অপেক্ষায় রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে নলিনী বলিল—বলেছেন, মা যেন আমার ফেরবার অপেক্ষায় বেঁচে থাকেন।

মায়ের চোখ দিয়া অকস্মাৎ অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেল। বহুক্ষণ

কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া তিনি বলিলেন—তার দোষ নাই। সে ভেবেছে এ আঘাত আমি সইতে না পেরে আত্মহত্যা করব। এ কথা যে কতবার বলেছি আমি তাকে। যেদিন সে গ্রেপ্তার হয় তার আগের দিন রাত্রেও একথা তাকে আমি বলেছিলাম, মা। বলেছিলাম, সঞ্জীব, সংসারে আমার সবচেয়ে বড় কাম্য তোর চরিত্রের সুনাম। সেই বস্তুতে যদি কেউ মিথ্যের কালিও মাখিয়ে দেয়, তবে যে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর পথ থাকবে না বাবা। নীরব হইয়া আবার তিনি কাঁদিলেন। তারপর বলিলেন—সেই মিথ্যের কালিই সেই বস্তুতে মাখিয়ে দিলে, তবুও আশ্চর্য এই নলিনী, কই আমি তো মরবার কল্পনাও করতে পারছি না।

নলিনী বলিল—তিনি আপনাকে বেঁচে থাকতে বলে গেছেন মা।

মা বলিলেন—ভয় নাই মা, সে কল্পনা আমি করি নি। আঘাতের ভয়ে ধর্মকে লঙ্ঘন করতে আমি পারব না। আত্মহত্যা মহাপাপ। আর তার যে কথা সেও আমি হেলা করব না মা। বেঁচে থাকবার চেষ্টা করব। তার দুঃখে দুঃখ আমি পেয়েছি, কিন্তু সে আমায় দুঃখ দেয়নি, একথা তাকে বলবার জন্য আমি চেষ্টা করব।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া মা সংসারের বন্দোবস্তে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করিলেন। হারাণ বাগ্দীকে ডাকিয়া নানা বন্দোবস্তের কথা হইতে লাগিল। সঞ্জীবের পাশের গ্রামবাসী এক বন্ধুকে ডাকিয়া কি সব পরামর্শ হইল। নলিনী আশ্চর্য হইয়া গেল। এ সংসারে শোভন বলিয়া একটা কথা আছে। তাহাকে নলিনী ভুল বুঝিল না কিন্তু এই সময়ে সংসারের প্রতি এতটা গভীর অনুরাগ তাহার যেন কেমন মনে হইল।

দিন দুই পরে সে বলিল—মা আমি আজ যাব মনে করছি।

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মা বলিলেন—কাজের ক্ষতি যদি হয় তোমার, তবে মা বারণ করব না। কিন্তু যদি সে ভয় না থাকে তাহলে কি আর পাঁচটা দিন থেকে যেতে পার না?

যতই অসন্তোষ মনে থাক তাহার, অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। মৃদুস্বরে সে বলিল—তাই হবে।

মা বলিলেন—একা এই ঘরে থাকতে হবে ভাবতেও আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে মা। মনে হয় ঘর যেন আমায় গ্রাস করে ফেলবে। ভাবছি কোথাও চলে যাব।

নলিনী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কোথায় যাবেন মা?

—কাশী।

নলিনী নীরব হইয়া রহিল। এ কয়দিনের অবিচারের জন্য অন্তরে অন্তরে অপরাধ বোধ না করিয়া সে পারিল না।

মা বলিলেন—অবলম্বন ভিন্ন তো সংসারে বাস করা যায় না মা? একমাত্র অবলম্বন যখন বিশ্বনাথ আমাকে কোল ছাড়া করে দিলেন তখন তাঁকে ছাড়া আর কাকে অবলম্বন করব বল?

গাঢ়স্বরে নলিনী বলিল—দয়া করে আমায় সঙ্গে নেবেন মা?

মা মুখ তুলিয়া নলিনীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—যাবে? তারপর আবার ধীরে ধীরে বলিলেন—আচ্ছা চল।

রমার জীবনে—তারপর?

তারপর উন্মত্ত ব্যভিচারের একটা সুদীর্ঘ বিচিত্র কাহিনী। রমা উন্মত্ত ভাবে বাবুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। যৌবনের আকস্মিক জাগরণে সে চাহিয়াছিল আত্মসম্মানের জন্য পুরুষের বলিষ্ঠ বাহুবেষ্টনী, সংসার, সন্তান, জীবজগতে কৈশোর-অতিক্রান্ত নারীর কল্পনার বস্তু যাহা কিছু—সব। প্রেম সে বোঝে নাই। কাহাকেও পাইতে কামনা সে করে নাই। সে কামনা করিবার মত আকাঙ্খার বলিষ্ঠতা তাহার ছিল না। সংসারের ঘটনার প্রবাহের মুখে যেখানে আসিয়া ঠেকিল, সেইটুকুকেই সে অবলম্বন করিল। সঞ্জীবের ছায়া তাহার অন্তরে পড়িতে পারে নাই। প্রখর সূর্যের কিরণদাহে শ্রান্ত ক্লান্তের মত সসম্ভ্রমে ছায়ার আড়ালে আড়ালেই সে থাকিত। কোনদিন দীপ্ত সূর্যের

দিকে ঊর্দ্ধমুখ হইতে তাহার সাহস হয় নাই। মহেন্দ্রবাবুকেও যে সে কামনা করিয়াছিল তাও নয়। কর্মচক্রে যেদিন তাহাকে তাহার বাপ মা শতমুখে তাহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিলেন, সেদিন সে কিশোরী নববধূটির মতই আশা আকাঙ্খা লইয়া অচেনা অজানা একটি পুরুষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল। বিবেচনা করে বিচার করে নাই, করিয়াছিল শুধু বাপ মায়ের কথার প্রতিধ্বনি, আপন ভাগ্যের প্রশংসা। এখানকার আদর লাঞ্ছনা সবই একান্ত আপনার বলিয়া সে গ্রহণ করিল। তাই মহেন্দ্রবাবু যখন একটি সুরচিত মিথ্যা কাহিনী তাহাকে পাখির মত পড়াইয়া গেলেন তখন সে সত্যের দিকে তাকাইতে সাহস করে নাই। সভয়ে ক্লিষ্ট অন্তরেও সে পাখির মত সে কাহিনীটি আয়ত্ত করিল, আপত্তি করিতে পারিল না। শুধু একবার অভ্যাসমত ভীরু সরল চোখের চকিত দৃষ্টি তুলিল কিন্তু পর মুহূর্তেই আপনা হইতেই সে দৃষ্টি নত হইয়া নিবদ্ধ হইল ধরিত্রীর বুকে।

অপরপক্ষে মহেন্দ্রবাবু কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তব রাজ্যের সজাগ মানুষ। জীবনে আয়োজন করেন তিনি প্রয়োজনের জন্য। প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আয়োজন তাহার চক্ষে আবর্জনার সামিল। হয়তো সংসারের অধিকাংশ মানুষেরই তাই; কিন্তু এদিকে তাঁহার কঠোরতা যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি সবল। বৎসর তিনেক পর সেদিন তিনি কড়ি গাঙ্গুলীর সহিত কথা কহিতেছিলেন—কোন কষ্ট ওর হবে বলে আমি মনে করি নে গাঙ্গুলী। ঘর একখানা কিনে দিয়েছি। তার ওপর কিছু টাকাকড়ি হলেই দিন ওর বেশ চলে যাবে।

কথা হইতেছিল রমাকে বিদায় করিবার। এই অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই রমার প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়াছে। সে আজ রোগজীর্ণ।

গাঙ্গুলী বলিল—সেটা কি ঠিক হবে হুজুর? ও কি আর সমাজে ঠাঁই পাবে।

বাবু হাসিলেন। বলিলেন—শাসন করে দেব সমাজকে।

গাঙ্গুলী বলিল—কিন্তু ধর্ম বলেও তো…

বাবু সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। গাঙ্গুলীর কথা আর শেষ হইল না। বাবু হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—তুমিও ধার্মিক হয়ে উঠলে গাঙ্গুলী। দোহাই তোমার, ভুল আইনের ভয় যত পার দেখাও, কিন্তু ধর্মের কাহিনী তুমি বল না। তা হলে হয় তো বয়স আর আমার বাড়বে না। এই বয়সেই অমর হয়ে থাকতে হবে।

গাঙ্গুলীর মুখ দিয়া আর কথা ফুটিল না।

বাবু আবার বলিলেন—ধর্মাধর্মসমাযুক্ত লোভ মোহসমাবৃত মানুষ আমরা গাঙ্গুলী। আমাদের এই ধর্ম। কায়মনোবাক্যে তাই পালন করি। এর বেশী কিছু ধর্ম বলে মানি না। পালন করতে প্রবৃত্তিও হয় না।

কথাগুলা গাঙ্গুলীর মাথায় হয় তো ঢুকিল না। সে নির্বোধের মত মাথা চুলকাইতে লাগিল।

মহেন্দ্রবাবু অকস্মাৎ উগ্র হইয়া উঠিলেন। উত্তেজনাভরেই তিনি বলিয়া গেলেন—বলতে পার গাঙ্গুলী, একটা মানুষ বেশী জীব হত্যা করে, কী একটা বাঘ বেশী জীব হত্যা করে! অবলীলাক্রমে অলস অবসরে টিপে টিপে পিঁপড়ে পতঙ্গ মেরে থাকে। আমি তো মেরে থাকি। পশুর ব্যভিচারের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, নিয়ম আছে, কিন্তু মানুষের ব্যভিচারের সময় নাই, নিয়ম নাই। হিংস্র পশু খায় শুধু রক্ত মাংস, কিন্তু উদ্ভিদ পশু জলচর খেচর কীট পতঙ্গ মানুষের অখাদ্য কিছু নয়। ধর্মের দোহাই আমাকে দিয়ো না গাঙ্গুলী। এই-গুলোই মানুষের ধর্ম—এই ধরেই মানুষ বেঁচে আছে আসলে।

গাঙ্গুলী একান্ত নির্বোধের মত বলিল—আজ্ঞে তা তো বটেই, তা তো বটেই।

বাবু হাসিয়া বলিলেন—কথাগুলো তোমার হয়তো কানে গেল না। তা না যাক ক্ষতি বিশেষ নাই। থাক ও কথা, তোমায় যা বললাম তাই ঠিক। রমার জবাব হয়ে গেল। ওকে তুমি নিয়ে যাও। যদি কখনও কিছু দরকার হয় তুমি এসে জানিয়ো বা জানাতে বলো।

গাঙ্গুলী বলিল—আপনার বাড়িতে তো দশটা বিশটা দাসী বাঁদী রয়েছে। ও যদি এইখানেই—

দৃষ্টিটা একটু তুলিয়া বাবু বলিলেন—তোমার এত সঙ্কোচ হচ্ছে কেন বলত ?

গাঙ্গুলী কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বোধ করি সেই চিন্তাই করিল। অবশেষে বলিল—কেমন যেন লজ্জা হচ্ছে আমার বাবু।

খানিকটা ব্যঙ্গহাস্যে বাবু হাসিলেন। তারপর গম্ভীর হইয়াই বলিলেন—না, তা হয় না এককড়ি। পুরাতন কাপড় বাক্সে তুলে রেখে পরিত্যাগ করা আমি পছন্দ করি নে। তুমি ওকে ডেকে বলে দাও। ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও বরং।

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—আমাকে মাপ করুন হুজুর।

বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

গাঙ্গুলী মিনতি ভরে বলিল—হুজুর।

মহেন্দ্রবাবু অনুরোধের সুরে বলিলেন—তোমাকেই বলতে হবে গাঙ্গুলী। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

একা নির্জনতার অবকাশ পাইয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—পাষণ্ড। বেটা মহা পাষণ্ড রে। কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। ক্ষেত্র এবং কাল সম্বন্ধে চেতনা তাহার মুহূর্তে ফিরিয়া আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে দরজাটা অর্ধোন্মুক্ত করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল। মনের আক্ষেপ মিটাইয়া সকল কথা বলা তাহার হয় নাই, মৃদুস্বরে সে আবার আরম্ভ করিল—বলে, পাপ নাকি বাপকে ছাড়ে না। তা একি পাপের কর্তাবাবা না কিরে বাপু। বিন্ধ্যগিরির মত বেটা বেড়েই চলেছে।

তারপর এদিকের দরজাটা ঠেলিয়া সে ডাকিল—কানাই! কানাই।

ভিতর হইতে সাড়া আসিল—যাই।

গাঙ্গুলী আবার বলিয়া উঠিল—আর এ বেটাও কি জুটেছে রে বাবা। ধম্মরাজের চর বৈক্ষদত্যি! পেভুভক্ত বটে বাবা।

কানাই আসিয়া বলিল—রমাকে ডেকে দিতে হবে নাকি ?

—হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। তুই কাজটা সেরে দিলেই তো পারতিস। রমাকে বলে দিগে, ওর জবাব হয়ে গেছে এ বাড়ি থেকে। কি আছে-টাছে গুছিয়ে নিয়ে আজই যেতে হবে আমার সঙ্গে। বুঝলি।

কানাই বলিল—যা বলবেন আপনিই বলুন। বাবু তো আপনাকেই বলতে বলে গেলেন। আমি ডেকে দিচ্ছি। সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না। দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর রমা আসিয়া প্রবেশ করিল। সত্যই রমা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। সে লাবণ্য শুকাইয়া গিয়াছে। মাথায় সে ঘন কেশ-শোভা নাই। শীর্ণ মুখের মধ্যে এখনও জাগিয়া আছে সেই হরিণীর মত সরল ভীরু দুটি চোখ ও তাহার চাহনি।

রমা কহিল—আমায় ডাকছিলে বামুনকাকা ?

গাঙ্গুলী শুধু বলিল—হুঁ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রমা বলিল—খোকার দুধ চড়িয়ে এসেছি আমি, বামুনকাকা।

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—সে আর নামাতে হবে না তোকে। তোর জবাব হয়ে গেল।

রমা একদৃষ্টে গাঙ্গুলীর দিকে চাহিয়া রহিল।

গাঙ্গুলী মাথা নত করিল। নত শিরেই সে বলিল—বাবু বলতে বলে গেলেন আমাকে। বুঝলি ? চকিতের মত দৃষ্টি তুলিয়া গাঙ্গুলী দেখিল রমা এখনও তেমনি ভাবে চাহিয়া আছে। সে আবার বলিল —বুঝলি ?

আবার গাঙ্গুলী চাহিয়া দেখিল রমা এখনও তেমনি দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া আছে। তাহার আর সহ্য হইল না। সে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—ড্যাব ড্যাব করে গরুর মত চেয়ে আছে দেখ। আমি কি করব তা ? চোখ নামা রে বাপু, চোখ নামা। বলি যা বললাম শুনলি তো ? আজই আমার সঙ্গে যেতে হবে। এখানে আর থাকা হবে না।

এতক্ষণে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমা প্রশ্ন করিল—আমার জবাব হয়ে গেল !

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমার সঙ্গেই যেতে হবে তোকে।

—চল।

গাঙ্গুলী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ভাল বিপদ রে বাবা। চল না—চল। একেবারে যেতে হবে। কি কি আছে তোর ভাল করে গুছিয়ে টুছিয়ে নে, বুঝলি।

রমা বলিল—কিছু তো নিয়ে আসি নি আমি।

আরও দের বৎসর পর।

অরুণোদয়ের পরই বন্দীশালার দুয়ার উন্মুক্ত হইল। জীবনের নবপ্রভাতে সেদিনের কারামুক্ত কয়জন বন্দীর সহিত বাহির হইয়া আসিল সঞ্জীব, শীর্ণ দেহ, বিশৃঙ্খল দীর্ঘ রুক্ষ চুল, মুখের নিম্নাংশ দাড়ি গোঁফে সমাচ্ছন্ন। সুন্দর রঙ পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে। যেন মরিচাধরা তীক্ষ্ণধার দীর্ঘফলা বিগতগৌরব তরবারী একখানি।

মুক্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া সে একবার চারিদিকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি বুলাইয়া কহিল—আঃ।

চারিদিকে দেখিতে দেখিতে সহসা সে বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল—মিস গাঙ্গুলী।

দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ির নিকট আসিয়া ডাকিল—মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী গাড়িখানার পাশে দাঁড়াইয়া তাহারই প্রত্যাশায় এদিক ওদিক চাহিতেছিল। কণ্ঠস্বরে মুখ ফিরাইয়া নলিনী যেন বেদনার্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে সকরুণ স্বরে শুধু বলিল—আপনি ? সে যেন বিশ্বাস করতে পারিতেছিল না।

ম্লান হাসি হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ, আমি। আপনি এমন হয়ে

গেছেন ? উঃ। যে শালার পরিশ্রম। কথাটা বলিয়াই সে যেন চকিত হইয়া উঠিল। বলিল—মাফ করবেন মিস গাঙ্গুলী। আজ সাড়ে চার বছর বাস করেছি জঘন্য ইতরমির মধ্যে। ভেতরে এতটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ছোঁয়াচ বাঁচাতে পারি নি, সে রোগের বীজাণু আমার মধ্যেও প্রবেশ করেছে।

নলিনী বলিল—ও সব সাময়িক সঞ্জীববাবু।

বাধা দিয়া সঞ্জীব বলিল—আমার তা মনে হয় না। বাইরে যেমন দেখছেন, সে মানুষের কঙ্কাল আমি, ভেতরেও ঠিক তাই। জীবনের যা কিছু সঞ্চয় সমস্ত নিঃশেষে অপব্যয় করে রিক্ত হয়ে ফিরে এসেছি। চেতনা আছে, চিত্ত নাই। বুকের মধ্যে রাশি রাশি বেদনা যেন রয়েছে কিন্তু বোধশক্তি নাই। অনুভব করতে পারছি নে। আপনার সঙ্গে কথা কইছি, আমার ভয় হচ্ছে, সমস্ত চেতনাকে জাগ্রত করে সংযত হয়ে কথা ভেবে বলতে হচ্ছে।

নলিনী অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তবুও সে বলিল—আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন সঞ্জীববাবু। স্থির হোন আপনি।

সঞ্জীব জর্জর ব্যক্তির মত বলিয়া উঠিল—উত্তেজনা যে দুর্বলেরই ব্যাধি। মুক্ত স্বাধীন পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আমার দেহ মন কেঁপে কেঁপে উঠছে শুধু।

ক্ষণিক নীরবতার পর সে বলিয়া উঠিল—আজ আমার সব চেয়ে বড় আশ্বাস কি জানেন ? শুনলে, ঘৃণা করবেন আমাকে। সব চেয়ে বড় আশ্বাস মা আমার বেঁচে নেই। এই মূর্তি নিয়ে তাঁর সামনে আমার দাঁড়াতে হবে না।

নলিনী শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সঞ্জীব বলিল—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ?

নলিনী এতক্ষণে বলিল—আপনাকেই নিতে এসেছি কমরেড।

—কমরেড। সঞ্জীব একটু হাসিল।

নলিনী বলিল—গাড়িতে উঠে বসুন।

—গাড়িতে উঠতে হবে? ভাল। সঞ্জীব গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

পিছনে পিছনে নলিনী গাড়িতে উঠিয়া কোচম্যানকে বলিল—হোটেলে নিয়ে চল।

সঞ্জীব বলিল—আপনার কাছে ঋণের আমার শেষ নাই। আপনার নিয়মিত পত্রেই শেষের দিকটায় সান্ত্বনা পেয়েছি, আশ্বাস পেয়েছি। নইলে মায়ের সংবাদ না পেলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। আপনি তো বরাবর মায়ের কাছে ছিলেন। মা সে কথা আমায় জানিয়েছিলেন।

মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—আমার সৌভাগ্য সঞ্জীববাবু তিনি আমায় সঙ্গে নিয়েছিলেন।

সঞ্জীব বলিল—আপনাকে ধন্যবাদ দেব না। কৃতজ্ঞতার ঋণ ধন্যবাদে শোধ হয় না। কিন্তু কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে। মিথ্যে বলবেন না দয়া করে। মা কি আমার খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন?

নলিনীর চক্ষু সজীব হইয়া উঠিল। রুদ্ধস্বরে সে কহিল—এই কথা বলবার ভার মা আমায় দিয়ে গেছেন। তাঁর সমস্ত ভাণ্ডার আমার কাছে গচ্ছিত আছে।

অসহিষ্ণু ভাবে সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—তাঁর মৃত্যুর কথা বলুন আগে। কত কষ্ট—

বাধা দিয়া নলিনী বলিল—সত্যিই আপনার অন্তরের বহু বিকৃতি ঘটেছে সঞ্জীববাবু। আপনার মাকেও আপনি স্মরণ করতে পারছেন না। কষ্ট কি তাঁকে স্পর্শ করতে পারত সঞ্জীববাবু? যেদিন আপনার কথাগুলো বয়ে নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে, তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন আকাশের দিকে চেয়ে। সেদিন বুঝতে পারি নি কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, তাঁর বক্তব্য আমার সঙ্গে ছিল না। ছিল উপরের সঙ্গে। তারপরদিন থেকেই কাশী যাবার উদ্যোগ আরম্ভ করলেন। বললেন—নলিনী, নিরবলম্বন হয়ে তো মানুষ থাকতে পারে না মা। আমি বিশ্বনাথকে অবলম্বন করতে কাশী যাব। আমার বহু ভাগ্য, আমায়—দয়া করে তিনি আমায় সঙ্গে নিয়েছিলেন। আপনি দেখেন নি, ভগবানে

আমার বিশ্বাস নাই, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, কি গভীর কি বিপুল সে নিষ্ঠা।

শুনিতে শুনিতে দরদর ধারে সঞ্জীবের চোখ দিয়া অশ্রুর প্রবাহ বহিয়া গেল। নলিনী নীরব হইলে বলিল—আমার কথা, আমার কথা কি বলতেন মা, আমায় বলুন।

নলিনী বলিল—আপনার কথা মানুষের কাছে কোনদিন বলতেন না তিনি। আপনার কথা তিনি বলতেন তাঁর বিশ্বনাথের সঙ্গে। তবে আপনাকে বলতে বলে গেছেন তিনি—উদ্গত আবেগে কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সঞ্জীব ব্যগ্রভাবে বলিল—বলুন বলুন, থামলেন কেন?

ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—মৃত্যুর পূর্বদিন আমায় বললেন, কয়েকটা কথা বলে যাই, সঞ্জীবকে বলো মা তুমি। তোমায় ভার দিয়ে যাচ্ছি। বলো—তার মা হয়ে কোনদিন অনুশোচনা করতে হয় নি আমাকে। সে যে দুঃখ ক্লেশ পেল তারই জন্য দুঃখ আমার। নইলে সে আমায় দুঃখ কোনদিন দেয় নি।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সঞ্জীব বহুক্ষণ কাঁদিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—তাঁর সৎকার?

নলিনী বলিল—তাঁর নির্দেশ মতই করিয়েছি। তিনি বলে গিয়েছিলেন —নলিনী, মনিকর্ণিকা ঘাটে তুমি দাঁড়িয়ে থেকে শ্মশান চণ্ডাল দিয়ে—

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—চণ্ডাল!

—হ্যাঁ চণ্ডাল। আমিও সে প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে। তিনি বললেন—চণ্ডাল বলে ঘৃণা করো না। চণ্ডালের মধ্যে থাকেন আমার বিশ্বনাথ। সঞ্জীব আমার ছোট জাতকে অস্পৃশ্য বোধ করতে নিষেধ করত। জীবন থাকতে তো সংস্কার ত্যাগ করতে পারলাম না। মরে সেই অনুরোধ রাখব। এই নিন তাঁর চিতাভস্ম।

একটি সুদৃশ্য কৌটা হইতে ভস্ম লইয়া সঞ্জীবের ললাটে তিলক পরাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি আসিয়া হোটেলে থামিল।

অপরাহ্নে ট্রেনে চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়া সঞ্জীব ও নলিনী দেশে ফিরিতেছিল। ক্ষৌরকর্মের পর সুপরিচ্ছন্ন শুভ্র পোশাকে কৃশ সঞ্জীবকে দেখিয়া নলিনী এক সময়ে বলিল—আপনাকে কেমন বোধ হচ্ছে জানেন?

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কেমন?

—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত।

ম্লানভাবে সঞ্জীব হাসিল। বলিল—বহ্নি এখনও আছে, বলছেন নলিনী দেবী?

নলিনী বলিল—নিশ্চয়। বহ্নির বিনাশ নাই সঞ্জীববাবু।

অন্যমনস্কভাবে সঞ্জীব বলিল—হবে।

দু পাশের প্রান্তর বহিয়া হু হু শব্দে ট্রেনখানা চলিয়াছে। জানালার উপর হাত দুটি ভাঁজিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া সঞ্জীব কি যেন ভাবিতেছিল। নলিনী বাহিরে পিছনপানে ধাবমান পারিপার্শ্বিকের দিকে একান্ত অন্যমনস্কের মত চাহিয়াছিল। একটা স্টেশনে আসিয়া ট্রেনখানা থামিল। কয়জন যাত্রী কামরাখানাকে প্রায় শূন্য করিয়া নামিল। মিনিট দুই বিরতির পর ট্রেন আবার চলিল।

অকস্মাৎ সঞ্জীব ডাকিল—নলিনী দেবী!

নলিনী মুখ ফিরাইল। সঞ্জীব তখন মাথা তুলিয়া তাহারই দিকে চাহিয়াছিল। সঞ্জীবের সে দৃষ্টি দেখিয়া নলিনী শিহরিয়া উঠিল। প্রশান্ত দৃষ্টি তাহার অস্বাভাবিক উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। দেহের মধ্যে একটা অস্থিরতা সংযমের শাসন উচ্ছেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। নলিনী ব্যস্ত হইয়া বলিল—শরীর কি অসুস্থ হয়ে পড়ল সঞ্জীববাবু?

সঞ্জীব বলিল—না।

—তবে এমন করছেন কেন আপনি ?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঞ্জীব বলিল—কিছু নয়। আপনি আমার মায়ের কথা বলুন।

নলিনী তাহার এই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ কিছুই বুঝিল না। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতার অন্তরালে বেদনার সন্ধান যেন সে পাইল। সে সুগভীর সহানুভূতির সহিত বাছিয়া বাছিয়া মায়ের জীবনের এই কয় বৎসরের খুঁটিনাটি নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

আর একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিল।

সঞ্জীব বলিল—মায়ের কথা মনে করলে দেহে মনে শক্তি পাই আমি। মাতৃভাগ্যে আমার মত ভাগ্যবান কম লোকই আছে মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী গাঢ় স্বরে উত্তর দিল—সে কথা আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

নলিনী আবার বলিল—তিনিও তাঁর সন্তানভাগ্যের প্রশংসা করে গেছেন। মনকে আপনি পীড়িত করবেন না।

ইহার পর একটা নিস্তব্ধতায় দুজনেই যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। গর্জনমান গতিশীল গাড়িখানার গতি, গর্জন কিছুতেই সে আচ্ছন্নতাকে যেন স্পর্শ করিতে পারিল না। বাহিরে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছিল। গৈরিক-বর্ণ অসমতল প্রান্তর যেন নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

নলিনী সচেতন হইয়া উঠিল। বলিল—আমাদের নামতে হবে সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীবও সচেতন হইয়া বলিল—হ্যাঁ। এই যে, এসে পড়েছি দেখছি। এইখানে একদিন বেড়াতে এসেছিলাম মনে আছে ? এই বাংলোটা ? এটা তো ছিল না। এই বাংলোটা নূতন হয়েছে দেখছি।

একটা টিলার উপর সুদৃশ্য একটি বাংলো দেখা যাইতেছিল।

নলিনী বলিল—এটা মহেন্দ্রবাবুর বাংলো। এইখানেই তিনি থাকেন এখন। থাইসিস হয়েছে তাঁর।

সবিস্ময়ে সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—থাইসিস হয়েছে! তারপর আবার বলিল—শক্তিমান পুরুষ। ওঁর মতকে পথকে আমি ঘৃণা করলেও ওঁর শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি মিস গাঙ্গুলী।

ঠিক সেই সময়ই ওই বাংলোটার মধ্যে খাটে শুইয়া মহেন্দ্রবাবু কথা কহিতেছিলেন প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে। তাঁহার অসুখ লইয়াই কথা। তিনি বলিতেছিলেন—ও ডাক্তারদের কথা বাদ দাও তুমি। ওরা যে যা বলে বলুক, এ সারবার রোগ নয়। ওয়াল্টেয়র, পুরী, সিমলে, নৈনীতাল যাওয়া, ও শুধু টাকাব শ্রাদ্ধ করা। আমি এখানেই বেশ আছি।

কর্মচারীটি পুরনো লোক। বাবুর বাপের আমল হইতে এখানে কাজ করিয়া চুলে পাক ধরিয়াছে। সে বলিল—সারবে বলেই তো লোকে যায়। অন্ততঃ উপকারও তো হবে।

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—সে উপশম এখানেও হবে। রোদ আর মুক্ত বাতাসের এখানে অভাব নাই। থাইসিসের বীজাণু—থাক এত তুমি বুঝবে না।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি আবার বলিলেন—কালই তাহলে তুমি সদরে যাও। না। কলকাতাই যাও, এটর্নীর বাড়ি। বিষয় বন্দোবস্তের খসড়াটা করে নিয়ে এস। বিষয় যেন ভবিষ্যৎ পুরুষেও কেউ ভাগ করতে না পারে—নষ্ট করতে না পারে। আমার বংশ যেন চিরদিন মাথা উঁচু করে থাকতে পারে। এখানে আর কেউ প্রভুত্ব করছে এ আমি মনে করতেও শিউরে উঠি। গোপীনাথপুরের কি হল? ওটা ও এখনও দিতে চাচ্ছে না?

—না।

—যেমন করে পার যত দাম লাগে—ওটাকে কিনে ফেল।

চাকলার মধ্যে বাড়ির দোরে ঐটুকু—ও আমি বাদ রেখে যাব না। বাদ রেখে গেলে ও আর হবে না। যেমন করে হোক—বুঝলে? ধর্ম অধর্ম বাছতে গেলে চলবে না।

কর্মচারীটি নীরবে আদেশ শুনিল, কোন উত্তর দিল না। মহেন্দ্রবাবু আবার বলিলেন—হাসপাতাল, স্কুল, কুয়ো, টিউবওয়েল যা যা সব করা হয়েছে সেগুলোর আলাদা একটা দলিল হবে। দেবোত্তরের কতগুলো সম্পত্তি নিয়ে ঐগুলোর মধ্যে দিতে হবে। তার থেকে এ সবের খরচ নির্বাহ হবে।

কর্মচারী শুনিয়া গেল। কিন্তু যেমন নীরবে দাঁড়াইয়াছিল তেমনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—দাঁড়িয়ে রইলে যে। কিছু বলবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা মুস্কিল হচ্ছে—

—কি?

—আপনার সেবা শুশ্রূষা করবার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কানাই একলা পেরেও উঠছে না।

—হুঁ। মহেন্দ্রবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সূর্য পাটে বসিয়াছে। অস্তরাগ-রঞ্জিত আকাশে বিচিত্র বর্ণশোভা।

কর্মচারীটি বলিল—পিসীমা বলছেন তিনি এসে থাকতে চান। বলছেন—আমার বয়স হল, মরতে চলেছি, আমার আবার রোগের ভয়। তা তিনি—

—না। পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে একের পর এক আর একজনকে ধরবে। সে হবে না।

—তা হলে কি কলকাতা থেকে একজন নার্সের ব্যবস্থা—

—না। সেও সুবিধে হবে না।

অকস্মাৎ যেন চিন্তার ঘোর হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিলেন—।

বলিলেন—এক কাজ কর। কড়ি গাঙ্গুলীর কাছে লোক পাঠিয়ে দাও। ...না। একেবারে লোক পাঠিয়ে দাও, রমা বলে যে ঝিটি এখানে ছিল তার কাছে। সে হয় তো আসতে পারে।

সঞ্জীবের শরীর ও মনের অবস্থা দেখিয়া যাই-যাই করিয়াও নলিনী যাইতে পারিল না। একমাস অতিক্রান্ত হইয়া গেল। নলিনী চঞ্চল হইয়া উঠিল। এইবার তাহার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা আসিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ আছে। তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহার কর্তব্য যথাসাধ্য সে করিয়াছে।

কিন্তু এদিকে সঞ্জীবের অবস্থা দেখিয়া চিন্তা উদ্বেগ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ভগ্ন শরীরের এতটুকু উন্নতি হয় নাই। বরং যেন অবনতিই ঘটিয়াছে। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ কেমন যেন অস্থির হইয়া পড়ে সে। একটা বিমর্ষতার মধ্যে সদা-সর্বদাই যেন আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাহাকে প্রফুল্ল সজীব করিবার জন্য নলিনীর চিন্তার আর অবধি রহিল না। কিন্তু তাও যেন সে চায় না। তাহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা যেন সঞ্জীবের অহরহ। নলিনীর চিকিৎসকের মন, নানা কঠিন ব্যাধির উপক্রমণিকা এই অবস্থার মধ্যে লক্ষ্য করিল। কর্মে প্রবৃত্তি নাই, প্রশ্ন করিলে উত্তর দেয় না, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কোন বস্তুই যেন তাহাকে আকর্ষণ করে না।

প্রত্যহই নলিনী তাহাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিত। সেদিন সে তাহাকে জোর করিয়া ধরিল।

—চলুন সঞ্জীববাবু একটু বেড়িয়ে আসি। আজ আপনাকে যেতেই হবে। সেই টিলার উপরে যাব, চলুন।

সঞ্জীব তাহার মুখের দিকে চাহিল। তারপর বলিল—না।

—কমরেডের আহ্বান—এ আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

সঞ্জীব নীরব হইয়া রহিল। নলিনী বলিল—আমার অনুরোধ

রাখবেন না সঞ্জীববাবু? দু-একদিনের ভেতরেই চলে যাব আমি। আপনাদের সেই টিলার ছবি বড় ভাল লাগে আমার।

সঞ্জীব আর না বলিতে পারিল না।

বৈশাখের অপরাহ্ণ। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়া রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও প্রখরতার শেষ নাই। পায়ের তলায় মাটির বুকে বসন্তে উদ্গত ঘাসগুলির মাথায় ছোট ছোট ফুলগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। আশেপাশে বহু আকন্দফুলের গাছ। সেখানেও সব ফুলের স্তবক শুকাইয়া গিয়াছে। তপোভঙ্গে রুদ্রের রোষবহ্নিতে বসন্তশোভার অন্তরালে মদন যেন ভস্ম হইয়া গেল। দিগন্তে এখানে ওখানে কাল মেঘ মাঝে মাঝে যেন ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিতেছিল।

সঞ্জীবের কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে চলিয়াছিল নতমুখে নীরবে।

একস্থানে নলিনী বলিয়া উঠিল—এইখানেই আমাকে সেদিন ফুল পেড়ে দিয়েছিলেন, না?

সঞ্জীব বলিল—হুঁ।

নলিনী বলিল—আপনার কি হয়েছে সঞ্জীববাবু? অনেকদিন থেকেই জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। সঙ্কোচের জন্য তা পারি নি। আজ কিন্তু আর থাকতে পারলাম না।

সঞ্জীব শুষ্কস্বরে বলিল—কিছু তো হয় নি।

—আমার কাছে লুকোবেন না। শরীরে কি অসুস্থতা অনুভব করেন?

—না।

—তবে?

সঞ্জীব কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল —মনের অসুস্থতা আমার। কিন্তু সে বলতে আমায় অনুরোধ করবেন না মিস গাঙ্গুলী।

ব্যথিত চিত্তে নলিনী বলিল—আমায় এতোপর ভাবেন আপনি?

সঞ্জীব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল—সাবধানে এবার মিস গাঙ্গুলী। টিলা আরম্ভ হল।

নলিনী হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—দুর্গম পথের যাত্রী আমরা। হাতে হাত দিন কমরেড।

টিলার পর টিলা অতিক্রম করিয়া তাহারা চলিয়াছিল।

নিস্তব্ধ গুমোট অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। অকস্মাৎ একখানি ছায়া যেন মমতার মত তাহাদের সঙ্গে আসিয়া পড়িল।

নলিনী বলিল—আঃ ছায়াটি বড় মধুর লাগল, না সঞ্জীববাবু? দেখুন, দেখুন, সঞ্জীববাবু কি ঘন কালো মেঘ।

সঞ্জীববাবু মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল—একি? এ যে কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠেছে। উপরের দিকে তো তাকাই নি। ফিরুন, ফিরুন।

নলিনী তখনও আকাশের দিকেই চাহিয়াছিল। পুঞ্জিত নিকষ-কালো মেঘ তুলার মত ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া দ্রুত বিস্তারে পরিধিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। চারিদিক বিষণ্ণ নিথর। দলে দলে পাখীরা ত্রস্তস্বরে কলরব করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে লোকালয়ের দিকে। ঊর্দ্ধে আকাশের কোলে ঘূর্ণায়মান বিন্দুর মত চিল শকুনেরা পাক খাইয়া খাইয়া ত্বরিত বেগে নীচে নামিয়া পড়িতেছিল। দূর দিগন্তে একটা গর্জ্জনমান শব্দ ক্রমশঃ যেন নিকট হইয়া আসিতেছে।

দ্রুতপদে দুজনে ফিরিয়া চলিয়াছিল। গর্জ্জনমান শব্দটা ক্রমশঃ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ চারিদিকের মেঘাচ্ছন্নতার ছায়ার ম্লানিমা চকিত হইয়া উঠিল একটি তীব্র নীল দীপ্তিতে। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল গর্জ্জন ধ্বনি।

সঞ্জীব দাঁড়াইল। পিছন ফিরিয়া দেখিয়া সে বলিল—ঝড় যে এসে পড়ল। আশ্রয়—আশ্রয় কোথায় পাই?

নলিনী পিছন ফিরিয়া দেখিল পশ্চিম দিগন্ত একটি প্রগাঢ় ধূলার যবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

সঞ্জীব উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিকে আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছিল।

নলিনীই তাহাকে ডাকিল—সঞ্জীববাবু, আসুন, আসুন, ঐ গর্তটার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিই। রাস্তার জন্য বা অন্য কোন প্রয়োজনে কাহারা টিলার পার্শ্বদেশ কাটিয়া কাঁকড় লইয়া গিয়াছে। তাহারই ফলে ছোট একটি গহ্বরের মত আশ্রয়। তাহারই মধ্যে উভয়ে গিয়া আশ্রয় লইল। দেখিতে দেখিতে গর্জ্জনমান ঝড় টিলার মাথার উপর দিয়া বিপুল বেগে বহিয়া গেল।

ঝঞ্ঝাতাড়িত উপলখণ্ডের পরস্পর সংঘর্ষে বিচিত্র শব্দ উঠিতেছিল। ঝড়ের প্রবাহের মধ্যে একটা উন্মত্ত হা হা রব। ধূলার প্রবাহে চারিদিক অন্ধকার। ছোট গহ্বরটির মধ্যে দুটি নর-নারী শঙ্কাতুর বিস্ময়ে ঝড়ের এই উন্মত্ত লীলা দেখিতেছিল।

অকস্মাৎ নলিনী বলিয়া উঠিল—অদ্ভুত, এ অদ্ভুত, সঞ্জীববাবু।

—আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? আমার মনে হচ্ছে আদিম যুগের মানুষ আমরা। ঝড়ের তাড়নায় আজই সর্বপ্রথম নীড় আবিষ্কার করলাম এই গহ্বরের মধ্যে। একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সঞ্জীবের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল।

বিপুল উত্তেজনায় কম্পিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ নলিনী হ্যাঁ। আদিম যুগের মানুষ আমরা—আমি নর—তুমি নারী। ঝঞ্ঝার তাড়নায় গহ্বরের মধ্যে অকস্মাৎ একত্র হয়েছি নীড় রচনার জন্য। ভবিতব্যতার বিধানে—প্রকৃতির ইঙ্গিতে।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে নলিনী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার হাত দুটি ধরিয়া সঞ্জীব কম্পিত স্বরেই বলিল—নলিনী আমি তোমায় ভালবাসি।

তাহার স্পর্শে নলিনী চমকিয়া উঠিল। ব্যস্তভাবে বলিল—উত্তেজিত হবেন না সঞ্জীববাবু, আমরা কমরেড।

উত্তেজনাভরেই সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ—কমরেড, কর্মসাথী। নীড় রচনা করব আমরা দুজনে। আমি বয়ে নিয়ে আসব উপাদান, তুমি

করবে রচনা। আমরা সত্যিই কমরেড।

নলিনী বলিল—সঞ্জীববাবু—সঞ্জীববাবু।

—শুনতে পাচ্ছি তোমার ডাক। কিন্তু জান নলিনী, প্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযত করা চলে কিন্তু প্রকৃতির প্রেরণাকে অবহেলা করবার সাধ্য কারও নাই। একদিন তোমাকে বলেছিলাম, রুদ্রের অনুচর আমরা, আমাদের তপোবনে মদনের প্রবেশ নিষেধ, ভুল—ভুল। স্বীকার করছি সে ভুল। তোমার কথাই সত্য, মদন ভস্ম হয়, কিন্তু প্রকৃতির দুলাল অতনুর গতি অবারিত।

নলিনী বলিল—সঞ্জীববাবু তা হয় না। আর তা হয় না। মায়ের কাছে যে পথ আমি পেয়েছি—সে পথ ত্যাগ করব না, করতে পারব না। পথ ছাড়ুন আপনি।

সঞ্জীবের চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছিল। সে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথরোধ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—না।

দৃপ্তভাবে নলিনী বলিল—আপনি অতি বর্বর, অতি নীচ—অতি হীন হয়ে গেছেন।

সঞ্জীব বলিল—হয়েছি। জান, জেলে বসে বসে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কল্পনায় তোমায় নিয়ে আমি নীড় রচনা করে এসেছি। এ কদিন সেই কথা নিবেদন করবার জন্য পাগলের মত অস্থির হয়ে ফিরেছি। বর্বর, হীন, নীচ যা বল তুমি, হয়েছি তোমার জন্য, তোমায় আমার পেতে হবে।

নলিনী দৃঢ়স্বরে বলিল—পথ ছাড়ুন।

—না।

নলিনী দৃপ্তভাবে এবার সঞ্জীবকে ঠেলিয়া পথ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। সঞ্জীব যেন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। সে প্রতিরোধ কল্পে নলিনীকে ধাক্কা দিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল। সে ধাক্কা নলিনী সহ্য করিতে পারিল না। ঘুরিয়া উপুড় হইয়া সে শুইয়া পড়িল। সঞ্জীব দাঁড়াইয়া ছিল পাথরের মূর্তির মত।

নলিনী ধীরে ধীরে উঠিল। কপালে একটা ক্ষত হইতে রক্ত

পড়িতেছিল। রক্তের উত্তপ্ত স্পর্শে নলিনী কপালে হাত
য়া দেখিল রক্ত। সে বলিল—দেখুন তো পাগলের মত কি
লেন? ছিঃ।

রক্ত দেখিয়া সঞ্জীবের যেন জ্ঞান ফিরিল। সে নত মস্তকে বলিল—
এই আমি বর্বর, নীচ, হীন, মিস গাঙ্গুলী। আমায় মাফ করবেন।
সঙ্গে সে উন্মত্ত ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। দুর্দান্ত ঝড়ের মধ্যে
কাশচারী বিহঙ্গের মত দূর-দূরান্তে সে যেন ভাসিয়া চলিয়াছিল।
ন হইতে বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিল—সঞ্জীববাবু—সঞ্জীববাবু!
দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। দেখিল তাহার পশ্চাতে নলিনী তাহাকে
স্বরে আহ্বান করিতেছে।

—এই ঝড়ের মধ্যে নির্জন প্রান্তরে আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে কোথায়
মি? ফিরে এস—নয়তো দাঁড়াও। আমায় সঙ্গে নাও!

বহু কষ্টে সঞ্জীব ফিরিল। নলিনীর চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল।
বলিল—এত বড় শাস্তি দিতে চাও কেন তুমি আমাকে? কী করেছি
মার আমি? কোথায় যাবে তুমি? জান, মা তোমার ভার আমা
য় গেছেন।

সঞ্জীব স্থির দৃষ্টি তাহার উপর স্থাপন করিল এবং বলিল—সত্যি
। নলিনী?

নলিনী তাহার হাত ধরিয়া বলিল—ঝড় এখনও থামে নাই। এস
ানে যাই। যে নীড় রচনা করেছি আজ এত শীঘ্র তাকে ভেঙে
য়া না।

গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নলিনী বলিল—হ্যাঁ, মা তোমায়
মার উপর ভার দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তুমি আমায় কমরেড হিসাবে
[illegible] আমাকে গড়ে তুলেছি আমি।
[illegible] বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিল।
[illegible] কিন্তু একি করলে বল তো?
মুছিতে গেল। বাধা দিয়া সঞ্জীব বলিল—মুছো

না। এস ওই রক্ত নিয়ে আমি তোমার সীমন্তের সিঁদুর রচনা করে দিই। গুহার মধ্যে মিলন আমাদের—এই আমাদের বিবাহ। আমি নর—তুমি নারী। আমি বর—তুমি বধূ। এক সঙ্গে দুজনে নীড় রচনা করব। এক কর্মে আমাদের চারখানি হাত অগ্রসর হয়ে আসবে। আমরা কমরেড—এস।

*　　*　　*　　*

আরও কয়টা টিলার পরে—একটা টিলার উপর সেই বাংলোটির মধ্যে তখন মহেন্দ্রবাবু শয্যায় শুইয়া ঝড়ের আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন। রমা আসিয়া শার্সিগুলি বন্ধ করিয়া দিতেছিল।

রমা আসিয়াছে—আজই আসিয়াছে। আহ্বান মাত্রেই সে আসিয়াছে। মহেন্দ্রবাবু মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিলেন তখন।

কর্মরতা রমার দিকে চাহিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—রমা।

রমা তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। তিনি বলিলেন—তুমি থাকবে তো রমা?

মৃদু অনুচ্চ স্বরে শান্ত মেয়েটি বলিল—থাকব।

তাহার হাত ধরিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—উইলে তোমায় আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাবো রমা।

তিনি তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া রমা বলিল—না।

বাবু বলিলেন—ঈশ্বরের দিব্যি রমা—

রমা শুধু হাসিল। বিচিত্র তিক্ত হাসি।

তারপর বলিল—ওষুধ খাবার সময় হয়েছে আপনার।

॥ সমাপ্ত ॥